ঢাকার ইতিবৃত্ত

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি



র‍্যাডিক্যাল

কলকাতা

প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ :
জানুয়ারি ২০০০

মুদ্রক :
গুপ্ত প্রেস
৩৭/৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০০০৯

প্রকাশক :
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০০০৯
দূরভাষ : ২২৪১-৬৯৮৮

উৎসর্গ

'স্মৃতির সঞ্চয়ে আবাল্য অংশীদার'
আমার অনুজ-অনুজা
তাহের, হাবীব, হাজেরা, জমিলা ও মোমেনাকে-

ভূমিকা

প্রায় চারশত বৎসর আগে, মুঘল সুবেদার ইসলাম খাঁ কর্তৃক বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থাপনের পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এখানে একাধিকবার রাজধানী স্থাপিত হয়েছে। ঢাকা যেমন একদিকে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অধিকারী হয়েছে, অন্যদিকে ঢাকাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনও একে একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের অধিকারী করে রেখেছে। আজকের ঢাকা অতীতে ঐতিহ্যের অনেকটাই ধারণ করে আছে, আবার ঐতিহ্যের অনেক কিছু আজ বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে। বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রচনার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের অবতরণা।

ঢাকায় আমার জন্ম। আজন্ম-লালিত ঢাকা আমার কাছে যেমন প্রিয়, তেমনি আমার সাহিত্য-সাধনায়ও ঢাকা একটি প্রিয়-প্রসঙ্গ। ষাটের দশকে আমি ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটি গবেষণা-বৃত্তি নিয়ে লন্ডন যাই। সেখানে ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ঢাকার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির বেশ কিছু উপাদান এবং তথ্যের সন্ধান পাই। যাটের দশকের সেসব উপাদানকে ভিত্তি করে রচিত কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়ে আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। তারপর থেকে অদ্যাবধি সময় ও সুযোগ পেলেই ঢাকা-প্রসঙ্গে প্রবন্ধাদি রচনা করে আসছি। ষাট ও সত্তর দশকে ঢাকার বেশ কিছু বিষয়ে আমিই প্রথম গবেষণা ও প্রবন্ধ-রচনায় উদ্যোগী হই। উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে– ঢাকার মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিপর্ব, ঢাকা-কেন্দ্রিক পুথি সাহিত্যের চর্চা, উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্য সাধনা ও ঢাকার সাময়িক পত্রাদির বিবরণ। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলি দীর্ঘকাল গ্রন্থকারে অগ্রথিত ছিল। তবে আনন্দের বিষয়, এসব প্রবন্ধে অনুপ্রাণিত হয়ে, পরবর্তীকালে অনেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। গবেষক ড. মুনতাসির মামুন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে আমার কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে 'চকবাজারের কেতাবপট্টি' ও 'উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (১৯৯০) নামে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কোলকাতার বটতলার অনুরূপ ঢাকায় চকবাজারে অবস্থিত 'কেতাবপট্টি' ও ঢাকার সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মুদ্রণযন্ত্রকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের সাহিত্য সাধনার যে পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল, তারই ইতিবৃত্ত 'চকবাজারের কেতাবপট্টি' গ্রন্থে রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি এবং অপর গ্রন্থ 'উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি' দেশে ও বিদেশে সুধী সমাজে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে।

ঢাকার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে আমার রচিত নির্বাচিত কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এ' গ্রন্থে। গ্রন্থটিকে দুটি পর্বে কাল বিভাজন করা হয়েছে। প্রথম পর্বে বিশ শতক এবং দ্বিতীয় পর্বে উনিশ শতক। এ' পর্বের প্রথম অধ্যায়ে ঢাকার চকবাজারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও বিবর্তনের কথা বলা হয়েচে। দুটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রের প্রতিলিপিও

'কিংবদন্তীর চকবাজার' প্রবন্ধে সংযোজন করা হলো। ঢাকার এককালে প্রসিদ্ধ ঈদ, মহররম ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত তিনটি মিছিলের কথা বলা হয়েছে 'ঢাকার মিছিল' প্রবন্ধে। ঢাকার মিছিল নিয়ে ইত:পূর্বে কোনো বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই। তবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আলম মুসাওয়ার নামে এক চিত্রশিল্পী ঢাকার ঈদ ও মহররমের মিছিল নিয়ে ৩৯টি চিত্র অঙ্কন করেছেন– যা বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। একালেও এই মিছিল চিত্রশিল্পীদের উপাদান যুগিয়েছে। ঢাকার আদি অধিবাসীদের রসিকতা বা পরিহাসপ্রিয়তা কিংবদন্তী-তুল্য। 'ঢাকাই রসিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত 'ঢাকার ঐতিহ্য' শীর্ষক এক বিশেষ সেমিনারে পঠিত হয়। মধ্যযুগের সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিমের কাব্যে আমরা প্রথম ঢাকার নামোল্লেখ পাই। এরপর থেকে, বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বা ঢাকার অঞ্চলবিশেষ এবং এর সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক ছড়া, কবিতা বা গান রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে 'কবিতায় সেকালের ঢাকা' প্রবন্ধে। যে-কোনো অঞ্চলেই মানুষের জীবন-ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকারও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। জেম্‌স টেইলার ১৮৩৮ সালে অনুষ্ঠিত লোক গণনা অনুসরণে ঢাকা শহরের অধিবাসীদের পেশা, ব্যবসা এবং কাজের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন,তাতে ১৬২টি জীবিকার নাম রয়েছে। এসব জীবিকার মধ্যে বেশ কিছু আজ বিস্মৃত প্রায়, শুধু তাদের স্মৃতি জড়িত রয়েছে ঢাকার বিভিন্ন পাড়ার বা মহল্লার নামের মধ্যে। সেকালের লুপ্ত বা বিস্তৃতপ্রায় কিছু জীবিকার পরিচয় 'ঢাকার লুপ্ত জীবিকা' প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে।

একটি প্রবন্ধে সেকালের ঢাকার বিনোদনের চালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিশ শতকের গোড়ার দিকেও ঢাকার শাহ্‌বাগ এলাকায় বন্য শূকর বা হরিণ শিকার হতো। ঢাকার রেসকোর্স এলাকায় এককালে সাহেব-মেমসাহেবরা ঘোড়দৌড় উপভোগ করতেন, অথবা মাঠের এক পাশে বসে 'পোলো' খেলা দেখতেন। শাহী দরবারে অথবা নবাব বাড়ির রংমহলে বাঈজীদের নূপুর নিক্কন শোনা যেত। এসব কথা আজ অতীত স্মৃতি মাত্র। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 'বাঙ্গালা যন্ত্র' নামে ঢাকায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পরই ঢাকাকেন্দ্রিক মুদ্রণ ও প্রকাশনার সূচনা। এর পাশাপাশি ঢাকার সাময়িকপত্র এবং বিভিন্ন সংগঠন ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করে ঢাকার সংস্কৃতিচর্চার সূত্রপাত। এ বিষয়ে আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে রচিত হয়েছে 'সেকালের ঢাকার সংস্কৃতি-চর্চা' প্রবন্ধটি।

ঢাকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক এক পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল এবং এখানে অনেক গুণীজন স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। স্থায়ীভাবে বসবাস না করলেও বেশ কিছু বরেণ্য ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে ঢাকায় আগমন করেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন, নবীন সেন, রাজকৃষ্ণ রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কথা বলা চলে। সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কেশবচন্দ্র সেন, ইসমাইল হোসেন শিরাজী এবং এ্যানি বেসান্ত, স্বামী বিবেকানন্দ। রাজনীতিবিদদের মধ্যে এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, জওয়াহেরলাল নেহরু, মাওলানা

শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। বলা বাহুল্য, তাদের শুভাগমনে ঢাকা এবং ঢাকাবাসী প্রীত এবং ধন্য হয়েছিল। 'সেকালের ঢাকায় শুভাগত সুধীবৃন্দ' প্রবন্ধে আমরা সে বৃত্তান্তই তুলে ধরেছি।

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ দুবার এসেছিলেন এবং নজরুল এসেছিলেন বেশ কয়েকবার। এখানে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁদের বিচরণ এবং সংবর্ধনার কথা আমরা দুটি পৃথক প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। ঢাকার প্রধান সামাজিক উৎসব ঈদ্ উল্ ফিতর এবং ঈদ্ উল্ আজহা নিয়েও একটি প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

মৎপ্রণীত 'চকবাজারের কেতাবপট্টি' এবং 'উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শীর্ষক দু'টি গ্রন্থ সংস্করণ শেষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। এই দুটি গ্রন্থের পরিশিষ্ট বাদ দিয়ে মুল পাচটি প্রবন্ধই বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে (উনিশ শতক)র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি হচ্ছে 'চকবাজার কেতাবপট্টি', 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী', 'উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্যচর্চার ধারা', 'বান্ধব'– 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন', 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ও ঢাকার নাট্যচর্চার ধারা'। এ পর্বে আরো চারটি নতুন প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন– উনিশ শতকে ঢাকার মুদ্রণ ও প্রকাশনা, 'উনিশ শতকে ঢাকার সাময়িকপত্র', 'সাময়িক পত্রে সেকালের ঢাকা-১' এবং 'সাময়িক পত্রে সেকালের ঢাকা-২'।

'ঢাকার ইতিবৃত্ত' ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শীর্ষক বর্তমান গ্রন্থে আমার রচিত গ্রন্থকারে অগ্রথিত এবং গ্রথিত মোট একুশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। মোটামুটিভাবে দুই শতকে ঢাকার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি রূপরেখা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। এ চিত্র সামগ্রিক বলবো না, কারণ কোনো গবেষণাকর্মই চূড়ান্ত নয়। যেহেতু প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্র নিবন্ধ রূপে রচিত হয়েছে, তাই কোন কোন প্রবন্ধে তথ্য বা বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আশা করি, পাঠকবর্গ তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

এ গ্রন্থের উপদান সংগ্রহে ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের যে সহায়তা পেয়েছি সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট আমি ঋণী। এ গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত বেশ কিছু দুষ্পাপ্য চিত্র সংযোজিত হয়েছে। এসব চিত্র বা আলোকচিত্রের উৎস-সূত্র উল্লেখ না করলেও আমি সংশ্লিষ্ট সকলের ঋণ এবং সৌজন্য স্বীকার করছি। আলোচ্য গ্রন্থপ্রকাশে 'গতিধারার' স্বত্বাধিকারী জনাব সিকদার আবুল বাশারের উদ্যোগ ও আন্তরিক প্রয়াসে আমি বিশেষভাবে মুগ্ধ। সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

সূচিপত্র

ঢাকা

তোমার সকল গৌরব সতত চিত্তহারিণী,
মোগল যুগের তুমি এক প্রাণবন্ত চিত্র।
তোমার রূপ ও অলঙ্কার অনন্য,
এবং এশিয়ার সংস্কৃতি ছড়িয়ে আছে
তোমার অঙ্গে
হে পুষ্পনগরী ঢাকা, প্রাচ্যের তুমি যে হৃদয় (অনূদিত)।

–খালিদ বাঙ্গালী

(উর্দু 'জাদু' পত্রিকায় প্রকাশিত)

বঙ্গ অলঙ্কার তুমি যে তা জানি পূর্ববঙ্গে।

–মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(ঢাকায় সংবর্ধনার উত্তরে)

ধন্য ঢাকা ভূমি! পুণ্যবতী তুমি
বিশাল বাঙলা দেশে।

–মোজাম্মেল হক

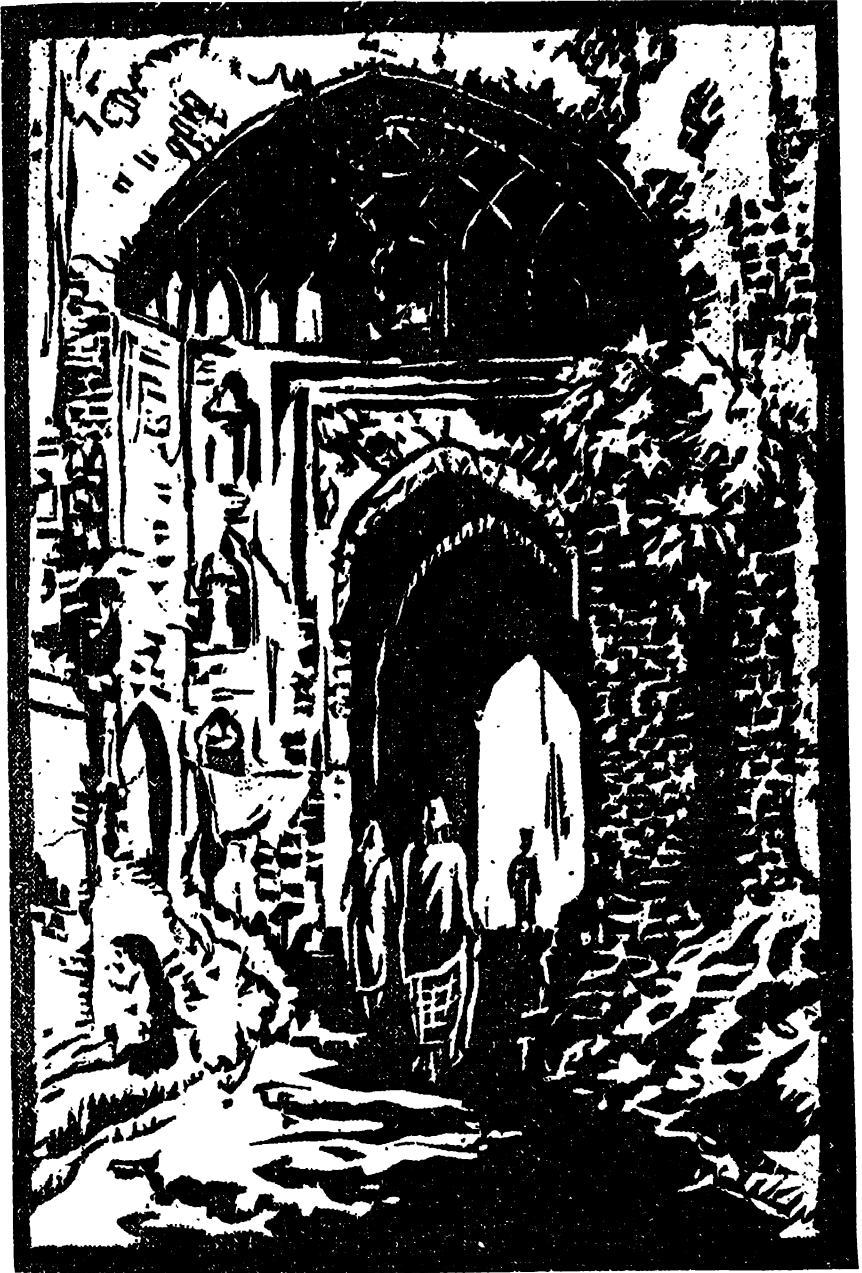
('জাতীয় ফোয়ারা' কাব্য)

পূর্ববঙ্গের উদয়াচল ঢাকা।

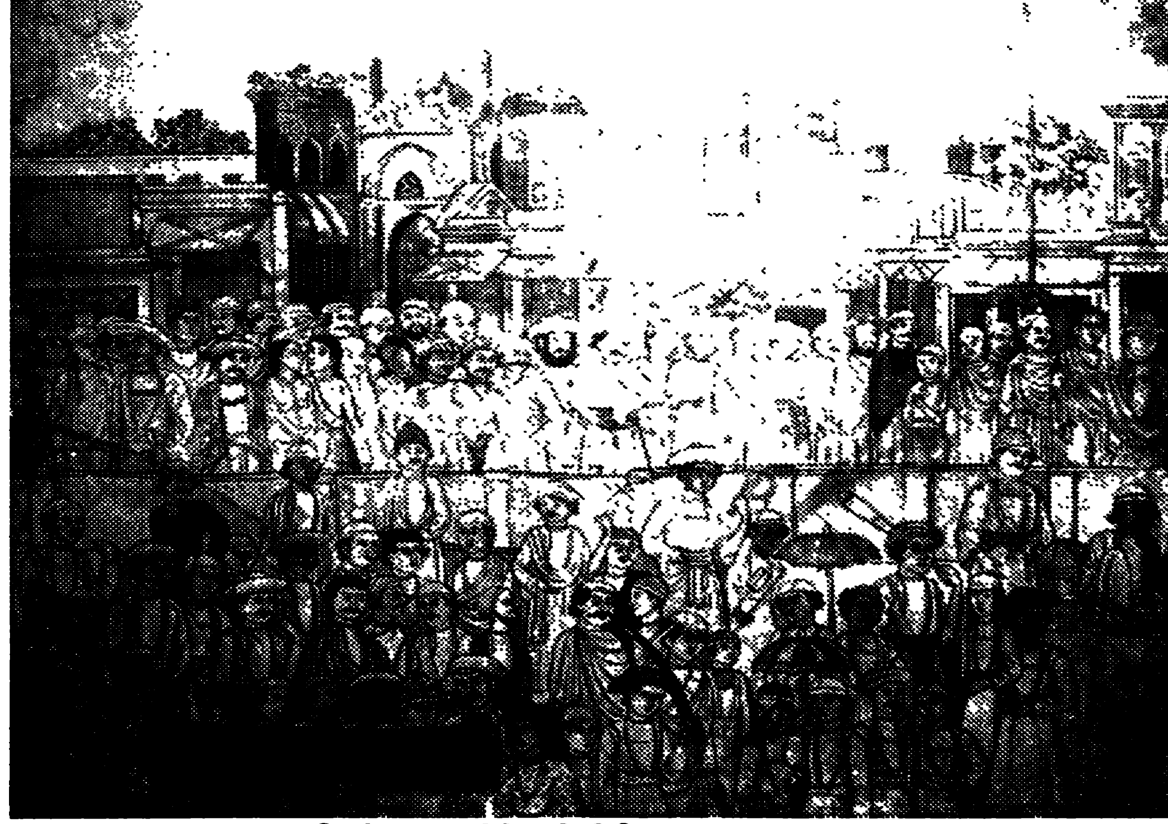
(ঢাকা প্রকাশ)।

প্রথম পর্ব

(বিশ শতক)



পঞ্চাশের দশকে 'বড় কাটরা' (শিল্পী-হামিদুর রহমান)



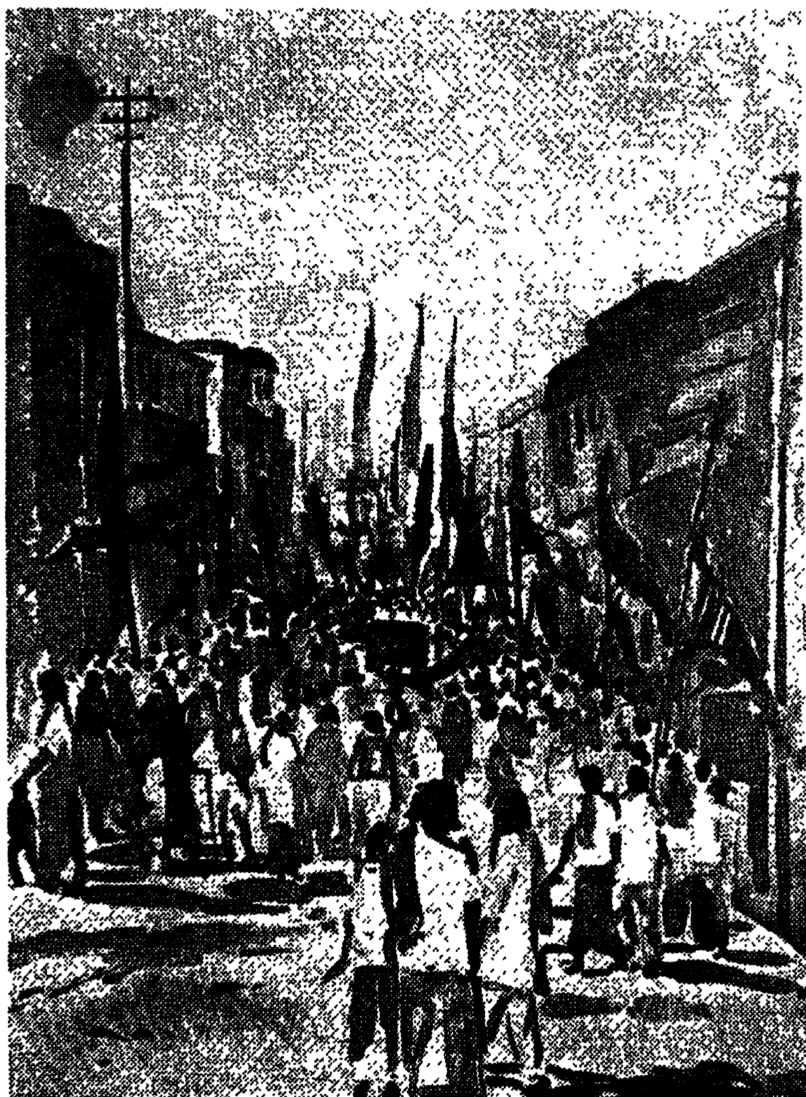
প্রাচীন চিত্রে ঈদের মিছিল (চিত্রশিল্পী–আলম মুসাওয়ার)



১৮৯০ সালের চকবাজার, মাঝখানে 'বিবি মরিয়ম' কামান



ধোলাই খালেব উপর ওয়াল্টার্স সাহেবের লোহাব পুল



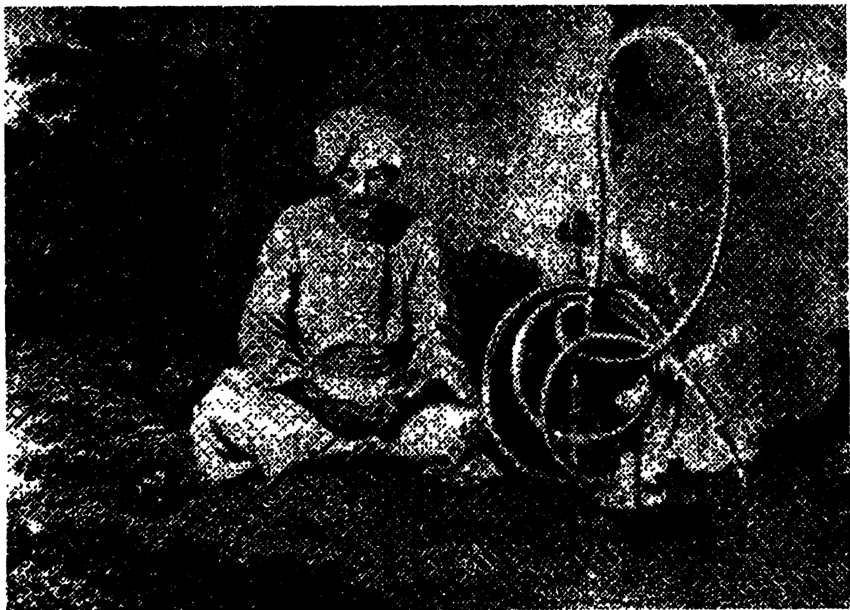
বিশ শতকের ঢাকায় মহররমের মিছিল (চিত্রশিল্পী খাজা শফিক আহমদ)



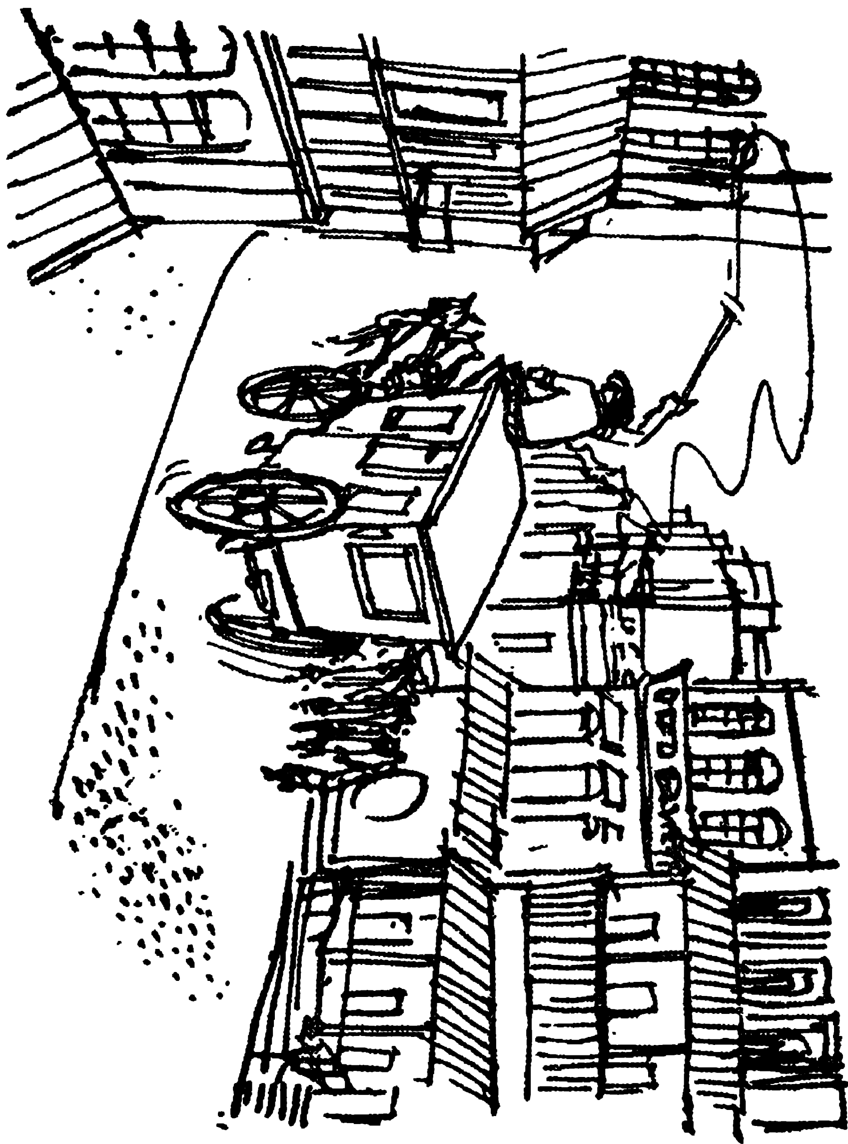
ঢাকার লুপ্ত জীবিকা : ভিস্তিওয়ালা (প্রাচীন পঞ্জিকার চিত্র)



প্রাচীন এক চিত্রে হাতির পিঠে মাহুত



প্রাচীন চিত্রে হুঁকা ও বনেদী হুঁকা



ঢাকার এক রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি ও গাড়োয়ান (চিত্রশিল্পী : রফিকুন নবী)

কবি-সম্রাট্ আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঢাকায় আগমন-উপলক্ষে

মুসলিম-হল ছাত্রবৃন্দের

অভিনন্দন

[illegible]

মুসলিম-হল ছাত্রবৃন্দ

মুসলিম হল ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্র-সংবর্ধনার মানপত্র



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ-ক্রমে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা প্রদান

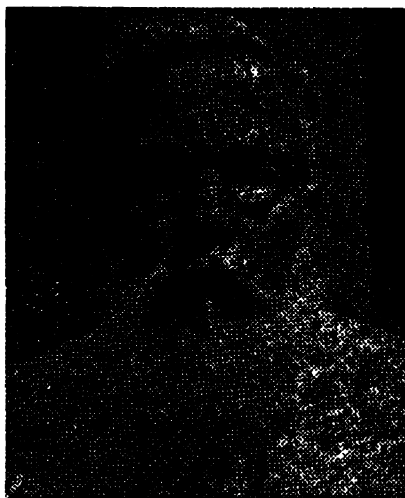
বাসন্তিকা।

এই কথাটি মনে রেখো, —
তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে, আপন মনে,
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

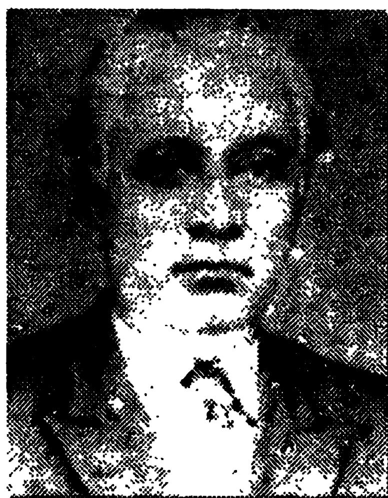
দিনের পথিক মনে রেখো, —
আমি চলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ওপার থেকে গেল ডেকে,
ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়,
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঢাকায় বসে জগন্নাথ হলের 'বাসন্তিকা' পত্রিকার জন্য লেখা গান



ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন



কবি আবদুল কাদির



মোহাম্মদ কাসেম



জসীমউদ্‌দীন

ঢাকায় কয়েকজন নজরুল-সুহৃদ

অভিযান

নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান।
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ—
"মানুষ মহীয়ান।"
চারিদিকে আজ ভীরুর মেলা
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কে উজান?
পাতাল ফেড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান॥

সহজ-সাজের নাইরে সময়
বেরিয়ে পড় আয়,
সব বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা মাথায় গায়।
আসবে রণ-মৃত্যু কবে,
সেই আশায়ই রইনি সবে ;

রাত পোহাবে প্রভাত হবে—
গাইবে পাখী গান
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান।

আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রাপথিক সব
এ উহারে হান্‌ছে আঘাত
করছে কলরব।

অভিযানে বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্ আগে চল্
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান।
ঊষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
"জয় নব উত্থান।"

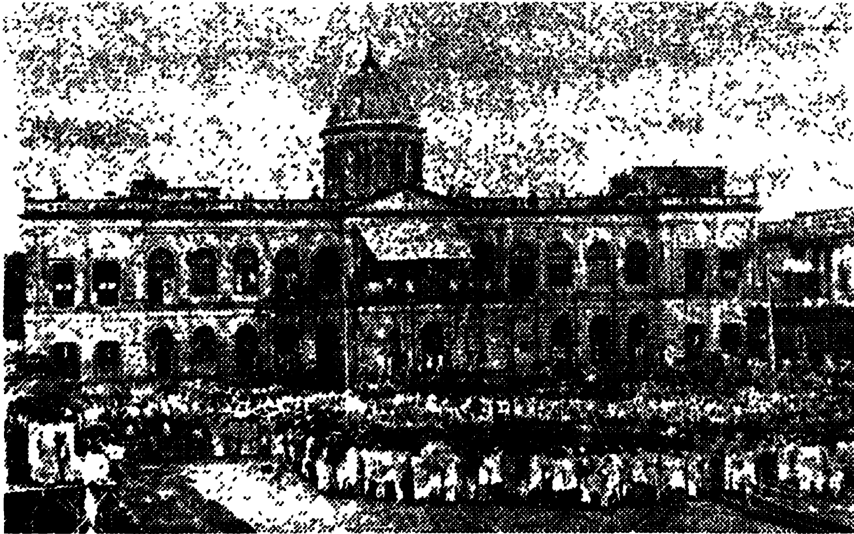
নজরুল ইসলাম

নারাণগঞ্জ,
২-৭-২১.

ঢাকার পত্রিকা 'অভিযান' এর জন্য রচিত নজরুলের কবিতা



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের সমাবর্তন-উৎসবে 'ডি-লিট' উপাধিতে ভূষিত শরৎচন্দ্র



আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত লাঠি, তরবারি ও কুস্তি খেলা (আগস্ট ১৯২৯)

কিংবদন্তির চকবাজার

সেকালের ঢাকা ছিল ছোট্ট একটি শহর। আর চকবাজার ছিল ঢাকার প্রাণবিন্দু– সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের প্রধান কেন্দ্র। বিত্ত, সম্প্রদায় ও জীবিকা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের এটি ছিল মিলনক্ষেত্র। চকবাজারের তুলনা আজও একমাত্র চকবাজার। কালপ্রবাহের বহু পরিবর্তনের মধ্যে চকবাজার তার ঐতিহ্যে ও গৌরবে আজও অনন্য।

মুঘল যুগে চকবাজারের প্রতিষ্ঠা। নবাব শায়েস্তা খান ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে চকবাজারের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়েই চকবাজারের উদ্বোধন। চকবাজারের কেন্দ্রস্থলে বাজারটি প্রতিষ্ঠিত হয় আরও পরে— ১৭০২ সালে। প্রতিষ্ঠা করেন মুর্শিদকুলী খান। এই বাজারটি 'পাদশাহী বাজার' নামেও খ্যাত ছিল। কারণ, বাজারের উত্তরে অবস্থিত মুঘল দুর্গ থেকে নায়েব-নাজিমরা এখানে আসতেন বাজার-সওদা করতে।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও চকবাজারের ভৌগোলিক গুরুত্ব কম ছিল না। চকের দক্ষিণে নিকটেই ছিল বুড়িগঙ্গা নদী। প্রধানত এই নদীপথেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পণ্যদ্রব্যাদি চকবাজারে আসত। সে কারণে চকবাজার 'চকবন্দর' নামেও খ্যাত ছিল। চকবাজার ঢাকার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত না হলেও এর অবস্থান ছিল এমনই যে, বাজারের দশদিক থেকে প্রায় দশটি রাস্তা এসে মিলেছে এই চকবাজারের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ও সামাজিক মিলনক্ষেত্রে। লক্ষণীয় বিষয়, চকবাজারের চারপাশে প্রধান সড়ক আর মাঝখানে প্রধান বাজার এই প্রাকৃতিক কাঠামোটিও প্রায় চার শ' বছর ধরেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

শায়েস্তা খান নির্মিত চক মসজিদটি শাহী মসজিদ নামে খ্যাত। এই মসজিদের চওড়া ও বড় খিলানগুলো আওরঙ্গাবাদ ও আহমদ নগরের রীতি অনুসারে শায়েস্তা খান এদেশে প্রচলন করেন। এগুলো শায়েস্তাখানী ধরন বা রীতি নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ কাটরা মসজিদটিও এই রীতিতে নির্মিত। ভূমি থেকে প্রায় দশ ফুট উঁচুতে দ্বিতলে চক-মসজিদটি অবস্থিত এটি ছিল দৈর্ঘ্যে ৫০ ফুট এবং প্রস্থে ২৬ ফুট। দু'পাশে দু'টি খিলান ছাড়াও মাঝখানে ছিল চারটি খিলান। ছাদের চার কোণে চারটি ছোট মিনার এবং মাঝখানে তিনটি বড় গম্বুজ। মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল সুউচ্চ মিনার, যার নিচে ছিল মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথ। দক্ষিণেও ছিল একটি ছোট্ট প্রবেশ পথ।

চকবাজারের শাহী মসজিদের সামনে যে খোলা অঙ্গনটি ছিল বর্তমানে তা আবৃত করে সম্প্রসারণ করা হয়েছে আয়তন এখন ৯৪ ফুট × ৮০ ফুট। এছাড়া মসজিদের প্রধান মিনারটিও সংস্কার করে আরও উঁচু করা হয়েছে।

স্যার চার্লস ডয়লির আঁকা (১৮২৭) চকবাজার শাহী মসজিদের একটি চিত্র 'এন্টিকুইটিজ অব ঢাকা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ছবির নিচে চিত্র পরিচিতিতে বলা হয়েছে,

'চক (বাজার) ও হোসেনী দালান'। সম্ভবত এটি কাল্পনিক চিত্র। কারণ অঙ্কিত ইমারতের সঙ্গে ঢাকার হোসেনী দালান বা চক মসজিদ কোনটিরই সাদৃশ্য নেই। তা ছাড়া হোসেনী দালানের পাশে চকবাজারের অবস্থান নয়। চকের শাহী মসজিদটিও কোনোকালে হোসেনী দালান নামে পরিচিত ছিল না, যদিও উক্ত গ্রন্থে ঢাকার বিবরণীতে লেখা হয়েছে– '১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই ভবনটি 'হোসেনী দালান' নামে খ্যাত'। এই বিভ্রান্তির মূল কারণ বলা যায় যে, হোসেনী দালান ও চক মসজিদ উভয় ইমারতের দ্বিতলে ছয়টি সুউচ্চ খিলান অনেক দূর থেকেও দেখা যেতো।

ডয়লির বিবরণীতে আর একটি তথ্য পাওয়া যায়, তা হচ্ছে আঠারো শতকের গোড়ার দিকে এই মসজিদটি ধর্মনিষ্ঠ নবাবের নামাজ আদায়ের স্থান ছিল।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ও ব্রাড্‌লি বার্ট রচিত 'রোমান্স অব এ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থে মুঘল যুগের রাজকীয় জৌলুসের উল্লেখ করে বলা হয়—

> আগেকার দিনের শান শওকত না থাকলেও চক মসজিদে এখনো নামাজীদের ভিড় জমে। ঈদের সময় মসজিদটি বিশেষভাবে আলোকিত করা হয়। পুরাতন জীবন এবং রুচির কিছুটা যেন আজও সে ধরে রেখেছে।

ব্র্যাড্‌লি বার্ট চকবাজারের যে ঐতিহ্যের কথা বলেছেন, তা তিরিশ বা চল্লিশের দশকেও অক্ষুণ্ন দেখেছি। বলা চলে, চক মসজিদ তখন কেন্দ্রীয় মসজিদের ভূমিকা পালন করত। তখন মসজিদে মসজিদে মাইকে আজান প্রচারিত হতো না। চক মসজিদের সুউচ্চ মিনার থেকে উচ্চারিত মুয়াজ্জিনের আজান বহুদূর থেকে শোনা যেত। চার-পাশের মসজিদের মুয়াজ্জিনগণ চক মসজিদের আজান শুনেই আজান দিতেন। রমজানের বা ঈদের চাঁদ দেখা দিলে এই মসজিদের সামনে থেকেই তোপধ্বনি করা হতো। রমজান মাসে বিশেষ করে 'তারাবী'র নামাজের সময় ঝাড়বাতির আলোকে মসজিদ আলোকিত হতো। রমজান মাসে রোজাদারদের জন্য চারদিক থেকে নানা রকমের ইফতারী আসত। নানা রকম দ্রব্যের মিশ্রণে প্রস্তুত হতো এক মিশ্র ইফতারী, যা শুধু রোজাদারদের কাছেই আকর্ষণীয় ছিল না, এর আকর্ষণে ছোট ছোট ছেলেরাও বাড়ির ইফতারী ফেলে মসজিদে ছুটত।

জুমার দিনে চক মসজিদের জৌলুস দেখার মতো। মনে হতো যেন এ আরেক ঈদের জামাত। মসজিদের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে রাস্তা পর্যন্ত এসে পৌঁছত জামাতের সারি। ঈদের জামাতের মতোই মসজিদ প্রাঙ্গণে ভিখারীদের ভিড় লেগে থাকত।

জুমার নামাজের আরেকটি আকর্ষণ ছিল নামাজ শেষে মিষ্টান্ন বিতরণ। মসজিদের আশ-পাশের লোকজন বিতরণের জন্য মিষ্টান্ন পাঠাত, কেউ মানত করে, আবার কেউবা বিনা মানতে। আমিরতি বা জিলাপির *ঠোঙ্গাও* ছিল বিশেষ ধরনের, শুকনো কাঁঠালপাতা বা বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি।

চক মসজিদে জামাতের সঙ্গে জানাজা লাভ বিশেষ সৌভাগ্যের বলে মনে করা হতো। এই মসজিদের জানাজার জন্য শহরের দূর-দূরান্ত থেকে মুর্দা নিয়ে আসা হতো।

চকবাজার মসজিদটি দ্বিতলে অবস্থিত। এর নিচের তলায় উনিশ শতকের শেষ দিকে গড়ে *ওঠে* কোরআন শরীফ, বাংলা বই ও আরবি-ফার্সি কেতাবের বিপণি কেন্দ্র। ১৮৬০ সালে

ঢাকার প্রথম 'বাঙ্গালা যন্ত্র' নামে একটি বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর এখানে পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের সূত্রপাত হয়। মসজিদের নিচে বিভিন্ন দোকানে কেতাব-কোরআন প্রভৃতি বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। দোকানে চেয়ার টেবিলের কাউন্টার ছিল না। দোকানদার টুপি মাথায় দিয়ে ফরাস পেতে বসতেন। এই পুস্তক বিক্রেতাদের মধ্যে অনেকেই কলকাতার বটতলার পুঁথির অনুকরণে বাংলা পুঁথি মুদ্রণে উৎসাহী হন। চক মসজিদের নিচের এই বইয়ের বিপণি কেন্দ্র 'চকবাজারের কেতাবপট্টি' নামে পরিচিত ছিল। এই কেতাব পট্টিতে ছিল মুন্সী হায়দর জানের একটি দোকান। তিনি নিজেও একজন পুঁথি রচয়িতা ছিলেন। তাঁর রচিত 'খলিল গোলজার' কাব্যে (১৮৭৪ খ্রিঃ) তিনি এই কেতাবপট্টির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

এই কেতাবের যার দরকার হইবে।
নিজ দোকানে মেরা আসিলে পাইবে॥
মিয়া রবিউল্লাহ বটে ভগিনী জামাই।
দোকানে থাকেন সেই পাবে তার ঠাঁই॥
চওকের পশ্চিম ধারে কেতাব পট্টিতে :
ঠিকানা বলিয়া দিনু সবার খেদমতে॥

চকপট্টির আর একজন দোকানদার ছিলেন মুন্সী আলিমুদ্দীন। তিনিও তাঁর প্রকাশিত 'শাহরুমের কেচ্ছা' (১৮৮০) গ্রন্থে নিজ দোকানের বর্ণনা দিয়েছেন—

"এই কেতাব যাহার আবিশ্বক [আবশ্যক] হইবে তিনি অত্র শহরের চৌক বাজারের পশ্চিম অধীনের কেতাবের দোকানে তত্ত্ব করিলে পাইবে"।

পরবর্তীকালে ঢাকার চকবাজারের কেতাবপট্টি ও তার আশ-পাশের অনেক মুদ্রাকর ও প্রকাশক বহুল পরিমাণে ঢাকাই পুঁথি প্রকাশ করেন। এসব পুঁথি বটতলার মুসলমানী পুঁথির ন্যায় বেশ বড় বড় হরফে এবং ডান দিক থেকে বাম দিকে ছাপা হতো।

চকবাজারের এই কেতাবপট্টির সামনেই ছিল খোলা প্রাঙ্গণ এবং একটি বেশ বড় ইঁদারা। ঢাকায় পানি সরবরাহের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে অর্থাৎ পানির কল প্রতিষ্ঠার আগে প্রায় বাড়িতেই নিজস্ব পাতকুয়ার ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে পানি সরবরাহের জন্য বড় বড় ইঁদারা নির্মিত হতো। চকাবাজার মসজিদের সামনের এই ইঁদারাটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য ছিল। তিরিশ বা চল্লিশের দশকে দাঙ্গার সময় অথবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ মহড়ায় এই ইঁদারার পানি ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। বর্তমানে চকবাজার মসজিদের সম্প্রসারণের ফলে ইঁদারাটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত। এই ইঁদারার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এর আশপাশে ছোটখাটো ফেরিওয়ালাদের দোকান। এরা বিভিন্ন রকমের ফল ও অন্যান্য পণ্যের ঝুড়ি সাজিয়ে বিক্রি করতে বসত। বছরে নতুন কোনো ফল বেরুলে তা সবার আগে পাওয়া যেত এই ইঁদারার পাশের ঝুড়িওলাদের দোকানে।

চকবাজারের মধ্যবর্তী বিরাট চত্বরে বিপণন কেন্দ্র মুঘল যুগ থেকেই শুরু হয়। আগে সেখানে ছিল একটি বিশৃঙ্খলা ও এলোমেলো বাজার, তাকে মুর্শীদকুলী খাঁ সংস্কার ও সুশৃঙ্খল করে নতুন রূপে চকবাজার প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ আমলে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট

ওয়ালটার চকবাজারেব আশপাশের রাস্তাগুলো প্রশস্ত করে চকবাজারকে সুবিন্যস্ত করেন। 'এন্টিকুইটিজ অব ঢাকা' গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর চকবাজারের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই চক বা ঢাকার বিপণি কেন্দ্রটি অতিপ্রাচীন স্থান। নগরীর যে অংশে এর অবস্থান তা পরিচিত ছিল পুরনো নেকাউস [নাখাস] নামে। মুর্শিদ আলী [কুলি] খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, প্রায় দু' শ' গজ আয়তনের একটি চতুষ্কোণ এলাকা। ফলমূল, শাকসবজি, খেলনা সামগ্রী, মিষ্টান্ন, খুচরা দ্রব্যাদির নিত্য বেচাকেনার স্থান। অপরাহ্নে স্থানীয় অধিবাসীরা এখানে দলে দলে সমবেত হন।

'নাখাস' শব্দটি আরবি, যার অর্থ হলো পশু ও ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান। অনুমান করা যায়, সেকালে চকবাজারে পশুপ্রাণী এবং ক্রীতদাস বেচাকেনার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৯০ সালের একটি প্রাচীন আলোকচিত্র পাওয়া যায় যাতে চকবাজারের পূর্ণরূপ দেখতে পাওয়া যায়। এতে গম্বুজ, মিনার, খিলানসহ চক মসজিদের চিত্র ছাড়াও চকবাজারের আশ-পাশের দোকান এবং চকের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত বাজারের অংশবিশেষ দেখতে পাওয়া যায়। বাজারের একাংশ উন্মুক্ত এবং অপরাংশ বেড়ার ছাউনি দিয়ে ঢাকা বা কুঁড়েঘর অর্থাৎ একাংশে অস্থায়ী পসরার ব্যবস্থা আর অন্য অংশে কিছুটা স্থায়ী দোকান। এছাড়া একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বাজারের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুঘল যুগের স্মৃতিবহ দু'টি কামানের অন্যতম কামান, যা 'বিবি মরিয়ম' নামে খ্যাত। অনেকে মনে করেন ইসলাম খাঁ রাজধানীর স্থান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমনকালে যে দু'টি কামান সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন এটি তারই একটি। অন্য কামানটি নাকি নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে। এই কামানটি চকবাজারে স্থাপনের আগে নদী তীরস্থ সোয়ারীঘাটে আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে এটি দীর্ঘকাল সদরঘাটে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর কামানটি কিছুকাল গুলিস্তান এলাকায় প্রতিষ্ঠিত থাকার পর অবশেষে ওসমানী উদ্যানে স্থাপিত হয়।

১৯০৪ সালের চকবাজারের একটি চিত্রে লক্ষ্য করা যায়, পুরো বাজারটি বেড়ার ছাউনিতে অথবা দোচালা ঘরে আবৃত। কামানটি তার আড়ালে দেখা যাচ্ছে না।

চকবাজারের উত্তরে রাস্তার ওপাশে এখন যেখানে কেন্দ্রীয় কারাগার অবস্থিত, সেখানে ইসলাম খাঁ এক দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই দুর্গের সঙ্গেই ছিল সরকারি টাকশাল। ১৭৭২ সাল পর্যন্ত ইসলাম খাঁর দুর্গ এখানে ছিল। পরে ১৭৭৩ সালে এখানে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থাপিত হয়। এ এলাকাতেই ১৮১১ সালে জেল-সংলগ্ন এক ভবনে পাগলা গারদ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকের মতে, জেলখানার নিকটবর্তী চকবাজারের খোলা চত্বরে এককালে ফাঁসির মঞ্চ স্থাপিত ছিল। কারাগারের ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো কয়েদীর ফাঁসি দেয়ার প্রয়োজন হলে চকবাজারের মধ্যবর্তী চত্বরে ফাঁসি দেয়ার ব্যবস্থা ছিল বলে অনুমান করা যায়। সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চকবাজারের সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনই এই ফাঁসির মঞ্চটি তুলে নেয়া হয়। সে সময় চকবাজারের দোকানপাটের আড়ালে 'বিবি মরিয়ম' কামানটিও লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যাওয়ায় এখান থেকে তা সরিয়ে সদরঘাটে স্থাপিত হয়।

চকবাজারের ভিতরের যে অবস্থা অর্থাৎ বহু অলিগলির মাঝখানে অসংখ্য ছোট ছোট দোকান, তা দীর্ঘকালের। মুঘল যুগ থেকেই একটি জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে, ঢাকা শহরটি

'বায়ান্ন বাজার ও তেপ্পান্ন গলি'র শহর। চকবাজারের ভিতরের অসংখ্য অলিগলির মধ্যে কেউ দিশেহারা হলেও বলবে চকবাজার হচ্ছে 'বায়ান্ন বাজার ও তেপ্পান্ন গলি'র বাজার।

চকবাজারের এই অসংখ্য অলিগলি ও দোকানের এই কাঠামো দীর্ঘকাল ধরে প্রায় অপরিবর্তিত আছে। অগ্নিকাণ্ড ও ঝড়ের ন্যায় নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিভিন্ন সংস্কার ও উন্নয়নের মধ্যেও চকবাজারের প্রাচীন রূপটি আজও যেন অবিকৃতই রয়ে গেছে। চকবাজারের দক্ষিণ প্রান্তে এখনও যে জাহাজ আকৃতির ভবনটি দেখা যায়, তা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জানা নেই। তবে ষাট বছর আগেও আমরা ভবনটিকে এখানে ঠিক এ রকমই দেখেছি।

খুচরা ও পাইকারী বাজার হিসাবে চকবাজারের খ্যাতি বহুকালের। দেশ জুড়ে ছিল এর নাম-ডাক। এর পাশাপাশি চকবাজারের দোকানদারদের প্রত্যুৎপন্নমতিতা ও রসিকতার খ্যাতিও এককালে বহুল প্রচলিত ছিল।

পঞ্চাশ ষাট বছর আগে ঢাকার অবস্থা দেখা গেছে বেশ জমজমাট। হিন্দু-মুসলমান, মাড়োয়ারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বেশ বড় বড় দোকান এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। চক সার্কুলারের ঠিক দক্ষিণে বেশ কয়েকটি পাকা ভবনে ছিল কাপড়ের দোকান, মনোহারী ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান। সে ভবনগুলো দাঙ্গার সময় আগুনে বিধ্বস্ত হওয়ার পর সেখানে আবার নির্মিত হয়েছে নতুন ভবন। সেকালের অসংখ্য দোকানের মধ্যে কেতাব কোরআনের কয়েকটি দোকান এখনও তাদের অস্তিত্ব বহাল রেখেছে। সম্ভবত আলাউদ্দিনের মিষ্টির দোকান চকবাজারের সবচেয়ে পুরনো দোকান।

হাকিম হাবিবুর রহমান তাঁর রচিত 'ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে' (ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে) গ্রন্থে বলেছেন, "আমার বাল্যকালে লাক্ষ্ণৌ থেকে প্রথমে মাদার বখ্শ ও কিছুদিন পরে আলাউদ্দিন নামে এই দুই মিষ্টিওয়ালা এখানে আসলেন এবং তাঁরা চকবাজাবে দোকান খুললেন"। এ গ্রন্থের অনুবাদক হাসেম সুফী অনুমান করেন যে, "আলাউদ্দিন ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঢাকায় আসেন লাক্ষ্ণৌ থেকে"। মাদার বখ্শ নামে হালুয়াইয়ের পরিচয় আমরা জানি না। তবে অনুমান করা যায় ১৮৮২ সালেও ঢাকায় হালুয়াইয়ের কোনো না কোনো দোকান ছিল। ১৮৮২ সালে চকবাজারের নিকটবর্তী রহমতগঞ্জের কবি গরীবুল্লাহ 'দেলারাম' নামে একটি পুঁথি রচনা করেন। এই পুঁথির নায়িকা দেলারাম ছিল এক হিন্দুস্থানী মিষ্টান্ন বিক্রেতার কন্যা।

১৯৩৫ সালের দিকে আলাউদ্দিনের যে মিষ্টির দোকান চকবাজারে দেখেছি, তা ছিল টিনের ছাউনি দেয়া বেশ বড় একটি দোকান। তার এক পাশে ছিল মিষ্টির পসরা, আর অন্য পাশে ছিল একাধিক তন্দুর। যেখানে তৈরি হতো বাকরখানি, নান প্রভৃতি রুটি। হাকিম হাবিবুর রহমানের মতে আলাউদ্দিন হালুয়াই ঢাকায় বিভিন্ন হিন্দুস্থানী মিষ্টির প্রচলন করেন।

সেকালের চকবাজার সব সময়ই ছিল সরগরম। তবে রমজান এবং ঈদ উপলক্ষে চকবাজারের চেহারা হতো উৎসবমুখর। চক মসজিদের সমানের রাস্তাটি ইফতারীর দোকান ও জনতার ভিড়ে জনাকীর্ণ ও কোলাহল-মুখর হয়ে উঠত। সে ঐতিহ্য এখনও অব্যাহত আছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বা তারও কিছু আগে যে চকবাজারের ইফতারীর দোকান বসত তার পরিচয় হাকিম হাবিবুর রহমানের গ্রন্থে পাওয়া যায়। সে বর্ণনাটি নিম্নরূপ—

চকবাজারে ইফতারীর দোকান বসত ও ধনী-দরিদ্র সবাই চকে আসতেন এবং বিকালে ভালো রকম মেলা বসে যেত। প্রত্যেক ব্যক্তিই চক থেকে কিছু না কিছু কিনতেন। বিভিন্ন রকমের ভাজা-ভুনা ও রমজানের বিশেষ সামগ্রী এখানে পাওয়া যেত। তন্মধ্যে গোলাবী ওখ্ড়া রমজান ছাড়া অন্য কোনো সময় পাওয়া যেত না এবং এখনকার মতো প্রত্যেক তেহারে বা পর্বে তার চেহারা দেখা যেত না।

লক্ষণীয় বিষয়, গোলাবী ওখ্ড়ার মতো এমন অনেক খাদ্যবস্তু, যেমন ফালুদা, বেলের মোরব্বা ইত্যাদি চকবাজারে একমাত্র রমজানের সময়ই পাওয়া যায়। এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে।

সেকালের ঢাকার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঈদ, মহররম বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত মিছিল। ঢাকার নায়েব-নাজিমদের আমলে রাজকীয় জৌলুসের সঙ্গে মিছিল বের হতো। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আলম মুসাওয়ার নামক জনৈক চিত্রশিল্পীর আঁকা চিত্রে সেকালের ঈদের মিছিলের অনেক চিত্র পাওয়া যায়। এ মিছিল সম্পূর্ণই ছিল রাজরাজড়াদের ব্যাপার। সাধারণ মানুষ সেখানে দর্শক মাত্র।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকায় চকবাজার থেকে যে ঈদের মিছিল বের হতো তাতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল প্রত্যক্ষ। এই মিছিল চকবাজার থেকে শুরু করে মিটফোর্ড রোড, ইসলামপুর, বাংলাবাজার, নবাবপুর ঘুরে বংশাল রোড ও জেল রোড হয়ে চকবাজারে ফিরে আসত। এই মিছিলে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

ঢাকায় রমজান মাসে সেহরি খাওয়াব সময় রোজাদারদের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য মহল্লায় মহল্লায় বিশেষ ক্বাসিদা বা আহ্বানগীতি পরিবেশনের রীতি প্রচালত ছিল। শ্রেষ্ঠ ক্বাসিদার দলকে চকবাজারে ঈদের দিন পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা ছিল। ঢাকায় মহরমের মিছিল হোসেনী দালান হতে বের হতো। তা চকবাজারের চারপাশে এক পাক ঘুরে আবার হোসেনী দালানে ফিরে যেত। আশুরার দিন বাংলাবাজার থেকে যে তাজিয়া মিছিল বেরুত তা চকবাজারের কেতাবপট্টির পাশের গলি দিয়ে চুড়িহাট্টা ও উর্দু রোড হয়ে আজিমপুরে চলে যেত।

মহরমের বিভিন্ন মিছিলের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল মধ্যরাতের মিছিল। সে মিছিলের স্বপ্নময় সম্মোহনের কথা লিখতে গিয়ে কবি শামসুর রাহমান তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

> "মুহররমের মিছিল সবচেয়ে ভালো লাগতো চকে। মাঝরাতের মিছিল। নানীর সঙ্গে যেতাম চকবাজারের একটা বাড়ীতে রাত্তিরে মিছিল দেখবো বলে। নানী বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন আর আমি মিছিলের জন্য অপেক্ষা করে ঝিমুতাম।
>
> একটু পরেই চোখের সামনে ঝলমলে মিছিল। আলম বরদার, আশা বরদার, কালো কাপড়ে ঢাকা বিবিকা দোলা— একে একে সবকিছু চোখের সামনে। আমার চোখ লুট করতে শুরু করে সিঙ্কের নিশান, লাঠির ঠোকাঠুকি, তলোয়ারের ঝলসানি, আগুনের চরকি।"

চকবাজারের আর একটি বড় আকর্ষণ ছিল, বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কাছে, চকবাজারের মেলা। বিশেষ বিশেষ পর্বে চকের চারপাশের রাস্তায় বসত সেই মেলা। উল্লেখযোগ্য মেলা বসত দুই ঈদ ও মহররমের সময়। দূর-দূরান্ত থেকে মেলার

নঝুনি ও ঢোলের বাদ্য, নাগরদোলার শব্দ শুনে ছেলেমেয়েরা ছুটে আসত মেলায়। খনও চকবাজারে মেলা বসে। কিন্তু একালের ছেলেমেয়েদের সামনে উন্মোচিত বিভিন্ন াকর্ষণ ঈদের মেলাকে যেন নিষ্প্রভ করে তোলে।

সেকালের ঢাকার জনসাধারণ চকবাজারের সামাজিক গুরুত্বকে বিশেষ মর্যাদা দিত। বয়ের দুলহাকে সুসজ্জিত টমটম গাড়িতে বসিয়ে ঘোড়ার গাড়ির মিছিল চকবাজার ঘুরিয়ে না ানলে বিবাহের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যেত। বরযাত্রীর মিছিল দেখলেই রাস্তার লোকজন 'পাশ সরে দাঁড়াত আর গুনতে থাকত এক চক্কর, দুই চক্কর ইত্যাদি। যে যত বেশি চক্কর রত তার কদর ছিল তত বেশি। শুধু তা-ই নয়, কেউ কেউ গুনতে থাকত মিছিলে ক'টি ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে। আরও মজার বিষয়, খৎনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে যার খৎনা করা হয় তাকেও বরের বেশে সুসজ্জিত করে চকবাজারে চক্কর দেয়ানো হতো। বরের মতো সেও পাগড়ি মাথায় দিয়ে মুখে রুমাল চেপে বসত, আর চারপাশের দর্শককে সালাম দিত। ছোট মেয়েদের কান বা নাক ফোঁড়ানোও ঢাকার একটি বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল। তাই তাদের জন্যও চকবাজারে মিছিলে চক্কর দেয়ার ব্যবস্থা ছিল।

সেকালে বিয়ের কেনাকাটা করতে চকবাজারে না এসে কারোরই কোনো উপায় ছিল না। শাড়ি-গয়না, বরের পোশাক, গায়ে হলুদের যাবতীয় উপকরণ– সবই পাওয়া যেতো চকবাজারে। কন্যা সাজানোর জন্য অথবা বাসর ঘর সাজানোর জন্যও এখানে আসতে হতো ফুলের দোকানে। এখন যেমন অলিতে-গলিতে ফুলের দোকান রয়েছে, সেকালে তা ছিল না। শাঁখারী বাজারের মোড়ে আর চকবাজারের মোড়ে দু-তিন জন ফুল বিক্রেতা বিকালে ফুলের ঝুড়ি নিয়ে বসত। ফুলের গন্ধে সেখানে বসত সৌরভের মেলা। তাদের ঝুড়িতে ছিল ফুলের মালা, ফুলের তোড়া এবং বিয়ের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ফুলের সাজি। আগাম বায়না পেলে তারা কন্যার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করত হাত, গলা, মাথার জন্য ফুলের গয়না।

সেকালের ঢাকা শহর সম্প্রসারিত হয়ে এখন রূপান্তরিত হয়েছে বৃহত্তর ঢাকা মহানগরীতে। নতুন নতুন প্লাজা-সুপার মার্কেটের ঝলমলে আলোতে চকবাজারকে হয়ত ম্লান মনে হতে পারে। কিন্তু চকবাজারের বিচিত্র বৈভবের ইতিহাস আজও অম্লান, অবিস্মরণীয়। পুনরায় বলতে ইচ্ছা করে, সেকালের সেই রহস্যময় ও স্বপ্নময় চকবাজারের তুলনা একমাত্র চকবাজারই। চকবাজার তাই এক অনন্য কিংবদন্তি।

ঢাকার মিছিল

১৬১০ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সুবেদার ইসলাম খাঁ কর্তৃক ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপনের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এখানে একাধিকবার রাজধানী স্থাপিত হয়েছে। ফলে, ঢাকা যেমন একদিকে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অধিকারী হয়েছে, অন্যদিকে ঢাকাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনও একে একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের অধিকারী করে রেখেছে। আজকের ঢাকা অতীত ঐতিহ্যের অনেক কিছুই ধারণ করে আছে, আবার ঐতিহ্যের অনেক কিছুই আজ বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে। যেমন, ঢাকার ঐতিহ্যময় মিছিল। এককালে প্রধানত তিনটি মিছিলের জন্য সারা বাংলা জুড়ে ঢাকার খ্যাতি ছিল। সেই তিনটি মিছিল হচ্ছে– 'ঈদের মিছিল', 'মহররমের মিছিল' ও 'জন্মাষ্টমীর মিছিল'।

ঈদের মিছিল

ঢাকায় ঈদ-উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল ঈদের মিছিল। এই ঈদের মিছিলের সূত্রপাত কবে থেকে হয়েছিল সে সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য জানা যায় না। তবে রাজা-বাদশাহদের বৈভব ও বিক্রম প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে মিছিলের প্রচলন সর্বকালে এবং সর্বদেশেই প্রচলিত। মুঘল আমলেও রাজকীয় মিছিলের ব্যবস্থা ছিল বলে অনুমান করা যায়।

নায়েব-নাজিমরা যখন ঢাকার নিমতলি প্রাসাদে এসে বসবাস শুরু করেন, তখন তাঁদের উদ্যোগেই ঈদের মিছিল শুরু হয়। এটা আঠারো শতকের কথা। সম্ভবত জন্মাষ্টমী মিছিলের অনুসরণে এই ঈদের মিছিলের উদ্ভব। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় ঢাকায় নায়েব-নাজিমদের বংশ লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ঈদের রাজকীয় মিছিল লোপ পায়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আলম মুসাওয়ার নামে এক চিত্রশিল্পী ঢাকার ঈদ ও মহর্‌রমের মিছিলের ৩৯টি ছবি আঁকেন। ছবিগুলি বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে। আলম মুসাওয়ারের আঁকা ছবিগুলি দেখে মনে হয় উনিশ শতকের ঈদের মিছিল নিমতলি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে হোসেনী দালান, বেগম বাজার, চক বাজার হয়ে নিমতলি প্রাসাদে গিয়ে শেষ হতো। রাস্তার দু'পাশে ও ছাদে ছিল দর্শকদের ভীড়। মিছিলে হাতির পিঠে ছিল হাওদা। হাতির হাওদা ও পালকিতে নায়েব-নাজিম ও তাঁর সঙ্গীরা আসীন থাকতেন। পাশে পাশে চলতো ছাতি-বরদার, হাতে কিংখাবের ছাতি। নানা রকমের নিশান, বাদ্যযন্ত্র, মিছিলকে করে তুলতো বর্ণাঢ্য ও প্রাণবন্ত। এক কথায় বলা যায়, সম্পূর্ণ মিছিলই ছিল রাজরাজড়ার ব্যাপার। সাধারণ মানুষ সেখানে দর্শকমাত্র।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঢাকায় পুনরায় ঈদের মিছিল চালু হয়। সাধারণ মানুষের জন্যই নয়, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই ছিল এই মিছিলের বিশেষত্ব।

বিগত বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঢাকায় ঈদের পর দিন যে মিছিলের প্রচলন হয়, তার উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকা পৌরসভার কমিশনার আহসান মোহাম্মদ আলী ওরফে জুম্মন বেপারী এবং লালবাগ মোমিন মোটর কোম্পানির মালিক আবদুল আজিজ। জুম্মন বেপারী

ছিলেন চকবাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব গোলাম নবী বেপারীর পুত্র। জুম্মন বেপারী ঢাকা বাইশ পঞ্চায়েতের শেষ জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। আবদুল আজিজও একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। মোমিন মোটর কোম্পানির বাসসমূহ ছিল ঢাকা এবং ঢাকার উপকণ্ঠের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র যানবাহন।

প্রথম দিকে মিছিলে ক্বাসিদা পরিবেশনকারী দলসমূহ অংশগ্রহণ করতো। সে সঙ্গে মোমিন মোটর কোম্পানির মোটরসমূহ জাহাজ, উড়োজাহাজ, ময়ূর, নৌকা ইত্যাদির মতো সাজিয়ে মিছিল বের করা হতো। পরবর্তীকালে ঈদের মিছিলের জৌলুস ও আড়ম্বর বৃদ্ধি পায়। জন্মাষ্টমীর মিছিলের পাশাপাশি ঈদের মিছিলেও পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন ঢাকার নবাবগণ। তাঁরা অর্থ ও উৎসাহ দিয়ে এই মিছিলের আয়োজনকে সফল করে তুলতেন।

ঈদের মিছিল চকবাজার থেকে শুরু হয়ে মিটফোর্ড রোড, ইসলামপুর, বাংলাবাজার, নবাবপুর ঘুরে বংশাল রোড ও জেইল রোড দিয়ে চকবাজারে ফিরে আসতো। এ মিছিল উপলক্ষে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক সমাগম হতো এই শহরে। ঈদের মিছিলে হাস্য-কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদের বিভিন্ন প্রকার আয়োজন ছিল। আমোদ-প্রমোদের পাশাপাশি সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা বা সামাজিক সমস্যার প্রতিফলনও ঈদের মিছিলে লক্ষ করা যেতো। বিশেষ করে তিরিশের বা চল্লিশের দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার মঞ্চ তৈরী করা হতো এবং যুব-সম্প্রদায় বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ পরে অভিনয় করতো। সামাজিক সমস্যা নিয়েও অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। যেমন, একটি মঞ্চে হয়তো একজন লোককে মদখোর হিসেবে সাজিয়ে জুতোর মালা পরিয়ে শাস্তি দেওয়া হতো। মঞ্চে লেখা থাকতো 'মদখোরের শাস্তি'। ঢাকার রহমতগঞ্জের তরুণ সম্প্রদায় একবার বখতিয়ার খিলজি ও সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়ের চিত্র মিছিলে তুলে ধরেছিল।

ঢাকার তিনটি মিছিলই অর্থাৎ ঈদের মিছিল, মহররমের মিছিল ও জন্মাষ্টমীর মিছিল দুর্ভাগ্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছে। বাদ্যসহযোগে মিছিল অথবা হোলি খেলার দিন গায়ে রঙ দেওয়া নিয়ে ঢাকায় বহুবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধেছে। ১৯৪৬-এর ঈদের মিছিল নবাবপুর দিয়ে যাবার সময় চারদিক থেকে আক্রান্ত হয় এবং বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। এ সময় পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে। সম্ভবত ঢাকায় মিছিলের উপর এই প্রথম কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-স্বরূপ এক ঈদের মিছিলে শাঁখারী বাজারের যুব-সম্প্রদায়ও যোগদান করেছিল।

১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর বহুবিধ সাংস্কৃতিক অভিঘাতে ঢাকার সাম্প্রদায়িক অভিন্নতা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। ঢাকাবাসীর নিজস্ব ঐতিহ্য ঈদের মিছিলও এ সময় বন্ধ হয়ে যায়।

মহররমের মিছিল

ভারতীয় উপমহাদেশে কয়েক শতাব্দী ধরে যে মহররম অনুষ্ঠান পালিত হয়ে এসেছে, তার প্রবর্তক ছিল ইরানের শিয়ারা। মূলত এটি শিয়া সম্প্রদায়েরই ধর্মীয় অনুষ্ঠান। দিল্লীর

মুঘল সম্রাটগণ ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ের, কিন্তু বাংলার নায়েব-নাজিমরা ছিলেন শিয়া। তাই ১৮ বা ১৯ শতকে নায়েব-নাজিমদের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলিতে শিয়াদের মহর্‌রম অনুষ্ঠান বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। তাঁদেরই উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় 'ইমামবাড়া' ও 'হোসেনী দালান' স্থাপিত হয়। 'ইমামবাড়া' হচ্ছে ইমাম হোসেনের স্মরণার্থে নির্মিত ভবন, যেখানে মহররম অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় এবং মহর্‌রমের তাজিয়া ও পতাকাসমূহ রক্ষিত থাকে। হোসেনী দালানও ইমাম হোসেনের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত অনুরূপ ভবন।

ঢাকায় কবে থেকে মহর্‌রম উৎসব পালিত হয়ে এসেছে তা সঠিক জানা যায়নি। তবে ঢাকা শহরে কয়েক শ' বছর আগে একাধিক হোসেনী দালান নির্মিত হয়েছিল। সবচেয়ে প্রাচীন হোসেনী দালান হচ্ছে ফরাশগঞ্জের 'বিবি-কা-রওজা' মহল্লায় প্রতিষ্ঠিত হোসেনী দালান। কেউ কেউ মনে করেন, ১৬০০ সালে জনৈক আমীর খাঁ এটি নির্মাণ করেছিলেন। এ অনুমানের সপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে জানা যায়, ১৮৬১ সালে জনৈক দোসানজী এটি পুনঃনির্মাণ করেন। ঢাকায় বর্তমানে প্রধানত যে হোসেনী দালানকে কেন্দ্র করে মহর্‌রম পালিত হয়, তা সম্ভবত আঠারো শতকের মধ্যভাগে ঢাকার নায়েবে-নাজিম জেশারত খান নির্মাণ করেন। এই হোসেনী দালানকে কেন্দ্র করেই মহর্‌রম মাসের প্রথম দশটি দিন মহর্‌রমের যাবতীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। প্রধানত শিয়াদের অনুষ্ঠান হলেও সুন্নী সম্প্রদায়ের জনসাধারণও এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। হোসেনী দালানের চত্বর ঘিরে যে মেলার আয়োজন হয় তাও খুব প্রাচীন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আলম মুসাওয়ারের আঁকা চিত্রমালায় হোসেনী দালানের মেলার ছবিও রয়েছে।

মহর্‌রমের মিছিল বহুকাল ধরে হোসেনী দালানকেন্দ্রিক মহররম অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবেই পরিচিত। আলম মুসাওয়ারের আঁকা ছবিতে মহর্‌রমের মিছিলেরও চিত্র পাওয়া যায়। ১৮৫০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়' পত্রিকায় হোসেনী দালানের বর্ণনা ও মহর্‌রমের মিছিলের সংবাদ পাওয়া যায়। ঐ পত্রিকায় লেখা হয়-

> "রজনীযোগে ঐ ধামে বহুমূল্যের ঝাড়াদিতে আলোকময় হয় এবং মোল্লারা মরচিআদি (মর্সিয়াদি) গীত করে, হোসনী দেওয়ানে (?) মহরমের কয়েক দিবস এরূপ নানা কাণ্ড দেখা যায় এবং তোপগস্তের (তুগ-গস্ত) দিবস বহুসংখ্যক পতাকা, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি লইয়া মান্য ২ মোগলেরা চকের চতুর্দিকে বেড়াইয়া পুনঃ উক্ত মসজিদে গমন করেন[১]।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইমামবাড়ার এই মর্সিয়াগীতির প্রভাব পুঁথি-সাহিত্যে এবং লোক-সাহিত্যে বিশেষ বিস্তার লাভ করে। পুঁথি সাহিত্যের 'শহীদে কারবালা', 'জঙ্গনামা' গ্রন্থাদি মর্সিয়া সাহিত্য নামেও পরিচিত। লোক সাহিত্যের জারিগানও মর্সিয়াগীতি।

১৮৬৩ সালে 'ঢাকা-প্রকাশ' পত্রিকায় মহর্‌রমের বর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্‌রমের মিছিলের আরেকটু বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে উর্দু 'জাদু' পত্রিকার মহর্‌রমের মিছিলের এক সুদীর্ঘ বর্ণনা বিধৃত হয়েছে :

---

১. মুনতাসীর মামুন- 'পুরনো ঢাকা, উৎসব ও ঘরবাড়ি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত- ১৯৮৯, পৃ. ১৬-১৭।

মহর্‌রমের সপ্তম দিবস বিকেলে হোসেনী দালান থেকে বের হয় বিরাট মিছিল। এই মিছিল 'তুগ-গস্ত' নামে পরিচিত। তুর্কী শব্দ 'তুগ'-এর অর্থ পতাকা এবং 'গস্ত'-এর মানে ঘুরে বেড়ানো। বক্‌শীবাজার, উর্দু রোড, বেগমবাজার, চকবাজার, দেওয়ান বাজার ঘুরে এই মিছিল হোসেনী দালানে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের প্রথমে থাকে কয়েকটি আখড়া, তারপর থাকে আলমবরদার অথবা পতাকাবাহী। এরপর নিশান নিয়ে এগিয়ে যায় হাতি আর ঘোড়া। ঘোড়ার পিছনে পিছনে থাকে লাঠিয়াল। ঘোড়ার পিঠে থাকে নহ্‌বত, তার সঙ্গে বাদকদল এবং সবশেষে ডঙ্কা। মিছিলের শেষে থাকে একটি হাতি এবং হাতির পিঠে দু'জন ঢোল-বাদক। নবম দিনে বিকেলে 'বিবি-কি-রওজা' থেকেও একটি মিছিল বের হয়। রাত্র তিনটায় হোসেনী দালান থেকে বেরোয় 'তুগ-গস্ত'-এর মতোই আরেকটি মিছিল। আশুরার দিন বিভিন্ন ইমামবাড়া থেকে তাজিয়া মিছিল বেরোয় এবং সেগুলি পানিতে ডুবিয়ে দেওয়ায় মধ্য দিয়ে শেষ হয় মহর্‌রম-উৎসব (অনূদিত)।[২]

মহর্‌রমের মিছিলের এই জৌলুস এবং মিছিলের বিভিন্ন পর্যায় বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত বহাল ছিল। তিরিশের বা চল্লিশের দশকে মহর্‌রমের মিছিল কি রকম ছিল, তার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা শামসুর রাহমানের 'স্মৃতির শহর' গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহররম এবং মহররমের মিছিল শিয়া সম্প্রদায়েরই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে সুন্নী সম্প্রদায়ের লোকেরাও অংশগ্রহণ করতো, তবে এ অংশগ্রহণের পিছনে ছিল প্রধানত কুসংস্কার বা বিশেষ মানত।

বর্তমানকালেও ঢাকায় হোসেনী দালান ও শিয়া সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে মহর্‌রম উৎসব পালিত হয়। মহররমের দশদিনের আচার-অনুষ্ঠান মোটামুটিভাবে অব্যাহত থাকলেও মহররমের মিছিলের সেই জৌলুস আর নেই। এখনও মহর্‌রমের মিছিল বেরোয়, আকারে ছোট এবং জাঁকজমকও স্তিমিত।

জন্মাষ্টমীর মিছিল

ঢাকার জনসাধারণের আমোদ বা চিত্তরঞ্জনের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান ছিল জন্মাষ্টমীর মিছিল। জন্মাষ্টমীর ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। শ্রীকৃষ্ণ এই তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এ কারণেই উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট জন্মাষ্টমী পবিত্র দিন বলে বিবেচিত হয়। এই উপলক্ষে এ দিবসে নানারূপ উৎসব পালিত হয়। ঢাকায় এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল জন্মাষ্টমীর মিছিল।

ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দীতে এই মিছিলের প্রবর্তন হয় বলে জেম্‌স্ টেইলার তাঁর 'টোপোগ্রাফি অব ঢাকা' (১৮৪০) গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, (বঙ্গানুবাদ) "নওয়াবপুরের ঐতিহ্যবাহী ও জাঁকজমকপূর্ণ জন্মাষ্টমীর মিছিল ৯৯২ হিজরী সাল অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয়। ইসলাম খাঁ বাহাদুর যখন ঢাকার

২. মুনতাসীর মামুন- প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯-২০

নবাব ছিলেন তখন উক্ত নবাবের বসাক দেওয়ান কৃষ্ণদাস মুচছুদ্দী প্রথম এই মিছিল বের করেন। নবাব বাহাদুর এই মিছিলে যথেষ্ঠ সাহায্য করেছিলেন।"[৩] এ সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে মতভেদ লক্ষ করা যায়। কেউ কেউ মনে করেন, কৃষ্ণদাস বসাকেরও আগে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম জন্মাষ্টমীর মিছিল বের হয়েছিল। প্রকাশ থাকে যে, ঢাকার নবাবপুর নিবাসী কৃষ্ণদাস মুচছুদ্দী কুলদেবতা 'লক্ষ্মী নারায়ণ'-এর প্রীত্যর্থে প্রতিবছর এই মিছিল বের করত। আনুমানিক ১৭২৫ সালে ইসলামপুরের পান্নিটোলা নিবাসী গদাধর ও বলাইচাঁদ বসাক নামে দুই ধনী ব্যক্তি তাঁদের ইষ্টদেবতার সন্তুষ্টির জন্য জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আরেকটি মিছিল বের করে। তারপর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নিয়মিত নবাবপুর ও ইসলামপুর থেকে দুটি মিছিল বের হতে থাকে। নবাবপুরের মিছিল নবাবপুর থেকে বেরিয়ে জনসন রোড ও বাংলা বাজার ঘুরে নবাবপুরে ফিরে যেত। ইসলামপুরের মিছিলও প্রায় অনুরূপ পথ দিয়ে নবাবপুর ঘুরে ইসলামপুরে এসে শেষ হতো।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে উর্দু বাজারে জনৈক গঙ্গারাম ঠাকুর নবাবপুর ও ইসলামপুরের মিছিলের অনুকরণে আরেকটি জন্মাষ্টমীর মিছিল চালু করেন। এই মিছিল উর্দু বাজার থেকে বেরিয়ে নবাবপুর ঘুরে আবার উর্দু বাজারেই প্রত্যাবর্তন করতো। তবে গঙ্গারাম ঠাকুরের মিছিল বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

গঙ্গারাম ঠাকুরের মিছিল বন্ধ হয়ে গেলেও নবাবপুর ও ইসলামপুরের মিছিল নিয়মিত বের হতে থাকে। মিছিলের উৎকর্ষ সাধনের জন্য দুই দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল। মিছিলকে বর্ণাঢ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা এবং নতুন কিছু প্রদর্শন করাই ছিল এই উভয় দলের উদ্দেশ্য। দীর্ঘকাল পর্যন্ত উভয় দলের মিছিল একই দিনে অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর দিন-ই বের হতো। কিন্তু কোন্ দলের মিছিল আগে যাবে বা পরে যাবে এ নিয়ে উভয় দলের মধ্যে প্রচুর মনোমালিন্য ও বাকবিতণ্ডা হয়। ১৮৫২ সালের দিকে এই নিয়ে তুমুল বিবাদ বাঁধে এবং কিছু খুন-জখমও হয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার কমিশনার উভয় পক্ষের সঙ্গে এক আলোচনা বৈঠকে বসেন। বৈঠকে স্থির হয় যে, নবাবপুরের মিছিল প্রথম দিন এবং ইসলামপুরের মিছিল দ্বিতীয় দিন ও পরবর্তী বছর ইসলামপুরের মিছিল প্রথম দিন এবং নবাবপুরের মিছিল দ্বিতীয় দিন বের হবে। এভাবেই পর্যায়ক্রমে উভয় দলের মিছিল প্রথম দিন বা দ্বিতীয় দিন বের হতো। এই সময় থেকেই ইসলামপুরের মিছিলের নবাবপুর আসা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ নিয়ম প্রচলিত ছিল।

১৮৫৭ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল তার সূত্রপাত হয় বাংলায় এবং এ মহাবিদ্রোহে ঢাকার ভূমিকাও কম ছিল না। লক্ষ করা যায় ১৮৫৭ সালে জন-জীবনে স্থিতিশীলতার অভাব থাকা সত্ত্বেও সে বছর ১৪ এবং ১৫ আগষ্ট জন্মাষ্টমীর মিছিল যথারীতি বের হয়েছিল। ব্রেনান্ড সাহেবের রোজ নামচায় আমরা তার নিম্নরূপ বর্ণনা পাই ঃ

জন্মাষ্টমীর উৎসব। যেমনটি হয় সব সময় তেমন। ভীড় হয়েছিল। বিপদ ঘটলে তার মোকাবেলা করার জন্যে হাতিতে চড়ে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর লোকজন টহল দিলো

৩. জেম্স টেইলার- কোম্পানি আমলে ঢাকা- মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, ঢাকা- ১৯৭৮।

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।[৪]

আর্থার লয়েড ক্লে-র লেখা "লিভ্‌স ফ্রমএ ডায়েরি ইন লোয়ার বেঙ্গল" গ্রন্থেও ১৮৬৭ সালে ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের একটি বিবরণ রয়েছে ঃ

> হিন্দুদের অগণিত ধর্মীয় উৎসবের মধ্যেই একটি হলো জন্মাষ্টমী (৮ম জন্মদিন) দেবতা কৃষ্ণের জন্মদিন। সরকারি ছুটি থাকে এদিন। ঢাকায় জন্মাষ্টমী তাঁতিদের উৎসব বলে পরিচিত। আনন্দমুখর এ উৎসব এখানে পালন করা হয় জাঁকজমকের সঙ্গে। ২৭শে আগস্ট জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা বের হলো। আগে আগে চলেছে রং-বেরঙের সাজানো বহু হাতি, বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত ঘোড়ার বহর। জিল্লাদার রঙিন বস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত গাড়ির উপর নৃত্যরত সঙ, কোনো না কোনো গাড়িতে মূকাভিনয় চলছে। ইউরোপে আনন্দ-মুখর কার্নিভালে যে শোভাযাত্রা বের হয় আড়ম্বর বা জাঁকজমকে কোনো দিক থেকে এ শোভাযাত্রা তার চেয়ে কম নয়। আমাদের বাড়ি বড় রাস্তার ধারে ছিল বলে সমাগত অতিথিরা ছাদে উঠে বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রা দেখেছিলেন।[৫]

১৮৫৬ সাল থেকেই ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলে সং-সাজের প্রচলন হয়। সং-সাজের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, নৌকা-বিহার, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, রাজপুত বীরাঙ্গনাদের যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি অভিনীত হতো। তবে, এই সং-সাজের প্রচলনের ফলে কিছু স্থুল আমোদ ও অশ্লীলতা প্রশ্রয় পায়। এ বিষয়ে সমকালীন পত্র-পত্রিকায়ও বিরূপ সমালোচনা লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিছিলের মধ্যেই নবাবপুর ও ইসলামপুর এক পক্ষ অন্য পক্ষকে গালি দিতো অথবা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তুলে ধরতো। এরূপ একটি হাস্যজনক বিদ্রূপের উল্লেখ ১৮৬৪-র 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় :

> "নবাবপুরের তামাসা কর্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তির গাড়ি বোধ হয় জীর্ণ অবস্থায় ছিল। গত সন তাহার নকল করিয়া ইসলামপুর পক্ষ হইতে ছোট চৌকির সঙ্গে (একখানি) যারপরনাই জীর্ণ গাড়ি ও তাহার সঙ্গে সংযুক্ত একটি শীর্ণ ঘোড়া বন্ধন করা হইয়াছিল। আর গাড়ির মধ্যে একটা মাস্তুল লাগাইয়া তাহাতে পাল ও কয়েক গাছ গুণ দেয়া হইয়াছিল এবং গাড়ির ছাদের উপর বসিয়া এক ব্যক্তি দাঁড় ও লগি মারিতে ছিল।"

এককালে জন্মাষ্টমীর মিছিলের প্রধান আকর্ষণ ছিল বড় চৌকী। এই চৌকীগুলি বেহারারা কাঁধে করে বহন করে নিয়ে যেতো। এগুলি ছিল ঢাকার ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের নিদর্শন। ডাকপাত, তবক, পান্নিপাত, রাং, বাদলা, চুমকি, সিল্ক, শোলা, কাঁচ, বাঁশ, কাগজ ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরী হতো বনভূমি, নদী, পর্বতসহ বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য। তাতে কাগজ ও শোলার তৈরী মানুষ, দেবদেবী, পশু-পক্ষী, নৌকা ইত্যাদি থাকতো। ১৯০১ সালে ঢাকায় বিদ্যুৎ-বাতির প্রচলন হলে রাস্তার বৈদ্যুতিক ও টেলিগ্রাফের তারের জন্য বড় চৌকী মিছিলের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। তার বদলে এলো ছোট

---

৪. আর্থার লয়েড ক্লে- ঢাকা; ক্লে'র ডায়েরী-ফয়েজুল করিম অনূদিত, ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ৫৩ (পরিশিষ্ট)।

৫. আর্থার লয়েড ক্লে- প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

চৌকী এবং চলন্ত গ্যালারি। গ্যালারিগুলিতে জীবন্ত মানুষ বসিয়ে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরা হতো।

গবেষক শিশির কুমার বসাক ১৯১৩ সালে ঢাকার নবাবপুরের জন্মাষ্টমী মিছিলের ক্রম অর্থাৎ কিভাবে মিছিল সাজানো হয়েছিল তার একটি তালিকা সংকলন করেছেন।[৬]

১. ১০০ জন আসাসোটাধারী পদাতিক।
২. বাদ্যকর দল।
৩. পতাকাধারী দল।
৪. শাখা বিশিষ্ট দীপগাছা বা বেলওয়ারী (কাঁচের) ঝাড়সহ বাহকগণ।
৫. ৫০ জন স্বর্ণ ও জরির কারুকার্য-খচিত ছত্রধারী।
৬. ৫০ জন স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত আলোকাধার বা আরানী (উহার ভিতর মোমের বাতি জ্বালান হয়) বাহক।
৭. পাখাধারী দল।
৮. কৃত্রিম বন্দুকধারী সৈন্যগণ।
৯. স্বর্ণ ও রোপ্যাধার বিশিষ্ট অসিধারীগণ।
১০. ৪০ জন স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বল্লম-বরদার
(ছড়ি , বল্লম, আসাসোটা ও বর্শাধারী)।
১১. ব্যাগ-পাইপ বাদ্য।
১২. পৃষ্ঠদেশ থেকে পা পর্যন্ত আবৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুকুট পরিহিত হাতী। তদুপরি রৌপ্য দন্ডের উপরে নিশান।
১৩. ইংরেজী বাদ্য।
১৪. উত্তম পরিচ্ছদ (পায়জামা, মুকুট, রৌপ্যমালা বা হল্কা) পরিহিত অশ্ব।
১৫. জোড়গাই (দেশী বাদ্য)।
১৬. সওয়ার বিশিষ্ট ও সওয়ারহীন অশ্ব।
১৭. রৌপ্য নির্মিত শিঙ্গা ও ঝগঝম্প ইত্যাদি বাদ্য।
১৮. ২৫ জন স্বর্ণছত্রধারী।
১৯. অশ্বপৃষ্ঠে ব্রজবাসিগণ।
২০. সখাগণ সমভিব্যাহারে অশ্বপৃষ্ঠে কৃষ্ণ।
২১. অশ্বপৃষ্ঠে নহবৎ বাদ্যকারগণ।
২২. নন্দোৎসব।
২৩. সং (সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নৃত্য-গীতাদি ও সাজসজ্জা)।

৬. শিশির কুমার বসাক- চারিশত বছরের জাঁকজমকপূর্ণ ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিল, যুগান্তর, ১৫ আগস্ট ১৯৫১।

২৪. ছোট চৌকী (বংশ, কাষ্ঠ ও কাগজ নির্মিত মঞ্চ)। তাতে নানারকম ব্যঙ্গচিত্র ও হাস্যরসের অবতারণা থাকে। কবির দল ও ডাঙ্গার উপরে নৌকা আরোহণকারীর দল– তাদের কণ্ঠোচ্চারিত ছড়া ও গানের সাহায্যে ইসলামপুর ও নবাবপুর উভয়পক্ষ পরস্পরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে।

২৫. দেশী বাদ্য।

২৬. ২৫টি ছোট চৌকী (তাতে কাগজের পুতুল দ্বারা বহু পৌরাণিক বিষয় প্রদর্শিত হতো)।

২৭. ইংরেজী বাদ্য।

২৮. দেব-দেবীর মূর্তি বসান রৌপ্য-নির্মিত চৌকী বা সিংহাসন প্রায় ২০টি।

২৯. ইংরেজী বাদ্য।

৩০. দেব-দেবীর মূর্তিবসান রৌপ্য-নির্মিত চৌকী বা সিংহাসন ১টি।

৩১. ইংরেজী বাদ্য।

৩২. দেব-দেবীর মূর্তিবসান স্বর্ণ-নির্মিত চৌকী বা সিংহাসন ১টি।

৩৩. ইংরেজী বাদ্য।

৩৪. দেব-দেবীর মূর্তিবসান স্বর্ণ-নির্মিত চৌকী বা সিংহাসন ১টি।

৩৫. ইংরেজী বাদ্য।

৩৬. খাস গিলাপধারী (স্বর্ণ ও জড়োয়া খচিত মখমল বা খাস গিলাপ, তার ভিতর কাষ্ঠ নির্মিত দন্ড থাকে) দল।

৩৭. চোপদার দল।

৩৮. রৌপ্য নির্মিত বল্লম বা বর্শাধারীর দল।

৩৯. ইংরেজী বাদ্য।

৪০. হস্তীপৃষ্ঠে 'অম্বরী হাওদার' ভিতর রাজা বসতেন। শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সেবাইতদের মধ্য হতে সুশ্রী স্বাস্থ্যবান, অবিবাহিত একজনকে বহুমূল্য পোশাকে সুসজ্জিত করে রাজা সাজান হত। রাজার একটু পশ্চাতে দু'পাশে দু'টি ভৃত্য চামর হাতে বসা থাকত।

৪১. নবাবপুর ও ইসলামপুর উভয় পক্ষের চারটি করে বড় চৌকী মিছিলের অঙ্গস্বরূপ ছিল"।

জন্মাষ্টমী মিছিল ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও পরিশ্রমের ফসল-স্বরূপ। বিশের দশকে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা কিরণ শংকর সেনগুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ[৭]

"জন্মাষ্টমী উৎসবের দু'দিন স্থানীয় মুসলিমদেরও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যেতো; ঘোড়ার গাড়ি গরুর গাড়ি সাজিয়ে বড়ো বড়ো চৌকি চালিয়ে নিয়ে যেতো যারা

৭. কিরণ শঙ্কর সেন গুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম- চল্লিশের দশকে ঢাকা, ঢাকা- ১৯৯৪, পৃ. ১৯।

তাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। গরিব শ্রমজীবি বছরের এই সময়টাতে রোজগারও করতো বেশ মন্দ নয়।"

পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মিছিলের গ্যালারিগুলোতে সমকালীন ঘটনা গুরুত্ব লাভ করে। যেমন- দিল্লীর দরবার, যারবেদা জেলে মহাত্মা গান্ধী, গোলটেবিল বৈঠক, আজাদহিন্দ ফৌজ ইত্যাদি। অর্থাৎ মিছিলের বিষয়বস্তু পৌরাণিক জগৎ বা কল্পলোক থেকে মর্তলোকে নেমে এল। অন্যদিকে মিছিলের আবেদনও সমকালীন জনমানসকে প্রভাবান্বিত করতে থাকলো।

১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর মাসের পর চারশত বছরের ঐতিহ্যবাহী জন্মাষ্টমী মিছিল বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এ. জি. স্টক তাঁর স্মৃতিকথায় সে বছরের জন্মাষ্টমী প্রসঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা লিখেছিলেন। তিনি প্রাচীন ইউরোপে প্রচলিত মিরাকল নাটকের সঙ্গে মিছিলের সঙ-এর সাদৃশ্য খুঁজে পান ঃ

"ইউরোপে আজকাল আর দেখা যায় না যে মিরাকল নাটকগুলো অনেকটা যেন সেই নাটক মঞ্চায়নের মত ব্যাপারই। ব্যতিক্রম এই যে, মঞ্চায়িত নাটকের দৃশ্যের বদলে গাড়িতে জীবন্ত চিত্র ও প্রতীকী চিত্র বহন করা হচ্ছিল[৮]।"

চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেন মিছিলের চৌকিতে এক পুতুল নাচের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"এই চৌকিতে আজ রাবণ-বধ পর্ব চলেছে। সে কী ভয়ানক দৃশ্য। যেমনি রাম-লক্ষ্মণের হাত-পা এবং মুখের ক্ষিপ্রগতি এবং মারাত্মক সব অস্ত্র নিক্ষেপ, তেমনি রাবণ তার বিরাট খড়গ, দ্রুত চালিয়ে, চারপাশের হাওয়াটাকে খন্ডখন্ড করে ফেলে। তার হাতের চকচকে এই অস্ত্রটি থেকে ঝটিকাক্ষুব্ধ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুতের আলো-জিহ্বা লক্‌লক্‌ করে। সেই আগুনে রামলক্ষ্মণ পুড়ে ছাই হয়ে যায় আর কী। তাই দেখে আমার চোখের পলক থেমে যায়, বুক ধড়ফড় করে ওঠে। সব মিলে এক অদৃষ্টপূর্ব, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা'।[৯]

মিছিলের বিবর্তন

ঢাকায় ঈদ, মহররম বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত মিছিল ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মিছিলের আয়োজন হয়েছে। এ মিছিলগুলি ছিল ভিন্নতর।

১৯২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ঢাকায় আসেন, তখন এমনি এক মিছিলের আয়োজন করা হয়। সকাল দশটার দিকে নারায়ণগঞ্জে রবীন্দ্রনাথ স্টিমার থেকে নামলেন। ঢাকা পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথে ভলান্টিয়ারেরা দু'পাশে শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে

৮. এজি স্টক- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি- ১৯৪৭-১৯৫১, মোবাশ্বেরা খান অনূদিত, প্রবাহ, ২৫ জুন ১৯৯৮।

৯. পরিতোষ সেন- জিন্দাবাহার, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ৬৫।

যায়। তাদের শ্লোগান ছিল 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকি জয়'। এই ভলান্টিয়ারদের মধ্যে আবুল ফজলও ছিলেন একজন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথা 'রেখাচিত্রে' মিছিলের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"বিপুল জনতার মিছিল রবীন্দ্রনাথের গাড়ী মাঝখানে রেখে ঢাকার দিকে এগুতে লাগলো। ভলান্টিয়ারদের শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত।.......... জনতার ব্যূহ ভেদ করে রবীন্দ্রনাথের মোটর এগুচ্ছে ধীরে ধীরে। গাড়ীর এক দিকের পা-দানিতে দাঁড়িয়েছেন অধ্যক্ষ অপূর্ব কুমার চন্দ, অন্য পা-দানিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডক্টর মাহমুদ হাসান। এভাবে ঝুলতে ঝুলতে তাঁরা নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা পর্যন্ত এলেন।"[১০]

১৯২৮ সালের ১৮ আগস্ট ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ইউরোপ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে স্বদেশে ফিরে আসেন। তাঁকে ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে বেগমবাজারের বাসভবন পর্যন্ত বাদ্যযন্ত্র ও গাড়িসহযোগে মিছিল করে নিয়ে আসা হয়।[১১]

১৯৪৭-এর ১৪ আগষ্টও ঢাকায় এক বর্ণাঢ্য মিছিল বেরোয়। ঢাকার বিভিন্ন মহল্লার তরুণ সম্প্রদায় বাদ্যযন্ত্রসহ কুচকাওয়াজ করে নগরী পরিভ্রমণ করে।

কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার মিছিলেরও বিবর্তন ঘটেছে। একদা রাজকীয় শানশওকত ছিল মিছিলের অঙ্গ, তাও লোপ পায়। সাধারণ মানুষ ও তাদের চিন্তাচেতনা মিছিলে ক্রমেই প্রাধান্য পেতে থাকলো। অবশেষে আমরা দেখি মিছিল হয়েছে প্রতিবাদের প্রতীক, বিক্ষোভের প্রতীক, বিজয়ের প্রতীক। এভাবেই মিছিল কথা বলে।

---

১০. আবুল ফজল- রেখাচিত্র, পৃঃ ১৪৩

১১. মোঃ আবদুল কাইউম- অসাধারণ এক মিছিলের কথা, জনকণ্ঠ ১৫ জুলাই, ১৯৯৫

ঢাকাই রসিকতা

।। এক ।।

প্রাচ্যের রহস্য নগরী ঢাকা। এর যেমন রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, তেমনি এর অতীত নিয়েও রয়েছে কত কাহিনী, কত কিংবদন্তি। কালের স্বাক্ষর হয়ে এখনও মাথা উঁচু করে আছে কত প্রাসাদ, কত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। ইতিহাসের উত্থান-পতন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধ্বংসলীলার মধ্যেও ঢাকাবাসীরা অফুরন্ত জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছে যুগে যুগে।

মুঘল আমলে ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। এখন ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। আজকের ঢাকার জীবনযাত্রা আন্তর্জাতিক জীবন-যাত্রার সংগে সম্পর্কিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সমাগমে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরেই ঢাকার আদি বাসিন্দা বা অধিবাসীরা আচার-ব্যবহারে, বাকরীতিতে, ভাষা-ব্যবহারে এবং রঙ্গ-রসিকতায় আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছে।

ঢাকার সাবেক অধিবাসী বলতে আমরা তাদেরই ধরে নেব, যারা পুরুষানুক্রমে ঢাকা শহরে বসবাস করে আসছে। এদের অধিকাংশই মুসলমান। ইব্‌রাহিম খাঁ অনুমান করেন যে, "ঢাকার সাবেক বাসিন্দারা মূলত 'সেমিটিক জাতের মানুষ', যারা আরব অথবা উত্তর আফ্রিকার কোনো দেশ থেকে এসেছিল, বহু শত বছর ধরে এদেশী লোকের সঙ্গে বিয়ে-শাদীর ফলে এদেশীয় হয়ে গিয়েছে।" তিনি তাঁর এ অনুমানের সপক্ষে বলেন, "এরা আরবদের মত সর্দারের অধীনে থাকতে ভালবাসে ও সর্দারের হুকুম বিশ্বস্তভাবে পালন করে। এদের বাকচাতুর্য, এদের উপস্থিতবুদ্ধি আরবদের সাথে তুলনীয়। এদের রসপ্রিয়তাও আরবদের মত। টাকা হাতে পেলে আমোদে-উল্লাসে ও মেহ্‌মানদারীতে অকাতরে খরচ করা— এও আরব প্রকৃতিরই সমার্থক।"[১]

ঢাকার আদি বাসিন্দারা দু'টি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল- 'কুট্টি' ও 'সুব্বাসী'। মুঘল আমল থেকেই ধোলাই (বা দোলাই) খাল ঢাকা শহরকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে। এককালে এ-খালের পূর্বদিকে বাস করত কুট্টিরা। আর পশ্চিম দিকে সুব্বাসী বা সুখবাসীরা। পরবর্তীকালে এ ধোলাই-খালের উভয় তীরে অর্থাৎ কলতাবাজার, রায় সাহেবের বাজার, নারিন্দা, সুরিটোলা, মৈশুণ্ডি, সূত্রাপুর, বংশাল ইত্যাদি এলাকায় কুট্টিদের বসবাস গড়ে উঠে। চকবাজার, বেগমবাজার, ইসলামপুর, বাবু বাজার, উর্দু রোড, লালবাগ ইত্যাদি এলাকায় ছিল সুব্বাসীদের নিবাস। এই সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বিদ্যমান ছিল। এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ কদাচিৎ গড়ে উঠত। পরে কালক্রমে এই দু'শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হবার ফলে এলাকাভিত্তিক পরিচয়ও লোপ পায়।

'কুট্টি' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ লক্ষ করা যায়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে যারা কুঠি তৈরী বা রাজমিস্ত্রীর কাজ করত, তারাই 'কুটি' নামে পরিচিত।

---

১. ইব্‌রাহিম খাঁ, বাতায়ন, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ৬৪১।

'কুঠি' শব্দ থেকে 'কুটি' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে[১]। আমাদের অনুমান 'কুটি' শব্দই দ্বিত্বভবনের ফলে হয়েছে 'কুট্টি' (তুলনীয় চাকা>চাক্কা)। মতান্তরে, যারা ধানকোটা, ডালকোটা, সুরকি কোটা ইত্যাদি কাজে জড়িত, তারাই কুট্টি।[২] কুট্টি শব্দের বুৎপত্তি যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে, এরা ছিল শ্রমজীবী মানুষ। রাজমিস্ত্রীর কাজ থেকে শুরু করে ঘোড়ার গাড়ি চালানো, দোকানদারী করা প্রভৃতি নানা রকম পেশায় তারা নিয়োজিত ছিল। এককালে যে বহুবিচিত্র পেশার মানুষ ঢাকা শহরে বাস করত, তার প্রমাণ টেলরের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি ১৮৩৮ সালে ঢাকাবাসীদের ১৬২টি পেশার তালিকা প্রদান করেছেন।[৩]

'সুব্বাসী' শব্দটি 'সুখবাসী' শব্দ থেকে ব্যুৎপন্ন। এরা উর্দু মিশ্রিত বাংলা ভাষায় কথা বলত। এরা যেমন কুট্টিদের হেয়জ্ঞান করত, তেমনি কুট্টিদের চোখে এরাও ছিল সৌখিন, বিলাসপ্রিয়, শ্রমবিমুখ ও আরামপ্রিয়। পক্ষান্তরে, কুট্টিরা ছিল খাস বাঙালি বা বাংলা-ভাষী। কুট্টিরা শ্রমজীবী মানুষ বলে নিজেদের অভিজাত ও সৎ বলে মনে করতো। তারা সুখবাসীদের ব্যঙ্গ করে বলতো বাজাইরা বা বাজারে।[৪]

১৬০৮ সালে মুঘল আমলে ঢাকা রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড়শ' বছরকাল এর গৌরব অক্ষুণ্ন ছিল। বৃটিশ আমলে ঢাকার ইতিহাসে নানা রকমের দুর্যোগ দেখা দেয়। ১৭৬৯, ১৭৮৪, ১৮৬৫ ও ১৮৬৬ সালের বন্যা ও দুর্ভিক্ষের ফলে জনসাধারণের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে হ্রাস পায়। ১৮০০ সালে ঢাকার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ, কিন্তু ১৮৩৮ সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮ হাজার মাত্র।[৫] আর্থিক ও বাণিজ্যিক অবস্থার অবনতির ফলে সাধারণ নগরবাসীর দারিদ্র্য চরমে পৌঁছে। তাদের জীবন ছিল নিতান্তই একঘেয়ে ও দুঃসহ। ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদি ছাড়া তাদের সাধারণ জীবনযাত্রাও ছিল দুঃখময়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যেও মাঝে মাঝে আনন্দের ছটা বিচ্ছুরিত হতো তাদের স্বভাবজাত রসবোধের কারণে। ঢাকাবাসীদের, বিশেষ করে ঢাকাই কুট্টিদের রঙ্গ-রসিকতার কথা আজ জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে।

গতানুগতিক জীবনে প্রতিমুহূর্তেই কিছু না কিছু আকস্মিক, বিস্ময়কর অথবা অসঙ্গতিপূর্ণ ঘটনা ঘটে, যা মানুষের মনে কৌতুকবোধ বা রসবোধকে উজ্জীবিত করে। সাহিত্যেও লক্ষ করা যায়, মানবজীবনের অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতাকে কেন্দ্র করে রচিত হয় 'হিউমার' বা রস-সাহিত্য। ঢাকাবাসীদের কৌতুক বা রসিকতা নিয়ে প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনী বিশ্লেষণ করলে সুদীপ্ত এক রসবোধের সন্ধান লাভ করা যায়, যার উদ্দেশ্য সমাজ-সংস্কার বা ব্যঙ্গবিদ্রূপ নয়, নিছক আনন্দ। তাদের রসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যের ব্যবহার, চটুল উত্তর (repartee) এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব (ready-wit)।

১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদিত), পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ব্যঞ্জন বর্ণ অংশ, ঢাকা ১৯৬৫, পৃঃ ৭৬।
২. নাজির হোসেন, কিংবদন্তির ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃঃ ২৯।
৩. জেমস টেলর, কোম্পানি আমলে ঢাকা (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত) ঢাকা ১৯৭৮, পৃঃ ১৩৪-১৩৭।
৪. নীলিমা ইব্রাহিম, ঢাকাই রসিকতা, "সাহিত্য পত্রিকা", বর্ষা ১৩৮০, পৃঃ ১৪৭।
৫. জেমস টেলর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৬।

ঢাকাবাসীদের রসিকতার সঙ্গে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষার ও বাক্যরীতির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষাতাত্ত্বিক জরিপ প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলার উপভাষাসমূহকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই ভাগে ভাগ করে, প্রাচ্য-শাখার অধীন পূর্বদেশীয় উপশাখায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর ও সিলেটের উপভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। গ্রিয়ারসন তাঁর 'Linguistic Survey of India" গ্রন্থে ঢাকার উপভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলো প্রদর্শন করেননি। পরবর্তীকালের গবেষকরা ঢাকা শহরের কুট্টিদের উপভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। আদি ঢাকাবাসীদের উচ্চারণে একটি বিশেষ লক্ষণ রয়েছে, তা হচ্ছে 'চ'-বর্গীয় ধ্বনির ঘৃষ্ট (Affricate) উচ্চারণ। আশ্চর্যের বিষয়, 'চ' বর্গের ঘৃষ্ট উচ্চারণ শুধু বাংলা ভাষায় নয়, কোনোও ভারতীয় আর্য ভাষায়ও এর নিদর্শন মেলে না। পণ্ডিতরা মনে করেন এটি ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাবজাত।

ঢাকাবাসীদের উপভাষার বাক্যরীতিতেও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হচ্ছে– প্রশ্নাত্মক বাক্যের বহুল ব্যবহার। যেমন- কোনো দোকানীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় 'গেঞ্জি আছে?' তবে তার জবাবে 'হ্যাঁ আছে' না বলে বলবে 'গঞ্জি থাকবো না, থাকবো কি?' ঢাকার উপভাষায় হিন্দী-উর্দূর প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সম্বোধনবাচক শব্দ 'আবে' হিন্দীজাত। 'বি' অব্যয় (আমি বি, তুমি বি) উর্দু বা হিন্দী থেকে আগত। বাক্যে বহুল ব্যবহৃত 'মগর' অব্যয়টিও উর্দু থেকে এসেছে।

শ্যালক-অর্থবাচক 'শালা' বা 'হালা' শব্দটি বাংলা ভাষায় গালি অর্থে ব্যবহৃত হলেও ঢাকাবাসীদের ভাষায় তা গালি অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এটি একটি অব্যয় মাত্র, কখনও কখনও অর্থহীন। তাই নিশ্চিন্তে তারা বলতে পারে 'বাপ হালা', 'মা হালা', ইত্যাদি।

ঢাকাই ভাষার এই ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানগুলো তাদের কৌতুক বা রসবোধের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত দু'একটি উদাহরণ দেয়া যায়। হোটেলের চায়ে মাছি পড়ার কথা বললে হোটেলওয়ালার উক্তি 'তিন পয়সার চায়ে হালা মাক্ষি পড়বো নাতো কি আত্তী পড়বো?' (তিন পয়সার চায়ে মাছি পড়বে নাতো কি হাতি পড়বে)। অথবা বাড়িওয়ালাকে ছাদ থেকে পানি পড়ার অভিযোগ করলে সে কম-ভাড়ার দোহাই দিয়ে বলবে, 'পানি পড়বো নাতো কি শরবত পড়বো?' (পানি পড়বে না কি শরবত পড়বে?)।

ঢাকাবাসীদের বিশিষ্ট শব্দপ্রয়োগ বা বাক্যরীতি কিভাবে তাদের রসবোধের সহায়ক হয় তার আরেকটি উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

"অনেক দিন পর মামা-ভাগ্নেতে দেখা-

– কি বে মামু কবে আইলা?

– আমি আহি নাই, আইয়া পড়ছি।

– আইয়া পড়ছো? ক্যামনে?

– আবে হালা চলছিলাম চানপুর, আইয়া পড়লাম নারায়ণগইঞ্জ।

– এইবার তো মামু খুব চাস করলাম।

– তে জমি আছে, জমা আছে, হাল চাস করবা না তো খাল কাটবা?

– আমি তো হালায় কদ্দু (লাউ) লাগাইলাম।

– তে কদ্দুর হময় (সময়) কদ্দু লাগাইবা না তো চাইল কুমড়া (চাল কুমড়া) লাগাইবা?

– আমি তো হালায় কদ্দু বাজারে লইয়া গেলাম।

– তে কদ্দু বাজারে লইয়া যাইবা নাতো কি হালা বুড়িগঙ্গায় ফালাইয়া দিবা?

– বুঝলা মামু পুলিশের লোক তো কিনতে আইলো। আমি তো হালা চাইর আনা চাইলাম।

– ক্যান চাইবা না? বড় কদ্দু, বালা কদ্দু, চাইর আনা চাইবা নাতো কি হালা চাইর পয়সা চাইবা?

– ওরা তো হালা চাইর পয়সা কয়।

– ক্যান কইবো না? হালা বাজার ভর্তি কদ্দু, চাইর পয়সা কইবো না তো কি চাইর আনা কইবো?

– আমি তো হালা চাইর আনার কম ছারুম (ছাড়বো) না।

– ক্যান ছাড়বা? বড় কদ্দু, ভাল কদ্দু, চাইর আনার কম ছাড়বা ক্যান?

– পুলিশের লোক, বুঝলা মামু কদ্দুও লইয়া গেলো, পয়সাও দিলো না।

– ক্যান দিব? অগোই রাজত্বি। তুমি হালা গ্যাছ পুলিশের লগে তেরিবেরি (বাড়াবাড়ি) করতে?

– আমি হালা কি করি, বাড়ি আইয়া পড়লাম।

– তে বাড়ি আইবা নাতো কি হুদা (অহেতুক) বাজারে বইয়া (বসে) থাকবা?

– এইবার হালা আর চাস করুম না।

– ক্যান করবা? জমি আছে, জমা আছে, ভালা মাটি, সার মাটি, তোমার হালা খাওনের চিন্তা? এইবার বাড়িত চুপচাপ বইয়া থাকো।"

ঢাকাবাসীদের রসবোধের পরিচায়ক এই গল্পটি অবশ্য নতুন করে লেখা, প্রচলিত কাহিনী নয়। তবে এতে ঢাকাই রসিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট।

শুধু ভাষাতাত্ত্বিক নয়, ঢাকার আদিবাসীদের রসিকতার মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানও দুর্লক্ষ নয়। ঢাকার আদিবাসীদের রসিকতার কাহিনীগুলোতে লক্ষ করা যায়, ঘোড়দৌড় বা ঘোড়াগাড়ির কোচোয়ানদেরকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ কাহিনীর সৃষ্টি। এককালে ঘোড়দৌড় এবং কাওয়ালী ছিল ঢাকাবাসীদের আমোদ-প্রমোদের একমাত্র অবলম্বন। ঢাকার নবাবদের উৎসাহেই ঘোড়দৌড়ের প্রচলন হয় এবং এই উপলক্ষে ঢাকার অফিস-আদালতও বন্ধ থাকতো। ঘোড়দৌড় নিয়ে প্রচলিত একটি গল্প আছে- একজন ঢাকাবাসী যে ঘোড়ার উপর বাজি রেখেছিল সে ঘোড়দৌড়ে সবার পেছনে পড়ে যায়, কিন্তু ঢাকাবাসীও সহজে হার মানার পাত্র নয়। সে তার ঘোড়া সম্পর্কে বলে 'হালা বাঘের বাচ্চা সবগুলিরে খেদাইয়া লইয়া গেলো (সব ঘোড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল)।'

ঢাকাই রসিকতায় বাঘের বাচ্চার সঙ্গে তুলনা দেয়ার মতো প্রচুর তুলনা বা উপমার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ঢাকাবাসীরা একে বলে 'মিশাল দেয়া'।

উনিশ শতকের ষাটের দশকে প্রথম-প্রচলিত ঘোড়াগাড়ির কোচোয়ানদের মুখে প্রচুর 'মিশাল' শোনা যায়। তারা তাদের গাড়ির ঘোড়ার সঙ্গে পঙ্ক্ষীরাজের তুলনা করতো এবং এও বলতো 'হপায় পঙ্ক্ষীরাজের ডানা কাটছি- গা-ও হুকায় নাই' (মাত্র পঙ্ক্ষীরাজের ডানা কেটেছি, ঘা-ও শুকায় নি)। গাড়ির ভাড়া কম বললে, তাদের মুখে শোনা যেতো প্রচলিত একটি রসিকতা- 'আস্তে কন, ঘোড়াবি হাসবো' (ঘোড়াও হাসবে)।

কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ঘোড়াগাড়ির যুগ শেষ হবার পর এসেছ 'রিকশার যুগ'। এখন ঘোড়া আর পঙ্ক্ষীরাজ নয়, রিকশাই হয়েছে 'পঙ্ক্ষীরাজ'। ঘোড়াগাড়িতে পর্দানশীন মহিলারা গাড়ির জাফরি তুলে দিয়ে যাতায়াত করতো। কিন্তু ঢাকার নবাগত রিকশায় পর্দানশীন মহিলারা শাড়ির ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে চলাফেরা করতো। তাদের নিয়ে ঢাকায় প্রচলিত এক গান ছিল– 'তিন চাক্কার রিকশা গাড়ি/ ভাবী চইল্যা যায়/ পায়ের মইধ্যে আলতা দিছে/ লাল দেহা যায়'। এ গানে ঢাকাবাসীদের রসবোধের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যবুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘোড়াগাড়ির কোচোয়ানদের মতো রিকশাওয়ালাদের ভাড়া নিয়েও কিছু রসিকতা প্রচলিত রয়েছে। অল্প দূরত্বের গন্তব্যস্থানের জন্য আট আনার বেশি ভাড়া চাওয়াতে যখন বলা হয়– 'আট আনায় যাবে না, ঐত দেখা যায়', তখন রিকশাওয়ালার অকাট্য যুক্তি- 'চান্দ বি দেখা যায়, তো আট আনায় যাইবেন' (চাঁদও দেখা যায় তবে আট আনায় যাবেন)? শুধু তাই নয়, রিকশা ভাড়া অপ্রত্যাশিতভাবে কম বললে এমনও শোনা যেতো- 'রিকশায় চড়ন লাগবো না, কুলির মাথায় বইয়া যান গা' (রিকশায় চড়া লাগবে না, কুলির মাথায় বসে যান)।

এককালে ঢাকা শহরে সারারাত ধরে কাওয়ালীর আসর চলতো। তাই মুরগি বিক্রেতা তার মুরগি ঝিমাচ্ছে, এই অভিযোগ শুনে বলে- 'মুরগি হালা সারা রাইত ধইরা কাওয়ালী হুনছে তাই ঝিমাইতাছে' (মুরগি সারা রাত ধরে কাওয়ালী শুনেছে, তাই ঝিমাচ্ছে)।

ঘোড়ার গাড়িওয়ালা, বাড়িওয়ালা বা রিকসাওয়ালা বাদ দিলে অধিকাংশ ঢাকাই রসিকতা দোকানদারদের কেন্দ্র করে। চকবাজার, মৌলভীবাজার, মোগলটুলী ও ইসলামপুরের বিভিন্ন ধরনের দোকানের অধিকাংশ ক্রেতাই ছিল গ্রাম বা মফঃস্বল থেকে আগত। ঢাকাই দোকানদাররা এ ধরনের ক্রেতাদেরকে হেয় জ্ঞান করে 'বাংগাল' নামে আখ্যায়িত করতো। শুধু তাই নয়, তাদেরকে জব্দ করে বা ঠকিয়ে আনন্দও পেতো। এর পেছনে অবশ্য তাদের শ্রেয়োমন্যতাই ক্রিয়াশীল ছিল। তারা মনে করতো, তাদের পূর্বপুরুষ মুগল আমলে একজন কেউকেটা ছিলো। ক্রেতারা জুতোর দামের অর্ধেক দরে জুতা কিনতে চাইলে তারা ক্রেতাকে একজোড়ার বদলে একটা জুতা গছিয়ে দিতো। গ্রামবাসীদেরও একটা ধারণা ছিল যে, দোকানদাররা তাদের ঠকায়। সে কারণে তারা দোকানদারকে অনেক কম দাম বলতো। দোকানদাররাও কম দাম বলায় হয়তো আয়না-ক্রেতাকে বলতো, 'আয়না কিনন লাগবো না, আইচায় পানি লইয়া চেহারা দেইখেন' (আয়না কিনতে হবে না, নারকেলের মালায় পানি রেখে চেহারা দেখবেন)। অথবা টুপি ক্রেতাকে বলতো- 'মাটির মালসা কিনা লন, পান্তা খাইবার বি পারবেন, মাথায়ও দিবার পারবেন।' এক পয়সার পাখা দিয়ে বাতাস করা যায় না এ-অভিযোগের উত্তরে দোকানদার বলতো- 'এক পয়সার পাঙ্খায় মাথা হিলাইতে অয়, পাঙ্খা না' (এক পয়সার

পাখায় মাথা নাড়াতে হয়, পাখা নয়)।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢাকাবাসীরা নিষ্ঠুর রসিকতা করতেও ছাড়তো না। যেমন, কাপড়ের দোকানে একজন ক্রেতা কালো রঙের সার্ট কিনতে এসে কোনোটাই পছন্দ না হওয়াতে চলে যায়। তখন দোকানদার ঐ কৃষ্ণকায় ভদ্রলোককে বলে, 'কাপড় কিনন লাগবো না, বুকে কয়টা বোতাম লাগাইয়া লইলেই অইবো।'

ঢাকাবাসীদের রসিকতা কখনোই অশ্লীল বা স্থূল ছিল না। তবে তা গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট না হলেও একান্তভাবে নাগরিকও নয়।

ঢাকাই রসিকতার বৈশিষ্ট্যই হলো যে, অন্যকে অপ্রস্তুত প্রতিপন্ন করে বিমল আনন্দ উপভোগ করা। এমনও ঘটে যে, যাকে নিয়ে রসিকতা করা হলো, তিনিও সে আনন্দে অংশগ্রহণ না করে পারেন না। বক্তার চটুল উত্তরে অথবা আশ্চর্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। পথে আমরা ডাকবাক্স তো অনেকেই দেখেছি, তবে ঢাকাই গাড়োয়ানের রসিকতায় প্রথম জানতে পারি, আমরাও মাঝে মাঝে ডাকবাক্সের মতো অবাক বিস্ময়ে হা করে থাকি (উদাহরণ-'মর জ্বালা, ডাকবাক্সের লেহান হা কইরা রইছেন ক্যা?)। এই চমকটাই ঢাকাই রসিকতার সম্পদ।

ঢাকাই রসিকতাকে মোটামুটি দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। এক জাতীয় রসিকতা গতানুগতিক, মান্ধাতার আমল থেকে চলে এসেছে। আর এক ধরনের রসিকতা সমকালীন পটভূমিতে ঢাকাবাসীদের Inherent quality থেকে উদ্ভূত। তাই যুগে যুগে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকাই রসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। গাড়োয়ান সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার অবাধ্য দুই ঘোড়াকে ভর্ৎসনা করে তাই বলে- 'দুই হালায় দুই দিকে চলছে, একজন নাজিমুদ্দিন আর একজন ফজলুল হক'। অন্য এক গাড়োয়ান হয়তো চলতে অনিচ্ছুক ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে, বলে- 'আর একটু যা, রেললাইন পার হইলেই তো মন্ত্রী হইয়া যাইবি।' বস্তুত, তখন মন্ত্রীরা সকলেই রেললাইনের উত্তরে নতুন শহরে বাস করতেন।

ঢাকাবাসীদের রসবোধ এক অর্থে অনন্য। কারণ, শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতীয় উপ-মহাদেশের আর কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের রসবোধ এমন কিংবদন্তিরূপে প্রতিষ্ঠা পায়নি। অঞ্চল-বিশেষের লোক বুদ্ধিমান বা বোকা, এমন নিদর্শন হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু অঞ্চল বিশেষের অধিবাসীদের ব্যাপক রসবোধের নিদর্শন পৃথিবীতেও কম। সৌভাগ্যক্রমে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের "বুলগেরিয়া ভ্রমণ"-গ্রন্থের সুবাদে আমরা জানতে পারি যে, বুলগেরিয়ায় 'গ্যাব্রোভো' গ্রামের অধিবাসীরা তাদের হাস্য-পরিহাসপ্রিয়তার জন্য সুপরিচিত এবং তাদের রসিকতা নিয়ে 'গ্যাব্রোভো অ্যানেকডট্স' নামে গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।[৬]

সামাজিক বিবর্তনের সংগে সংগে ঢাকার আদি অধিবাসীরা আজ জনতার ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের সেই রঙ্গ-রসিকতার কাহিনীও ক্রমে লোপ পাচ্ছে। কিন্তু বিমল আনন্দ অনুসন্ধানে ঢাকাবাসীদের রসবোধ যেভাবে উৎসাহিত হয়েছিল, সেভাবে আমরাও যদি শত সমস্যা-জর্জরিত জীবনে আনন্দের অনুসন্ধান করি, তবে জীবন অবশ্যই কল্যাণময় হবে।

৬. মুহাম্মদ এনামুল হক, বুলগেরিয়া ভ্রমণ, ঢাকা ১৯৭৮, পৃঃ ১৫৭।

।। দুই ।।

ঢাকাই রসিকতার কয়েকটি গল্প

(১)

ঢাকাই কুট্টি বসে আছে ঘোড়াগাড়ির কোচবাক্সে। যাত্রী বাবু জামাজোড়া পরে দোতলার ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। এমন সময় পা গেল হড়কে। বহুতর ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বাবু গড়িয়ে নামলেন নিচে। কোচোয়ান তিন লাফে কোচবাক্স থেকে নেমে বাবুকে কোলে তুলে নিল। সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দরদ ভরা কণ্ঠে বলে "আহো-হো কত্তার বড় লাগছে। আহা-হা-হা, এইখানে লাগছে, এ-হে-হে-হে ওইখানে লাগছে"। গা বুলায় আর আদর করে, আদর করে আর গা বুলায়। শেষে কিন্তু সান্তনা দিয়ে বলে-"কিন্তু বাবু, আইছেন বড় জলদি"।

(ধূপছায়া-সৈয়দ মুজতবা আলী)

(২)

ঘোড়াগাড়ির কোচোয়ানের সঙ্গে ভাড়া ঠিক করছে এক যাত্রী।

যাত্রী - ওই রমনা যেতে কত নেবে?

গাড়োয়ান - এমনি ত দেড় ট্যাকা লই, ত বাবুর লাইগা এক ট্যাকাতেই অইবো।

যাত্রী – বলে কি হে? ছ-আনায় হবে না?

গাড়োয়ান – আস্তে কন বাবু, ঘোড়ায় হুনলে (শুনলে) আসবো (হাসবো)।

(ধূপছায়া)

(৩)

ঘোড়ার গাড়ি চলছে, কিন্তু গতি মন্থর।

যাত্রী – কিমুন ঘোড়া তোমার মিয়া, চলবার পারে না।

গাড়োয়ান – কি কন হুজুর। চলবো, চলবো। পয়সা লইছি, না চইলা পারে। (চাবুক মেরে) আবে হালা চলস্ না ক্যা?

যাত্রী – তোমার যে ঘোড়া। দুই পাশে পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে, সারা গায়ে ঘা।

গাড়োয়ান – হালায় আমার পঙ্খীরাজ। পরশু দিন পাঙ্খা কাটছি। ঘা-ও হুকায় (শুখায়) নি।

যাত্রী – কই তোমার পঙ্খীরাজ, চলে না কেন?

গাড়োয়ান – আমিও হালায় ভাইবা পাই না। কান লড়ে, ল্যাজ নড়ে, মগর পাও কেন লড়ে না?

(বাতায়ন-ইব্রাহীম খাঁ)

(৪)

ঢাকায় সদ্য আগত একজন ঘোড়াগাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়া ঠিক করছে।

যাত্রী – বাদামতলী যাবে, কত ভাড়া চাও।

গাড়োয়ান – পাঁচ সিকা পয়সা দিয়েন, হুজুর।

যাত্রী – না, অতো ভাড়া দেওয়া যাবে না।

গাড়োয়ান – একটা টাকা দিয়েন হুজুর।

যাত্রী – তা হবে না, আট আনায় যদি পার চলো।

গাড়োয়ান – ঠিক আছে, চলেন, হুজুর আপনেরো ঠেকা, আমারো ঠেকা।

মাঝপথে গিয়ে গাড়ি থামলো।

যাত্রী – একি! গাড়ি থামলো যে?

গাড়োয়ান – আমি কি করুম হুজুর, গোড়ায় (ঘোড়ায়) তো কবুল করে না।

যাত্রী – তারে মানে?

গাড়োয়ান – হুজুর, ঘোড়ায় কয়-আট আনার রাস্তাতো পার অইয়া আইছি।

যাত্রী – তারপর?

গাড়োয়ান – অহন নাইমা পড়েন। আর না অইলে আরও আট আনা ছাড়েন। ঘোড়ারে কইয়া বইলা রাজি করাই।

(বাতায়ন)

(৫)

অনেকদিন আগের কথা, মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দিন আর কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হক দু'জনেরই দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঘোড়ার গাড়ির দু'টি ঘোড়াই হঠাৎ বে-সামাল হয়ে পড়েছে। যাত্রী প্রশ্ন করে- 'কি হলো তোমার?' তৎক্ষণাৎ উত্তর এলো- 'দ্যাহেন না হালায় ফজলুল হক আর নাজিমুদ্দিন, দুই হালায় দুইদিকে চলছে।'

(নীলিমা ইব্রাহীম)

(৬)

ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ছে, তবু ঘোড়া এগোয় না। তখন গাড়োয়ান আদরের সুরে বলছে- 'আর এক জিরিসি (একটুখানি) চল, সোনা আমার, চল।'

যাত্রী – 'বড় তো আদর করতে লাগছো ঘোড়ারে। ও এগিয়ে গেলে ওরে কি আমিরতি খাওয়াবে?'

গাড়োয়ান – 'আরে ও কোন রকমে রেললাইনটা পার অইয়া রমনা গেলেই ত মন্ত্রী অইয়া যাইবো।'

(বাতায়ন)

(৭)

মহল্লায় আড্ডা বসেছে।

– আবে হুনছস্ নি?

– কওনের আগেই হুনুম। আমি কি মন্ত্রী আইনদ্দীন অইলাম না কি?

– ক্যান? আইনদ্দীন তোমার কি করছে?

– মন্ত্রী অওনের আগে কথা হুনছে। অহন সামনে গিয়া কিছু কওনের আগেই কয় হুনছি, হুনছি। হালায় নি হি আরও বড় মন্ত্রী অইবো।

– আর গাইল (গালি) দিস না ভাই। যতো গাইল দিবি, ততোই হালায় উপরে উঠবো।

– তবে এ্যালা (এখন) তারিফ শুরু কর, আপনেই নাইমা আইবো।

(বাতায়ন)

(৮)

সদরঘাট থেকে একজন রিকশায় গুলিস্তান যাবে।

– এই রিকশা, গুলিস্তান যাবে?

– যামু না ক্যান? একশ'বার যামু।

– কতো নেবে?

– এক টাকা দিয়েন।

– বলো কি হে? একটু গেলেইতো গুলিস্তান দেখা যাবে।

– বহুত বালা কইছেন। এইখান থেইকা তো চান্দ দেহা যায়। এক টেকায় চান্দে বি যাইবার চান?

(৯)

ঢাকায় তখন রেসকোর্সের ময়দানে ঘোড়দৌড় চালু ছিল। একজন ঢাকাবাসী একটি ঘোড়ার উপর বাজী রাখলো। দুর্ভাগ্য যে, তার ঘোড়া সবার শেষে এল। বন্ধুরা যখন তাকে ব্যঙ্গ করতে শুরু করলো, তখন সে বললো- 'আবে কি কস? দেখলি না, ঘোড়া তো না, বাঘের বাচ্চা। ঐ বাঘের বাচ্চা হগল ঘোড়ারে খেদাইয়া লইয়া গেলো'।

(১০)

দশ টাকা ঘর ভাড়ার বাসিন্দারা বেশ কয়েক মাস ভাড়া পরিশোধ করেনি। বাড়ির মালিক তেড়ে আসে। বাড়িওয়ালা কিছু বলার আগেই একজন বলে ওঠে- 'আপনার এই ভাঙা ঘরের ভাড়া দশ টাকা! আর একটু বৃষ্টি হলেই ছাদ থেকে পানি পড়তে শুরু করে।'

বাড়িওয়ালা বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বলে- 'কন কি? দশ ট্যাকা ভাড়ার ঘরে পানি পড়বো না তো শরবত পড়বো?'

(১১)

চায়ের দোকানের এক ক্রেতা অভিযোগ করে- 'এই মিয়া, তোমার চায়ে যে, পিঁপড়া ভাসে?' চায়ের দোকানদার উত্তর দেয়- 'তিন পয়সার চায়ে পিঁপড়া ভাসবো নাতো আত্তী (হাতি) ভাসবো?'

(১২)

এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো লং কোট বা প্রিন্স কোট বানাতে। ভদ্রলোকের গায়ের রঙ মিশ্‌কালো, তদুপরি তিনি হাড়কিপ্‌টে। কালো বনাত দেখলেন, সাজ দেখলেন, আলপাকা দেখলেন, কোনো কাপড়ই তাঁর পছন্দ হয় না, অর্থাৎ দাম পছন্দ হয় না। দোকানী শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সদুপদেশ দিলো- 'কর্তা, আপনে কালো কোটের জন্য খামোকা পয়সা খরচ করতে যাইবেন ক্যা? গতরে বুকের উপর ছ-টা বুতাম আর দুই হাতে কব্জির উপর তিনটা তিনটা কইরা ছয়টা ছোট বুতাম লাগায়া নেন। কালা কোট আর বানান লাগবো না।'

(ধূপছায়া)

(১৩)

ডিম কিনতে এসেছে একজন বেশ লম্বাগোছের ভদ্রলোক।

– এই ডিমের হালি কতো?

– দুই ট্যাকা।

– কি বলে? এই ছোট ছোট ডিম দুই টাকা হালি?

ঈষৎ খর্বকায় ডিমওয়ালা উর্দ্ধনেত্রে লম্বা ক্রেতার দিকে তাকিয়ে বলে- 'অতো দূর থাইকা দেখলে সবই ছোট দেখা যায়। কাছে আইয়া দেহেন, আণ্ডা বড় না ছোট।'

(১৪)

ফলের দোকানে এক ভদ্রলোক আম কিনতে এসেছেন। তিনি কয়েকটা আম টিপে টিপে দেখে অবশেষে বলেন- 'না, তোমার আম ভালো নয়। ভেতরে পচা।' আম-বিক্রেতা চীৎকার করে আর সব আম-বিক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে- 'আবে হক্কলে সাবধান। আমের ডাক্‌টর আইছে। হালায় আমের নাড়ী টিপা কইয়া দিছে- আম পচা।'

(১৫)

মুরগিওয়ালা মুরগি বিক্রি করছে। একজন ক্রেতা এসে এটা দেখছেন, ওটা দেখছেন, কিন্তু কোন মুরগিই পছন্দ হচ্ছে না। ক্রেতা বলেন- 'তোমার সব মুরগিই দেখি ঝিমাচ্ছে। এই অসুস্থ মুরগি কিনে কি হবে?'

মুরগিওয়ালা হাসতে হাসতে বলে- 'কি যে কন সাব। কাইল রাইতে সব মুরগি সারা

রাত জাইগা কাওয়ালী হুনছে, আর অহন ঝিমাইতেছে।' বলেই সে মুরগির খাঁচায় কষে এক থাপড় লাগায়। মুরগিগুলো সমস্বরে চিৎকার করে উঠে।

(১৬)

চকবাজারের টুপির দোকানে সদ্য গ্রাম থেকে আসা একজন টুপি কিনতে এসেছে। সে জানে যে, দোকানদাররা গ্রামের লোকদের ঠকায়। তাই দোকানদার যখন টুপির দাম বলে দু'টাকা, তখন সে বলে-চাইর আনায় দিবা না?'

দোকানদার উত্তেজিত হয়ে বলে- 'টুপি কিনন লাগবো না। চাইর পয়সায় একটা মালসা (মাটির পাত্র) কিনা লইয়া যাও। মাথায় বি দিবার পারবা, আবার ভুক লাগলে ঐটায় পান্তা বি খাইবার পারবা।'

(১৭)

আরেক ক্রেতা এসেছে আয়নার দোকানে। আয়নার দাম চার টাকা শুনে সে বলে- 'আট আনা দিমু।' দোকানদার বলে- 'খামোখা পয়সা খরচ করো ক্যা। একটা নাইরলের আইচা (নারকেলের মালা) যোগার কইরা পানি ভইরা লিও– চেরা (চেহারা) বি দেখবার পারবা, আবার আইচায় মুড়ি বি খাইবার পারবা।'

(১৮)

বাজারে এসেছে এক ক্রেতা। গ্রাম থেকে এসেছে। চেহারা আর পোশাক দেখেই বোঝা যায় গ্রাম্য। তালপাতার পাখা কিনছে। দোকানদার ক্রেতা বুঝেই দাম হাঁকে এক টাকা। ক্রেতা দাম বলে দুই আনা। দোকানদার দু'আনায় একটি ভাঙা পাখা দিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরেই ক্রেতা ফিরে এসে অভিযোগ করে, 'এতে বাতাস করা যায় না।'

দোকানদার হাসতে হাসতে বলে- 'করছেন কি? দুই আনার পাঙ্খায় কি পাঙ্খা নাড়ন লাগে? হাতে পাঙ্খা ধইরা রাখবেন আর পাঙ্খার বদলে মাথা হিলাইতে থাকবেন।'

(১৯)

কাছারিতে একটি মামলা চলছে। এক ঢাকাবাসী এসেছে। তার পিতা একজন সাক্ষী। কিন্তু ঠিক সময়ে সে ঢাকাবাসীর পিতা কোথাও গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উপায়ান্তর না দেখে সে তার ভগ্নীপতিকে ধরে নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে- 'এই আমার বাপ।'

মামলার কাজ নির্বিঘ্নে শেষ হয়। মামলার শেষে ক্রুদ্ধ ভগ্নীপতি বলে- 'আমারে বাপ বানায়া দিলা?' ঢাকাইয়া তখন হাসতে হাসতে বলে- 'কামের সময় বাপ অইবার পারবা না তো, বইন বিয়া দিছিলাম কেলেগা।'

(২০)

বিদেশী কায়দা-কানুন জানা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রাস্তায় একজন ঢাকাবাসীর ধাক্কা লেগে যায়। দুঃখিত হয়ে ভদ্রলোক 'সরি' বলতে গিয়ে আঞ্চলিক উচ্চারণে বলে- 'ছরি।

ঢাকাবাসী তরুণটি বলে- 'ধাক্কা বি দিলি আবার ছেড়ি (মেয়েছেলে) বি কইলি?'

(২১)

ইংরেজী জানা কেতা- দুরস্ত এক ভদ্রলোক একটি জিনিস কিনে দোকানদারকে বলে- 'থ্যাঙ্ক ইউ'। দোকানদার বলে- 'বালা কইলি তো বালা। আর যদি গাইল দিয়া থাকস, তে তুই থাঙ্কু, তর বাপ থাঙ্কু, তর চৌদ্দ গুষ্টি থাঙ্কু।'

(২২)

পাড়ার তরুণেরা টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। পুরস্কার বিতরণীর জন্য সমাদরে ডেকে এনেছে মহল্লার সর্দারকে। সর্দার সাহেব জীবনে টেবিল টেনিস খেলা বা টেবিল টেনিস বল দেখেননি। তাই পুরস্কার দেবার সময় বক্তৃতায় তিনি বলেন–

"একজন হারছেন, একজন জিতছেন- এটা কুন কথা না। একজন জিতবোই, একজন হারবোই। মগর আপনারা দুইজনে বহুত বাইড়া-বাইড়ি কইরাও আণ্ডাটারে ফাটাইবার পারলেন না। সাব্বাস দেই, ওই মুরগিরে- যে মুরগি ওই আণ্ডাটা পাড়ছে।"

(২৩)

একজন স্থূলকায় ব্যক্তি গেছেন মাংস কিনতে। তিনি অভিযোগ করেন- 'তোমার গোস্তে তো দেখি সবই হাড়।' গোস্ত বিক্রেতা কসাই বলে 'গোস্তে আড্ডি থাকবো না তো থাকবো কি? আপনার শরীরেওতো আড্ডি (হাড়) কম নাই। এক কাম করেন, গোস্ত না কিনা কেলা (কলা) কিনা লিয়া যান- আড্ডি পাইবেন না।'

(২৪)

কলা বিক্রেতাকে এক ক্রেতা বলে- 'তোমার কলা বড় ছোট, সব এক সাইজের না।

- 'হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান অয় সাব? আল্লাহরই ইনসাফ বড় ছোট।'

কবিতায় সেকালের ঢাকা

ঢাকা মহানগরী এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী। ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সুবাদার ইসলাম খাঁ ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং এর নতুন নামকরণ হয় জাহাঙ্গীরনগর। মুঘল আমলেই এদেশে ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে এবং ইউরোপীয়দের স্মৃতিকথায় বা ভ্রমণ-কাহিনীতে ঢাকার নাম বিভিন্ন বানানে পাওয়া যায়; যেমন Daeck (১৬১২), Dekaka (১৬১৭), Daka (১৬৬০), Daca (১৬৬৫), Dacca ((১৬৮২) ইত্যাদি।[১]

মধ্যযুগের কবিতায় ঢাকার উল্লেখ খুব বেশি পাওয়া যায় না। ঢাকার প্রাচীনতম উল্লেখ আমরা কবি আবদুল হাকিমের (সতের শতক) রচনায় লক্ষ করি ঃ

স্বপনেতে কেহ ঢাকা কেহ চাটি গ্রাম।[২]

স্বপ্নে একজন মানুষ অনায়াসে লক্ষযোজন পার হয়ে যেতে পারে একথা বোঝানোর জন্যই কবি ঢাকা-চট্টগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন।

মুঘল শাসনামলে ঢাকার ইতিহাস ও পরিচিতি রচিত হয়েছে প্রধানত ফারসি ও উর্দু ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ অবলম্বনে। কোম্পানি বা ব্রিটিশ সরকারের আমলের ঢাকায় অধিষ্ঠিত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে অনেকেই ঢাকা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ, রিপোর্ট, ভ্রমণকাহিনী ও রোজ-নামচা রচনা করেছেন। ঢাকার ইতিহাস রচনায় এগুলো মূল্যবান উপাদান বলে বিবেচিত হয়। উনিশ শতকের সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকা অবলম্বন করে ঐতিহাসিকগণ সেকালের ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। সেকালের কবিতায় ঢাকার যে পরিচয় বা বিবরণ পাওয়া যায়, আমরা এখানে তা তুলে ধরছি।

আমাদের লোকসংস্কৃতির একটি প্রধান শাখা ছড়া। যুগ যুগ ধরে লোকের মুখে মুখে ছড়া রচিত ও প্রচলিত হয়ে এসেছে। কিছু কিছু ছড়ায় আমরা ঢাকার উল্লেখ পাই। যেমন–

১. চলরে ভাই ঢাকায় যাই,
ঢাকায় গিয়ে ফল খাই,
সে ফলের গিরু (গিঁট) নাই (=ডিম)।[৩]

২. বেহায়া বেরসিক বাঁকা
তিন নিয়ে ঢাকা।[৪]

১. William Crooke সম্পাদিত Hobson-Jobson নতুন সংস্করণ, Rupa & Co, Calcutta 1990, পৃঃ ২৯০।
২. ড. রাজিয়া সুলতানা (সম্পাদিত)- আবদুল হাকিম রচনাবলী, ঢাকা, স্বপ্নের বয়ান, পৃঃ ৪২৯।
৩. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা ধাঁধার রূপ ও গঠন-প্রকৃতি, লোক-সংস্কৃতি গবেষণা, বৈশাখ/ আষাঢ় ১৪০১, পৃঃ ২২।
৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা প্রবাদ, স্থান-কাল পাত্র, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ১২৫।

প্রথমোক্ত ছড়ায় 'ঢাকা' শব্দটির হেঁয়ালীগত কোনো অর্থ না থাকলেও একটি তথ্য এখানে জানা যায় যে, ঢাকায় কেউ বেড়াতে এলে এখান থেকে ফল-মূল কিনে নিয়ে যেতো। অর্থাৎ ঢাকায় জমজমাট ফলের বাজার ছিল। দ্বিতীয় ছড়াটি নিন্দাবাচক। এর রচয়িতা ঈশ্বরগুপ্ত না হলেও এই ছড়া ঈশ্বরগুপ্তের একটি বিখ্যাত ছড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়-

"রেতে মশা দিনে মাছি
এই তাড়িয়ে কল্‌কেতায় আছি।[৫]

ছড়া দুটির রচনাকাল আমাদের জানা নেই, কিন্তু উনিশ শতকে প্রচলিত দু'টি ছড়া আমরা পেয়েছি। উনিশ শতকের প্রথমদিকে ঢাকায় মৌলভী আবদুল আলী নামে জনৈক ব্যক্তি বিশেষ সুবিদিত ছিলেন। তাঁর মেজাজ ও উগ্র স্বভাবের জন্য তাঁকে ঢাকাবাসীরা 'পাগলা মৌলভী' বলে ডাকতো। "ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছড়ায় আমরা মৌলভী আবদুল আলীর কথা পাই।

"দেবতার মধ্যে শ্মশানকালী
আর মানুষের মধ্যে আবদুলালী।"[৬]

অনুরূপ আরেকটি ছড়া ঢাকায় সেকালে প্রচলিত ছিল ঃ

"আলি মিয়ার ঘড়ি
নিলাম্বর সেনের বড়ি
গোকুল মুনসীর গোঁফে তাও
গল্প যদি শুনতে চাও
তবে মৃত্যুঞ্জয় মুন্‌সীর কাছে যাও।"[৭]

ঢাকার নবাবদের আদিপুরুষ আলি মিঞা বা খাজা আলী মুল্যাহ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বুড়িগঙ্গার তীরে কয়েকটি কুঠিবাড়ি ফরাসী কুঠিয়ালদের কাছ থেকে কিনে নেন। একটি কুঠি বাড়ির নাম ছিল 'রঙমহল' এবং তাতে একটি ঘড়ি বসানো হয়। এই ছড়া প্রসঙ্গে মুনতাসীর মামুন কিছু তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'আলি মিঞার এই ঘড়িতে কখনো ঠিক সময় দিত না। নীলাম্বর সেন ছিলেন কবিরাজ যাঁর ওষুধে কোনো কাজ হতো না। সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেনের নানা গোকুল মুন্সীর গোঁফ ছিল দর্শনীয় বস্তু। আর মৃত্যুঞ্জয় মুন্সী ছিলেন আজগুবি গল্প বলিয়ে।'[৮]

দীনেশচন্দ্র সেনের জীবনকথায় গোকুল মুন্সীর গোঁফ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানা যায় ঃ

'গোকুল মুন্সীর সুকৃষ্ণ লীলায়িত গোঁফ দুটির তোয়াজের জন্য দুইটি ভৃত্য নিযুক্ত

৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- ভূমিকা ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ। বঙ্কিম রচনাবলী, বিবিধ খণ্ড, পৃঃ ১০৫।
৬. মুনতাসীর মামুন, 'ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী' ঢাকা ১৯৯৩, পৃঃ ৫।
৭. মুনতাসীর মামুন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।
৮. মুনতাসীর মামুন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।

ছিল, তাহারা মোমজমা প্রভৃতি উপাচারে সেই গোঁফ জোড়ার সকালে বিকালে সেবা ও সৌষ্ঠব-সাধন করিত। ৪০ বৎসর বয়সেও তিনি যে জড়োয়া সাঁচ্চা পাথর সংযুক্ত চটীজুতা ব্যবহার করিতেন, তাহার দাম ছিল ৪০/ ৪২ টাকা।'[৯]

ঢাকার দোলাই খালের উপর ১৮২৮ সালে যে লোহার পুল নির্মিত হয়, তা ছিল ঢাকার একটি দর্শনীয় বস্তু। তদানীন্তন ঢাকার কালেক্টর ছিলেন ওয়ালটার্স সাহেব। তাঁরই উদ্যোগে এই বিখ্যাত লোহার পুল নির্মিত হয়। এটি নির্মাণ করতে দু'বছর সময় লেগেছিল। পরবর্তীকালে এই পুলের সংস্কার হলেও সেকালে পুলের নিচে বাজার বসত। ঢাকাবাসীরা ওয়াল্টার সাহেবের নামে যে ছড়া বেঁধেছিল, তাতে সে বাজার বা গঞ্জের কথা পাওয়া যায়।

"ওয়ালটার সাহেবনে পুল বানায়া
উনকা নীচে গঞ্জ বসায়া
আওর চাওয়কাধারি কামান
গুড় গুড় চাল"............ ।[১০]

এই ছড়ায় চকবাজারের যে কামানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা 'বিবি মরিয়মের কামান' নামে খ্যাত। মুঘল আমলে নির্মিত এই কামানটি সুবাদার মীর জুমলা আসাম অভিযানের সময় ব্যবহার করেছিলেন এবং পরে তা ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। কামানটি দীর্ঘকাল ধরে সদরঘাটে বসানো ছিল। পরে এটি গুলিস্তানের সামনে নিয়ে আসা হয় এবং বর্তমানে ওসমানি উদ্যানে এটি স্থান পেয়েছে। সদরঘাটে অধিষ্ঠিত থাকা-কালে সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে বহু পল্লীবাসী এই দর্শনীয় কামানটি দেখতে আসত। এই কামান নিয়ে বিভিন্ন ধরণের জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। তাই লক্ষ করা গেছে, সদ্য গ্রাম থেকে আগত গ্রামবাসীরা হাত দিয়ে কামানটি মেপে এর সঠিক মাপ খুঁজে পেত না। এমনকি অনেকে তেল সিদুঁর দিয়েও এই কামানকে পূজা করত।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ ময়মনসিংহের গ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত একটি মেয়েলি ছড়া সংগ্রহ করেন। এই ছড়ায় ঢাকার স্বর্ণকারের তৈরী বিভিন্ন অলংকারের প্রসঙ্গ এসেছে ঃ

"রান্ধন ঘরে বইসা বিবি মানজা (কোমর) দেখাইছে,
ঢাকা থাইকা নওশা মিয়া শিকল পাঠাইছে।
ও শিকল ভাল না, পিতল মিশাইছে।
রান্ধন ঘরে বইসা বিবি পাও দেখাইছে,
ঢাকা থাইকা নওশা মিয়া খাড়ু (নূপুর) পাঠাইছে,
ও খাড় ভাল না, তামা মিশাইছে।[১১]

৯. দীনেশচন্দ্র সেন- বাংলার পুরনারী (ভূমিকাংশের জীবন কথা) ১৯৩৯, পৃ. চার আনা।
১০. নাজির হোসেন- 'কিংবদন্তির ঢাকা', ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৬।
১১. ইবরাহিম খাঁ- বাতায়ন, ঢাকা ১৯৬৭, পৃ: ১০৯।

ঢাকার নবাব আবদুল গনি (১৮৩০-১৮৯৬) ১৮৭২ সালে অলি মিঞার রঙমহলকে সংস্কার করে পুনর্নির্মাণ করেন, যা বর্তমানে 'আহসান মঞ্জিল নামে খ্যাত। আবদুল গনি তাঁর পুত্র খাজা আহসানউল্লাহর (১৮৪৬-১৯০১) নামানুসারে এই বাড়ির নামকরণ করেন। শতাব্দীকাল ধরে বুড়িগঙ্গার তীরের এই প্রাসাদটি ঢাকার শোভাবর্ধন করে আসছে। বুড়িগঙ্গা নদী এবং তার পার্শ্ববর্তী সুদৃশ্য 'আহসান মঞ্জিলে'র একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায় কবি আবদুর রহিমের কাব্যে।

'ঢাকার নবাব সাহেবের পুঁথি' (১৩১৩) নামে একটি গ্রন্থে তিনি লিখেছেন–

নবাব আহছান উল্লাহ্ সাহেব পশ্চাতে।
আপন রাজ্যের কাজ লাগিল করিতে।।
সুবিচার সৎকার্য্য করে সর্ব্বক্ষণ।
বাড়াইল অর্থ ভূমি পূর্ব্বের দ্বিগুণ।।
কত আর অট্টালিকা করিয়া নির্ম্মাণ।
ইন্দ্রালয় জিনি যেই করে বাড়িখান।।
বুড়ীগঙ্গা নামে নদী দক্ষিণ দিগেতে।
সুনির্ম্মল জল তার সুন্দর দেখিতে।।
সুবাতাস অহর্নিশি লাগি সে নদীর।
গ্রীষ্মকালে হৈয়া যায় শীতল শরীর।।
বঙ্গেতে এমন বাড়ি নাহি আছে আর।
এরেমের বাগ জিনি দেখিতে বাহার।।

কবি আবদুল রহিম 'ঢাকার নবাব সাহেবের পুঁথি' কাব্যে প্রসঙ্গত নবাব সলিমুল্লার (১৮৭১-১৯১৫) দান- দাক্ষিণ্যের কথাও লিখেছেন–

"নবাব ছলিমউল্লা সাহেব ঢাকার।
যাঁর মত বঙ্গদেশে না হইবে আর।।
বৎসরে বৎসরে লোক পাঠান মক্কায়।
নির্ণয় না জানি হজ্জ কত বা করায়।
মসজিদ দিতেছেন কত ঠাঁই ঠাঁই।
পুষ্করিণী কত আর সংখ্যা তার নাই।।
দিতেছেন দেশে দেশে রাহেতে খোদার।
কতকেরে জমী বাড়ি দিতেছেন আর।।
ছওয়াল করিলে কেহ ফিরিয়া না যায়।
তৎক্ষণাৎ পায় যেই যেই যায়।।
ফকির কাঙাল আর আলেম লোকেরে।
দিতেছেন টাকা কত হাজারে হাজারে।।"

সেকালে নবাবদের দান ও সাহায্যের কথা কিংবদন্তিতুল্য ছিল। নবাব সলিমুল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করে নদীয়া-শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) তাঁর 'জাতীয় ফোয়ারা' কাব্যে (১৩১৯) একাধিক কবিতা রচনা করেন। ১৩১৩ সালে ২ বৈশাখ ঢাকার শাহ্‌বাগে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র অধিবেশন বসে। মোজাম্মেল হক প্রথম অধিবেশনে "চাঁদের হাট" শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করেন। তাতে বিভিন্ন স্তবকে তিনি ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। উক্ত কবিতার ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ স্তবকে কবি লিখেছেন ঃ [১২]

-১৩-

পূর্ণপ্রতিভা বিজলী গঞ্জন,
বদনমন্ডলে ঝলে,
দীনদুঃখহারী লেখা গো তাহাতে
বিধাতার সুকৌশলে।
উৎসাহী উদ্যোগী সর্ব্ব গুণাধার,
স্বজাতির হিতে সদা আগুসার,
খুঁজিয়া না মেলে উপমা তাঁহার
বঙ্গবসুমতী-তলে,
প্লাবিয়া ভারত গায় যার যশঃ
স্বজাতি বিজাতিদলে।

-১৪-

বিনয় বিজ্ঞতা মহত্ত ধীরতা
একাকারে শোভে যার
দানব্রত যাঁর বর্ণে সাধ্য কার?
অতুলন বসুধায়।
রাজদ্বারে যাঁর বিপুল সম্মান,
এই হাটে সেই চাঁদের প্রধান,
খাজা সলিমুল্লা শোভে শীর্ষস্থান
আহা যেন অলকায়,
দেবগণ মাঝে দেবরাজ রাজে,
মাধুরী উথলি ধায়!!!

এ কবিতার একটি স্তবকে পরলোকগত নবাব খাজা আবদুল গণি সম্পর্কে বলা হয়- 'সুকৃতির গুণে তিনি তো অমর'।[১৩]

১২. মোজাম্মেল হক- জাতীয় ফোয়াবা, ১৩১৯, পৃঃ ৯৪-৯৫।

১৩. মোজাম্মেল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৫।

নবাব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে খাজা সলিমুল্লাহই প্রথম সক্রিয়ভাবে রাজনীতি অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমর্থনের মধ্যে দিয়ে এর সূত্রপাত। মুনতাসীর মামুন মনে করেন, "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমর্থন করে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে (বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে) তিনি নিজের কর্তৃত্ব সংহত করেন।"[১৪] এ-কারণে অনেকে তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করেন। মোজাম্মেল হক তাঁর 'জাতীয় ফোয়ারা' কাব্যের 'সাম্যগীতি' কবিতায় ২২-২৩ সংখ্যক স্তবকে, ঢাকার নবাবের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়, সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য তুলে ধরেন। উক্ত কবিতার পাদটীকায় কবি মোজাম্মেল হক লিখেছেন :

"ঢাকার নবাব বাহাদুর তাদৃশ অবোধ নহেন নীচাশয় নহেন- কলহপ্রিয় নহেন। তবে তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধী নহেন; বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষ নহেন; কিন্তু তিনি দেশ হিতৈষী, স্বজাতি হিতৈষী, শিল্প-বাণিজ্য বিদ্যার উৎসাহদাতা, নেতা ও দাতা, ইহাতেই হিন্দু ভ্রাতৃগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা তাঁহাকে বলিতে ইচ্ছা হয় বলুন, কিন্তু রসনা সংযত রাখা উচিত"।[১৫]

কবি মোজাম্মেল হক ১৩১৩ সালের পৌষ মাসে সমগ্র ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির অধিবেশনে 'অপূর্ব দৃশ্য' নামে একটি কবিতা পাঠ করেন। উক্ত কবিতায় তিনি ঢাকাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

"ধন্য ঢাকা ভূমি! পূণ্যবতী তুমি,
বিশাল বাঙলা দেশে।
বরষের পরে হরষের ভরে
আবার তোমার শাহবাগ পরে
আজি গো যে সভা মনোজ্ঞ মধুর
হেরিনু নয়নে এসে–
অনুপম তাহা, স্বপ্ন হেরি যেন
নিশীথে নিদ্রাবেশে।"[১৬]

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সাময়িক-পত্র 'কবিতা কুসুমাবলী' (১৮৬০) ছিল একটি 'পদ্যময়ী কবিতা মাসিক'। এ পত্রিকার কবিতা লেখকদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশচন্দ্র মিত্র, জগদ্বন্ধু ভদ্র, ভারতচন্দ্র সরকার, রাধারমণ শীল, মথুরামনাথ মজুমদার, কবি আহমদ প্রমুখ। 'কবিতা কুসুমাবলী' পত্রিকাটি বিভিন্ন কবির বিভিন্ন বিষয়ক কবিতায় সমৃদ্ধ ছিল।

'কবিতা কুসুমাবলী' পত্রিকার এক সংখ্যায় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার রচিত 'বুড়িগঙ্গা দর্শন' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। বুড়িগঙ্গা নদী সেকালে খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল।

---

১৪. মুনতাসীর মামুন, ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃঃ ২৯৪।

১৫. মোজাম্মেল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪-২৫।

১৬. মোজাম্মেল হক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪-২৫।

দীনবন্ধু মিত্র বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, যে, 'গামলা করেই বুড়িগঙ্গা নদী পার হওয়া যায়।'[১৭] ১৮৫৭ সালের দিকে কবি নবীন সেন যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তিনি দীনবন্ধু মিত্রের উক্তি স্মরণ করে মন্তব্য করেন বুড়িগঙ্গার কলেবর এত সঙ্কীর্ণ যে– তা পার হওয়ার জন্য গামলাও প্রয়োজন হয় না।[১৮] এটি অবশ্যই অতিশয়োক্তি। কিন্তু বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী আবাসগৃহ থেকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বুড়িগঙ্গা নদীকে দেখেছিলেন আর এক দৃষ্টিতে। বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী প্রাকৃতিক দৃশ্য কবিকে মুগ্ধ করেছে এবং তার হৃদয় জুড়িয়েছে। কবিতাটির প্রথম কয়েকটি চরণ হচ্ছে :

"মমালয় সন্নিহিত
বুড়ীগঙ্গা প্রবাহিত
বান্ধাঘাট শোভিত যথাতে।
সেখানে বসিলে গিয়া
জুড়ায় সন্তপ্ত হিয়া
সলিল শিকরসিক্ত রাতে।
তার ধারে উচচতর
বকুল পাদপবর
কুসুমিত বসন্তাগমনে
নিকটে কামিনী তার
ভিতরে সুরভি তার
সমীরের সুখদ মিলনে।"[১৯]

'কবিতা কুসুমাবলী' পত্রিকায় রাধারমণ শীল রচিত কয়েকটি কবিতায় সেকালে ঢাকার কিছু চিত্র পাওয়া যায়।

ঢাকায় দীর্ঘকাল ধরে মুসলমান-প্রধান এলাকায় জারী গান, শাহ্ মাদারের গান, নীলের গান, ভাটের গান ইত্যাদি ঢাকা শহরের সঙ্গীত রস-পিপাসুদের তৃপ্তি সাধন করে এসেছিল। এর পাশাপাশি যাত্রাগানেরও প্রসার ছিল। পূজার আগে, বিভিন্ন এলাকায় দল বেঁধে, গান গেয়ে, গানের বায়না পাবার জন্য যাত্রা গানের দল ঘুরে বেড়াতো। রাধারমণ শীলের একটি কবিতায় এর বর্ণনা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-[২০]

'কবিকর দল যত সাজাইয়া দল।
বায়না পাবার তরে হতেছে চঞ্চল।
তারা এইবার আরো উচ্চ সুরে গায়
ঢোলের চাটির চোটে মাটি ফেটে যায়।

১৭. উদ্ধৃত, নবীনচন্দ্র সেন- আমার জীবন, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ২৭০।
১৮. নবীন চন্দ্র সেন-প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭০।
১৯. গিরিজাকান্ত ঘোষ- 'কবিতা কুসুমাবলী', ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, চৈত্র ১৩২৫।
২০. গিরিজাকান্ত ঘোষ- 'কবিতা-কুসুমাবলী' ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৫।

চিতান নোহরা বাঁধাগীত বাজিতেছে।
মহল্লায় মহল্লায় গলা ভাঙ্গিতেছে।'

উনিশ শতকের শেষ দিকে বিশেষ করে সপ্তম ও অষ্টম দশকে, ঢাকায় মদ্যপানের বিশেষ বিস্তার ঘটে। ১৮৭৮ সালে ঢাকা শহরে ১৬১টি মদের দোকান ছিল বলে প্রকাশ। ঢাকার নাট্যকার হরিশচন্দ্র মিত্র ও হরিহর নন্দী তাঁদের রচিত প্রহসনে মদ্যপানাসক্তির বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন। শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এই আসক্তির হাত থেকে মুক্তি পাননি। এ সম্পর্কে রাধারমণ শীল লিখেছেন -

'হায় হায় বিখ্যাত বিদ্বান লোক যারা,
সুরার প্রধান ভক্ত হয়েছেন তারা।
কেহ সুরাপানে মত্ত হয় বলে।
রিফরম বিরাজিত সদালাল জলে।
এমন সুরার শক্তি সতত প্রবল।
তবে আর কিসে হবে দেশের মঙ্গল।'

রাধারমণ শীলের আর একটি কবিতায় সেকালের ঢাকায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি চিত্র পাওয়া যায়–

'আগে তেল আট সের টাকায় পেয়েছি
সে তেল এখন হায় সে তেল এখন,
তিন সের টাকাতেও না হয় ঘটন।
পূর্ব্বাপর এক বেটে অল্পমূল্যে লুন।
এখন লুণের দরে লেগেছে আগুন।
ভেতো বাঙালীর সার ভরসা তন্ডুল।
বিদেশ চালানে তাহা হয়েছে ভন্ডুল।
আগেতে টাকায় ছিলো দুধ কুড়ি সের।
আটসের পাইনাকো অদৃষ্টের ফের।
ঘৃত ছানা মাখন কি করিব আহার।
শাক-ভাত খেয়ে কাল কাটা হল ভার।
এদিকে ওদিকে দুদিকে মারা যাই।
বাঙালীর ভাগ্যে সুখ বুঝি আর নাই।'

লক্ষ করা যায়, ১৮৬০ সালের দিকে ঢাকায় এক টাকায় তিন সের তেল পাওয়া যেতো। দুধের দাম ছিল প্রায় দু'আনা সের। 'বাঙালীর ভাগ্যে সুখ বুঝি আর নাই'-দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে বিপর্যস্ত কবির এই খেদোক্তি এ যুগের বাঙালির জন্যও কম সত্য নয়।

উনিশ শতকে ঢাকায় চকবাজারের কেতাবপট্টিকে কেন্দ্র করে পুঁথি সাহিত্যের বিশেষ

প্রসার ঘটে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পুঁথি সাধারণত প্রণয়-কাহিনী-ভিত্তিক অথবা উপদেশমূলক। এসব পুঁথিতে পুঁথিকারগণ সমাজ-সচেতনতারও বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের কাব্যে সমকালীন সমাজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই পুঁথিকারদের অনেকেই ছিলেন ঢাকা নগরবাসী। যার ফলে তাদের বর্ণিত সমাজ-চিত্র, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঢাকারই সমাজ-চিত্র।

রাধারমণ শীলের কবিতায় আমরা সেকালের ঢাকার মদ্যাসক্তির চিত্র পেয়েছি। এই আসক্তির কারণেই ঢাকার পুঁথিকাররা 'শরাবীর বয়ান' নামে কবিতা তাঁদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কবি মোহাম্মদ ফয়জুদ্দিন তাঁর 'নাজাতুল মোছলেমীন' কাব্যে পরকালে মাতালদের যে আজাব হবে তা তাঁর 'শরাবীর বয়ানে' বিবৃত করেছেন-

'সারাবিকে খিচ্যা লিবে হাসর ময়দান।।
উলঙ্গ পিয়াসা ভুকা চক্ষু আন্ধা আর।
কলেজা ফাটিয়া যাবে মুক্ষের মাঝার।।
আগুনের বেড়ি কড়ি হাতে গলে পাএ।
কবরে আগুন তার জ্বলিবে সদায়।।[২১]

ঢাকার দোভাষী পুঁথিকারগণ সমাজের দুর্নীতি বা বিশৃংখলার কথা বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন বয়ানে। আহমদ আলী তাঁর 'ফেরকায়ে আরবাইন' (১৮৭১) কাব্যে মাল বিক্রেতাগণ ওজনের হেরফের করলে পরকালে কিরূপ শাস্তি ভোগ করবে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীদের শাস্তির কথাও তিনি এক বয়ানে তুলে ধরেছেন। সেকালে বিভিন্ন মহল্লায় সরদাররা স্থানীয় অপরাধের বিচার করতেন, কিন্তু সর্বদা সে বিচারে ইনসাফ থাকতো না। তাই মোহাম্মদ ফয়জুদ্দিন তাঁর 'তেরছদ্দির পুঁথি'তে 'মহল্লার ছরদারের এনছাপের বয়ান' বিবৃত করেছেন। ভূত-চালান বা জ্বিন-চালানের ব্যবসা করে যারা সাধারণ লোককে প্রতারণা করতো, তাদের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন কবি আব্বাস আলী 'মেছবাহুল মোছলেমীন' কাব্যে 'ভূত-চালানিয়া ও জ্বিন-চালানিয়া লোকের দাগাবাজি'র বয়ানে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকার মুসলমান মেয়েরা অবগুণ্ঠন ত্যাগ করে যে অন্দর মহলের বাইরে এসে বিচরণ করতো, তা ঢাকার পুঁথিকারগণ ভালো নজরে দেখেননি। বিভিন্ন কবির কাব্যে এ বিষয়ে প্রচুর বয়ান লিখিত হয়েছে। যেমন আজিমুদ্দিনের 'আশকনামা' গ্রন্থে (১৮৯৭) 'বেপর্দা আওরতের বয়ান', মহাম্মদ ইছমাইলের 'আদাবাতুন নেছা' গ্রন্থে (১৮৭৯), 'যে সকল মরদেরা আপনা নারীকে পর্দায় রাখে না তাহাদের নছীহত', আজিমুদ্দিনের 'খোলাছাতোল মাবেয়াত' গ্রন্থে (১৮৬১), 'কলির আওরতের বয়ান' ইত্যাদি।

আহমদ হেছাবউদ্দিন তাঁর 'খোলাছাতোন্নাছিহত' গ্রন্থে (১৮৭৬) 'আওরতের বেপর্দার বয়ানে, লিখেছেন–

২১. মোহাম্মদ ফয়জুদ্দিন- নাজাতুল মোছলেমীন, ঢাকা ১৯৭০, পৃঃ ৯০।

শোনহে আল্লার বান্দা করিয়া গউর।
আওরত রাখহ ঘরে পরদার ভিতর।।
এইদেশে আওরত দেখি বড় বদচাল।
বালেগ বেদাওনি কত নারী এছা বদরত।।
যেখানে সেখানে ফিরে নাহি করে ডর।
বাড়ি বাড়ি যায় তারা হাঁটিয়া হাঁটিয়া।।
রঙ্গরসে ঘরে যায় বেগানার বাড়ি।
এ ধার ও ধারে ফিরি হাতে হাত ধরি।।[২২]

সেকালে ঢাকার বস্তি এলাকায় অথবা নিম্নবিত্তদের বাড়িতে যে পর্দার বিশেষ বালাই ছিল না, সে কথাও কবি উল্লেখ করেছেন-

'টাট্রি পরদা নাহি রাখে খোলা বাড়ি ঘর।
আন্দর বাহির সব এক বরাবর।।
বড় মানষি করে তারা বড় বাড়িঘর।
বাড়ির উপর নাহি পরদার আছর।।
ফকির যায় অন্দরের বিচে।
ভিখ খোঁজে গিয়া আওরতের কাছে।
সে সব বাড়িতে যদি পরদা থাকিত।
তবে কেন পর লোক অন্দরে যাইত।।

অধিকাংশ বা নিম্নবিত্তদের বাড়ি ছিল কাঁচা ঘর। বাড়ির সামনের সদর দরজার ব্যবস্থা প্রায়ই ছিল না। পর্দা-রক্ষার খাতিরে কোনো কোনো বাড়ির সামনে চট ঝুলত। সেকারণে কবির উক্তি 'আন্দর বাহির সব এক বরাবর' নিরর্থক নয়।

ঢাকার কবি গরীবুল্লার 'রৌসনল মোমেনিন' গ্রন্থে সেকালের বিত্তবানদের পুত্র বিদ্যা-শিক্ষার্থে ঢাকা শহরে এসে বিভিন্ন ব্যক্তির গৃহে কিভাবে জায়গীর থেকে গড়াশুনা করতো তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন–

'ভাল লোকের বেটা হৈলে তালেবেলেম হয়।
এলেমের কারণে তারা দিন করে খায়।।
বিদেশে আসিয়া কত উঠাইল দুখ।---------
কোথা মজা কোথা খেজা খালি ডাইলের পানি।
এলেমের খাতিরে এত উঠায় পেরেশানি।।'

গরীবুল্লাহর 'রৌসনল মোমেনিন' গ্রন্থের প্রকাশ কাল ১৮৬৭ সাল। এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা অন্তত একটি তথ্য পাই যে, ভালো লোকের ছেলেরাই বিদ্যা-শিক্ষার্থে ঢাকায় এসে

২২. আহম্মদ হেছাবদ্দীন- খোলাছাতল নছিহত, 'আওরতের পর্দার বয়ান', ১৯৭৬।

জায়গীর থাকত এবং ঊনিশ শতকের ষাটের দশকেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকায় স্কুল কলেজ-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকায় জায়গীর থাকা ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যাঁরা জায়গীর থাকতেন, তাঁরা আহার ও বাসস্থানের বিনিময়ে গৃহকর্তার ছেলেমেয়েদের পড়াতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মাষ্টার সাহেবরা বিশেষ সম্মান লাভ করলেও সর্বক্ষেত্রে তা তাদের ভাগ্যে জুটতো না। কথা-সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ ১৯১৪ সালে যখন জগন্নাথ কলেজে পড়ার জন্য ঢাকায় আসেন, তখন তিনি এক বাড়িতে জায়গীর থাকেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে সে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে জায়গীর জীবনের একাধিক উপকারিতার কথা উল্লেখ করেন[২৩]ঃ

"প্রথমত জায়গীর জীবনে ছাত্ররা জনগণের মধ্যে বাস করিয়াই শিক্ষা লাভ করে।

দ্বিতীয়ত ঃ জায়গীরবাসী ছাত্র পরের ভাত খায় এটাও ঠিক না। জায়গীর বাড়ির দু'চার জন ছেলে-মেয়ে তাদের পড়াইতে হয় বলিয়া তারা নিজেদের রোজগারী খানাই খায়।

তৃতীয়ত ঃ গণ-সমাজ-জীবনে বাস করিয়া শিক্ষা লাভ করে বলিয়া এরা সমাজের আচার-আচরণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং মানব-জীবনের সহিত ব্যাপকতর ক্ষেত্রে পরিচিত হয়।

চতুর্থত ঃ জায়গীরবাসী ছাত্র হোষ্টেলবাসীর চেয়ে আত্ম-বিশ্বাসী, স্বনির্ভর, মিতব্যয়ী ও বিষয়জ্ঞানী হইতে শিখে।"

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশে' সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংবাদ প্রধানত স্থান পেত। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র কবিতা, এমনকি ব্যঙ্গ-কবিতাও মুদ্রিত হতো।

১৮৮৮ সালের নভেম্বর মাসে বড় লাট লর্ড ডাফরিন ঢাকায় আসেন। ঢাকায় বড় লাটের আগমন উপলক্ষে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় একটি ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

"আসিলেন বড় লাট, ঢাকায় বাড়িল ঠাঁট।
সেজেছে সদর ঘাট, রমনা যাবার বাঁট,
বাটে বাটে পথে ঝাট গুলজার লোকের হাট,
দেখিবারে সমরাট, বিলাসীরা ছাড়ছে খাট,
বিলাসিনী ছাড়ছে নাট মাতালেরা ছাড়ছে চাট,
কেউ বা করি চুলে পাট, কেউ বা গায়ে দিয়ে শাট,
কেউ বা পরি মাজায় গোট কেউ বা পানে রাঙায়ে ঠোঁট,
কেউ বা হ্যাট কোট, কেউ বা করি মাথায় মোট,
কেউ বা ভাঙ্গায়ে টাকার নোট কিনে এনেছে সেরি পোর্ট,

২৩. আবুল মনসুর আহমদ- আত্মকথা, ঢাকা ১৯৭৮, পৃঃ ১৩৭-৩৮।

কেউ বা চড়ে পিনিস বোট, মাঝির উপর করছে চোট,
কেউ বা দলে করি জোট, করে নিচ্ছে বহ্বাস্ফোট,
কেউ খাচ্ছে আকরোট, কেউ খাচ্ছে কারি রোষ্ট,
টকারের দেখিয়া ঘটা কবি ধর্লেন কলম কাটা।[২৪]

বড়লাটের আগমন উপলক্ষে ঢাকায় যে সাজ সাজ রব উঠেছিল তার একটি সুন্দর চিত্র এখানে পাওয়া যায়। অন্যদিকে এ কবিতায় তৎকালীন বিলাস-বৈভবের চিত্রও ফুটে উঠেছে। বড় লাটের আগমন উপলক্ষে কেউ পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে গায়ে চড়িয়েছে সুন্দর শার্ট, কেউ বা 'হ্যাট কোর্ট' পরে 'সেরি পোর্ট' কিনছে অথবা 'পিনিস বোটে' করে বিহার করছে। এমন কি বিলাসিনীরা নাট-ছেড়ে কোমরে 'গোট' পরে পানে ঠোঁট রাঙ্গিয়ে পথে বেরিয়েছে।

১৮৯৪ সালে ঢাকায় ছোট লাট চার্লস ইলিয়েটের আগমন উপলক্ষে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার একটি সংখ্যায় অনুরূপ ব্যঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়।

"কোন বাবু সজ্জা করে গৃহে মারিয়া কপাট;
কেহ করে তেরা সিঁথি, কারো ফেসান আলবার্ট।
কেহ বা সুখেতে বসে গাইছে সিন্ধু সুরাট;
আনন্দে মাতিয়া কেহ দেখিছে খেমটা নাট।"

উদ্ধৃতি দুটিতে আমরা সেকালের বিলাসীদের বিদেশী পোশাক-জুতার প্রতি আসক্তির পরিচয় পাচ্ছি।

উনিশ শতকে মাইকেল মধূসূদন দত্তের আগমনও একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৮৭১ সালের সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এক মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় আসেন এবং প্রায় দশ দিন এখানে অবস্থান করেন। ঢাকার পোগোজ স্কুলে ঢাকাবাসীদের পক্ষ থেকে এক অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন করা হয়। অনেকে মনে করেন, সভায় প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রটি 'বান্ধব' সম্পাদক কালী প্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক রচিত। ঢাকাবাসীদের সম্বর্ধনার উত্তরে মধূসূদন দত্ত স্বরচিত কবিতায় বলেন,

"নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ অলঙ্কার তুমি যে তা জানি পূর্ববঙ্গে।।[২৫]

ঢাকার প্রশস্তি প্রসঙ্গে আর একটি কবিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। কবিতাটি উর্দু ভাষায় রচিত এবং এর রচয়িতা খালিদ বাঙালি। ১৯২৩ সালে খাজা মুহম্মদ আদিলের প্রচেষ্টায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 'জাদু'র ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ সংখ্যায় ঢাকার প্রশস্তিমূলক এই উর্দু কবিতাটি প্রকাশিত হয়। নিম্নে আমরা কবিতাটির অংশবিশেষের উদ্ধৃতি ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করছি-

---

২৪. 'ঢাকা প্রকাশ' ১৯ অগ্রহায়ণ, ১২৯৫: ২ ডিসেম্বর, ১৮৮৮।

২৫. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়- মধূসূদন, আষাঢ় ১৩৫২, পৃঃ ৯২।

মূল ঃ "হর শান্ দিল্ লর্শি হায়, হর আন দিলরুবা হায়
তু দৌরে মোগলিয়াকা এক নকশে জাঁ ফেজা হায়
যাহির ফবন ফবন সে আন্দাজ এক যুদা হায়
পিনহা আদা আদা মে তহজীবে এশিয়া হায়
পূরব কি জান হায় তু, এ্যায় গুল জমিনে ঢাকা"।[২৬]

অনুবাদ ঃ "(তোমার) সকল গৌরব সতত চিত্তহারিণী,
মোগল যুগের তুমি এক প্রাণবন্ত চিত্র।
তোমার রূপ ও অলঙ্কার অনন্য,
(এবং) এশিয়ার সংস্কৃতি ছড়িয়ে আছে তোমার অঙ্গে
হে পুষ্পনগরী ঢাকা, প্রাচ্যের তুমি যে হৃদয়।"[২৭]

বাংলা সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে 'শনিবারের চিঠি'র যখন প্রবল প্রতাপ, ঠিক তখনই ঢাকায় অজিত দত্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসু–এই তিনজনে মিলে 'শনিবারের চিঠি' কে ব্যঙ্গ করে একটি কবিতা মুখে মুখে রচনা করেন।

ঢাকার বিভিন্ন পাড়া বা মহল্লার নাম নিয়ে 'ঢাকা ঢিক্কি' নামে এই কবিতাটি রচিত হয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন- 'এটি কবিতার অনুপ্রাস নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র বিদ্রূপের প্রত্যুত্তর।"[২৮]

১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাসে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্যে এই কবিতাসহ একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে কবিতাটি সম্পর্কে বলা হয়েছিল-

"আমরা তিনজনে মিলিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছি। তাহা অতি আধুনিক কবিতার টাইপ রূপে গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতে অর্থহীন অনুপ্রাস, শব্দের ঢিটিক্কার, কুশ্রীতায় সৌন্দর্যান্বেষণ, বর্তমান বিজ্ঞানের উপাসনা– এই অতি আধুনিকদের যাহা কিছু বিশেষত্ব সবই আছে। প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্যে আধুনিকদের রুচি নাই, তাই আমরা ঢাকা শহর বর্ণনা করিয়াছি। নিম্নে উদ্ধৃতি চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত কথাগুলি ঢাকার এক একটি পাড়ার নাম।"[২৯]

সম্ভবত ১৯২৭ সালে 'ঢাকা ঢিক্কি' কবিতাটি রচিত হয়েছিল। অনুপ্রাস সৃষ্টি কবিতাটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এর কোনো কোনো চরণে ঢাকার পাড়া বিশেষের খ্যাতি বা কুখ্যাতির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

'ঢাকা ঢিক্কি'

ফাগুনের গুণে 'সেগুনবাগানে' আগুনে বেগুন পোড়ে,
ঠুনকো ঠাটের 'ঠাঠারি বাজারে' ঠাঠা ঠেকিয়াছে ঠিক;

২৬. আহমদ হাসান দানী রচিত DACCA (১৯৬২) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।
২৭. জনাব ইমতিয়াজ ফারুকী সাহেবের সৌজন্যে অনূদিত।
২৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-'কল্লোলযুগ', পৃঃ ১৩৪।
২৯. গৌতম ভট্টাচার্য-বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত ও প্রগতি-'দেশ সাহিত্য সংখ্যা', ১৩৯৭, পৃঃ ১৬৮।

ঢাকার ঢেঁকিতে ঢাকের ঢেঁকুর ঢিঢিক্কারেতে ঢোঁড়ে,
সং 'বংশালে' বংশের শালে বংশে সেঁধেছে শিক।
ভূয়া 'উয়ারির' কুয়ার ধূঁয়ায় চূঁয়ায় গুয়ায় শুঁয়া,
বাছা 'এছাকের' কাছার কাছেতে কাছিমের কাছি আছে।
'চকে'র চাক্কু- চাক্কার চিকা চকচকি চাগে চূয়া
'সাঁচি বন্দরে' মন্দোদরীরা বন্দী বান্ধিয়াছে।
পাষন্ড ঐ 'মৈসুন্ডির' মুন্ডে গন্ডগোল।
'সূত্রাপুরে'র সূত্রধরের পুত্রেরা কাৎরায়,
'লালবাগে' লাল ললনার লীলা ললিত-লতিকা-লোল
'জিন্দাবাহার' বৃন্দাবনেরে নিন্দিছে সন্ধ্যায়।
'বক্সী-বাজারে' বাক্সে নক্সা মকশো একশোবার,
রমা রমণীরা 'রমনায়' রমে রম্যা রম্ভাসম,
'একরামপুরে' বিক্রি মাকড়ি লাকড়ি শুক্রবার,
গন্ধে অন্ধ 'নারিন্দ্যা' যেন বিন্দু ইন্দুগম।
চর্মে ঘর্মে 'আর্মেনিটোলা' কর্মে বর্মাদেশ,
টাকে-টিকটিকি-টিকি 'টিকাটুলি' টিকিট কাটে
'তাঁতি বাজারের' তোৎলা তোতার তিতা-তরে পিত্যেশ
'গ্যান্ডারিয়া'র ভন্ড গুন্ডা চন্ড চন্ডু চাটে।

ঢাকা শহর নিয়ে লেখা একটি 'ভাবের গান' অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য সংগ্রহ করেছিলেন। ভাবের গান একজাতীয় লোক-সঙ্গীত। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের মতে, এই ভাবের গান মূলত দেহতত্ত্বের গান। তিনি এ গান সম্পর্কে লিখেছেন– "বাউল, বোষ্টম, ফকির অথবা সাধু ও সুগায়ক গৃহস্থও এই ভাবের গানের চর্চা করিয়া থাকেন। পায়ে নূপুর পরিয়া, হাতে একতারা ও খঞ্জনী লইয়া দেহের উন্নত ও অবনত নানাবিধ ভঙ্গীতে পাদচারণা-নৃত্যে যখন গায়ক গাহিয়া উঠেন– 'বানিয়েছে পাঁচ ভূতে এই বাঙ্গালা খান ঃ খাড়া রয় চৌপায়া পরিমাণ' তখন শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মত সৃষ্টিতত্ত্বের গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়।"[৩০]

বিষ্ণুপদ সংগৃহীত ঢাকা শহরকে অবলম্বন করে রচিত ভাবের গানটি নিম্নরূপ ঃ

ঢাকা শহর ঢাকা যতক্ষণ
সেই ঢাকা খুলে দেখতে গেলে
থাকেনা আর তেমনি মতন।
ঢাকার কথা শোন তবে বলি,
ঢাকার ভিতর আছে ঢাকা

৩০. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ঢাকা ও কলিকাতা ভাবের গান, 'মাসিক মোহাম্মদী', পৌষ ১৩৬২, পৃঃ ২৭৯।

তিপ্পান্ন গলি,
তথায় চৌখস্ মানুষ কেউ পড়ে না
পড়ে যত অন্ধজন।।
ঢাকার ভিতর কূপ রয়েছে
গোটা আষ্টেক নয়,
তার আটটীর কাছে যেমন তেমন
একটীর কাছে ভয়।
তথায় লোভী কামী পড়লে পরে
তখনি হারায় জীবন।।
ঢাকায় আছে বৃহৎ কারবার
মহাজন অনেক আছে
আছে কত চুটকী দোকানদার,
তারা কেউ লাভে মূলে সব খোয়ালে
কেউ পেয়েছে রত্ন ধন।।

কাজী নজরুল ইসলামও ঢাকা নিয়ে একটি গান রচনা করেন। কিন্তু এটি ঢাকা-প্রশস্তি নয়। ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নজরুলের কবিমন ব্যথিত হয়ে এই গান রচনা করেন, যার প্রথম চরণ- 'এল কুৎসিত ঢাকার দাঙ্গা, আবার নাঙ্গা হয়ে।' দাঙ্গাকে কবি সুন্দর একটি চিত্রকল্পের সাহায্যে বলেছেন– 'ডান হাত দিয়ে বাম হাত কাটে, ভাইকে মারিছে ভাই।' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জাতি বা দেশের কল্যাণ আনে না সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে এ গানের শেষে ঃ-

'জাতির দেশের অকল্যাণের,
ইহারাই আজ হেতু,
বাঁধিতে দেয় না ইহারাই
মহামিলনের প্রেম-সেতু।'[৩১]

ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বিশের দশকের শুরুতে ভালোই ছিল।[৩২] কিন্তু ১৯২৬-এ কলকাতা ও বরিশালে দাঙ্গার একটা সূত্র ধরে ঢাকায় দাঙ্গা বেঁধে উঠে। নজরুল ইসলামের কবিতাটি সম্ভবত এ সময়েই রচিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় ঢাকার কথা না থাকলেও তাঁর 'বাঁশী' কবিতায় ঢাকাই শাড়ি আশ্চর্য মহিমায় সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে 'আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানীর' কোন ভেদ নেই, কারণ সেই হরিপদ কেরানীর রয়েছে মানসপ্রিয়া, যে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে এবং "তার পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদূর।"

---

৩১. নজরুল রচনাবলী- বাংলা একাডেমী প্রকাশিত, ১৯৭৭, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৭।

৩২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম– 'চল্লিশের দশকের ঢাকা', ১৯৯৪, পৃঃ ১৯।

এই ঢাকাই শাড়ি যুগ যুগ ধরে মেয়েদের কাঙ্খিত অতি প্রিয় এক স্বপ্ন। তাই একটি লোকগীতিতে পাট বাছাইয়ের কাজে নিয়োজিত মেয়েদের কণ্ঠে শোনা যায় ঃ-

আয়, আয়, আয়–আয়রে সই,
পাট বাছিতে চল।
এই পাট বেচিয়া এবার কিনমু রূপার মল।
পাটে আমার ভাত কাপড়,
পাটে ঢাকাই শাড়ী
পাটের দৌলতে আমার শান বান্ধা বাড়ি।[৩৩]

লক্ষ করা যায়, যুগ যুগ ধরে শুধু ঢাকাই শাড়ি নয়, সামগ্রিকভাবে ঢাকা কবিদের কবিতা রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে এবং সৃজনশীল কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৩৩. সিরাজউদ্দিন কাসিমপুরী- বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি, ঢাকা ১৯৭৩, পৃঃ ১৮০

ঢাকার লুপ্ত জীবিকা

উনিশ শতকে ঢাকা ছিল একটি ক্ষুদ্র শহর, যার আয়তন ৮ বর্গমাইলের বেশি ছিল না। লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। জেম্‌স্ টেইলার তদানিন্তন ম্যাজিস্ট্রেট মি. গ্রান্টের সহায়তায় ১৮৩৮ সালে যে আদমশুমারি করেন, তাতে লক্ষ করা যায়, শহরতলী গ্রামগুলো বাদ দিয়ে একমাত্র ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৬০,৬১৭ জন।[১] মুঘল আমলের বৈভব তখন ছিল না, কিন্তু তবু ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঢাকা এ-সময়ে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সংযোগ ঘটে। ঢাকা হয়ে ওঠে 'বায়ান্ন গলি ও তেপান্ন বাজারের শহর'।

সেকালের ঢাকা ক্ষুদ্র শহর হলেও তা ছিল শ্রমজীবী মানুষের ভীড়ে কর্মচঞ্চল। বিভিন্ন পেশা বা জীবিকার লোক এসে জড়ো হয়েছিল এই ঢাকা শহরে। একালের ঢাকায় বিভিন্ন অঞ্চল বা পাড়ার নামের মধ্যেই সেসব শ্রমজীবী মানুষের স্মৃতি জড়িত রয়েছে। যেমন- মালিবাগ, মালাকর নগর, মাহুতটুলী, শাঁখারী বাজার, পটুয়াটুলী, তাঁতীবাজার, টিকাটুলি, কাগজীটোলা, গোয়ালনগর, চুড়িহাট্টা ইত্যাদি। জেম্‌স্ টেইলার তাঁর 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা' (১৮৪০) এবং জেমস ওয়াইজ তাঁর 'নোটস অন্য দ্যা রেসেস, কাস্টস এন্ড ট্রেডস অব ইস্টার্ণ বেঙ্গল' (১৮৮৩) গ্রন্থে বিভিন্ন পেশা ও জীবিকার সুদীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করেছেন।

জেমস টেইলার ১৮৩৮ সালে অনুষ্ঠিত লোক-গণনা অনুসরণে ঢাকা শহরের অধিবাসীদের পেশা, ব্যবসা এবং কাজের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তাতে ১৬২টি জীবিকার নাম রয়েছে।[২] জেমস ওয়াইজের গ্রন্থে এর প্রায় অর্ধেক জীবিকার কথা বলা হলেও তিনি প্রতিটি জীবিকার বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩] এই উভয় তালিকায়ই অধুনা প্রচলিত জীবিকার কথা ছাড়াও বেশ কিছু লুপ্তপ্রায় অথবা বিস্মৃত-প্রায় জীবিকার কথা বলা হয়েছে। ঢাকার মসলিন খ্যাতি সর্বজনবিদিত। কিন্তু মসলিন ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের বস্ত্রের জন্য ঢাকা বিখ্যাত ছিল। তাই লক্ষ করা যায়, টেইলার অথবা ওয়াইজের তালিকায় বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক পেশার কথা রয়েছে। যেমন ঃ

১. তাঁতী, ২. দর্জি, ৩. বাদলা ওয়ালা (রূপার জরি বা সূতা প্রস্তুতকারক), ৪. চিকান্দাজ (বুটি তোলা মসলিন বস্ত্রের সীবন শিল্প), ৫. চীপিগর (মসলিন বস্ত্রে, নকশা ছাপা মারার কাজে নিয়োজিত শিল্পী), ৬. সূতা পরিষ্কারক বা সূতা-ধোলাইকারক, ৭. রঙ্ রাজ (বস্ত্রে-রঞ্জনকারী), ৮. দস্তফরাস (পুরানো বস্ত্র-বিক্রেতা), ৯. কের্দানী (কোমরে বাঁধার মোটা বস্ত্রের প্রস্তুত-কারক), ১০. মুরাকষ (কাপড় রঙকারী), ১১. মুগজি (যারা কাপড়ের আঁচল বা পাড় সেলাই করে), ১২. নার্দিয়া (যারা মসলিনের এলোমেলো সূতো

১. জেমস টেলর-'কোম্পানি আমলে ঢাকা' (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত) ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ ঢাকা, পৃঃ ১৭১।

২. জেমস টেলর, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৩৪-১৩৭।

৩. James Wise-Notes on the Races, Castes, & Trades of Eastern Bengal, London, 1883, P. 38-116.

ঠিক করে দেয়) ১৩. জরদজী (রেশমী, সোনা ও রূপার সূতায় চিকন্ কাজে নিয়োজিত), ১৪. ইসতিরিওয়ালা, ১৫. শালগর (শাল ধোয়ার কাজে নিয়োজিত), ১৬. রাফুগর (রিপুকর) এবং ১৭. নীলগর (নীল কাপড়ের রঙকারক)।

এ তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সেকালের ঢাকার বস্ত্রশিল্প বা সূচীশিল্প শুধু যে বাণিজ্যিক গুরুত্ব লাভ করেছিল তা নয়, এই শিল্প চারুকর্মের জন্যও বিখ্যাত ছিল।

জেমস টেইলার বা জেমস ওয়াইজের তালিকায় আমরা আরো লক্ষ করি, বেশ কিছু বিচিত্র জীবিকার কথা অথবা পরিচিত কিছু জীবিকা বা পেশার বিশিষ্ট নাম। এমনি কিছু পেশা বা জীবিকার তালিকা আমরা নিম্নে তুলে ধরছি ঃ-

১. বাঁবরদার (বিয়ে-সাদিতে পতাকাবাহক)।
২. ইত্মামদার (খাজনা আদায়কারী)।
৩. গোরখন্দ (কবর খননকারী)।
৪. গরু দাগানিয়া (যে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে গবাদি পশুর চিকিৎসা করে)।
৫. দস্তরবন্দ্ (পাগড়ী নির্মাতা)।
৬. খরানী মোল্লা (যে সরকারি অফিস সমূহে শপথনামা পাঠ করায়)।
৭. খুন্দিগর (শিঙ্গা বা গজদন্তের কারুশিল্পী)।
৮. কুটিয়াল (ধান সিদ্ধ ও ধান কোটার কাজে নিয়োজিত)।
৯. হাত-কুট (যারা খোয়া ভাঙ্গে বা সুড়কি কোটে)।
১০. চিরা-কশ (তাম্র-নির্মিত বাসন-কোসন ইত্যাদির খোদাইকারী)।
১১. পরতাল্লা (চাপরাস অথবা তকমার জন্য পট্টি প্রস্তুতকারক)।
১২. নালবন্দ্ (যারা ঘোড়ার পায়ে নাল লাগায়)।
১৩. নৈচাবন্দ্ (হুঁকার পেঁচানো নল নির্মাতা)।
১৪. সাঁধুয়া (স্বর্ণকারের দোকানের ঝাঁট দেয়া গুঁড়ো কয়লা, জঞ্জাল ইত্যাদি থেকে স্বর্ণরেণু বা পূরক পদার্থ সংগ্রহকারী)।
১৫. সানতরাশ (পাথর কাটার লোক)।
১৬. সুবলওয়ালা (বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারী)[৪]
১৭. চুনুরী ওয়ালা (যারা চামর দোলায় অথবা চামর দিয়ে ধুলা ঝাড়ে)।
১৮. কাহ্হাল (চক্ষু চিকিৎসক অথবা চশমা প্রস্তুতকারক)।
১৯. কুঞ্জরা (ফল বিক্রেতা)।
২০. সঙ্গর (ছুরি ধারকারী)।
২১. সুজনগার (গিল্টিকারী)।
২২. জারকোফ্ত (সোনা-রূপার পাত নির্মাতা)

৪. ১ থেকে ১৬ সংখ্যক জীবিকার জন্য দ্রষ্টব্য জেমস টেলর।

২৩. সদাকর (রৌপ্যকার)।

২৪. রেজা (ছাদ-পিটানী বালকবৃন্দ)।[৫]

জেমস ওয়াইজ বিভিন্ন জীবিকার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন যে, অধিকাংশ কর্মজীবী বা শ্রমজীবী শিল্পী ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত।

আমরা অবশ্য জানি যে, বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন পেশা বা জীবিকার উদ্ভব হয়। অন্যদিকে কালের বিবর্তনে কিছু পেশা বা জীবিকা লোপ পায়। এমনি বিস্মৃত-প্রায় অথবা লুপ্তপ্রায় কয়েকটি জীবিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

ছাদপিটানী

সেকালে ঢাকা শহরে পাকা দালানের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ হতো চুন-সুরকির মিশ্রণে। ছাদকে পোক্ত করার জন্য এবং ঢালাই মজবুত করার জন্য ভালো করে ছাদ পেটানোর প্রয়োজন হতো। এ কাজের জন্য একশ্রেণীর শ্রমিক নিয়োজিত হতো, যারা 'ছাদপিটানী' নামে পরিচিত ছিল। জেম্‌স ওয়াইজ তাদের আরেকটি নাম দিয়েছেন 'রেজা'[৬]।

এই ছাদ-পিটানীরা ছাদ-পেটানোর জন্য কাঠের এক বিশেষ ধরনের মুগুর ব্যবহার করতো, যার বিভিন্ন নাম হচ্ছে 'পিটনা', 'রেজা' অথবা 'কোবা'। 'কোবা' শব্দটি আরবি ভাষায় মুগুর অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

ছাদ পেটানোর কাজে নিযুক্ত হতো একদল শিশু শ্রমিক, যাদের বয়স ছিল ১০ থেকে ১৭-র মধ্যে। ছাদ-পিটানীর দলে এই কিশোরদল নিযুক্ত হতো দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে। এদের নিয়োগকর্তা 'সর্দার' নামে পরিচিত। সর্দারের হাতে থাকতো একটা লম্বা বেত, কখনো কখনো অন্য হাতে একটি ছাতা। এই লম্বা বেত দিয়ে সর্দার ছাদ-পিটানী বালকদের নিয়ন্ত্রণ করতো। বেত্রাঘাতের প্রয়োজন হতো খুবই কম। বেতের উদ্যত শাসানী অথবা বাতাসে সপাং আওয়াজই শিশু-শ্রমিকদের জন্য ছিল যথেষ্ট। এই সর্দারের সঙ্গে থাকতো বেহালাওয়ালা গায়ক, যার কাজ ছিল সর্বক্ষণ বেহালা বাজিয়ে গান করা। এই গানই 'ছাদ-পিটানী গান' নামে পরিচিত। জেমস ওয়াইজ জানিয়েছেন যে, এই গান গাওয়ার কাজে মহিলারাও নিযুক্ত হতো।[৭] এরা প্রায়ই অশ্লীল গান গেয়ে ছাদপিটানী শ্রমিকদের কাজে উৎসাহ প্রদান করতো।

বঙ্গেশ্বর রায় এক প্রবন্ধে ছাদপেটানোর একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন–

"রমজান মিঞা (অর্থাৎ বেহালাওয়ালা গায়ক) একখানি অতি-জীর্ণ বেহালা বাম কাঁধে ঘাড় বাঁকাইয়া থুৎনির সাহায্যে চাপিয়া ধরিয়া ছড়িখানা রঞ্জক মাখাইবার পর দক্ষিণে দণ্ডায়মান বারেক মিঞাকে (অর্থাৎ বেত্রধারী সরদারকে) আওয়াজ দিলেন- 'রেডি'।

৫. ১৭ থেকে ২৪ সংখ্যক পেশার পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য ওয়াইজ।

৬. জেমস ওয়াইজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫।

৭. জেমস ওয়াইজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫।

হঠাৎ বারেক মিঞার কণ্ঠে আওয়াজ উঠিলো- 'দ-ই'। ছাদ-পিটানী কিশোরদল সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুলিলো- 'দ-ই'। অমনি রমজান মিঞা চীৎকারে ফাটিয়া পড়িলেন, 'আণ্ডা-বাচ্চা-সব-সই'। সঙ্গে সঙ্গে, বেহালার ছড়ির টান প্যাঁ প্যাঁ করিতেই প্রারম্ভিক সঙ্গীতের প্রথম স্তর তাহার গলার মধু মিশিয়া, চতুর্দিক আলোড়িত করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিলো।

গানের গলা রমজান মিঞার তেমন ফেলনা নয়। তদুপরি এহেন আঁস্তাকুড় হইতে কুড়াইয়া আনা বেহালাখানি হাতের যাদুতে এমন অবিশ্বাস্য ধ্বনি সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ও স্বকর্ণে না শুনিলে কে বিশ্বাস করিবে।"[৮]

ছাদ পেটানো গানের একটি বিশেষ রীতি ছিল। গায়ক প্রথমে গানের এক পংক্তি বা স্তবক একা গাইবে এবং তখন কিশোরদল হাতের কোবা দিয়ে ছাদ পেটাতে থাকবে। গায়কের কণ্ঠস্বর থেমে গেলে কিশোর শ্রমিকদল ছাদ পেটানো বন্ধ করে সমস্বরে গানের পংক্তি বা স্তবক একই সুরে গেয়ে উঠবে। এভাবেই পালাক্রমে চলতে থাকে ছাদ-কোবানো আর সমবেত সঙ্গীত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাদ পেটানো গানের বিষয় ছিল আদিরসাত্মক অথবা ইঙ্গিতপূর্ণ। আমরা বঙ্গেশ্বর রায়-উদ্ধৃত তিনটি ছাদ পিটানী গানের অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরছি।[৯]

ক) জজ সাহেবের টেরি মাইয়া
পেখম মেইলাছে,
মহব্বতের রশির টানে
উধাও অইয়াছে।
কেলাস নাইনে ছাত্রী আছিল,
গতর শোভা ভালই আছিল,
কেম্বে কমু হগল কথা,
সরম অইতাছে...... ইত্যাদি।

খ) যে জন আমায় ভালবাইসাছে
কলকাতায় নিয়া আমায় হাইকোর্ট দেখাইছে;
যে জন আমায় ভালবাইসাছে
গোয়ালন্দ নিয়া আমায় হিল্‌শা খাওয়াইছে;
যে জন আমায় ভালবাইসাছে
চাটগাঁয় নিয়া আমায় হুট্‌কি খাওয়াইছে;
যে জন আমায় ভালবাইসাছে
বামনবাইরা নিয়া আমায় মাঠা খাওয়াইছে;

৮. বঙ্গেশ্বর রায় ছাদ-পিটানী গান, 'ঢাকা আমার ঢাকা', কলকাতা ১৯৯০, পৃঃ ১৮-১৯।
৯. বঙ্গেশ্বর রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

যে জন আমায় ভালবাইসাছে

ময়মনসিংহ নিয়া আমায় বাইগন খাওয়াইছে;

যে জন আমায় ভালবাইসাছে

ড্যামরায় নিয়া আমায় শাড়ী পিন্দাইছে...... ইত্যাদি[১০] ।

গ) বিয়া না দিলে দাদা দেশে যামু না,

কসম খাই তর জরুরে নজর দিমু না..... ইত্যাদি[১১] ।

ছাদ-পিটানী কিশোরদের অধিকাংশই হয়তো ছাদ-পেটানো গানের অর্থ বুঝতো না, কিন্তু সে গানের সুরে তারা যে উল্লসিত হয়ে উঠ্তো, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, তাদের উল্লসিত হাতের ছাদ-পেটানো কর্মদক্ষতারই সহায়ক ছিল।

ছাদ-পেটানো গানের সুরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলে অনেক কবি ও সুরকার এ-সুরের অনুকরণে গান রচনা করেছেন। নজরুল ইসলাম লিখেছেন ঃ-

"সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদগো

পেট ভরে ভাত পাইনা ধরে আসে হাতগো।"[১২]

ছাদ পেটানো গানের সুরে রচিত একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক গান উদ্ধৃত করেছেন সোমেন চন্দ-

"দে দে স্ট্যালিন ভাই

পায়ে পড়ি ছাইড়া দে,

আর্য হিটলার মরে লাজেতে......... ।"[১৩]

এ গানগুলো অবশ্য কথার মাহাত্ম্যে নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জেমস ওয়াইজ তাঁর গ্রন্থে (১৮৮৩) গৃহ-নির্মাণের কাজে নিয়োজিত মিস্ত্রির নাম দিয়েছেন 'রাজ'। তারা সাধারণত কুম্ভি শ্রেণী থেকে আগত।[১৪] বর্তমানেও রাজ বা রাজমিস্ত্রি শব্দ-দুটি প্রচলিত আছে। ওয়াইজ আরো দুটি শ্রমজীবীর কথা বলেছেন, যাদের নাম 'যোগারিয়া' বা তাগারিয়া'। এই শব্দ দুটি এখনও প্রচলিত আছে।

বাতিওয়ালা

একালের আলোঝলমল ঢাকার তুলনায় সেকালের ঢাকা ছিল প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। বড় রাস্তার মোড়ে অথবা গলির মোড়ে টিম্‌টিম্ করে জ্বলতো কেরাসিনের বাতি। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় বাতিওয়ালা আসতো বাতি নেভাতে বা জ্বালাতে। তাদের কাঁধে থাকতো

১০. বঙ্গেশ্বর রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩-২৪।

১১. বঙ্গেশ্বর রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

১২. নজরুল-রচনাবলী, ৩য় খন্ড, বাংলা একাডেমী ১৯৯৩ পৃঃ ৮৪৬।

১৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম- 'চল্লিশের দশকের ঢাকা', ঢাকা-১৯৯৭, পৃঃ ৫৯।

১৪. জেমস ওয়াইজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪।

ছোট্ট একটি মই। কখনো বা হাতে থাকতো কেরোসিনের টিন। সন্ধ্যা হলেই এরা এসে মই বেয়ে ল্যাম্প-পোস্টে উঠে তেল ঢালতো অথবা বাতি জ্বালাতো। আবার সকাল হলেই এসে সেই বাতি নিভিয়ে দিয়ে যেতো। এই ছিল তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ।

কবি শামসুর রাহমান বাল্যস্মৃতিতে এই বাতিওয়ালা স্বপ্নরাজ্যের যাদুকরের ন্যায় অম্লান হয়ে আছে ঃ

"আমি রোজ অপেক্ষা করতাম, কখন সুর্যিমামা পশ্চিম আকাশ থেকে তাঁর রঙিন গালিচাটা গুটিয়ে নেবেন, কখন ছায়া নামবে গলিতে। কারণ সূর্যের আলো ফুরুলেই বাতিওয়ালা আসবে আলো জ্বালানোর খেলা খেলতে। গলির শেষ সীমার বাতিটায় আলোর ফুল ধরবে, নরম তুলতলে আলোর ফুল। বাতিঅলা মই বেয়ে উঠবে, ফতুয়ার পকেট থেকে কী একটা বের করবে, তারপর গলিতে আলোর কলি, যেন কোনো যাদুকর সন্ধ্যের বোঁটায় ঝুলিয়ে দিয়েছে আলোর ফুল, আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে।"[১৫]

ঢাকার রাস্তায় কেরোসিনের বাতির অবস্থা ১৮৭৭ সালে প্রবর্তিত হয়। রাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত সম্রাজ্ঞী ঘোষণার উপলক্ষে একটি বিশেষ ফান্ড গড়ে তোলা হয় এবং এ-ফান্ড থেকে প্রথমে রাস্তার বাতির ব্যবস্থার জন্য ৬,৫০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। বাতির সংখ্যা প্রথমে ছিল ১০০। পরে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৩ সালে এর সংখ্যা ছিল ৩০০ এবং ১৯০০ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০২।

'আলোর যাদুকর' বাতিওয়ালাদের মজুরিও ছিল খুবই কম। বাতিওয়ালাদের সঙ্গে মাসিক চুক্তিতে বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। '১৯০০ সালে পৌরসভার এক রিপোর্টে জানা যায় যে, পূর্বে প্রতি বাতি জ্বালানোর জন্য মাসিক হার ছিল ১ টাকা ৭ আনা। কিন্তু ১৮৯৯ সালের কেরোসিনের দাম কমায় সে হার নির্ধারিত হয় ১ টাকা ৩ আনা। শুধু তা-ই নয়, ১৮৯৯ সালের আগে বছরে মাত্র পাঁচ মাস বাতি জ্বালানো হতো। ১৮৯৯ সালে সে-ব্যবস্থা বদলে শুধু তিন মাস সারা রাত বাতি জ্বালানোর নিয়ম প্রবর্তিত হয়।'[১৬]

নবাব আহসানউল্লাহ্র উদ্যোগে ঢাকায় বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। তাঁর পিতা নবাব আবদুল গনিকে ১৮৮০ সালে সি-এস-আই উপাধি প্রদান করা হলে নবাব আহসানউল্লাহ আনন্দের সঙ্গে ঢাকা শহরে বৈদ্যুতিক বাতি প্রদানের আশ্বাস দেন। তাঁর প্রায় চার লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্যে ঢাকায় প্রথম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠে। ১৯০১ সালের ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আহসান মঞ্জিলে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত লেফটেনান্ট-গভর্ণর বোল্টন সাহেব এক সুইচ টিপে ঢাকায় বৈদ্যুতিক আলোর উদ্বোধন করেন। সমকালীন 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় এক কৌতুকময় সংবাদ পরিবেশন করা হয় ঃ

গতকল্য সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে, শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুরের অনুকম্পায় ঢাকা নগরীর

১৫. শামসুর রাহমান- 'স্মৃতির শহর', ঢাকা প্রথম ঢাকা নগর জাদুঘর সংস্করণ, পৃঃ ৮।

১৬. Azimusshan Haider- 'A city and its Civic body', Dhaka, 1966, p. 113.

প্রধান রাস্তাগুলি চপলা চমকে অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিয়াছে। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির দীনা, ক্ষীণা দীপকলিকা, কৌতূহলাক্রান্ত, অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূর ন্যায় এখানে ওখানে অলক্ষ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া পথিকের মনে ঘৃণার সঞ্চার করিয়া দিত, আজ সেখানে দামিনী প্রভা বিমল চন্দ্রিকাপাতে জনসাধারণের নয়নমন পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে।

নবাব বাহাদুরের অর্থসাহাযের প্রধান শর্ত ছিল রাস্তার বাতির জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে যেন কোনো ট্যাক্স আদায় করা না হয়। ঢাকা পৌরসভা ১৯৪৭ -এর দেশ বিভাগের পূর্বে এই দায়বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেনি।[১৭] ১৯৪৭-এর পরে জনসাধারণের কাছ থেকে রাস্তার বাতির জন্য ট্যাক্স আদায় শুরু হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা প্রবর্তন পূর্ববঙ্গে প্রথম এবং সমগ্র বঙ্গদেশে দ্বিতীয়। এর আগে দার্জিলিং শহরে বৈদ্যুতিক আলো প্রবর্তিত হয়।[১৮]

১৯০১ সালে ঢাকায় বৈদ্যুতিক আলো প্রবর্তিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে বিভিন্ন রাস্তায় তা সম্প্রসারিত হতে থাকে। পাশাপাশি কেরোসিনের বাতির ব্যবস্থাও দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বর্তমান শতকের চল্লিশের দশকেও ঢাকায় বাতিওয়ালার দেখা পাওয়া যেতো। কোনো কোনো গলিতে তখনো জ্বলে উঠতো কেরোসিনের বাতি, বাতিওয়ালার হাতের দীপশলাকায় ছোঁয়ায়। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ১৯৩৫ সালে রাস্তায় বৈদ্যুতিক বাতি ও কেরোসিনের বাতি ছিল যথাক্রমে ১,০৬৬ এবং ৮৬৯। দেশবিভাগের সময় এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৩৭০ এবং ১,০৭০।[১৯]

ভিস্তিওয়ালা

ঢাকায় পানি সরবরাহ-ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে খাবার পানি সংগ্রহ করা হতো বুড়িগঙ্গা নদী থেকে অথবা শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ইঁদারা থেকে। বিভিন্ন বাড়িতে স্থাপিত পাত-কুয়া থেকেও পানি সংগৃহীত হতো। চকবাজার মসজিদের সামনে এবং বেগম বাজার মসজিদের পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত দু'টি ইঁদারা বিশ শতকের প্রথমার্ধেও বিদ্যমান ছিল।

একালে ভিস্তিওয়ালা কদাচিৎ দেখা গেলেও সেকালে প্রতি মহল্লায় ভিস্তিওয়ালারা চামড়ার মশকে করে বাড়ি বাড়ি পানি সরবরাহ করত। পানি বহনের জন্য মশক বা থলির নাম ছিল 'ভিস্তি'। লক্ষণীয় বিষয়, এই 'ভিস্তি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হলো 'বিহিশ্‌তী' অর্থাৎ পানি হলো বেহেশ্‌তী বা স্বর্গীয় সুধা।

ঢাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রচলিত হয়। ঢাকার নবাব আবদুল গনি (১৮৩০-১৮৯৬) এই পানি-সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। নগরবাসীদের যাতে করভারে প্রপ্রীড়িত করা না হয়, এই শর্তেই নবাব

১৭. Sharif Uddin Ahmed (ed). 'Dhaka Past Present Future', Dhaka, 1991, p. 253.

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৩।

১৯. আজিমুশ্‌শান হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪।

বাহাদুর টাকা প্রদান করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের আগষ্ট মাসে বড় লাট নর্থ ব্রুক 'ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১৮৭৮ সালে ঢাকার চাঁদনী ঘাটে ঢাকা বিভাগের কমিশনার পিকক সাহেব তা উদ্বোধন করেন।

কেদারনাথ মজুমদার তাঁর 'ঢাকার বিবরণ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পরিবেশন করেন।[২০]

'১৮৭৮ খ্রিঃ অব্দে ফিল্টার না করিয়াই শহরবাসীদিগকে কলের জল প্রদান করা হয়। পরবর্তী বৎসরে শহরের কেবল মধ্যভাগে পরিষ্কার জল প্রদান করা হয় এবং তৎপরবর্তী বৎসর হইতে লোহারপুল পর্যন্ত বড় বড় রাস্তাগুলি পরিষ্কার জল প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন পর্যন্তও অনেক ক্ষুদ্র রাস্তায় জল প্রদানের বন্দোবস্ত ছিল না।

১৮৮৪ খ্রি. অব্দে ঢাকার মিউনিসিপ্যাল কমিটি ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া কলবৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। ডিউক অব কনটের কলিকাতায় আগমন চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ঢাকার স্বনামধন্য নবাব স্যার আহসানুল্লা বাহাদুর ১১,০০০ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ঐ অর্থে শহরের উত্তর অংশে নবাবপুর হইতে ঠাঁঠারীবাজার এবং দেলখোশবাগ পর্যন্ত জল প্রদানের বন্দোবস্ত হয়। ঐ লাইন 'Cannaught extension' নামে অভিহিত হইবে নির্ধারিত হয়।'

কেদারনাথ মজুমদার আরও জানান যে, ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার মিউনিসিপ্যালিটি শহরের সর্বত্র জলপ্রদানের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবিভাগের পর ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হলে পানিরকল সংযোগ প্রতি বাড়িতে সম্প্রসারিত হয়। অবশ্য এ ব্যবস্থা কার্যকর হতে অনেক সময় লেগেছিল। এ কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঢাকায় বিভিন্ন বাড়িতে পানি সরবরাহের প্রধান উৎস ছিল পাতকুয়া অথবা ভিস্তিওয়ালা।

ঢাকার ভিস্তিদের বলা হতো 'সুবকা'[২১], মতান্তরে 'সাক্কা'[২২]। এই সাক্কাদের বসবাস ছিল যে এলাকায়, সে এলাকাটি সাক্কাটুলি নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এলাকাটি সিক্কাটুলী নামে পরিচিত।

বাড়িতে বাড়িতে পানি সরবরাহের কাজ ছাড়াও মহররমের সময় ঢাকায় ভিস্তিওয়ালাদের আরেকটি দায়িত্ব পালন করতে দেখা যেত। দ্বিপ্রহরে মহররমের মিছিলে রাস্তার দু'পার্শ্বে প্রতীক্ষারত এবং রৌদ্রক্লান্ত দর্শকদের মাঝে ভিস্তিওয়ালারা পানি বিতরণ করত। এই পানি বিতরণের মধ্য দিয়ে ভিস্তিওয়ালা কারবালার মর্মান্তিক কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দিত এবং সবাইকে যেন আর একবার জানিয়ে দিত- 'পানির অপর নাম জীবন'।

২০. কেদারনাথ মজুমদার- ঢাকার বিবরণ।

২১. মুনতাসির মামুন- 'ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী', ঢাকা ১৯৯৩, পৃঃ ২৯৮।

২২. নাজির হোসেন- কিংবদন্তির ঢাকা, ৩য় সংস্করণ ঃ ১৯৯৫, পৃঃ ১৮৫।

কুয়াওয়ালা

একালের ঢাকার রাস্তায় শোনা না গেলেও সেকালে মহল্লায় মহল্লায় শোনা যেত কুয়াওয়ালার ডাক। কুয়াওয়ালারা হাঁকতো, 'কুয়া-সা-ফ', 'কুয়া-সা-ফ'। ঢাকায় পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা হওয়ার আগে প্রায় বাড়িতেই কুয়া ছিল। সাধারণত বাড়ির মেয়েরাই এই কুয়া ব্যবহার করতো। ঘটি-বালতি ইত্যাদির সাহায্যে তারা পানি তুলতো। দড়ি ছিঁড়ে এই ঘটি-বালতি প্রায়ই কুয়ার নিচে পড়ে যেত। ঘটি-বালতি তোলার জন্যে এক বিশেষ ধরনের বস্তু পাওয়া যেত, যা দেখতে অনেকটা নৌকার ছোটখাটো নোঙ্গরের মতো। এই বস্তু দিয়ে গৃহিণীরা সুকৌশলে ঘটি-বালতি টেনে তুলতো। কিন্তু তাতে অপরাগ হলে, খোঁজ করা হতো কুয়াওয়ালাকে। কুয়াওয়ালা এসে কুয়ার পানিতে ডুব দিয়ে তুলে আনতো হারানো সেই ঘটি-বালতি। শুধু তা-ই নয়, কুয়োর নিচের কাদা-মাটি থেকে অনেক আগে হারিয়ে যাওয়া বাসন-কোসন এবং আরো অনেক কিছু উদ্ধার করে আনতো তারা। তুলে আনা সেসব বস্তুর সঙ্গে উঠে আসতো হারানো দিনের অনেক স্মৃতি। কুয়াওয়ালারা হয়তো তুলে আনতো স্বামীর দেয়া প্রথম কানের দুল, ছোট্ট শিশুটির হাতভাঙ্গা খেলনা-পুতুল, এমনি আরো অনেক কিছু।

কুয়াওয়ালাদের আরেকটি কাজ ছিল কুয়া সাফ করা। কুয়ার পানি বেশি নোংরা হয়ে গেলে তাদের ডাক পড়তো কুয়ার আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য। দু'জন বা তিনজন কুয়াওয়ালা দড়ি বালতি নিয়ে লেগে যেত কুয়া পরিষ্কারের কাজে। দড়ি বেয়ে একজন নিচে নেমে যেত। সে বালতিতে ময়লা কাদা-মাটি তুলে দিত। আরেকজন তা টেনে তুলতো। তারা কাদা-মাটি তুলে চুণ দিয়ে কুয়ার পানি পরিষ্কার করতো।

এখন ঢাকার বাড়িতে বাড়িতে আর কুয়াও নেই, আর শোনাও যায় না সেই কুয়াওলার ডাক, 'কুয়া-সা-ফ'।

মাহুত

সেকালে ঢাকায় হাতিশালা ছিল, অনেক হাতি আর মাহুত ছিল। একালের পিলখানা, এলিফেন্ট রোড, মাহুতটুলি প্রভৃতি স্থান তারই স্মৃতি আজও বহন করছে। হাতি ছিল সেকালে বিত্ত ও বৈভবের প্রতীক তাই, রাজা-নবাব ও জমিদারদের হাতিশালায় থাকতো অনেক হাতি এবং সেসব হাতির তদারকের জন্য মোতায়েন থাকতো এক শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষ, যারা 'মাহুত' নামে পরিচিত ছিল।

'মাহুত' শব্দটির বুৎপত্তি সংস্কৃত 'মহামাত্র'। এটি একটি সুভাষিত নাম বলা চলে। জেমস্ ওয়াইজও জানাচ্ছেন যে, উনিশ শতকের শেষদিকে মাহুতেরা 'সরদার' বা 'জমিদার' নামেও অভিহিত হতো। তাঁর মতে হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ের নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকেরা এই পেশা গ্রহণ করতো এবং তাদের অধিকাংশই গাঁজা, মদ ও আফিং-এ আসক্ত ছিল।

উনিশ শতকে ঢাকার পিলখানায় প্রতিষ্ঠিত ছিল সরকারি হাতিশালা। একজন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-এর কর্তৃত্বাধীনে হাতিশালার তিনটি বিভাগ ছিল-১) সামরিক-বাহিনীর

পরিবহন- হাতি, ২) স্টেট বিভাগের হাতি এবং ৩) খেদার হাতি বা প্রশিক্ষণ-হাতি। ঢাকার রমনা এলাকা ছিল হাতির বিচরণ-ক্ষেত্র। পিলখানায় মাহুতেরা তাদের হাতি বর্তমান হাতিরপুল এলাকার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেত রমনায়।

সেকালে ঢাকার বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে এবং মিছিলে হাতি ছিল অন্যতম আকর্ষণ। পিলখানার হাতি ছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন জমিদারের হাতি মিছিলে অংশগ্রহণ করতো। অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচীন চিত্রাবলীতে, ঈদের বা মহররমের মিছিলে, হাতির শোভাযাত্রা লক্ষ করা যায়। হাতির পিঠে ছিল সুদৃশ্য পোশাকে সজ্জিত মাহুত। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলেরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল হাতির শোভাযাত্রা।

একালে চিড়িয়াখানার ভেতরে বা বাইরে দু'একটি হাতি দেখা যায়। তবে সেকালের রাজা-বাদশার হাতিশালা নেই, তাই মাহুতও নেই বললেই চলে। পিলখানা, সেতো শুধু নামেই হাতিশালা।

ফকির-দরবেশ, মুশকিল আসান

আরবী 'ফকির' শব্দটি দরিদ্র অর্থে ব্যবহৃত হলেও বাংলা ভাষায় শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে দরিদ্র বা সর্বহারা এবং আরেকটি হচ্ছে সংসার-ত্যাগী সাধু-পুরুষ বা দরবেশ। সে কারণেই ভিক্ষুকবেশী ফকির সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো ফকির প্রকৃতই ভিক্ষুক না দরবেশ, এই দ্বিধায় অনেকেই তাড়াতাড়ি কিছু অর্থ প্রদান করে বিদায় দেয়। ফকির-দরবেশ এখনও হয়তো দেখা যায়, কিন্তু যুগের ব্যবধানে এদের আচার ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর এক শ্রেণীর ফকিরের কথা জেমস ওয়াইজ তাঁর গ্রন্থে বলেছেন। তিনি লিখেছেন সম্মানিত এবং শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে ফকিররা ছিল উপদ্রব-স্বরূপ। দরবেশ-বেশী এসব ফকির দ্বারে দ্বারে গিয়ে খঞ্জনি বাজাতো। হয়তো একজন দোকানদার তার ব্যবসার কাজে ব্যস্ত অথবা একজন স্থূলকায় বিত্তশালী দিবানিদ্রারত, তখন তারা ফকিরের অবিরাম খঞ্জনি বাজানোর যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কিছু টাকা দিয়ে ফকিরকে বিদায় করে দিতো।[২৩]

দরবেশের পোশাকধারী ফকির দেখে যে কোনো নিরীহ মানুষই দুর্বল হয়ে পড়ে। একশ্রেণীর ভণ্ড ফকির মানুষের সে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে থাকে। বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই প্রতারক ফকিরদের কাছে গ্রামের বহু সরল মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে। দরবেশের পোশাক পরে জটাধারী এই ফকিররা কমণ্ডলু ও রুদ্রাক্ষের মালা হাতে রাস্তার পাশে বসে থাকতো। এরা সাধারণত তাদের শিকারের স্থান বেছে নিতো রেলওয়ে ষ্টেশন, জাহাজ-ঘাট এবং কোর্ট-কাছারির কাছে। সদ্য গ্রাম থেকে আগত গ্রামবাসী অথবা মামলায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ এদের কাছে সহজেই প্রতারিত হতো। ফকিরের সঙ্গী মিষ্টি কথায় এদের

২৩. জেমস ওয়াইজ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৩।

ডেকে নিয়ে যেত ফকিরের কাছে, যাতে তাদের বিপদ থেকে ফকির বাবাজি উদ্ধার করেন। ফকিরের আশ্বাস-বাক্য শুনে বিভ্রান্ত হয়ে, সেই সরল-প্রাণ মানুষেরা সঙ্গের সব টাকাকড়ি ফকিরের হাতে তুলে দিতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফকির সেখান থেকে উধাও হতো।

আরেক শ্রেণীর ফকিরের কথা কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর বাল্যস্মৃতিতে লিখেছেন, তাদের নাম 'মুসকিল আসান'। তিনি লিখেছেন ঃ

"সন্ধ্যার পর রাস্তায় গ্যাসপোষ্ট জ্বলতো, রাত একটু বাড়লেই সমস্ত পাড়া নিঝুম হয়ে যেতো। প্রায়ান্ধকার পরিবেশে রাজকাহিনীর গল্পগুলো শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম। আর অনেক সন্ধ্যায় প্রায় এই সময়েই গলিপথে হাঁক শোনা যেতো 'মুসকিল আসান'। একটি কাঁচের বাক্সে মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালিয়ে বাক্সটি মাথায় চাপিয়ে অন্ধকারে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতো ফরিকবেশী বিশালকায় একটি লোক, এক আধ পয়সা বাক্সটির ভেতরে ফেলে না দেয়া পর্যন্ত লোকটি নড়তে চাইতো না। পয়সা পেলে ধীরে ধীরে ছায়ামূর্তির মতো সে গলির মোড়ে মিলিয়ে যেতো।"[২৪]

শিশু কিশোরদের কাছে এই মুশকিল আসান ভীতিপ্রদ ছিল। তারা রাস্তার মোড়ে মুশকিল আসানের ডাক শুনলেই দরজা-জানালা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতো। মুশকিল আসান কোনো সাড়াশব্দ না পেলে নিঃশব্দে চলে যেতো।

নৈচাবন্দ, হুঁকা বরদার

বিংশ শতাব্দীতে এদেশে সিগারেটের প্রচলন হয় এবং মানবদেহে এর ভয়াবহ ফল দেখে এ-কালে আমরা সবাই আতঙ্কিত হই। উনিশ শতকের আগে সিগারেটের প্রচলন না থাকলেও তখন তামাকের প্রচলন ছিল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। পনের শতকের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসামঙ্গল' কাব্যের একটি উদ্ধৃতিতে তামাকের ব্যবহারের কথা পাই—

"সুবর্ণের হুঁকা লইয়া তামাকু ভরিয়া দেয় আগে"।

অনুমান করা যায়, হুঁকা ও তামাকের ব্যবহার ঐ শতাব্দীতে বহুল প্রচলিত ছিল। সুবর্ণের না হলেও দেশী উপকরণের হুঁকার অভাব ছিল না। ছিল নারকেলের শুকনা খোল এবং মাটির তৈরী ছিলিম।

'তামাকু' শব্দটি এসেছে পর্তুগিজ 'তাবাকো' থেকে। লক্ষণীয় বিষয়, সতেরশ তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ম্যানোয়েল দা আস্ সুম্পসাঁম প্রণীত 'পর্তুগীজ বাংলা অভিধানে' তামাক শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আঠারো শতকেরই হ্যালহেডের মুনশীর অভিধানে তামাকু শব্দটি রয়েছে, যার অর্থ বলা হয়েছে 'ধোঁয়ার পাতা'।[২৫]

হুঁকা সাধারণ মানুষই ব্যবহার করে থাকত। শুধু তাই নয়, আজ পর্যন্তও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অতিথি আপ্যায়নে হুঁকার ব্যবহার সুবিদিত। অন্যদিকে, সম্ভ্রান্ত ঘরে নলওয়ালা হুঁকার মাধ্যমেই তামাক সেবনে আভিজাতের লক্ষণ ছিল।

২৪. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম– 'চল্লিশের দশকের ঢাকা', ঢাকা ১৯৯৪, পৃ: ১৮।

২৫. মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, 'বাঙালি প্রণীত প্রথম বাংলা অভিধান', ২০০২, ঢাকা, পৃঃ ৫৬।

এ দেশের নবাব, জমিদার বা রাজাদের মধ্যে এই নল-বিশিষ্ট হুঁকার ব্যবহার বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল। মুঘল চিত্রকলায় হুঁকা-পানরত নবাব নাজিমদের চিত্র পাওয়া যায়। সতেরশ পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে আঁকা একটি মুঘল চিত্রে ঢাকার নবাব-নাজেম মুর্শিদ কুলি খাঁকে হুঁকা-পানরত অবস্থায় দেখা যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ "রাইটার" বা কেরানী থেকে শুরু করে লর্ডদের ভেতরেও এই নৈচার বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সুভো ঠাকুরের সংগ্রহে রবার্ট ক্লাইভের ব্যবহার করা সুদৃশ্য একটি কাচের গড়াগড়া রয়েছে। 'গড়াগড়া' শব্দটি হুঁকার গড়-গড় শব্দের সাদৃশ্যে উদ্ভূত একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। ইংরেজরা এই নৈচা বা হুঁকার নামকরণ করেছিল 'হাব্‌ল-বাব্‌ল (Hubble-Bubble)। এটিও ধন্যাত্মক শব্দ।

উনিশ শতকে ঢাকাতে অবস্থানরত ডাঃ জেমস ওয়াইজ "নোটস অন রেসেস কাস্ট এ্যান্ড ট্রেডস্ অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল" (১৮৮৩) গ্রন্থে হুঁকার নির্মাতা বা নৈচাবন্দ' এর একটি মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"আজকাল ঢাকায় হুঁকার নল বানানোর ব্যবসা যেমন রমরমা, তেমনি লাভজনক। ঢাকা শহরে প্রায় একশো পরিবার আছে যাদের একমাত্র কাজ হুঁকার নল বানানো।

শিশু, জাম, জারুল ও শিমুল কাঠ দিয়ে নৈচা বানানো যায়। লোহার লম্বা শূল দিয়ে কাঠ গর্ত করে তারপর সেটাকে আকারে আনা হয়। ধনী লোকেরা সাধারণত হুঁকার নল ব্যবহার করেন, তা বানানো হয় আবলুশ কাঠে।

হুঁকার নল বিভিন্ন রকম। যেটা সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ে, সেটা হলো পেঁচানো। দেড় প্যাঁচ দিয়ে যেটা বানায় সেটাকে বলে দেড়-খাম। অনেক প্যাঁচ যেটাতে সেটা হ'ল সত্তর-খাম।

যে উপকরণ দিয়ে নৈচা[২৬] বানানো হয় তার নামকরণ হয় সেই উপকরণের নামে। ধূমপায়ীদের মধ্যে কেউ কেউ 'খশ্‌খশ্‌' দিয়ে মোড়ানো হুঁকার নল পছন্দ করেন। কেননা, খশখশ পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে গড়াগড়া টানলে যে ধোঁয়া বের হয়, তা হয় শীতল ও স্নিগ্ধ। আবার কেউবা হুঁকার নলে পুঁতি বসিয়ে নেয়, কিংবা নলটা মুড়িয়ে নেয় রূপার তার দিয়ে, নয়তো দামী পাথর বসায়।"[২৭]

হাকীম হাবীবুর রহমান তাঁর "ঢাকার স্মৃতিকথায়" লিখেছেন—

"নৈচা তৈরীর কাজ ঢাকায় যে রকম হয়, সমগ্র ভারতে কোথাও সেরূপ হয় না এবং এখানকার নৈচার কত যে রকমারিত্ব তৈরী হয়েছে যে, সুবহান্নালা এরূপ সুন্দর, পাতলা অথচ মজবুত নৈচা কোথাও তৈরী হয় না[২৮]।"

নলওয়ালা হুঁকো বা নৈচার উপকরণে ধনী বা দরিদ্র, এই বিত্ত পরিচয়ও চিহ্নিত থাকতো। এছাড়া নৈচা বা গড়গড়ার নলের প্যাঁচ দেখেও বোঝা যেত রাজরাজড়াদের মান বা স্ট্যাটাস। গবেষকদের মতে ভাওয়াল, বর্ধমান অথবা পাথুরিঘাটার মহারাজাদের গড়গড়ার নলে ছিল আড়াই প্যাঁচ। এছাড়াও তাঁদের হুঁকা বহন করে পেছনে পেছনে ছুটত

২৬. হুঁকার একটি অংশ। কাঠের তৈরী সোজা খাড়া নলকেই নৈচা বলে।

২৭. জেমস ওয়াইজ, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও পেশার বিবরণ, ফজলুল করীম অনূদিত, ঢাকা, ১ম খণ্ড, ১৯৯৮, পৃঃ ১১৩।

২৮. হাকীম হাবীবুর রহমান 'ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে' ঢাকা (অনূদিত)।

হুঁকাবরদার (হুঁকাবহনকারী)। এটিও আজ লুপ্তপ্রায় জীবিকা।

এক কালে নৈচাবন্দ বা নৈচাবন্দ-নির্মাতারা খাজে দেওয়ান ১ম লেন-এর মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় একসঙ্গে বাস করতো। সে এলাকা 'নৈচাবন্দ পট্টি' নামে পরিচিত ছিল। এখন সে নাম সবার কাছেই অপরিচিত। কালের বিবর্তনে রাজ-রাজড়াদেরও যুগ শেষ হয়েছে এবং নৈচাবন্দ বা হুঁকা বরদার- রাও হারিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে।

টানা-পাংখাওয়ালা বা পাংখাপুলার

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ১৯০১ সালে ঢাকায় শুরু হয় বৈদ্যুতিক বাতির যুগ। প্রথমে রাস্তায় বৈদ্যুতিক বাতির সংযোগ দেয়ার পর ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিক শক্তি সম্প্রসারিত হয় কারখানায়, অফিস-আদালতে এবং অবশেষে রাস্তার দু'পাশের দালান কোঠায়। ত্রিশের দশকে ঢাকায় বাড়ি বাড়ি বিদ্যুতের ব্যবহার সম্প্রসারিত না হলেও অফিস আদালতে এবং সরকারি স্কুল-কলেজে বৈদ্যুতিক পাখার বদলে ব্যবহৃত হতো টানা পাখা। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় ছাদ-সংলগ্ন এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত টানা থাকত ঝালর আকৃতির বিরাট কাপড়ের বা সতরঞ্জের পাখা। এই পাখা সংলগ্ন এক দড়ি দরজার বাইরে অবস্থানরত পাংখাওয়ালা বা পাংখা-পুলার সারাদিন ধরে পাংখা টানতে টানতে ঘরের ভেতরে বাতাস সঞ্চালন করতো। এই পাখা টানতে টানতে তাদের গা দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরতো, কখনো বা ক্লান্তিতে তারা ঘুমিয়ে পড়তো। বড় সাহেবের ধমকে তাদের ঘুম ভাঙতো। স্কুল-কলেজে এই টানা পাংখাওয়ালাদের বেতন বাবদ ছাত্রদের কাছ থেকে পাংখা-ফি আদায় করা হতো।

টিক্কাওয়ালা

সাধারণ হুঁকাই হোক বা লম্বা নলওয়ালা নৈচা, তার অপরিহার্য একটি উপকরণ হলো ছিলিম। যাতে থাকে জ্বলন্ত টিকা এবং তামাক। এই টিকা যারা তৈরী করে, তাদের বলা হয় টিকাওয়ালা বা 'টিক্কাওয়ালা'। উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত জেমস ওয়াইজের গ্রন্থে টিক্কাওয়ালাদের একটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাওয়া যায়। জেমসের মতে সেকালে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকায় বাস করত প্রায় পঁয়ত্রিশ ঘর টিক্কাওয়ালা। টিক্কাওয়ালারা শুক্রবার দিন তাদের পণ্য এই-টিক্কা বিক্রী করতো না। কেন করত না, তা জেম্স ওয়াইজ সাহেবের জানা ছিল না।

সাধারণত টিক্কা তৈরী করা হয় কাঠ-কয়লা থেকে। কাঠ কিছুক্ষণ পোড়ার পর তা' নিভিয়ে ফেলে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে গুঁড়ো করা হয়। বাড়ির মেয়েরাই কয়লার গুঁড়োর সঙ্গে পানি মিশিয়ে 'লেই' বা আঠালো মণ্ড তৈরী করে ছোট ছোট পিঠার আকারে বানিয়ে রৌদ্রে শুকাতে দিত। বাঁশের চাটাইয়ের উপরে অথবা মাদুরের উপরে তা বিছিয়ে সারি করে শুকাতে দেওয়া হতো। টিক্কার পাইকারী ক্রেতারা এই মাদুরের হিসাবে টিক্কাগুলো কিনে নিত। জেমসের সময় অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষার্ধে এই টিক্কার দাম ছিল পাঁচ থেকে ছয় আনা (তিনটি মাদুরের)। সস্তা টিক্কায় সাধারণত আগুন জ্বালানোর পর তা' খুব তাড়াতাড়ি

শেষ হয়ে যায়। ঠিকমতো বানানো পাকা বা বেশি দামের টিক্কা ধীরে ধীরে জ্বলে এবং নিভতেও বেশ সময় নেয়।

বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকেও ঢাকার পূর্বপ্রান্তে 'টিকাটুলি' এলাকায় কয়েকঘর টিক্কিয়াওয়ালার বসতি ছিল। রেল-লাইনের দু'পাশে রৌদ্রে শুকাতে দেওয়া সারি সারি মাদুরে বিছানো টিক্কার সম্ভার ছিল একটি পরিচিত দৃশ্য।

টিক্কা বা টিক্কিয়া ঢাকার বিশেষ এক পণ্যদ্রব্য বলে গণ্য হতো। ঢাকায় তৈরী টিক্কিয়া এত হালকা ও নিখুঁত হতো যে, একটি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে বেশ কয়েকখানা টিক্কিয়া ধরানো যেতো।[২৯] নাগরিক পরিবেশে হুঁক্কা বা নৈচা-সংস্কৃতিও কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নেই কোনো টিক্কাওয়ালা, কিন্তু টিকাটুলী নামটি এখনো এক লুপ্ত-পেশাজীবীর স্মৃতি বহন করে রয়ে গেছে।

চীনা জুতাওয়ালা

দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা যাঁদের রয়েছে, তাঁরা লক্ষ করে থাকবেন, প্রায় শহরেই 'চায়না টাউন' নামে একটি বিশেষ এলাকা রয়েছে। সেখানে চীনা সম্প্রদায়ের অভিবাসীরা বংশানুক্রমে বসবাস করছে। ভারতের বিভিন্ন শহরেও রয়েছে 'চীনা পট্টি'।

ঢাকায়ও এককালে ছিল এই 'চীনা পট্টি'। মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে যে রাস্তাটি চলে গেছে নলগোলা বা ইমামগঞ্জের দিকে, সেই রাস্তার শুরুতে ছিল ঢাকার 'চীনাপট্টি'। বেশি নয়, মাত্র আট দশটি দোকান নিয়ে গড়ে উঠেছিল চীনা-পট্টির এই বসতি। সবগুলি দোকানই ছিল চীনা জুতাওয়ালাদের দোকান।

ইংরেজ আমলে কোনো এক সুদূর অতীতে এদের পূর্ব-পুরুষরা এদেশে এসেছিল। তারপর থেকে এরা বংশপরম্পরায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করে চালিয়ে যাচ্ছিল এই জুতা তৈরীর ব্যবসা। চীনা জুতাওয়ালাদের দোকান ছিল একাধারে জুতা তৈরীর কারখানা এবং আবাসস্থল। স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে এরা এই ভবনেই বসবাস করত। দোকানে পরিবারের প্রায় সব লোকই একসঙ্গে কাজ করতো। পুরুষদের পাশাপাশি চীনা পোশাক পরে মেয়েরাও জুতা তৈরীর কাজে লেগে যেত। আবার কেউ কেউ ব্যস্ত থাকতো জুতা বিক্রীর কাজে। ঢাকায় এখানেই দেখা যেত মেয়ে -পুরুষ একসঙ্গে কাজ করতে। এভাবে কাজ করার প্রচলন ঢাকার অন্যত্র দেখা যেত না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও চীনা পোশাক পরে দোকানে ঘুরে বেড়াত। ব্যবসার প্রয়োজনে অথবা ক্রেতাদের সঙ্গে দর-দস্তুরের সময় এরা বাংলায় কথা বলতো। তবে মাতৃভাষা তারা ভুলে যায়নি। তারা নিজেরা পরস্পর চীনা ভাষায়ই কথা বলতো। অনেক সময়েই দেখা যেতো প্রবীণরা দোকানের এক কোণে বসে চুরুট টানতো আর চীনা খবরের কাগজ পড়তো। দোকানের সামনে এবং ভেতরে সাজানো থাকতো সারি সারি জুতা। শৌখিনদের মধ্যে অনেকেই এই জুতা কিনতে চীনা দোকানে আসতো।

বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকেও ঢাকায় দেখা গেছে চীনাপট্টিতে চীনা জুতাওয়ালাদের রমরমা ব্যবসা। ১৯৪৭ এর দেশ-বিভাগের পর ক্রমে এদের ব্যবসা হারিয়ে যায়, লোপ পায় চীনা পট্টি এবং চীনা দোকানদার।

---

২৯. জেমস্ ওয়াইজদ-প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৪।

খুন্দিগর বা শিং-এর কারিগর

প্লাস্টিকস্ বা 'রেজিনের' যুগ শুরু হওয়ার আগে এদেশে বহুল ব্যবহার ছিল শিং-এর তৈরী চিরুনী, বোতাম এবং ছোট ছোট কৌটার। এই শিং-এর কারিগরকে বলা হতো 'খুন্দিগর'। খুন্দিগর শব্দটি এসেছে ফার্সি 'কুন্দিকার' থেকে। চল্লিশের দশকে দেখা গেছে ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে নবাবগঞ্জ এলাকায় ছিল বেশ কয়েকঘর কুন্দকারের বসতি। ঢাকার এই কুন্দকার সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ তাঁর গ্রন্থেও এক ক্ষুদ্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন[২৯]। প্রমাণিত হয়, উনিশ শতকেও ঢাকায় এই জীবিকা অব্যাহত ছিল।

গরু-মহিষের শিং আগুনে গরম করে পরে প্রয়োজনবোধে কঠিন কোন জিনিসের চাপে তা সোজা করে অথবা চ্যাপ্টা করে বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরী করা হতো। তারা বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার না করেও বিশেষ ধরনের কুঁদকল (Lathe) ব্যবহার করতো। ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে যারা শিং-এর চিরুনি বা বোতাম তৈরী করতো, তারা ছিল মুসলমান কারিগর। 'বুতামের চাহিদা অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় ঢাকার পূর্বাঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও বুতাম তৈরির পেশায় নিয়োজিত হয়। আর এসব তৈরি বোতামই কুলুটোলার হাটে বেচা কেনা হতো'।[৩০] ঢাকার সেই খুন্দিগর বা শিং-এর কারিগর আজ ইতিহাসের পাতায় লুপ্ত।

সাবুনওয়ালা

উনিশ শতকের শেষ দিকে ঢাকায় সম্ভবত কাপড় ধোয়ার কাজে বিদেশী সাবানের প্রচলন ছিল না। তখন কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো বাংলা সাবান নামে পরিচিত এক বিশেষ ধরণের গোলাকার সাবান। ঢাকাই ভাষায় বলা হতো 'বাংলা সাবুন'। ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটি এলাকায় গড়ে উঠেছিল এই সাবানের কারখানা। সাবানের কারখানার লোকজন অথবা সাবানের বিক্রেতাদের বলা হতো সাবুনওয়ালা। জেমস্ ওয়াইজের মতে, ঢাকায় তৈরী সাবান রপ্তানী-দ্রব্যের মধ্যে ছিল অন্যতম। ভারতের সর্বত্র ছাড়াও বার্মার পেনাং ও মালয়ে এই সাবান রপ্তানী হতো।

ত্রিশ-চল্লিশের দশকে চকবাজারের নিকটবর্তী ছোট কাটরা এলাকায় বেশ কয়েকটি সাবানের কারখানা ছিল। সেখানে দেখা গেছে, কিছু লোক ব্যস্ত রয়েছে প্রায় পাঁচ ছয় ফুট উঁচু লোহার কড়াইয়ে সাবানের উপকরণ জ্বাল দিতে। হয়তোবা আরেকদল জ্বাল দেয়ার পর স্তূপ করা সাবানের মণ্ড বেশ বড় আকারের গোলাকার চামচ দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে শক্ত ও জমাটবদ্ধ করতো। পিটিয়ে পিটিয়ে তারা তৈরী করতো জমাটবদ্ধ সাবানের গোলাকার বল। 'বাংলা সাবান' নামে পরিচিত এই গোলা ওজন দরে বিক্রি করা হতো, প্রয়োজনবোধে তারা লোহার তার দিয়ে এই গোলা টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে নিত। ঢাকা শহরের বাজারে বা বিভিন্ন বিপণি কেন্দ্রে এই গোলা সাবান বিক্রির ব্যবস্থা ছিল।

জেমস্ ওয়াইজ এই সাবান তৈরীর বিশেষ প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়েছেন। সোডা ক্ষার এবং চুন পানির সঙ্গে মিশিয়ে প্রথমে মটকায় জ্বাল দেয়া হতো। কয়েকদিন পর তা ঠাণ্ডা হলে

৩০. নাজির হোসেন- 'কিংবদন্তির ঢাকা', ৩য় সং, ১৯৯৫, পৃঃ ২৫৫।

জমা ময়লা-তলানি তুলে ফেলে দেয়া হতো। তারপর পশুর চর্বি বা তিলের তেল মিশিয়ে দ্বিতীয়বার জ্বাল দেয়া হতো। যত বেশিবার এবং বেশিক্ষণ জ্বাল দেয়া হতো, সাবানের মানও ততই বেড়ে যেতো। ভালো সাবান তৈরী করতে প্রায় দু'সপ্তাহ সময় লাগতো।[৩১]

যান্ত্রিক প্রযুক্তির ব্যবহারে আজকাল আধুনিক সাবান তৈরী হচ্ছে। ঢাকার এই বাংলা সাবান তৈরীর প্রক্রিয়া ক্রমে লোপ পেয়ে গেছে। সেই সাবানের কারখানাও আজ দেখা যায় না, সাবানওয়ালারাও আর নেই।

হজমিওয়ালা

ষাট-সত্তর বৎসর আগে বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকে ঢাকায় এক ফেরিওয়ালা দেখা যেতো, যারা হজমিওয়ালা নামে পরিচিত ছিল। মাথায় তাদের ছিল নানা রকমের হজমির পসরা। তারা অলি-গলির মোড়ে, বাজারে অথবা স্কুলের বাইরে তাদের পসরা নিয়ে বসতো। তারা বিশেষ করে দুরকমের হজমি বিক্রি করতো, যা ছিল ছেলেমেয়েদের কাছে খুবই প্রিয়। একটি ছিল গোলাপি রঙের দানা দানা, টক-মিষ্টি। আরেকটি ছিল কালো রঙের দানা, যা ছিল বেশ টক। ছেলেমেয়েদের কাছে ছিল হজমিওয়ালার এক বিশেষ আকর্ষণ। ম্যাজিকই বলা চলে একে। ওদের কাছে রয়েছে দু রকমের শিশি। একটি শিশি থেকে হজমির মধ্যে কয়েক ফোঁটা কেমিকেল দিয়ে তারপর আরেক শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা কিছু দিলেই ধপ্ করে আগুন জ্বলে উঠতো। এটা শুধু ম্যাজিক দেখানোর জন্যই নয়, এতে নাকি হজমি সুস্বাদুও হতো।

আজকাল হজমিওয়ালাদের দেখা পাওয়া যায় না বললেই চলে।

কোচোয়ান বা গাড়োয়ান

অনেক অতীত এখন আমাদের কাছে স্মৃতিমাত্র। অতীতের অনেক দৃশ্যমান বস্তুই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে 'এ্যান্টিক'। ঢাকায় যে ঘোড়ার গাড়ি ছিল একমাত্র যানবাহন, সে গাড়ি এখন শৌখিন বস্তু বা এ্যান্টিক। রিক্সা বা মোটরগাড়ির প্রচলন হয়েছে আরও অনেক পরে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলের শেষ দিকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ঢাকায় সিভিল সার্জন হয়ে আসেন জেমস্ টেলর। এ সময়ে তিনি ঢাকার উপর একটি গ্রন্থ লিখেন 'টপোগ্রাফী অফ ঢাকা', যা আঠারো শত চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি কালেক্টর মিঃ ডগ্‌লাসের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, ১৭৯০ সালের দিকে ঢাকা শহরে একদল সৈনিকের দ্বারা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ির প্রবর্তন করা হয়।[৩২] ১৮৪৪ সালের দিকে 'ক্যালকাটা রিভিউতে' প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শহরে নানা ধরনের ঘোড়ার গাড়ি চলমান ছিল, যেমন– ব্রিট্‌জকাস (Britzkas),

৩১. জেমস্ ওয়াইজ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৩।
৩২. জেমস্ টেলর- Topography of Dacca, 'কোম্পানি আমলে ঢাকা', মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃঃ ৮৪।

বারুশ (Barouche), ল্যাঞ্জে (Landav), চ্যারিয়াট (Charlot), ফেটান (Phaeton), বাগ্নি (Buggy), ব্রাউনবেরি (Brown Berry) এবং ক্রাহাঞ্চি গাড়ি (Krahanchy)। শেষোক্ত গাড়ি সম্পর্কে সাহিত্যিক ও গবেষক সাঈদ আহমদ লিখেছেন–

> এ গাড়িটি চার আসন বিশিষ্ট। পেছনে ফুটম্যানের দাঁড়াবার জায়গা থাকত। শক্ত ছাদ। গাড়িটা অনেকটা বাক্সের মতো। দু'ধারে চারটি জানালা এবং দুই ঘোড়া জুড়ে চালানো হতো। পরবর্তীকালে কেবল এই গাড়িটি ঢাকায় টিকে গেল। একেই আমরা ঢাকার গাড়ি বলে স্বীকৃতি দিয়েছি। এটাকে করাচী গাড়ি বলা হতো। 'ক্রাঞ্চি' শব্দ বিকৃত হয়ে 'করাচী' তে পরিণত হয়েছে[৩৩]।

এ গাড়ির একটি বিশিষ্টতা এই যে, এতে স্কুল কলেজের ছাত্রীরা অথবা পর্দানশীন মহিলারাও যাতায়াত করতে পারতো। দু'ধারে চারটি জানালা এবং দু'দরজার উপরের দিকে কাঠের বিশেষ জাফরির ব্যবস্থা ছিল। এগুলো তুলে দিলে আবরুরক্ষাও হতো, অন্যদিকে আলো-বাতাসেরও অভাব থাকত না। ছাদের ওপর দু'জনের আসন ছিল যাতে একজন বসত গাড়োয়ান বা গাড়ির চালক। তার পাশে সহকারী বসারও ব্যবস্থা ছিল। গাড়ির ভেতরে চার আসনে চার যাত্রীর অতিরিক্ত কোনো যাত্রীকেও প্রয়োজনবোধে গাড়োয়ানের পাশে বসতে দেয়া হতো।

গাড়ির চালককে গাড়োয়ান বলা হলেও তাদেরকে কোচোয়ান বললে তারা খুব খুশি হতো। তারাও বেশি ভাড়া আদায়ের জন্য তোষামুদে ভাষায় যাত্রী বুঝে সম্ভাষণ করতো– 'মহারাজ", "বাবু", "মসয়" (মহাশয়), 'ভদরনোক' (ভদ্রলোক), 'মেমসাব' ইত্যাদি। আদর করে, তাদের গাড়ির ঘোড়াকেও বলতো 'পঙ্খিরাজ'। সখকরে তারা ঘোড়ার কানে গুঁজে দিত ফুল অথবা মাথায় মুকুটের মতো করে পাখির পালক দিয়ে সাজাতো।

কোচোয়ানরা গাড়ির ওপরে বসে চাবুক হাঁকিয়ে যেভাবে রাস্তায় গাড়ি চালাতো, মনে হতো তারাই রাস্তার লর্ড বা মহারাজা।

বিশ শতকের গোড়া দিকে ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণের কারণে ঘোড়ার গাড়ির সংখ্যা বেড়ে যায়। জনসাধারণের যাতায়াতের কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও সরকারি কাজেও এ গাড়ি ব্যবহৃত হতো। সাহিত্যিক কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছিলেন– "প্রতিদিন দেখা যেতো বিশালাকায় অশ্বচালিত গাড়িতে শহরের ডাক নিয়ে ডাক বিভাগের কর্মীরা আসা-যাওয়া করতো।[৩৪]" এসময় ঢাকার নওয়াব বাড়ির লোকেরাও নিয়মিত ঘোড়ার গাড়িতে চড়তেন। নওয়াব বাড়ির জনৈক কাজী কাইউমের ৩.১.১৯০৪ তারিখে লেখা ডায়েরিতে জানা যায়, সেদিন তিনি গনি নামের এক কোচোয়ানের গাড়িতে চড়েন।[৩৫] ভাড়াটে সংগ্রহের জন্য কোচোয়ানরা শহরের অলিতে গলিতে অথবা বাজারের মোড়ে ঘুরে বেড়াত। রাজধানী সঙ্গে প্রধান যে ট্রেনটি ঢাকার ফুলবাড়িয়া স্টেশন থেকে রওয়ানা হতো এবং

৩৩. সাঈদ আহমদ, ঢাকায় ঘোড়ার গাড়ি এবং সায়গল, 'শৈলী', ১ আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৫৭।
৩৪. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম– চল্লিশের দশকের ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৬।
৩৫. অনুপম হায়াৎ- নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি, ঢাকা ২০০১, পৃঃ ১।

ফুলবাড়িয়ায় ফিরে আসতো তার নাম ছিল ক্যালকাটা মেইল। এই ক্যালকাটা মেইল যাওয়া বা আসার সময় শহরের প্রায় সব ঘোড়ার গাড়ি ভিড় করতো ফুলবাড়িয়া স্টেশনের সামনে। ট্রেন এসে পৌছলে যাত্রী আকর্ষণের জন্য গাড়োয়ানদের চাটুবাক্য নিক্ষিপ্ত হতে থাকত। এর একটি সুন্দর চিত্র এককালের স্বাধীনতা-সংগ্রামী পুরুষ বঙ্গেশ্বর রায় তাঁর 'ঢাকা আমার ঢাকা' (১৯৯০) গ্রন্থে তুলে ধরেছেন ঃ

"ঢাকা ফুলবাইরা রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন আসিয়া ভিড়িয়াছে।.... একপাল গাড়োয়ান ইহাদের অভ্যর্থনায় আগে হইতেই রেডি। যাত্রীর দল প্লাটফর্মের গেট্‌দিয়া বাহির হইবামাত্র উষ্ণ আহবানের ফোয়ারা ছুটিলো—

"কই মহারাজ, এই যে এদিকে নজর্‌ দেন একটু,
সোনা মিয়ারে ভুইলা গেলেন নাকি? ঘোড়া দুইটা
আজও কানতে কানতে আপনার লাইগা প্যাচাল
পারতাছিল........ কি? গাড়ি লাগবোনা!
হায়া হায় হায় হায়, বেইমানি আর কারে কয়"।
"সেলাম আলি কোম হাজী সাহেব! চলেন
চলেন, জলদি জলদি; বিবিজান রাইন্দাবাইরা
বইয়া আছে, আঃ দশ বাজেতক একটা দানাবি
গিলেনি......... কি? যাইবেন না! মক্কা শরীফ
থাইকা ফিরা আইয়া কইলাজাটারে এক্কেবারে
পাথর বানাইয়া ফালাইছেন।"
"এই যে গুড মর্নিং মেমসাব, সাহেবনে
ভেজা......... কি? জ্যাম! ইস্‌ দেখছচ্‌নি বে,
কেমুন বটর বটর ইংলিশ কয়? বেটির মুখ
দিয়া য্যান বুইড়া ছাগলে লাদাইবার লইছে।[৩৬] "

পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হতো যাত্রীদের বোঁচকা বা সুটকেস্‌ ধরে টানাটানি অথবা ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি। যারা ভাড়া নির্ধারণে কালক্ষেপণ না করে তড়িঘড়ি গাড়িতে উঠে বসতো, গাড়োয়ানের কাছে তাদের নাজেহাল হওয়ার অন্ত ছিল না। গাড়ি কিছুদর যাওয়ার পরই শুরু হতো ভাড়া নিয়ে বাক-বিতণ্ডা। ভাড়া নিয়ে কোচোয়ানের কটূক্তি যাত্রীদের ক্রোধ বা রোষ বাড়তে থাকতো। আর অন্যদিকে গাড়োয়ানের বাক-চাতুর্য্য বা রসবোধে যাত্রীরাও মনে মনে না হেসে থাকতে পারত না। ঢাকার গাড়োয়ান বা কোচোয়ানদের এই রসবোধ অনেকটা কিংবদন্তি তুল্য। কৌতুক অভিনেতা ভাণু বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঢাকাই গাড়োয়ান' শীর্ষক এক গ্রামোফোন রেকর্ডে গাড়োয়ান ও যাত্রীর মধ্যে কথোপকথনের রসময় চিত্র তুলে ধরেছেন। রেকর্ডটি এককালে খুবই জনপ্রিয় ছিল।

৩৬. বাঙ্গশ্বর রায়- ঢাকা আমার ঢাকা, ১৯৯০ কলকাতা, পৃঃ ৪।

ক্যালকাটা মেইল ধরার জন্য কোনো যাত্রী যথাসময়ে স্টেশনে পৌছতে না পারলে গাড়োয়ানরা আকর্ষণীয় ভাড়া আদায় করে যাত্রীদের পৌছে দিত নারায়ণগঞ্জের স্টিমার ঘাটে। সেখান থেকে রওয়ানা হতো গোয়ালন্দের পথে স্টিমার, যা গোয়ালন্দ মেইল নামে খ্যাত ছিল। ঘাটে যথাসময়ে পৌছে দিতে পারলে কোচোয়ানদের ভাগ্যে অতিরিক্ত বখশিশ্ মিলতো।

গাড়োয়ান বা কোচোয়ানরা যাত্রী পেলে মাঝে মাঝে শহরের এক প্রান্তে মিরপুরেও গাড়ি নিয়ে যেত। এছাড়া সদরঘাট থেকে চকবাজার যাত্রীপিছু ভাড়া নিয়ে বিশেষ সার্ভিসও চালু ছিল। গাড়োয়ানদের মধ্যে অনেকে দুঃসাহসিক কাজেও প্রয়োজনে এগিয়ে আসতো। এরা ঢাকার দাঙ্গার সময় হিন্দু-মুসলমান এলাকার মধ্যদিয়ে সবেগে গাড়ি ছুটিয়ে যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌছে দিত।

সাঈদ আহমদ ভারতের বিখ্যাত গায়ক কুন্দনলাল সায়গলের ঢাকা সফরকালে ঘোড়ার গাড়ি চড়ার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। "১৯৪৪ সালে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন আর্মানিটোলার 'নিউ পিকচার হাউসে' (পরবর্তীকালে 'সাবিস্তান হল') গান গাইতে। ফুলবাড়িয়া স্টেশনে তখন জনতার ভিড়ে বেসামাল অবস্থা। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক এবং অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা সায়গলকে ধরাধরি করে স্টেশনের বাইরে রাখা সুসজ্জিত 'ডেমলার' গাড়িতে বসাতে নিয়ে গেল।

কিন্তু সায়গলের চোখ পড়লো একটা হাসি-খুশি গাড়োয়ানের মুখের উপর। মাথায় জরির টুপি, ইসলামপুরের আদম কোচোয়ন উচ্চস্বরে গান গাইছে আর সায়গলের দিকে তাকাচ্ছে। ইশারা করছে সম্ভ্রমে। সায়গল সবাইকে ঠেলে ফেলে ওই গাড়ির দিকে এগুলেন। কর্মকর্তারা উচ্চ কণ্ঠে বললো 'ওস্তাদজি আপনার মোটরগাড়ি এই দিকে।' সায়গল কোনোদিকে না তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সোজা আদমের ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে বসলেন। মজার ব্যাপার হলো, তিনি ভেতরের আসনে না বসে পেছনে ফুটম্যানের আসনে গিয়ে বসলেন। সবাই হকচকিয়ে গেল। কিন্তু সায়গলের কথা অমান্য করা যায় না। সময় অপব্যয় না করে তারা গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো। সায়গল পেছন থেকে চিৎকার করে বললেন-গাড়ি চালাও। ফুলবাড়িয়া স্টেশন ফেলে গাড়ি ছুটলো। কোচোয়ান ঘোড়াকে চাপা স্বরে বলছে দুলকি চালে চলতে। কারণ সায়গল প্রাণখুলে গান গাইছে। 'তোমার বীণায় গান ছিল আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো, ফুল ছিল।' কি অপূর্ব হৃদ্যতা। 'জীবনমরণ' চলচ্চিত্রে সায়গল এই গান গেয়ে পুরো বাংলার মন জয় করেছিলেন সেই সময়ে।"[৩৭]

আদম কোচোয়ান এবং তার ন্যায় আরও অনেক কোচোয়ান ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে ওদের বাক্-চাতুর্য্য, উপস্থিত বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং তাদের বিচিত্র জীবনধারা হারিয়ে গেলেও স্থান করে নিয়েছে সাহিত্যে, গল্পে অথবা সিনেমার কাহিনীতে। কোচোয়ান নিয়ে অনেক গান, কাহিনী এবং চলচ্চিত্র প্রণীত হয়েছে।

৩৭. সাঈদ আহমদ- প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

সহিস, জকি এবং রেসটিপ হকার

ঘোড়া এবং ঘোড়-দৌড় সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি পেশাজীবীও ইতোমধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। ঢাকা শহরে ছিল অনেক ঘোড়ার গাড়ি এবং গাড়ির উপযোগী ছোট-খাটো ঘোড়া। এছাড়াও ঢাকায় ছিল ঘোড় দৌড়ের জন্যে বেশ কিছু জোয়ান তাগড়া ঘোড়া। এদের রক্ষণাবেক্ষণ বা দেখভালের জন্য বহু অশ্বশালা ছিল। ঢাকার স্থানীয় ভাষায় একে বলা হতো 'আড়গাড়া'। ঢাকার আবাসিক এলাকায় নির্বিশেষে বিভিন্ন স্থানে আড়গাড়া গড়ে উঠেছিল। সাতরওজার একটি আড়গাড়ার অবস্থিতির সংবাদ দিয়েছেন শামসুর রাহমান তাঁর 'স্মৃতির শহর ঢাকা' গ্রন্থে। একটি প্রাচীন দলিলে দেখা গেছে পোগোজ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এন. পি পোগোজের আবাসিক গৃহ 'সুধাময় হাউস' (বর্তমানে আর্মানিটোলার আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসীর কার্যালয়)-এর পার্শ্বে উত্তর কোণে একটি আড়গাড়া বা অশ্বশালা ছিল। এই আড়গাড়ার মালিক পোগোজ সাহেব ছিলেন কিনা সে তথ্য জানা যায় নি। সেকালে ঢাকার দেশী বা বিদেশী অনেক ঘোড়ারই মালিক ছিলেন ঢাকা শহরের গণ্যমান্য লোকজন বা নওয়াব বাড়ির সদস্য। এসব ঘোড়া রাখা বা তত্ত্বধানের জন্য ছিল তাঁদের নিজস্ব আড়গাড়া। এসব আড়গাড়ায় ঘোড়ার দেখাশুনার জন্য নিয়োজিত ছিল অশ্বপালক বা সহিস। সহিস শব্দটি এসেছে আরবী 'সাইস' থেকে। হয়তো বিশ্বখ্যাত আরবি ঘোড়ার পাশাপাশি সহিস শব্দটিও বাংলায় চলে এসেছে।

সহিসের ছিল নানাবিধ দায়িত্ব। নিয়মিত ঘাস-বিচালি খাওয়ানো ছাড়াও তারা সকাল বিকাল ঘোড়ার গায়ে খড় দিয়ে ঘষে-মেজে, ঘোড়ার শরীরকে মসৃণ ও সুন্দর করে তুলত। ঘোড়াকে গোসল করিয়ে এই সহিস কয়েক পাক হাঁটিয়ে নিয়ে আসত। ঘোড়ার ক্ষুরে যথাসময়ে লোহার নাল লাগানো ছিল তাদের অন্যতম কাজ। অবশ্য পেশাদার কামার দিয়েও একাজ করানো যেতো। আড়গাড়ায় স্বতন্ত্র সহিস না থাকলে কোচোয়ানরাই এসব দায়িত্ব পালন করতো। আড়গাড়ার ঘোড়ার সঙ্গে কোচোয়ান বা সহিসদের আদর সোহাগের সম্পর্ক ছিল। অতি আদরে মাতাল অবস্থায় এরা ঘোড়াকে চুমু খেতে গিয়ে ঘোড়ার লাথিও হজম করেছে, দেখা গেছে।

ঢাকায় ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল আরেক শ্রেণীর পেশাজীবী পেশাদার অশ্বারোহী বা 'জকি' (jockey)। ঘোড়দৌড়ের মহড়ায় অথবা চূড়ান্ত ঘোড়দৌড়ের সময় এদের নানা রংয়ের পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঘোড়া দৌড়াতে দেখা যেত। এদের পিঠে ও থাকত এক বিশেষ নম্বর-চিহ্ন।

ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে জড়িত ছিল আরেকদল ফেরিওয়ালা। তারা ঘোড়দৌড়ের আগে প্রস্তুত ছোট্ট আকারের পুস্তিকা ফেরি করে বিক্রি করতো। শনিবারের ঘোড়দৌড়ের রেসটিপ-হকাররা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে এই পুস্তিকা ঘোড়দৌড়ের দু'তিন দিন আগে থেকেই ফেরি করে বেড়াত। চিৎকার করে, অনেকটা সুর করেও, হাঁকতো রেস্‌টিপ (Race-Tips)। এতে থাকত ঘোড়দৌড়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার তালিকা, ঘোড়ার জকি হবে কে, তার নাম এবং সম্ভাব্য বিজয়ীর ইঙ্গিত। ঘোড়দৌড়ে বাজি রাখার আগ্রহীরা রেসের দিন কাড়াকাড়ি করে কিনতো রেসটিপ। কোন ঘোড়া বিজয়ী হবে এ নিয়ে রেসের

কয়েকদিন আগে থেকেই চলতো জল্পনা-কল্পনা। আর এ জল্পনা-কল্পনার সহায়ক ছিল তাদের হাতের 'রেসটিপ'। যারা 'রেইস' খেলতে যেতো তাদের কাছে বিশেষ সহায়ক ছিল এই রেসটিপ।

ঢাকা ঘোড়দৌড় পরিচালনা করতো ঢাকা জিমখানা ক্লাব। তারা একটি রেসটিপ প্রকাশ করতো। বহুল পরিচিত আর একটি রেসটিপ ছিল 'চাঁন মিয়া সাহেবের রেসটিপ'। এই চাঁন মিয়া সাহেব ঢাকা পৌরসভার একবার কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ঘোড়দৌড় স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও রমনার রেস্‌কোর্সে (পরবর্তী নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) দীর্ঘকাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল চারপাশের কাঠের রেলিং। এককালে সেই কাঠের রেলিংও তুলে ফেলা হলো। জকিরা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেল। আর জনসমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল অনন্যসাধারণ রেসটিপ ফেরি-ওয়ালারা।

মিরাসী বা মিরাসান

ঢাকায় সেকালে 'মিরাসী' বা 'মিরাসান' নামেও একদল গায়িকা ছিল, যারা ঢাক-ঢোল নিয়ে অন্দর মহলে গান পরিবেশন করতো। এরা বংশানুক্রমে এই পেশা গ্রহণ করতো (ফারসি 'মিরাসি' শব্দের অর্থ বংশানুক্রমে বা উত্তরাধিকার সূত্রে)। মিরাসিরা প্রধানত বিয়ে উপলক্ষে অথবা 'নাক ছেদানী', 'কান ছেদানী' ও 'খাৎনা' অনুষ্ঠানে গান-বাজনা করতো। এদের গান-বাজনা মেয়ে-মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জেমস্ ওয়াইজের মতে, এরা সাধারণত দরিদ্র বিধবা, কখনো নাচে না, তবে মাঝে মাঝে সং সাজে। জীবন যাপনে এরা বেশ মর্যাদাবান।[৩৮] বিনোদনের প্রয়োজনে তারা পুরুষের বেশেও গান করতো বা বিশেষ অঙ্গভঙ্গী করতো। তাদের গানের অনুষ্ঠানে ছেলে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

একালে 'মিরাসি' বা 'মিরাসান'-দের দেখা পাওয়া না গেলেও এদের জায়গা দখল করে নিয়েছে হিজড়ারা। হিজড়ারা বিশেষ অনুষ্ঠান বা উপলক্ষে মেয়েমহল বা পুরুষ-সমাবেশে নির্বিশেষে নাচ-গান করে থাকে।

বায়োস্কোপওয়ালা

ঢাকা টেলিভিশনের প্রচলন বা সিনেমা হলের প্রসার যখন ছিল না, তখন বিরাট এক বাক্স কাঁধে নিয়ে একদল ফেরিওয়ালা শহরের অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াত আর চিৎকার করত 'বায়োস্কাপ-ওয়ালা'। তার চিৎকার শুনে পাড়ার ছেলে-মেয়েরা দৌড়ে যেত বায়োস্কাপ-ওয়ালার কাছে। দর্শনীর বিনিময়ে তারা বাক্সের তিনদিকে চার পাঁচটা গোলাকার জানালার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ঐ জানালার ভেতর দিয়েই দেখা যেত নানা দৃশ্যপট। কোনোটা তাজমহলের ছবি, আবার কোনোটা হরিণ বা বাঘের ছবি। বাক্সওয়ালা হাতে ডুগডুগি বাজিয়ে নূপুর পায়ে তালে তালে নাচত। এক হাতে সে

১. জেমস্ ওয়াইজ-'পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ', ১ম ভাগ, অনুবাদ, পৃঃ ১১০।

বায়োস্কোপের সূতা নেড়ে নেড়ে ছবি বা চিত্রপট পরিবর্তন করত আর সুরে সুরে গাইত। – 'এই দেখ তাজমহল এই দেখ কুতুবমিনার'।

বাল্যকালে ঢাকার অলি-গলিতে বা কোন মেলায় এই বায়োস্কোপওয়ালার বাক্সে নানা চিত্র যারা দেখেছেন, তারা গোলাকার আতশ কাচের ভেতর দিয়ে দেখার সেই পুলক ও শিহরণ আজও অনুভব করতে পারবেন।

কালের বিবর্তনে টিভিতেই হোক বা প্রেক্ষাগৃহে হোক, বায়োস্কোপ আজ কত সুলভ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে বায়োস্কোপওয়ালা ও তার বাক্স। তবে কোনো কোনো বায়োস্কোপওয়ালা তার পুরানো পেশার ঐতিহ্য রক্ষা করে গ্রামেগঞ্জে কখনো কখনো বায়োস্কোপের ডালি নিয়ে বসে।

কাবুলিওয়ালা

কাবুলিওয়ালা বলতে আমরা বুঝি আফগানিস্তানের বা কাবুলের অধিবাসী। ঢাকায় আমরা এককালে যে কাবুলিওয়ালা দেখেছি তাদের জন্ম কাবুল বা আফগানিস্তানের কোনো এক অঞ্চলে হলেও তারা সুদূর বাংলায় এসেছিল জীবিকারই অন্বেষণে। বিশাল দেহ, মাথায় লম্বা পাগড়ী, কাঁধে বিরাট ঝোলা আর পায়ে কাবুলি জুতা। এই কাবুলিকে দেখে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের 'মিনি'-র ন্যায় ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় পাওয়া বিচিত্র কিছুই নয়। বহুল-পরিচিত কিশোর পাঠ্য গ্রন্থ 'ডাইনী বুড়ি' গ্রন্থ যারা পড়েছে তারাতো ভয় পাবেই। কারণ 'ডাইনী বুড়ি' গল্পে লেখা ছিল ডাইনীরা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে পেলে পিঠের ঝোলায় ভরে নিয়ে যায়। সুতরাং কাবুলিওয়ালার আর দোষ কি?

কাবুলিওয়ালাদের ঝোলায় থাকতো তাদের পণ্যদ্রব্য। কাবুল বা পেশোয়ার থেকে আনা নানা রকমের ফল ছিল তাদের প্রধান পসরা। কাবুলিওয়ালারা এই ফল-ফলাদিকে বলতো মেওয়া। তাই তাদের আরেক নাম ছিল 'মেওয়া-ওয়ালা'। শুধু তাই নয়, তারা 'হিংওয়ালা' নামেও পরিচিত ছিল। কারণ তারা ব্যঞ্জনের মসলারূপে ব্যবহৃত হিং নামের একজাতীয় কটু গন্ধময় নির্যাস বিক্রি করতো। গৃহিণীদের কাছে এর বিশেষ চাহিদা ছিল। এছাড়াও তারা সুরমা বিক্রি করতো। পেস্তা-বাদাম, কিশমিশ, মনক্কা, আখরোট, হিং ইত্যাদি ওজন-দরে বিক্রি করতো, সেজন্য তাদের সঙ্গে থাকতো ছোট আকারের নিক্তি।

ঢাকায় এরা আসত দলবেঁধে এবং ঢাকারই কোনো এক অঞ্চলে ঘর ভাড়া করে এরা থাকতো। ত্রিশ-চল্লিশের দশকে বংশাল অঞ্চলে এদের একসঙ্গে থাকতে দেখা গেছে। কাবুলিওয়ালাদের আর একটি অলিখিত পেশা বা জীবিকা ছিল, তা হচ্ছে সুদে টাকা ধার দেয়ার ব্যবসা। কুসিদজীবী হিসেবে তাদের আইন-সঙ্গত স্বীকৃতি না থাকায় এরা টাকা ধার দিতে বা টাকা ফেরত নিতে সন্ধ্যার অন্ধকারেই সক্রিয় হতো।

কাবুলিওয়ালাদের হাতের লাঠির ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শুনলেই ঋণ-গ্রহীতার হৃদ-কম্পন শুরু হয়ে যেত।

কাবুলিওয়ালারা তাদের মাতৃভূমিতে পরিবার পরিজন রেখে এসে এখানে অনেকটা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতো। তারা নিজেদের ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই বুঝতো না। তবে

এই প্রবাস জীবনের মধ্যেও তারা আপন সংস্কৃতিকে ভুলে থাকতে পারেনি। তাই ঢাকায় ঈদ্-উল্-ফিতর অথবা ঈদোজ্জোহায় দেখা গেছে পল্টন ময়দানে জড়ো হয়ে তাদের ঢোলের তালে তালে রঙ্গিন রুমাল উড়িয়ে কাবুলি নাচ নাচতে। আশেপাশের দর্শক তাদের এই নৃত্য দেখে বিমোহিত হতো সন্দেহ নেই। আর কাবুলিওয়ালারা এই প্রবাসে এসেও যে আপন সংস্কৃতিকে ভুলতে পারেনি এই আত্মতৃপ্তি নিয়েই ঘরে ফিরতো।

পঞ্চাশ বা ষাটের দশক পর্যন্ত ঢাকায় কাবুলিওয়ালাদের দেখা পাওয়া গেলেও ততদিনে তাদের হিং বা মেওয়া বিক্রির জীবিকা ক্রমে লোপ পেয়েছে। কালের বিবর্তনে তারাও এ দেশ ছেড়ে চলে যায়।

আমরা এখানে ঢাকায় কয়েকটি লুপ্ত জীবিকা তুলে ধরলাম। মানুষের রুচি বদলে গেছে, প্রযুক্তির নানা উন্নয়ন হচ্ছে; পণ্যের বিকল্প নির্মিত হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই পুরাণো অনেক জীবিকা লোপ পেয়ে গেছে, অনেক নতুন বা বিকল্প জীবিকাও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এটাইতো স্বাভাবিক যে, পুরানো ঢাকার চালচিত্র এভাবেই বদলে যাবে।

সেকালের ঢাকা : বিনোদন

প্রায় চারশো বছর আগে মুঘল আমলে ঢাকায় বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা কত বিশেষণেই না বিভূষিত হয়েছে। ব্রাড্‌লি বার্ট বলেছেন 'রহস্য-নগরী ঢাকা',। উর্দু কবি খালিদ বাঙালি ঢাকার বন্দনা-গীতিতে সম্বোধন করেছেন– 'হে পুষ্পনগরী ঢাকা, প্রাচ্যের তুমি যে হৃদয়' ('পূরব কি জান হায় তু, এ্যায় গুল-জমিনে ঢাকা')। কেউ বলেছেন 'বায়ান্ন বাজার ও তেপান্ন গলি'র শহর ঢাকা, কেউ বা হয়তো আখ্যায়িত করেছেন– 'কিংবদন্তির ঢাকা'। প্রকৃতই ঢাকাকে নিয়ে কত কাহিনী, কত ইতিহাস, কত কিংবদন্তি। সে ইতিহাসে একদিকে যেমন রয়েছে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কত কথা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না ও আনন্দ বেদনার বিচিত্র সমারোহ।

মানুষ মাত্রেই আনন্দের পিয়াসী। দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিকতার মধ্যে যখন সে কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না, তখনই সে বাইরের জীবনের আনন্দ, প্রমোদ বা বিনোদনের সন্ধান করে। সাধারণ মানুষ সে মুঘল আমলেই হোক অথবা ব্রিটিশ আমলেই হোক, বিনোদন খুঁজে পেয়েছে আপন লোক-সংস্কৃতিতে। পর্ব-পার্বনের মেলা, জারি-মাদারের গান, পালাগান, যাত্রাগান, নানা রকমের লোকনৃত্য ইত্যাদি কর্মক্লান্ত মানুষের জীবনে ক্ষণিকের জন্য হলেও এনে দিত আনন্দের শিহরণ।

মুঘল আমল থেকেই আমরা দেখি, নায়েব-নাজিম, রাজা-মহারাজা বা জমিদারদের বিলাস-বৈভব ছিল ভিন্ন এবং তাদের আমোদ-প্রমোদের জগৎ ও জীবন ছিল ভিন্ন প্রকৃতির।

ঢাকায় দরবারী নৃত্যের ঐতিহ্য স্বয়ং ইসলাম খানই প্রথম প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক শার্লীমানের বরাত দিয়ে হাকীম হাবীবুর রহমান লিখেছেন যে, ইসলাম খানের দরবারে প্রায় ১২ শত 'কাঞ্চনী' অর্থাৎ 'স্বর্ণময়ী নর্তকী' বহাল ছিল। এদের কাজ ছিল গান গেয়ে বা নেচে দরবারের সকলের চিত্ত বিনোদন করা। পর্যটক ইবনে বতুতাও বলেছেন, বাংলায়, বিশেষ করে ঢাকায় খুব কম মূল্যে ক্রীতদাসী পাওয়া যেতো, যারা ফার্সী গজল খুব ভালো গাইতে পারতেন। হাকীম হাবীবুর রহমানের 'ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে' গ্রন্থের অনুবাদক হাশেম সুফি তাঁর টীকায় 'মসিরুল উমরা' গ্রন্থের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, ইসলাম খান সরকারি তহবিল থেকে ১২০০ কাঞ্চনীর জন্য ৮০ হাজার টাকা খরচ করতেন।

পরবর্তীকালে এই কাঞ্চনীদের উত্তরসূরী বাঈজীরা রাজা-উজীর, নবাব-মহারাজা ও জমিদার সম্প্রদায়ের বিনোদনের উপাদান যোগাতো। বাঈজীরা ঘরোয়া মজলিশে, রঙ্গমহলে. বাগানবাড়িতে বা বজরায় নাচ-গান করতো। ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে এরা আসতো। ঢাকায় অনেকে স্থায়ীভাবে থাকতেও শুরু করে এবং তার ফলে বাঈজী পাড়াও গড়ে উঠে। বলা হয়ে থাকে, উনিশ শতকে ঢাকার নবাব নুসরাত জঙ্গ, নবাব শামসুদ্দৌলা, নবাব কমরদ্দৌলা, নবাব আবদুল গনি ও নবাব আহসানউল্লাহর সময় বাঈজীদের নাচ

গান উত্তুঙ্গতা লাভ করে। নবাব আবদুল গনির এক মজলিশে লাক্ষ্ণৌ থেকে বেগম মুশতরী বাঈজী ও কলকাতা থেকে কয়েকজন বাঈজী আসে এবং ১৬ দিন ধরে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করে।

নবাব আবদুল গনির বাসভবনে প্রাভাতিক চায়ের আসরে, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশ গ্রহণ করতেন এবং সেখানে শহরের নাম করা বাঈজীরা উপস্থিত থাকতো। এই বাঈজীরা নবাব সাহেবের সরকার থেকে বেতনাদি লাভ করতো। হাকীম হাবীবুর রহমান এ-রকম তিনজন বাঈজীর নামোল্লেখ করেছেন– আন্নুবাঈ, গান্নুবাঈ এবং নওয়াবীন। হাবীবুর রহমানের বিবরণীতে ঢাকার আরো কয়েকজন বাঈজীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন— এলাহীজান, পীয়ারী বাঈ, আবেদী বাঈ, আচ্ছি বাঈ, লক্ষ্মীবাঈ, কালীবাঈ, রাজলক্ষ্মী, অতুলবাঈ, ইমামীবাঈ, পান্নবাঈ, জমরুদবাঈ, বাতানীবাঈ, ওয়াযুবাঈ এবং আমীর জান প্রমুখ। এদের মধ্যে অনেকে সমাজসেবায়ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ঢাকায় পানি-সরবরাহ প্রকল্পে আমীরজান কিছু অর্থসাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু আবদুল গনি তা' গ্রহণ করেননি। রাজলক্ষ্মী বাঈ জিন্দাবাহারের একটি কালীমন্দির নির্মাণে অর্থব্যয় করে।[১] আন্নুবাঈ, গান্নবাঈ এবং নওয়াবীন ভগিনী-ত্রয় পরবর্তীকালে ঢাকার রঙ্গমঞ্চে 'ইন্দ্রসভা' নামের নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং নিজেরাও অভিনয়ে সক্রিয় অংশ নেন।[২] এই প্রথম ঢাকার রঙ্গমঞ্চে মহিলাদের অবতরণ। নাচ ও গানের জলসায় আমরা বাঈজীদের বিশেষ ভূমিকাই দেখিনি, বাংলা সাহিত্যেও অনেক বাঈজী-চরিত্রের আবির্ভাব লক্ষ করা যায়।

নাচের জলসায় গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই শুধু উপস্থিত থাকতেন না, সেখানে ইংরেজ রাজ-কর্মচারীদের উপস্থিতিও ছিল। ইংরেজ রাজ-কর্মচারী, যাঁরা এখানে অবস্থান করতেন তাঁদের সমাজেও নৃত্যগীতের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তবে, তা একান্তভাবেই তাঁদের সংস্কৃতির অঙ্গ-বিশেষ।

বহিরাঙ্গনেও তাঁরা বিনোদনের উপাদান খুঁজে নিয়েছিলেন। কাহিনীকাব্য বা কিংবদন্তীতে দেখেছি, অবসর-বিনোদনের জন্য রাজ-রাজড়ারা শিকার অভিযানে বেরোতেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখি রাজা-মহারাজা বা নবাব বাদশাহ্দের বিনোদনের একটি প্রধান মাধ্যম ছিল এই শিকারের শখ।

ইংরেজ রাজকর্মচারীরাও এদেশে এসে এই শিকারের নেশায় মেতে উঠতেন। ১৭৭৩ সালে কোম্পানি আমলে ঢাকা কুঠির এক কর্মকর্তা রবার্ট লিন্ডসের বিবরণীতে এবং উনিশ শতকে আর্থার লয়েড ক্লে-র ডায়েরিতে আমরা ঢাকার উপকণ্ঠে পশু শিকারের বর্ণনা পাই। ক্লে ১৮৬৬'র ১১ মে নবাব আবদুল গণির কাছ থেকে কয়েকটি হাতি যোগাড় করে নিয়ে ঢাকা শহরের উত্তর দিকের জঙ্গলে বন্য শুকর শিকারে গিয়েছিলেন। উনিশ শতকেই শুধু নয়, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও জমিদারদের বাঘ বা হরিণ শিকারের কথা কিংবদন্তির মতো শোনা যায়। শিকারের পর বাঘের চামড়া, হরিণের শিং ও চামড়া

১. হাকীম হাবীবুর রহমান– ঢাকা পাচাশ বারাস পাহলে, হাশেম সুফি সম্পাদিত। পৃঃ ১২৯।
২. শিশির কুমার বসাক-ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস, 'আজাদ সাহিত্য মজলিশ', দৈনিক আজাদ ১০-১০-১৯৬৪।

বৈঠকখানায় প্রদর্শন করে তাঁরা বিশেষ গর্ববোধ করতেন।

ঢাকায় আমোদ-প্রমোদের আর একটি মাধ্যম ছিল মোরগের লড়াই বা পাখির লড়াই। কোম্পানি আমল থেকেই এদেশে এটি একটি জনপ্রিয় শখ বলে গণ্য হয়ে এসেছে। প্রধানত বিত্তশালীরা ছিলেন এর উদ্যোক্তা। তাই একে অনেকেই বলত 'শাহী শখ'। টেইলারের গ্রন্থে বলা হয়েছে– 'চন্দ্রালোকে নৌকাবাইচ ছিল লোকদের অন্যতম আমোদ-প্রমোদ।

ঢাকায় ইংরেজ সিভিলিয়ানরা বিনোদনের আরও একটি মাধ্যম খুঁজে পেয়েছিল পোলো খেলায়। ১৮৬৭ সালের ৩ এপ্রিল ঢাকায় প্রথম পোলো খেলা চালু হয়। রমনার রেসকোর্সের বটগাছের নিচে বসে সাহেব এবং মেম সাহেবরা এই পোলো খেলা উপভোগ করতেন। বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত এলাকাটি ছিল তখনকার রেসকোর্স বা ঘোড়-দৌড়ের মাঠ।

ঢাকায় ১৮২৫ সালের দিকে তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ডস্ ঢাকায় ঘোড়দৌড় প্রবর্তন করেন। ঢাকার নবাব গনির সময় উনিশ শতকের ষাটের দশকে এটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এখানে বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত এই ঘোড়দৌড় চালু ছিল। ১৮৬৪ সালের "ঢাকা প্রকাশ"- এ প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, সেকালে সপ্তাহে চারদিন ঘোড়দৌড়ের বাজি হতো। এ উপলক্ষে অফিস আদালতও বন্ধ থাকত। শনিবার একেবারেই বন্ধ এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে অর্ধবেলা বন্ধ। ঘোড়দৌড়ের এই বাজি খেলায় ঢাকার বহু দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত লোকেরা সর্বস্বান্ত হয়েছে। তাই এই ঘোড়দৌড় খেলা ইংরেজ সাহেব-সুবাদের কাছে ছিল অবসর-বিনোদন, আর নিরীহ ও নিঃস্ব ঢাকাবাসীদের কাছে তা ছিল ভাগ্যবিড়ম্বনা। এ যেন অনেকটা 'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'।

আমরা এ পর্যন্ত রাজা, জমিদার বা উচ্চবিত্তদের বিনোদনের কথা বললাম। প্রকৃতপক্ষে এ সব আমোদ-প্রমোদ প্রক্রিয়া একান্তই ছিল তাঁদের নিজস্ব, তাতে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তদের কোনও ভূমিকা ছিল না। তারা ছিল একান্তই যোগানদার বা আজ্ঞাবহ। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, সাধারণ মানুষ সর্বদাই বিনোদন খুঁজে পেয়েছে তাদের লোকসংস্কৃতিতে। তাদের অংশগ্রহণ বা পৃষ্ঠপোষকতায় লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্য বা লোকনাট্যের ধারা প্রবহমান রয়েছে। হাকীম হাবীবুর রহমানের রচনায় আমরা জানতে পারি, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় ঘাটু গানের বিশেষ প্রচলন ছিল। তিনি সেকালের ঘাটু গানের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন।

"যতদূর জানা যায়, ঘাটু গান হলো কোনো সুন্দর বালককে গান বা নাচের তালিম দেয়া, ঠুংরি এবং গজল মুখস্থ করানো, ওস্তাদদের গান এবং স্থানীয় কবিদের গান শেখানো। বেশির ভাগ মুসলিমরাই এর অনুরাগী ছিল এবং অধিকাংশ মহল্লাবাসীদের মধ্যে দলভিত্তিতে প্রতিযোগিতা থাকত। প্রথমত কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি বালককে কাঁধে বসিয়ে নিত। সন্ধ্যায় বড় জমায়েত থাকত, যারা কাঁসর বাজাত এবং তাদের মধ্যে দু'একজনের ঢোল থাকত। মেয়েদের পোশাক ও গহনায় সজ্জিত বালক গান গাইত এবং গানের সঙ্গে সঙ্গে বলে যেত এটা শুরু। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বালক অনুরূপভাবে তার জবাব দিত। তারপর বালকদের মাটিতে নামিয়ে দেয়া হতো। অতঃপর নাচও শুরু হয়ে যেত। দর্শকরা

চতুর্দিকে থাকত এবং প্রশংসা করে উৎসাহ দিত। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অধিকাংশই মারামারিতে সমাপ্তি লাভ করত। যাতে গরিব গায়ক বেশি মার খেত অথবা তাকে অন্য দল জোর করে 'মালে গণিমতে'র মতো ছিনিয়ে নিয়ে যেত এবং এটাই এর শেষ। সাধারণ জনতাই এই শখের অনুরক্ত ছিল এবং বংশীয় ভদ্রলোকেরা এর থেকে দূরে দূরে থাকতেন। (মোঃ রেজাউল করিম অনূদিত)"।

সেকালের ঢাকায় খেমটা নাচেরও বিশেষ প্রচলন ছিল। এ নৃত্য একক নৃত্য নয়। জোড় বেঁধে নারী অথবা নারীর রূপসজ্জায় কিশোর বা যুবকেরা খেমটা নাচ পরিবেশন করত। উনিশ শতকে এ নাচের বিশেষ প্রসার ঘটে। বলা হয়ে থাকে, 'খেমটা নাচে নিতম্ব ও কোমরের কাজ আদিরসাত্মক হলেও তা চমৎকার ছন্দনৈপুণ্যে ভরপুর'(বাঙলা নাট্যকোষ-সেলিম আল্‌দীন)। এ নাচের তুলনায় বাঈজী নাচ ছিল সংযত, রুচিসম্পন্ন এবং আভিজাত্যবোধের পরিচায়ক।

ঢাকায় সেকালে 'মিরাসী' বা 'মিরাসন' নামেও একদল গায়িকা ছিল, যারা ঢাকঢোল নিয়ে অন্দরমহলে গান পরিবেশন করত। এরা প্রধানত বিয়ে উপলক্ষে, 'নাক ছেদানী', 'কান ছেদানী' ও 'খৎনা' অনুষ্ঠানে গান-বাজনা করত। এদের গান-বাজনা মেয়ে মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঢাকাবাসীদের বিনোদনের আর একটি মাধ্যম ছিল কাওয়ালী গান। এ গানের ভাষা ছিল উর্দু। নজরুল ইসলামই প্রথম বাংলা ভাষায় কাওয়ালী গান রচনা করে বাংলা কাওয়ালী গানকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সেকালে সামিয়ানা টাঙিয়ে সারা রাত ধরে ওই কাওয়ালী গানের আসর বসত। ঢাকাই রসিকতার গল্পেও এই কাওয়ালী গানের অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। মুরগি ঝিমাচ্ছে দেখে ক্রেতার অভিযোগে বিক্রেতারও সরাসরি উত্তর --- 'গতকাল সারা রাত ধরে মুরগি কাওয়ালী শুনেছে বলে এখন ঝিমাচ্ছে'। ঢাকার সংস্কৃতিতে কাওয়ালী গানের বিশেষ স্থান ছিল বলেই লক্ষ করা যায়, চল্লিশের দশকে ফজলুল হক হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সাহিত্য সভায়ও কাওয়ালী গানের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় কায়কোবাদ ও সৈয়দ এমদাদ আলী প্রধান অতিথি ছিলেন।

ঢাকা প্রাচীনকাল থেকেই সঙ্গীতচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। সে কারণেই হাকীম হাবিবুর রহমান ঢাকাবাসীদের সঙ্গীতানুরাগ প্রসঙ্গে বলেছেন–

"এটা একটা বাস্তব সত্য যে, ঢাকাইয়ারা অনেক সঙ্গীত রসিক। বলা হয়ে থাকে যে, যেভাবে লাখ্‌নৌর সাধারণ লোকেরা লয় ও সুরের পার্থক্য বুঝে সে রকম ঢাকাইয়ারাও কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই বিশেষভাবে তাল নির্ণয় করতে পারে। জনসাধারণের মধ্যেও এই বোধশক্তি দেখা যায় যে, তারা যে কোনো পরিস্থিতিতেই রাগ-রাগিনী সম্পর্কে দ্বিধাহীনভাবে সঠিক মত প্রকাশ করতে পারে"।[৩]

কিন্তু কালক্রমে ঢাকায় ধ্রুপদী সঙ্গীতের কদর কমে যায়। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কথা বলতে গিয়ে হাকীম হাবীবুর রহমান দুঃখের সঙ্গেই বলেন– "সমাজ বদলাতে বদলাতে কি থেকে কি হয়ে গেল। স্কুলসমূহে সঙ্গীতবিদ্যা পাঠ্য তালিকার

৩. হাকীম হাবীবুর রহমান- প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।

অন্তর্ভুক্ত হলো।" শুধু তাই নয়- "ঘরোয়া গানের আসরে একমাত্র ঢোল বাজান হতো, কিন্তু আজকাল হারমোনিয়ামও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। .... বাংলা যেখানে সঙ্গীতের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখত সেখানে এখন প্রাচীন সঙ্গীতের মান ক্রমে অবনতির দিকে যাচ্ছে।"[৪]

ঢাকার মঞ্চে নাট্যাভিনয় শুরু হওয়ার আগে, ঢাকাবাসীদের নাট্যপিপাসা কিছুটা নিবৃত্ত করত যাত্রার আসর। যাত্রার ঐতিহ্য অবশ্য বহু প্রাচীন। সাধারণ মানুষের তখন একমাত্র বিনোদন-মাধ্যম ছিল এই যাত্রা। সময়ের বিবর্তনে যাত্রায় রুচি-বিকৃতির প্রশ্রয় পাওয়ায় যাত্রার গৌরব হ্রাস পায় এবং শিক্ষিত সমাজ তা থেকে ক্রমে দূরে সরে আসে। সাধারণ মানুষ তখন মঞ্চে নাটক দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে।

লক্ষণীয় বিষয়, ১৮৬০ সাল ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ১৮৬০ সালেই ঢাকায় স্থাপিত হয় প্রথম বাংলা মুদ্রাযন্ত্র এবং প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'নীল দর্পণ' ও ঢাকার প্রথম সাময়িকপত্র 'কবিতা কুসুমাবলী'। অনুমান করা হয় যে, ১৮৬০ সালের দিকে ঢাকায় নাট্যচর্চা বা নাট্যাভিনয় শুরু হয়। ঢাকার নাট্যচর্চার ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা "পূর্ববঙ্গ-রঙ্গভূমি"কে কেন্দ্র করে।

বর্তমানে যেখানে জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত, 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' সেখানে স্থাপিত হয়েছিল। এর একপাশে ছিল 'মণ্ডি সাহেবের কুঠি' আর অন্যপাশে 'পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজ'। এই "পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি"র বাঁধা স্টেজে প্রথম যে নাট্যাভিনয়ের সংবাদ আমরা পাই, তা হচ্ছে ঢাকার নাট্যামোদী যুবকদের অভিনীত 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয়। পরবর্তীকালে এই রঙ্গমঞ্চে বহু নাটক অভিনীত হয়েছে, কখনও তা পেশাদার নাট্যসমাজের উদ্যোগে, আবার কখনওবা অপেশাদার শৌখিন নাট্যানুরাগীদের প্রচেষ্টায়। পেশাদার নাট্যসংস্থা কর্তৃক আয়োজিত নাট্যাভিনয়ে স্ত্রী-চরিত্রে মহিলারাই অভিনয় করতেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ঢাকায় তিনজন বাঈ (গন্নু বাঈ, আন্নু বাঈ এবং নয়াবীন) 'ইন্দ্রসভা' ও 'যাদুনগর' নামে দু'টি নাটকে অভিয়ন করেছিলেন। এ দু'টি নাটকই ছিল উর্দু নাটক। সেকালে ঢাকায় উর্দু নাটকের বেশ চল ছিল। সাধারণ সভায় বা রঙ্গমঞ্চে মহিলাদের অবতরণে বেশ কিছু সময় লেগেছে। এর জন্য দায়ী ছিল যেমন সামাজিক সংস্কার, তেমনি জনসাধারণের বিরোধিতাও অনেকাংশে দায়ী ছিল। তবে সংগোপনে মহিলাও যে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন না, তা নয়। এ বিষয়ে একটি তথ্য পাওয়া যায় ঃ

"বলধার জমিদার নগেন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে (বর্তমান বলধা গার্ডেন) প্রতিদিন তাঁর স্বরচিত যে সব শৃঙ্গার-রসাত্মক নাটিকার অভিনয় হতো সেখানে পুরুষ কিংবা নারী সব চরিত্রের অভিনয় মেয়েরাই করতো। নগেন্দ্র চৌধুরীর স্ব-নির্বাচিত অতিথি ব্যতীত অন্য কারোর সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না" (স্মৃতিকণা- অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসেইন)।

ঢাকায় ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে শান্তি নিকেতন থেকে কিছু ছাত্রছাত্রী এসেছিল নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। এ অভিনয়ের প্রতিবাদে ঢাকা

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩০।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ কয়েকজন সুধী ব্যক্তি এক বিবৃতি দেন। সে বিবৃতিটি ঢাকার স্থানীয় সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ'-এ প্রকাশিত হয়। সে প্রতিবাদপত্রে বিবৃত হয়-

> কৃতাঞ্জলিপুটে আমরা এই নিবেদন করি যে, আপনারা শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধা, নরনারী নির্বিশেষে উক্ত অনুষ্ঠান এবং এই শ্রেণীর যাবতীয় অনুষ্ঠানকে বর্জন করিবেন। ভদ্রঘরের মহিলারা পুরুষের সমক্ষে নৃত্য করিয়া অর্থোপার্জন করিবেন, এই অপমান যে বাঙালীর প্রাণ সহ্য করিতেছে তাহা দেখিয়া ও ভাবিয়া আমরা বিমূঢ় হইয়াছি। ঢাকাবাসী উক্ত অনুষ্ঠান বর্জ্জন করিয়া আত্মমর্যাদার পরিচয় প্রদান করুন, ইহা আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।"....

সেকালে শরৎকালে পূজা উপলক্ষে অথবা বারোয়ারী চাঁদায় গড়ে তোলা অস্থায়ী মঞ্চে নাটকের আয়োজন করা হতো। এ মঞ্চ তৈরী হতো স্কুল বা কলেজ প্রাঙ্গণে অথবা কোনো উন্মুক্ত মাঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল কর্তৃক আয়োজিত নাটক 'কার্জন হল মঞ্চে' অনুষ্ঠিত হতো।

বর্তমানে অবলুপ্ত মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট মঞ্চে বহুকাল ধরে নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা চলে এসেছিল। ১৯১৭ সালেও এটি 'ঠাটারি বাজার মিলনায়তন' বলে পরিচিত ছিল। নবাব পরিবারের ডায়েরীতে উল্লেখ আছে ১৯১৭ সালের ৭ আগষ্ট এই মিলনায়তনে 'যুদ্ধ (১ম বিশ্বযুদ্ধ) তহবিলে' অর্থ-যোগানের জন্য 'ম্যাজিক শো'র ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ঢাকার প্রগতি লেখক সঙ্ঘের আমন্ত্রণে কলকাতা থেকে বিজন ভট্টাচার্য তার নাট্যদল নিয়ে এসেছিলেন 'নবান্ন' নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য। নাটক মঞ্চস্থ করার উপযোগী মঞ্চ না থাকায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল সদরঘাটে রূপমহল সিনেমার উল্টোদিকে মেয়েদের স্কুলের এক মিলনায়তন মঞ্চে। নাটকে অভিনয় করেছিল শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি এবং আরো অনেকে।

সম্ভবত ১৯৫০-এর কোনো এক সময় 'শৌখিন' নৃত্যগোষ্ঠীর এক নৃত্যানুষ্ঠান ঢাকার 'রূপমহল' সিনেমার মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। বুলবুল চৌধুরী এসেছিলেন তাঁর নতুন গড়ে তোলা নৃত্য দল নিয়ে। সঙ্গে ছিল তাঁর স্ত্রী আফরোজা বুলবুল। অনুষ্ঠানটি ছিল কয়েকটি ছোট ছোট নৃতাভিনয়ের সমষ্টি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল– বিগত দুর্ভিক্ষের কাহিনী নির্ভর 'যেন আমরা ভুলে না যাই'। এছাড়াও ঐতিহ্য নির্ভর কয়েকটি নৃত্যও ছিল, যেমন– 'আনার কলি' ও 'হাফিজের স্বপ্ন' প্রভৃতি। ঢাকায় তখন কোনো রঙ্গমঞ্চ ছিল না। তাই স্বল্প-পরিসর সিনেমা হলের মঞ্চেই আয়োজিত হয়েছিল এই নৃত্যানুষ্ঠান।

১৯৫৬ সালের দিকে ঢাকায় 'বহুরূপী নাট্য–গোষ্ঠী' তাঁদের প্রযোজিত 'শাপমোচন' মঞ্চস্থ করার জন্য ঢাকায় আসে। আরমানিটোলার 'পিকচার হাউস' সিনেমা প্রেক্ষাগৃহের স্বল্পপরিসর মঞ্চেই তা মঞ্চায়ন করতে হয়। ঢাকার দর্শক মহলে এই নৃত্যানুষ্ঠান বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল।

সম্ভবত তার আগে বা পরে ঢাকায় এসেছিল এক চীনা নাট্যদল। তখনকার ঢাকা স্টেডিয়ামে বিরাট এক অস্থায়ী রঙ্গমঙ্গ ও গ্যালারি তৈরী হয়েছিল। সুন্দর ও অভিনব সেই নৃত্যানুষ্ঠান ঢাকাবাসীদের অনেকের স্মৃতিতেই আজও অম্লান হয়ে আছে। তাদের 'ড্রাগন নৃত্য', 'নৌকা নৃত্য', 'পাখা নৃত্য' অথবা 'ময়ূর নৃত্যে'-র চমক অবিস্মরণীয়। পরবর্তীকালে আমাদের দেশীয় নৃত্যেও এর প্রভাব লক্ষ্য করেছি। সমকালে চীনা নৃত্যগোষ্ঠীর নাচের মধ্যে জাগলারি বা জিমসন্যাস্টিকস্ (শারীরিক কসরত) প্রাধান্য পেয়েছে।

ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর এখানে অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ান নৃত্যগোষ্ঠীর এক নৃত্যানুষ্ঠান। প্রাচ্যের ধীর ও মন্থর নৃত্য-ভঙ্গির বিভিন্ন মুদ্রা উদ্ভাসিত হয়েছে অঙ্গুলী-হেলনে বা নয়ন-কটাক্ষে। তাদের নৃত্যে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি আমাদের পুঁথি সাহিত্যের চরিত্র 'আমির হামজা' ইন্দোনেশিয়ার একটি লোক নৃত্যেরও চরিত্র।

বহুকাল ধরেই আমাদের গ্রামে-গঞ্জে, মেলায় প্রধান আকর্ষণ হয়ে আছে আমাদের দেশীয় সার্কাস। ঢাকা শহরেও তারা মাঝে মাঝে এসেছে তাদের সার্কাস পার্টির বহর নিয়ে। নবাব পরিবারের ডায়েরীতে দেখা যায় ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার আরমানিটোলা মাঠে সার্কাসের তাঁবু এসে বসে। তবে পঞ্চাশের দশকে ঢাকার পল্টনে সুদূর মাদ্রাজ থেকে 'কমলা সার্কাস' নামে এক সার্কাস দল এসে ঘাঁটি গাড়ে। এতো আর গ্রাম্য সার্কাস পার্টি নয়; বিরাট এই সার্কাস দল এসেছিল নতুন প্রযুক্তি, বিপুল জনবল ও অনেক পশুপ্রাণী সঙ্গে নিয়ে। সার্কাসে বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই ছিল সুদৃশ্য পোশাকে সজ্জিত মহিলা। এই কমলা সার্কাস এত বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, তিন মাসের চুক্তিতে তারা প্রায় বছর খানিক এই বিনোদনের পস্‌রা সাজিয়ে রাখে।

প্রায় সমকালেই মার্কিন মুল্লুক থেকে আসে সার্কাসের মতই আরেক চমক নিয়ে 'সার্কারামা'। পল্টনের ময়দানে স্থাপিত হলো সার্কাসের তাঁবুর মতই বিরাট গোলাকার তাঁবু। তাঁবুর ভেতরে চারপাশে দর্শকদের আসন। মাঝখানে সিনেমার পর্দার মত গোলাকার বিরাট সাদাপর্দা। সিনেমার প্রজেক্টারের সাহায্যে যেমন পর্দায় ছবি ফুটে উঠে, তেমনি সার্কারামার পর্দায়ও ছবি ফুটে উঠলো, যা দর্শকরা চারদিক থেকে দেখতে পায়। পর্দায় প্রকাশ পেল আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের পথঘাট, উঁচু উঁচু দালান ও এবং বিচিত্র দৃশ্যপট। দর্শকদের মনে হচ্ছিল তারা যেন গাড়িতে বসে আমেরিকা দেখে বেড়াচ্ছে। চলচ্চিত্রের এই প্রযুক্তিগত কেরামতি বা কৌশল দেখে সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে বাড়ি ফেরে।

ঢাকায় বিনোদনেব জগতে নতুন যুগের সূচনা হয় সিনেমার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে। লক্ষণীয় বিষয় ভারতীয় উপমহাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের পথিকৃত ছিলেন হীরালাল সেন। তিনি ঢাকার জিন্দা বাহারের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরি গ্রামে। তাঁর পিতামহ ছিলেন গোকুল মুন্‌শী (সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেনের মাতামহ)। বলা হয়ে থাকে, ১৯০২-১৯০৫ সালের মধ্যে বগজুরিতে গোকুল মুন্‌শী স্থাপিত নাট মন্দিরে হীরালাল সেন চলচ্চিত্র প্রদর্শনের বিশেষ আয়োজন করেছিলেন।

পরবর্তীকালে ঢাকায় বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৯১৯-২২-এর মধ্যে ঢাকার আরমানিটোলায় একটি সিনেমা প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়, যা সেকালে 'পিকচার হাউস' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে তা 'শাবিস্তান' নামে আখ্যাত। এই ত্রিশের দশকেই ঢাকায় আরও কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহ প্রতিস্থিত হয় যেমন ঃ রূপমহল-১৯২৪, লায়ন-১৯২৭, মুকুল-১৯২৮-২৯।

সে সময় হিন্দি সিনেমার জনপ্রিয়তা তেমন বৃদ্ধি পায়নি, তাই এসব প্রেক্ষাগৃহে প্রধানত বাংলা ছায়াছবি প্রদর্শিত হতো। পরবর্তীকালে অবশ্য ম্যাটিনি শো এবং তারও পরে মর্ণিং শো'তে ইংরেজীতে ছবি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। বাংলা ছবিতে তখন প্রমথেশ বড়ুয়া ও কানন বালার যুগ চলছিল। সেকালে বাংলা ছবি এত জনপ্রিয় ছিল যে,

ঢাকাই গাড়োয়ানদের মুখেও মুখে শোনা যেত, কানন বালার সেই বিখ্যাত গান 'আমি বনফুল গো......'।

সেকালে ঢাকায় দৈনিক কোনো সংবাদপত্র ছিল না, যার বিজ্ঞাপনের পাতায় সিনেমার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হতে পারত। কোনো কোনো সাময়িকপত্রে অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটি সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখা যেত। বিজ্ঞাপনের প্রধান মাধ্যম ছিল, ব্যানারসহ ব্যান্ডপার্টির মিছিল, এই মিছিলে সিনেমার বিজ্ঞাপনের 'হ্যান্ডবিল' বিলি করা হতো। তাছাড়া, রাস্তার মোড়ে মোড়েও বিভিন্ন দালানের দেয়ালে সিনেমার পোস্টার শোভা পেত।

ঈদ উৎসবে সিনেমার প্রধান আকর্ষণ ছিল 'ফুল সিরিয়েল'। এটি ছিল এক টিকিটে সারারাত ধরে অনেক ছায়াছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা। 'ফুল সিরিয়েল' দেখার জন্য দর্শকদের ভিড়ের কমতি ছিল না। সারারাত ধরে যাত্রার পালা দেখে অথবা সারারাত ধরে কাওয়ালী শুনে অভ্যস্ত দর্শক বা তাদের উত্তরসূরিরা এই 'ফুল সিরিয়েল' দেখার সুযোগ হাতছাড়া করত না। মহিলারাও সিনেমা দেখায় কম আগ্রহী ছিল না। তাদের জন্য পর্দায় ঘেরা স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা ছিল। প্রেক্ষাগৃহের বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা অপসারণ করা হতো আর বাতি জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সেই পর্দা টেনে দেয়া হতো।

চল্লিশের দশকে বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঢাকায় দু'টি সিনেমা গৃহ নির্মিত হয়- 'নিউ প্যারাডাইজ' ও 'ব্রিটানিয়া'। এ দু'টি প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত ইংরেজী ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। রুচিসম্মত ইংরেজী ছবি প্রদর্শন করার কারণে প্রেক্ষাগৃহ দু'টি ছাত্র এবং শিক্ষিত ও রুচিসম্মত দর্শকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

সেকালে ঢাকার সিনেমা ছিল আপামর জনসাধারণের একমাত্র বিনোদনকেন্দ্র। বলা চলে বিনোদন তখন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে।

ঢাকায় একালে খাল-নালা ভরে যাচ্ছে, মাঠ ঘাটও লোপ পাচ্ছে। কিন্তু সেকালে মাঠের অভাব ছিল না, খেলাধূলার জায়গাও ছিল প্রচুর। সুযোগ ও জায়গা পেলেই ছেলেরা মেতে উঠতো লাটিম, মার্বেল বা ডাংগুলি খেলায়। স্কুলের ছাত্ররা উৎসাহী ছিল ফুটবল খেলায়। কোনো কোনো স্কুলে হকি বা ক্রিকেট খেলারও ব্যবস্থা ছিল। ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে আমেরিকান খেলা বেইস্‌বলের প্রচলন ছিল। একবার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল আর্মানিটোলা স্কুলে বেইস বল খেলা চালুর উদ্দেশ্যে খেলার সরঞ্জামাদি উপহার দিয়েছিল। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

ফুটবল বাঙালীর প্রিয় খেলা। জাতীয় খেলা বললেও ভুল হবে না। মহল্লার মাঠে বহুকাল আগে থেকেই ফুটবল খেলার প্রচলন হয়ে আসছে। ঢাকার নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে সেকালের খেলাধুলার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। নওয়াব বাড়ির নিজস্ব একটি ফুটবল ও হকি দল ছিল, তার নাম 'ব্যাচেলব ইউনিয়ন ক্লাব'। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে (১৯০৪-১৯১৬) পল্টন ময়দানে অথবা নিমতলীর মাঠে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অথবা প্রীতি খেলা ('ফ্রেন্ডলি ম্যাচ' নামে পরিচিত) অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। সেকালের ফুটবল বা হকি দলের কয়েকটি নাম আমরা সেখানে পেয়েছি। যেমন– ঢাকা কলেজ দল, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, আর্মেনিয়ান দল, ইস্টার্ন ক্লাব, ক্রিসেন্ট ক্লাব, কলেজিয়েট স্কুল দল, মনিপুরি পাড়ার দল, গুর্খা দল, ইউনিয়ন ক্লাব, জনসন ক্লাব এবং ফরিদাবাদ ফুটবল ক্লাব।

পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন ফুটবল ক্লাব ছিল, যারা অন্যান্য ক্লাবের সঙ্গে প্রীতি ফুটবল খেলার আয়োজন করতো। ঢাকা শহরে তখন লালবাগ কেল্লায় ছিল গোরা সৈন্যদের ঘাঁটি। এই গোরা সৈন্যদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিভিন্ন দলের প্রীতি ফুটবল খেলার ব্যবস্থা হতো। তারা বাইরে কোথাও খেলতে না গেলেও তাদের মাঠে আমন্ত্রণক্রমে বিভিন্ন মহল্লার ফুটবল দল খেলতে যেতো। বহুবার লালবাগ কেল্লার সেই মাঠে 'রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস্ সোসাইটি' দলের ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। একদিন এই প্রীতি ফুটবল খেলায় গোরা সৈন্যরা বেশ ফাউল করে খেলছিল। রেফারিও ছিলেন একজন ইংরেজ, তিনি এসব ফাউলকে ইচ্ছে করেই অগ্রাহ্য করে যান। রহমতগঞ্জ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। রেফারির কাছে প্রতিবাদ জানালেও তার কোনো ফল হয় না। প্রথমে বাদানুবাদ, পরে যখন হাতাহাতির উপক্রম হয়, তখন খেলা বন্ধ হয়ে যায়। রহমতগঞ্জ দলকে মাঠ থেকে বের করে দেয়া হয় এবং এই দলের সঙ্গে তারা আর খেলবেনা বলে জানিয়ে দেয়। ঔপনিবেশিক অহমিকায় খেলোয়াড়-সুলভ প্রীতি বা সৌহার্দ্য ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।

প্রীতি ফুটবল খেলার বাইরেও প্রচলিত ছিল কাপ বা শীল্ড প্রতিযোগিতা। নির্ধারিত এন্ট্রি ফি, ক্লাবের নিজস্ব ফান্ড অথবা কারো বদান্যতা নিয়ে এসব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট্স স্পোর্টিং এ্যাসোসিয়েশন বা ডি-এস-এ মাঠে অনুষ্ঠিত হতো রোনাল্ড্স শিল্ডের খেলা।

১৯৩৭ সালে এই ডি-এস-এ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এক চাঞ্চল্যকর প্রদর্শনী ফুটবল খেলা। এতে অংশ নেয় ইংল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত কোরিন্থিয়ান ফুটবল দল এবং ঢাকার ডি-এস-এ দল। এ খেলায় কোরিন্থিয়ান দল ঢাকার ডি-এস-এ দলের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে সফরে এসে এই দলের এটি ছিল একমাত্র পরাজয়।

টিনের ঘেরা-দেওয়া ও কাঠের গ্যালারিওয়ালা ডি-এস-এ মাঠও কালক্রমে লোপ পেল। নতুন এক আন্তর্জাতিকমানের স্টেডিয়াম স্থাপিত হলো ফুটবল, ক্রিকেট, এ্যাথলেটিক্স ইত্যাদি সব ধরনের খেলারই আয়োজন নিয়ে। ১৯৫৫ সালে এই স্টেডিয়াম স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় শুরু হলো নতুন এক ক্রীড়া-সংস্কৃতি, যাকে বলা চলে 'ক্রিকেট–কালচার'। মাঠের মাঝখানে খেলতে নামল ধবধবে সাদা পোশাকে সজ্জিত খেলোয়াড়বৃন্দ। মাঠের চারপাশে নানা শ্রেণীর মানুষ কয়েকদিন ধরে সারাদিন ভর বসে বসে সে খেলা দেখল। আর তাদের মুখে মুখে নতুন সব শব্দের খই ফুটতে লাগল– ওভার, উইকেট, আউট, লেগ বাই, বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি, গুগলি, চায়না ম্যান– আরও কত কি। মহিলারাও অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে খেলা দেখতে লাগলো। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। দর্শকরা জানল ও শিখল যে, খেলা দেখতে গেলে লাঞ্চ বক্স নিয়ে যেতে হয় অথবা কিছু কিনে খেতে হয়। এই খেলাকেই নাকি বার্নাড 'শ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন– এ এমনি খেলা যে, খেলোয়াড়রাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখে'। এ খেলা খেলতে বাংলাদেশ নামের নতুন এক দেশের খেলোয়াড়রা এখন দেশের বাইরে খেলতে যায়, বিজয়ও ছিনিয়ে আনে। আর এ খেলা ছড়িয়ে পড়েছে শুধু ঢাকা শহরে নয়; গ্রামেগঞ্জে, মাঠে-ময়দানে, অলিতে-গলিতে। বাড়ির প্রশস্ত উঠানও রূপান্তরিত হলো ছোটখাটো স্টেডিয়ামে।

ঢাকা স্টেডিয়ামেই (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম) এককালে আন্তর্জাতিক কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঢাকায় অবশ্য কুস্তি নবাগত ক্রীড়া ছিল না। সেকালে ঢাকার প্রায় মহল্লাতে ছিল কুস্তির আখড়া। সেখানে নামকরা পাহ্‌লোয়ান বা হবু পাহ্‌লোয়ান ব্যায়াম চর্চা এবং কুস্তির মহড়া দিত। নওয়াব বাড়ির তরুণদের মধ্যেও কুস্তির চর্চা ছিল। ১৯২৩ সালে নওয়াব বাড়ির ছেলেরা প্রদর্শনীর বিনিময়ে কুস্তি ল'ড়ে যে অর্থ আয় করে তা খিলাফত কমিটির তহবিলে জমা দেয়া হয়।

এ্যাথেলেটিক্‌স বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আকর্ষণও সেখানে কম ছিলনা। মহল্লার খেলার মাঠে চাঁদা তুলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনে অথবা স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উৎসবের এক মনোরম পরিবেশ ছিল। আয়োজক বা দর্শকদের উৎসাহের কমতি ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠই ছিল সবচেয়ে বড় মাঠ, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। আন্ত-স্কুল প্রতিযোগিতারও ভেন্যু ছিল এই মাঠ। সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা ছিল আহ্‌সানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কয়েকটি অভিনব আইটেম ছিল, যা দেখে সকল দর্শক প্রচুর আনন্দ লাভ করতো। যেমন– 'অবস্‌টাকল্‌ রেইস'-এ বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতার পথ পার হয়ে প্রতিযোগীরা কখনো 'পিপার' ভেতর দিয়ে পার হয়ে, কখনো বা রং-এর বস্তার ভেতরে ঢুকে সারাগায়ে রঙ মেখে দর্শকদের হাসির খোরাক যোগাতো। আরেকটি প্রতিযোগিতা ছিল সাইকেলে চড়ে কাচের চুড়ি সংগ্রহ। প্রতিযোগীরা সাইকেলে চড়ে লম্বা ছিপ হাতে মাঠে কয়েক চক্কর ঘুরে বিভিন্ন স্থানে অনেক উঁচুতে রাখা কাচের চুড়িগুলি ছিপ দিয়ে তুলে নিয়ে, সাইকেল থেকে মাটিতে পা না দিয়ে, প্রতিযোগিতা শেষ করতো। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আরো আকর্ষণ ছিল 'সাইকেল রেইস' ও 'মাইল রেইস'। এই দু'টি প্রতিযোগিতাই ছিল সর্ব-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত, অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের বাইরে অন্য যে কেউ এতে অংশগ্রহণ করতে পারতো।

ঐতিহ্য পরম্পরায় প্রচলিত ঢাকার আরেকটি খেলা হলো চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে ঘুড়ি উড়ানো। প্রায় একমাস ধরে চলে এই ঘুড়ি উড়ানো উৎসবের প্রস্তুতি ও আয়োজন। সহজেই যাতে ঘুড়ি কাটা-কাটিতে জয়ী হওয়া যায় তার জন্য কাচের গুঁড়ো দিয়ে সূতোর শক্তি বৃদ্ধি করা হতো। ঢাকাবাসীদের ভাষায় একে 'মাঞ্জা' বলা হয়। বিরাট হামান দিস্তায় কাচ গুঁড়ো করার প্রক্রিয়া চলতো অনেকদিন ধরে। খোলা মাঠে-ময়দানে চলতো ঘুড়ি উড়ানোর লড়াই বা 'হরিফি'। এই কাটা-কাটির খেলায় কোনো ঘুড়ি কাটা গেলে সবাই চিৎকার করে উঠতো 'ভা-কাট্‌টা' বা 'ভো-কাট্‌টা' বলে। শুধু মাঠেই বা খোলা জায়গাতেই নয়, বাড়ির ছাদেও নাটাই হাতে উঠে পড়ে সব বয়সের বালক, তরুণ। লাল, নীল, সবুজ ঘুড়িতে ঢাকার আকাশ ছেয়ে যায়। তবে খোলা ছাদে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে অনেকের আকস্মিক মৃত্যুও পরিবারে নিয়ে আসে শোকের ছায়া।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিনোদনের উপায়, প্রকৃতি ও পদ্ধতির বহু বিচিত্র রূপান্তর ঘটেছে। তবু সেকালে ঢাকার অধিবাসীদের বিনোদন ব্যবস্থা মানুষের জীবনে ক্ষণিকের জন্য হলেও এনে দিত স্বস্তির আশ্বাস, চিত্তের অনুরঞ্জন আর অপার আনন্দ। তাই সেকালের বিনোদন আজ ইতিহাসের উপাদান মাত্র।

সেকালের ঢাকার সংস্কৃতি-চর্চা

সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান নদীর ন্যায়। লক্ষ করা যায়, বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা কোনো না কোনো সংগঠনের প্রতিষ্ঠা এই প্রবহমান ধারায় গতি সঞ্চার করে এবং তখনই সংস্কৃতি-চর্চায় নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। উনিশ শতকে ঢাকায় এমনি এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল, তা হচ্ছে, ঢাকায় এখানে মুদ্রণযন্ত্র 'বাঙ্গালা যন্ত্র'-এর প্রতিষ্ঠা।

১৮৬০ সালে ব্রজসুন্দর মিত্র, ভগবানচন্দ্র বসু প্রমুখের প্রচেষ্টায় ঢাকায় 'বাঙ্গালা যন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা জানি, ১৭৭৮ সালে হুগলীতে প্রতিষ্ঠিত এক ছাপাখানায় ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত প্রথম বাংলা বই 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ দিয়ে বাংলা-গ্রন্থ-প্রকাশের দ্বারোদঘাটন হয়। ঢাকার সাহিত্য-চর্চার ইতিহাসে 'বাঙ্গালা যন্ত্র' প্রতিষ্ঠা অনুরূপ তাৎপর্যপুর্ণ ঘটনা। এই মুদ্রণযন্ত্রকে কেন্দ্র করে ঢাকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। ১৮৬০ সালে এই বাঙ্গালা যন্ত্রেই দীনবন্ধু মিত্রের যুগান্তকারী নাটক 'নীল দর্পণ' ছাপা হয়। এটি ঢাকায় মুদ্রিত প্রথম বাংলা বই। ঢাকার প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'কবিতা কুসুমাবলী' এ সময়ে (১৮৬০) মুদ্রিত হয়। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক'। প্রবীণ লেখক রাজনারায়ণ বসু কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারকে 'ঢাকাই কাপড়ের' ন্যায় উৎকৃষ্ট 'ঢাকাই কবি' আখ্যা দেন।[১]

১৮৬১ সালের মার্চ মাসে ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ' প্রকাশিত হলে এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকায় যে কয়েকজন সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তাঁদের মধ্যে আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– হরিশচন্দ্র মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরিহর নন্দী ও গোবিন্দচন্দ্র দাস। ১৮৭৫ সালে কবি নবীনচন্দ্র সেন দু'দিনের জন্য ঢাকায় এসেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেন- "এত শিক্ষিত ও সুসম্পন্ন লোক পূর্ববঙ্গের অন্য কোনো নগরে নাই।"[২] কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকাটি এ সময়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে এবং অনেকেই একে 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' বলে আখ্যায়িত করেন। ১২৮১ মাঘ সংখ্যা 'বান্ধবে' রবীন্দ্রনাথের 'হোক ভারতের জয়' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির শেষে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ নাম মুদ্রিত ছিল না, শুধু 'র' লেখা ছিল এবং পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়, হিন্দুমেলা উপলক্ষে কবিতাটি রচিত। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ-নামাঙ্কিত না হলেও তাঁর আদ্যক্ষর-চিহ্নিত এই কবিতা রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বনামে লিখিত কবিতা। এটি জনসমক্ষে পঠিত তাঁর প্রথম কবিতা।

'বান্ধব' পত্রিকায় বাংলার ইতিহাস ও বাঙ্গালি সংস্কৃতি বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ

১. 'ঢাকা প্রকাশ'- ১৫ মাঘ, ১৩২৩।

২. নবীনচন্দ্র সেন- 'আমার জীবন', বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ২৭০।

প্রকাশিত হয়। এ জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১. 'বঙ্গের ইতিবৃত্ত ঘটিত কথা', ২. 'প্রসিদ্ধ তিতুমীর', ৩. 'বঙ্গে দ্বাদশ ভৌমিক', ৪. 'রাজা কংস নারায়ণ', ৫. 'বাঙালীর সিংহল বিজয়', ৬. 'বঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা', ৭. 'দিনাজপুরের প্রস্তর স্তম্ভলিপি' ৮. 'বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন' এবং ৯. 'আহার ও বাঙ্গালী'।

'বান্ধব' পত্রিকার কালীপ্রসন্ন ঘোষকে কেন্দ্র করে ঢাকায় একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আড্ডা গড়ে ওঠে। এই আড্ডা অধিকাংশ সময় বসত 'বান্ধব' কার্যালয়ে সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাড়িতে। 'বান্ধব কুটির' নামে খ্যাত এই বাসভবনটি ছিল ঢাকার আর্মানিটোলার পূর্বদিকে। কখনও কখনও আড্ডা বসত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা আদালতের সাবজজ গঙ্গাচরণ সরকারের বাসভবনে। গঙ্গাচরণ সরকারের বাসভবনে কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছাড়াও আরও অনেকে সেই সাহিত্যিক সান্ধ্য আড্ডায় নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করতেন। 'বান্ধব' কার্যালয়ের সাহিত্যিক আড্ডায় কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গে যাঁদের বিশেষ সখ্য ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা-সম্পাদক পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, রামায়ণের অনুবাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, নটরাজ অমৃতলাল বসু, 'সাধারণী' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। "কালীপ্রসন্ন ঘোষের এই আড্ডার আকর্ষণ এত তীব্র ছিল যে, দীনবন্ধু মিত্র যে কয়দিন ঢাকায় ছিলেন প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দুই জনে এক স্থানে মিলিতেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গে আলাপ করে রাত্রি ১১টা-১২টা পর্যন্ত একত্র থাকতেন।"[৩]

অনুমান করা যায়, ঢাকার সাহিত্য অঙ্গনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ। তিনি ভাওয়াল রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করে জয়দেবপুর যাওয়ার পর 'বান্ধবের আড্ডা' ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তিনি জয়দেবপুরে অবস্থানকালেও সেখানে 'সাহিত্য সমালোচনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ 'কবি কাহিনী'র একটি বিস্তৃত সমালোচনা 'বান্ধব' পত্রিকায় (মাঘ, ১২৮৫) প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থের প্রথম প্রকাশিত সমালোচনা।

সেকালে কোনো নির্ধারিত বিষয়ে মনীষীদের বক্তৃতা প্রদান সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ ছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে 'শ্রুতি সুখকর মর্মস্পর্শিনী ভাষা'য় বক্তৃতা প্রদান করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর ন্যায় মওলানা আকরম খাঁ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ অনেকেই ঢাকায় বক্তৃতা প্রদান করে তাঁদের বিশেষ বাগ্মিতার পরিচয় দেন।

সেকালে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান আভিজাত্যের বিশেষ লক্ষণ ছিল। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদানে বক্তার যেন গৌরব বৃদ্ধি হতো। ১৮৯৮ সালে ঢাকায় প্রাদেশিক সমিতির যে তিন-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাতে যোগদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকায় এসে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন– 'ঢাকার দর্শনীয় জিনিস তিনটি– প্রথমে মা ঢাকেশ্বরী, তারপর কালীপ্রসন্ন

৩. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়- 'বঙ্গভাষার লেখক', পৃঃ ১৪৩।

বাবু ও দীননাথ বাবু (অর্থাৎ দীননাথ সেন)'। এই সমিতির অধিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরেজি বক্তৃতা প্রদান। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি শ্রোতাদের জন্য বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের সপক্ষে ইতোপূর্বে সোচ্চার হয়েছিলেন ১৮৫৭ সালে নাটোরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সমিতির সভায়। ঢাকায় তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতার জন্য দাবি জানালেও তা কার্যকর হয়নি। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতার অংশবিশেষ শ্রুতমাত্র সভাস্থলে বসেই বঙ্গানুবাদ করেন। সে বঙ্গানুবাদের পাঠ শুনে সকলে পুলকিত ও বিস্মিত হন।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সমিতির সভায় (১৮৯৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতমাতার উদ্দেশ্যে রচিত একটি গান গেয়ে শোনান। অনুষ্ঠান শেষে ১ জুন, ১৮৯৮ তারিখে নর্থ ব্রুক হলে একটি 'সান্ধ্য সম্মিলনী' সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত গায়ক চন্দ্রনাথ রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা কৌতুকপ্রদ মন্তব্য প্রকাশ করেন ঃ

> "অত্রত্য সঙ্গীতবিদেরা রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গীতাভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যদি ত্রুটি পাইয়া থাকেন, তাহা আমরা উল্লেখ করা উচিত মনে করি না। ত্রুটি থাকিলেও সুকণ্ঠের জন্য রবীন্দ্রবাবু এখনকার কোন কোন গায়কের অপেক্ষা প্রশংসাভাজন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ঢাকায় ধ্রুপদী সঙ্গীতের ধারার পাশাপাশি লৌকিক সঙ্গীতের ধারাও বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকে মুসলমান প্রধান ঢাকায় জারির গান, শাহ্ মাদারের গান প্রভৃতি নানা রকমের গান সংস্কৃতি-রসিকদের তৃপ্তি সাধন করত।

উনিশ শতকে ঢাকায় কয়েকজন সঙ্গীতবিশারদ সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঢাকা জুবিলী স্কুলের শিক্ষক নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৯০৪) 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' নামে তিন খণ্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এটি বিভিন্ন বিষয়ক সঙ্গীতের একটি সঙ্কলন গ্রন্থ। এতে সঙ্গীতকারদের জীবনীও স্থান পায়। এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনী সম্ভবত কবির প্রথম প্রকাশিত জীবনী। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'সঙ্গীত রস মঞ্জরী' নামেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঢাকা ব্রাহ্মস্কুলের শিক্ষক আদিনাথ দে 'সঙ্গীতমালা' নামেও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দীনবন্ধু মিত্র ছাড়াও ঢাকায় বিভিন্ন সময়ে কয়েক জন মনীষীর সমাগম ঘটে। যেমন– মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় আসেন এবং প্রায় দশ দিন এখানে অবস্থান করেন। এ সময়ে পগোজ স্কুলে ঢাকাবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁকে একখানি মানপত্র প্রদান করা হয়। অনেকের অনুমান, মানপত্রের খসড়াটি কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক রচিত। এই অভিনন্দনপত্রের উত্তরে মধুসূদন বলেন, "আমি সুদ্ধ বাঙ্গালী নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর"। ঢাকাবাসীদের সংবর্ধনার উত্তরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। তার প্রথম কয়েকটি চরণ-

"নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ অলঙ্কার তুমি যে তা জানি

পূর্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।"

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলগৃহে এবং 'ঢাকা প্রকাশ' কার্যালয়ে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য দু'টি সভার আয়োজন করা হয়। ঢাকার 'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকার এক সংবাদে জানা যায় যে, ঢাকার 'জ্ঞানকরী সভায়' বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় মধুসূদন বহু বিবাহের সপক্ষে রচিত মনুর শাস্ত্রাদি বুড়িগঙ্গায় নিক্ষেপের কথা বলেন।[৪]

১৮৭৫ সালে কবি নবীনচন্দ্র সেন যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তাঁকে স্থানীয় একটি সভাগৃহে অভ্যর্থনা জানানো হয়। উক্ত সভায় গঙ্গাচরণ সরকার, অভয়চন্দ্র বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সুধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

১৮৬৫ সালের দিকে ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' নামে প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নাট্যশালাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় নাট্যচর্চার সূত্রপাত হয়। পণ্ডিতগণ মনে করেন এরও আগে ১৮৬০ সালে ঢাকায় নাট্যাভিনয় শুরু হয়েছিল। ১৮৬১ সালেই ঢাকায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়। পরবর্তীকালে অমৃতলাল বসু (১৮৭৩) তাঁর নাট্যদল নিয়ে ঢাকায় আসেন এবং 'পূর্ববঙ্গ-রঙ্গভূমির' বাঁধা স্টেজে 'নীলদর্পণ' নাটক মঞ্চস্থ করেন। এই নাট্যমঞ্চে পেশাদার এবং শৌখিন অনেক নাট্যগোষ্ঠী নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। ঢাকার নাট্যসমাজ এখানে নাট্যাভিনয় দেখার জন্য টিকিট বিক্রয়ের প্রথাও চালু করেন।

ঢাকার মুসলমান সমাজে উর্দু ও ফারসির বিশেষ চর্চা ছিল। লক্ষ করা যায়, ঢাকার ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার আগে এখানে আরবি, ফারসি ও উর্দু পুঁথির ব্যাপক প্রচলন ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত 'গুলিস্তাঁ', 'বোস্তাঁ','সিকান্দার নামাহ্', 'লায়লা মজনু', 'পান্দে নামা', 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', 'ইউসুফ জোলেখা' প্রভৃতি পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই ঢাকা অঞ্চলের এবং বেশ কিছু পাণ্ডুলিপির লিপিকর অথবা পুঁথির স্বত্বাধিকারী বা মালিকও ছিলেন ঢাকার অধিবাসী।[৫] উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকায় বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক উর্দু বা ফারসি সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন খাজা আবদুল গাফফার, মীর্জা গোলাম হোসেন আতিশ এবং সৈয়দ মাহমুদ আজাদ প্রমুখ। ঢাকার কবিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নবাব পরিবারের সদস্য। কয়েক জন ছিলেন ঢাকার আদি অধিবাসী। ঢাকার আদি অধিবাসীদের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক লক্ষণ ছিল তাঁদের প্রত্যুৎপন্ন রসিকতা। তাঁদের এই রসিকতা আজ প্রায় কিংবদন্তিতুল্য।

রমজান, ঈদ-উল-ফিতর ও মহররম উপলক্ষে ঢাকার আদি অধিবাসীরা কাসিদা রচনা করত। সেহরীর সময় রোজাদারদের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য বিশেষ কাসিদা পরিবেশনের প্রতিযোগিতা হতো। বিশ শতকেও এ রীতি অব্যাহত ছিল।

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- 'মধুসূদন দত্ত' (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), কলিকাতা ১৩৫২, পৃঃ ৯০।

৫ A. B. M. Habibullah- 'Descriptive catalogue of Persian, Urda and Arabic manuscripts in the Dacca University Library, Vol. I & II

ঢাকার আদি অধিবাসীরা যেমন উর্দু ও বাংলা মিশ্রিত ভাষায় কথা বলত, তেমনি ঢাকার চকবাজারের কেতাব পট্টি থেকে প্রকাশিত পুঁথিতেও মিশ্রভাষারীতির নিদর্শন ছিল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এসব পুঁথিতে সেকালের ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকার মুসলমান মেয়েরা অবগুণ্ঠন ত্যাগ করে অন্দরমহলের বাইরে এসে বিচরণ করত। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজে তা বিশেষ গর্হিত বলে বিবেচিত হয়। ঢাকার পুঁথিকারগণ এই নারী-প্রগতি ভালো নজরে দেখেননি। বিভিন্ন কবির কাব্যে এ বিষয়ে প্রচুর 'বয়ান' লিখিত হয়েছে। যেমন- আজিমুদ্দিনের 'আশক নামা' ছাপা পুঁথিতে (১৮১৭) 'বেপর্দা আওরতের বয়ান', মহাম্মদ ইছমাইলের 'আদাবাতুন নেছা' ছাপাপুঁথির (১৮৭৯) 'যে সকল মরদেরা আপনা নারীকে পর্দায় রাখে না তাহাদের নছীহত', আজিমুদ্দীনের খোলাছাতোল মারেফাত' ছাপা পুঁথিতে (১৮৬১) 'কলির আওরতের বয়ান' ইত্যাদি।

মুসলমান সমাজের প্রগতিশীল চিন্তারও অভাব ছিল না। বিশেষ করে ১৮৪১ সালে 'ঢাকা কলেজ' প্রতিষ্ঠার পর এখানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই কলেজকে কেন্দ্র করে এ-শহরে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। ঢাকা কলেজে যাঁরা ছাত্র বা শিক্ষক ছিলেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন স্বনামখ্যাত এবং পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে তাঁদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান তরুণ নারী-শিক্ষার জন্য এক সংগঠন গড়ে তোলেন 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩) নামে। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্র। এঁরা হচ্ছেন সভাপতি হিম্মত আলী, সম্পাদক আব্দুল মজিদ, সহকারী সম্পাদক হেমায়েত উদ্দীন এবং সহকারী সম্পাদক জাহেদুর রহিম জাহিদ। কার্যনির্বাহক সভার সভ্য না হলেও সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আব্দুল আজিজ (পরে খান বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত)। তিনি ১৮৮৬ সালে বিএ পাস করেন। আব্দুল আজিজ দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন।

'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর আগে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'ঢাকা সমাজ সম্মিলনী সভা' নামে একটি সংগঠন স্থাপিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম সুপারিন্টেনডেন্ট মৌলবী ওবেদুল্লাহ বা ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়াদী। এই সম্মিলনীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি সাধন।

'সুহৃদ সম্মিলনী'র প্রধান কার্য ছিল স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার। গৃহে অবস্থান করেও যাতে মুসলমান মহিলারা বাংলা বা উর্দু ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে পাঠ্যতালিকা প্রণীত হয়। উক্ত পাঠ্যতালিকা অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। 'সুহৃদ সম্মিলনী' ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে এই সম্মিলনীর কর্মসূচি পুরুষ শিক্ষা এবং সমাজ সেবায় সম্প্রসারিত হয়।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অচিরেই এটি একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ঢাকায় এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। বিশের এবং ত্রিশের দশকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা

বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ ঢাকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। এঁরা হচ্ছেন বিভাগের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯২১-২৪), শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, মোহিতলার মজুমদার, গণেশচরণ বসু, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, অজিতকুমার দত্ত প্রমুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগ এবং ঢাকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক বা ছাত্রদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন– রমেশচন্দ্র মজুমদার (অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢা. বি.), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (অধ্যাপক আইন বিভাগ, ঢা. বি. ১৯২১-২৪) কাজী মোতাহার হোসেন (অধ্যাপক পদার্থ, পরিসংখ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১-৬১ খ্রিঃ), আবুল হোসেন (অধ্যাপক অর্থনীতি ও বাণিজ্য ঢা. বি. ১৯২১-৩১), বুদ্ধদেব বসু (ছাত্র, ইংরেজী বিভাগ ঢা. বি. ১৯২৭-৩১), অমলেন্দু বসু (অধ্যাপক, ইংরেজী ১৯৩১-৪৮), মন্মথ রায় (ছাত্র, ১৯২৪-২৬), লীলা নাগ (ছাত্রী, ইংরেজী, ১৯২৩) আবুল ফজল (ছাত্র, ঢা. বি. ১৯২৫-২৮), আব্দুল কাদির (ছাত্র-১৯২৭-২৯ ঢা. বি.), কাজী আবদুল ওদুদ (ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, বাংলার অধ্যাপক-যোগদান ১৯২০), ত্রিপুরা শংকর সেন শাস্ত্রী (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা/ অধ্যাপনা, ১৯২৩-৫১ খ্রিঃ) এবং কিরণ শংকর সেনগুপ্ত (শিক্ষকতা)।

পরবর্তীকালে এই অধ্যাপকবৃন্দ বা ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যিক বা গবেষকরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার এঁরা ছিলেন প্রধান লেখক। এমনকি অনেকেরই সাহিত্যে হাতেখড়ি হয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায়। ঢাকার উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা তখন ছিল– ঢাকা হল বার্ষিকী 'শতদল' (প্রথম প্রকাশ ১৯২৩), জগন্নাথ হল বার্ষিকী– 'বাসন্তিকা' (১৯২৩), 'দীপিকা' (১৯২৪), 'তরুণ পত্র' (মাসিক- ১৯২৫), 'শান্তি' (মাসিক-১৯২৬), 'অভিযান (মাসিক-১৯২৬), 'পাক্ষিক দরদী' (১৯২৬), 'শিখা' (বার্ষিক-১৯২৭), প্রগতি' (মাসিক-১৯২৭), 'সঞ্চয়' (মাসিক ১৯২৮), 'জাগরণ (মাসিক-১৯২৮), 'জয়শ্রী' (মাসিক-১৯৩১), 'চাবুক' (সাপ্তাহিক-১৯৩৩), 'সোনার বাংলা' (সাপ্তাহিক ১৯৩৩) এবং 'সবুজ বাঙলা' (মাসিক নারায়ণগঞ্জ থেকে- ১৯৩৪)।

সাংস্কৃতিক তৎপরতায় বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকাও কম নয়। লক্ষ করা যায়, ঢাকায় এ সময়ে অর্থাৎ বিশের ও ত্রিশের দশকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন- 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' (১৯২৫), 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬), 'শান্তি সাহিত্য সম্মিলনী' (১৯২৭) এবং 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' (১৯৩৮)। প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন ছাড়াও ছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাহিত্যিক আড্ডা, যেমন- 'প্রগতির আড্ডা' (১৯২৭) এবং 'সোনার বাঙলা আড্ডা' (১৯৩৩)।

১৯২৬ সালে দু'টি স্মরণীয় ঘটনা ঢাকার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মকে বিশেষ চঞ্চল করে তুলেছিল। তা হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে বিশেষ বক্তৃতা প্রদানের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়বার ঢাকায় আগমন এবং কাজী নজরুল ইসলামের ঢাকায় প্রথম পদার্পণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬-এর ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আগমন করেন। প্রায় এক

সপ্তাহকাল ঢাকায় অবস্থান করে, ১৫ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে কবি ঢাকা ত্যাগ করেন। ৭ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে ঢাকা নর্থব্রুক হলে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করে। সেদিন অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় জনসাধারণের পক্ষ থেকে ঢাকার করোনেশন পার্কে কবিকে অভিনন্দন জানোনো হয়। 'নর্থব্রুক' হলের স্বল্প পরিসরে, রবীন্দ্রনাথের দর্শনপ্রার্থী সকলের স্থান সঙ্কুলান হয়নি। কিন্তু, ঢাকার 'করোনেশন পার্কের' মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রায় দশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানে তাঁকে জনসাধারণের পক্ষ থেকে এবং 'হিন্দু-মোসলেম সেবাশ্রম' থেকে পৃথক পৃথক মানপত্র প্রদান করা হয়। মঞ্চসজ্জার জন্য কবিকে উপস্থিত জনসাধারণ দেখতে পাচ্ছিলেন না। সকলেই যাতে কবিকে দেখতে পান সে উদ্দেশ্যে মঞ্চসজ্জা অপসারণ করা হয়।

১০ ফেব্রুয়ারি কবি কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও অধ্যাপকবৃন্দ এবং ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকদের সামনে 'Meaning of Art' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। কবির সঙ্গে মঞ্চে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে মুসলিম হলের ছাত্র-সজ্ঞ কবিকে সংবর্ধনা জানোনোর আয়োজন করে। সম্পূর্ণ মিলনায়তন এবং মঞ্চ এমন সুসজ্জিত ও সুশোভিত হয় যে, সে অভূতপূর্ব দৃশ্যের বর্ণনা পরবর্তীকালে অনেকেই তাঁদের স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। তাঁকে যে মানপত্রটি প্রদান করা হয় তা অধ্যাপক আবুল হোসেন রচনা করে বলে জানা যায়। মুসলিম হলে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণটি মোহাম্মদ কাসেম সম্পাদিত 'অভিযান' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় এবং সেই অভিভাষণটিও অধ্যাপক আবুল হোসেন কর্তৃক অনুলিখিত[৬]। এছাড়াও তিনি জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে, 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী'তে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে বক্তৃতা প্রদান করেন।

'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' ছিল ঢাকার রবীন্দ্রানুরাগীদের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে প্রত্যাগত জনৈক মনোরঞ্জন চৌধুরী। এই সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ অপূর্বকুমার চন্দ। আবুল ফজল ছিলেন এর সহ-সম্পাদক।

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম ঢাকায় আসেন। নজরুল অনুরাগীরা স্বাভাবিকভাবেই কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এ সময় কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মোহাম্মদ কাসেম, তরুণ কবি আবদুল কাদির এবং আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন।[৭] কথাশিল্পী মোহাম্মদ কাসেম একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা জানালে নজরুল তাঁকে উৎসাহিত করেন এবং পত্রিকাটির নামকরণ করেন 'অভিযান'। কবি তাঁর স্বল্পকালীন ঢাকা সফর শেষে 'অভিযান' নামে একটি কবিতাও লিখে দেন। কবিতাটি মোহাম্মদ কাসেম সম্পাদিত 'অভিযান' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৩৩৩) প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে নজরুলের লেখা এটি প্রথম কবিতা। 'অভিযান' পত্রিকার এ সংখ্যায় জসীমউদ্দীন, আবদুল কাদের,

৬. 'অভিযান'- মোহাম্মদ কাসেম সম্পাদিত, ঢাকা ভাদ্র, ১৩৩৩, ১ম বর্ষ-১ম সংখ্যা, পৃঃ ১০-১২।

৭. আবদুল কাদির- ঢাকায় নজরুল, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, ১৯৮৯, পৃঃ ৪৪।

মোতাহার হোসেন চৌধুরী, মিসেস এস এন হোসেন (পরবর্তী কালে বেগম সুফিয়া কামাল নামে পরিচিত), বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ তরুণ কবিদের কবিতা স্থান পায়।

ঢাকায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত (জানুয়ারি, ১৯২৬) 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র এক বৈঠকেও নজরুল যোগদান করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণ শেষে, নজরুল স্বরচিত গান গেয়ে উপস্থিত সকলকে মোহিত করেন।

সে বছরই অক্টোবর মাসের শেষ দিকে, নজরুল পুনরায় ঢাকায় আসেন নির্বাচনী প্রচারণার জন্য। পরবর্তী বছর ১৯২৭-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি নজরুল মুসলিম সাহিত্য সমাজের আমন্ত্রণক্রমে প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য ঢাকায় আসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি 'আসিলে কে গো অতিথি' (খোশ আমদেদ) গানটি পরিবেশন করেন। কবি এ গানটি ঢাকায় আসার পথে পদ্মায় স্টিমারে বসে রচনা করেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হয় নজরুলের গজল গান দিয়ে। গজলের পর তিনি তাঁর নতুন কবিতা 'খালেদ' আবৃত্তি করে শোনান। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা'য় প্রকাশিত বার্ষিক কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়- এই আবৃত্তি শুনে ঢাকার 'কয়েকজন স্থিতিশীল মৌলভী সাহেবের চোখ দিয়ে নাকি অশ্রু বের হয়েছিল'।[৮] এ সময় কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এবং ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় কবি ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। জগন্নাথ হলে তদানীন্তন প্রভোস্ট রমেশচন্দ্র মজমুদার তাঁর হলে নজরুলকে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। কবি সেখানে তাঁর কতকগুলো জনপ্রিয় গান গেয়ে শোনান।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নজরুল মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য ঢাকায় আগমন করেন। এবারও তিনি বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন তাঁর রচিত 'নতুনের গান' গেয়ে। প্রায় তিন সপ্তাহের অবস্থানকালে তিনি এবার দু'জন তরুণ সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হন। এঁরা হচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা 'উমা মৈত্র' (নোটন) এবং 'প্রতিভা সোম' (রানু)। এই দু'জন তরুণীর মধ্যে সফল সঙ্গীত শিল্পীর সম্ভাবনা কবি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর নিজের গান তাদেরকে শেখাতে এবং সম্ভব হলে তা গ্রামোফোন রেকর্ডে রেকর্ড করাতে। সে সময় অধ্যক্ষ মৈত্রের বাড়িতে প্রায় দিনই নজরুলের গানের আসর বসত। কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন–

> "সে সময় সস্ত্রীক মৈত্র মশায়, সত্যেন বাবু (প্রফেসর সত্যেন বোস) এবং আমিও বহুদিন এঁদের সঙ্গে সঙ্গীতানন্দ উপভোগ করেছি"।[৯]

১৯২৮ সালের জুন মাসেও নজরুল ঢাকায় আসেন। নজরুল যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তিনি শুধু খ্যাতির শীর্ষেই নন, তাঁর গান এবং আবৃত্তি দিয়ে দেশসুদ্ধ লোককেও প্রায় পাগল করে তুলেছিলেন। ঢাকায় আসার পর বহু বুদ্ধিজীবী ও কৃষ্টিবান

৮. আবদুল হোসেন- বার্ষিক সম্মেলনের বিবলন, 'শিখা, ১ম বর্ষ ১৯২৭, পরিশিষ্ট।

৯. কাজী মোতাহার হোসেন, স্মৃতিপটে নজরুল, 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা', বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬, পৃঃ ১০০।

নাগরিকদের কাছ থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সাহিত্য-সভার পক্ষ থেকে অথবা কোনো সাহিত্যিক আড্ডা থেকে সে কি বিপুল আমন্ত্রণ! নজরুলকে তাঁদের আসরে নিয়ে গিয়ে, তাঁর গান ও আবৃত্তি শুনে ধন্য হবার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা। 'কাড়াকাড়ি' শব্দটি ব্যবহার করলেও বোধকরি ভুল হবে না। শুধু কবি হিসাবে নয়, গজল গানের স্রষ্টা হিসাবে তিনি তখন খুবই জনপ্রিয়। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত গজল গানগুলোর বদৌলতে নজরুলের গজল গান তাঁদের প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

ঢাকায় 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী এবং 'শান্তি' পত্রিকার কার্যালয়ের 'শান্তি সাহিত্য সম্মিলনী'র সভায় কবি আমন্ত্রিত হন এবং কবি তাঁর গান ও আবৃত্তি দিয়ে সকলকে বিমোহিত করেন।[১০] বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' পত্রিকার আড্ডায়ও কবি কয়েকবার যোগদান করেন। জগন্নাথ হলের তদানীন্তন সাহিত্য-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুও তাঁর হলে আয়োজিত এক সভায় কবিকে আমন্ত্রণ জানান। সে সভার কথা স্মৃতিকথায় লিখতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, উক্ত অনুষ্ঠানে ইডেন কলেজের অধ্যাপিকারাও উপস্থিত ছিলেন। এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় ঘটনা, কারণ সভা-সমিতিতে মহিলাদের উপস্থিতি সেকালে ছিল খুবই বিরল।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র দ্বিতীয় বর্ষে দ্বিতীয় অধিবেশনে এক সাহিত্য সভায় কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়- "সে সভার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাহাতে ফজিলাতুন নেছা এম. এ, মিস প্রভাবতী দে বি. এ এবং আরও ২/ ৩ জন মহিলা উপস্থিত থাকিয়া সভার আনন্দ ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

মুসলিম সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তৃতায় বা আলোচনায় গুরু গম্ভীর এবং অনেক সময় বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা হতো। কিন্তু এসব সভায় গানেরও ব্যবস্থা ছিল। এই সমাজের সাহিত্য সভায় বা বার্ষিক সম্মিলনে যাঁরা গান গেয়ে শোনাতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন খসরু, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, মৌলবী গোলাম আহম্মদ, আব্দুস সালাম খাঁ প্রমুখ।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র সভায় নারী-পুরুষ শুধু এক গৃহে সমবেত হতেন না, মঞ্চে এক সঙ্গে তাঁরা গানও গাইতেন। এমনকি মুসলমান মেয়েরাও সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। 'সাহিত্য সমাজে'র কার্যবিবরণী সূত্রে জানা যায়, মহিলাদের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রতিভা সোম, চিত্রা চ্যাটার্জী, রমা নাগ, কুমারী জিয়াউন নাহার ও কাজী মোতাহের হোসেন তনয়া কুমারী জোবেদা। বিশ শতকের নারী প্রগতির হাওয়া তখন ঢাকায়ও বইতে শুরু করেছিল।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ঢাকার সংস্কৃতি চর্চায় একটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা হচ্ছে- কবিতার আসরের আয়োজন; যার নাম দিয়েছিলেন তাঁরা 'মুশায়েরা' এবং সভাপতিকে বলা হয়েছে 'মীর-মুশায়েরা'। "ধুপ ও লোবান জ্বালিয়ে আতর ও গোলাপের

---

১০. দ্রষ্টব্য ক) আবুল ফজল, রেখাচিত্র, পৃ. ১৪১।
খ) 'শান্তি'-৮ ফাল্গুন ১৩৩৪।

সুরভিতে এবং বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত প্রথম 'মুশায়েরা'য় কবি মোহিতলাল মজুমদার ও পরিমল কুমার ঘোষের কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়।" আর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কাজী আব্দুল ওদুদ, শ্রীশচন্দ্র দাস, আমিন উদ্দীন, শামসুল হুদা, মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে মীর-মুশায়েরা ছিলেন অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের দ্বারা সভায় আনন্দ বর্ধন করেছিলেন মোহাম্মদ হোসেন, বীরেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলী, যোগেশ চক্রবর্তী, রফিক উদ্দীন আহমদ প্রমুখ।

১৯৩২-৩৩ 'র ১৯ মার্চ, দ্বিতীয় 'মুশায়েরা' অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এর মীর-মুশায়েরা ছিলেন অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। সাহিত্য সমাজের কার্যবিবরণীতে এ অনুষ্ঠানের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

"মীর-মুশায়েরা'র উদ্বোধন-অভিভাষণের পর কুমিল্লার বিখ্যাত সুরশিল্পী মুহাম্মদ হুসেন সাহেব হাফেজের অনুবাদ একটি গজল গেয়ে শোনান। এই গজলের পর মুশায়েরা মজলিসের কাজ আরম্ভ হয়। সু-কবি অধ্যাপক পরিমল কুমার ঘোষ নিজে উপস্থিত হতে পারেননি, কিন্তু একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন-- অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেব তা পাঠ করেন। মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ, অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার, আব্দুল কাদের খাঁ, এ জেড নূর আহমদ, শামসুল হুদা, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আমিন উদ্দীন আহমদ ও অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবান তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সঙ্গীতের দ্বারা মজলিসের আনন্দ বর্ধন করেছিলেন মুহম্মদ হুসেন, কুমারী সরমা বসু, কুলচন্দ্র সেন, কুমারী উষাতারা ভট্টাচার্য, হাবিবুর রহমান, আব্দুর রশিদ, কুমারী যূথিকা রায় ও আশুতোষ চ্যাটার্জী। অধ্যাপক সুশোভন সরকার একটা আবৃত্তি দ্বারা, কাজী আনওয়ারুল হক সেতার-বাদন দ্বারা ও অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর স্বরচিত একটি রস রচনা পাঠ করে সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন।"

ঢাকার সংস্কৃতি-সেবী হাকীম হাবিবুর রহমানের বাসভবনে এমনি 'মুশায়েরা' বা সাহিত্য মজলিসের আসর বসতো। কোনো এক মাঘী পূর্ণিমায় হাকিম সাহেবের বাড়ির ছাদে এক মজলিসে কবি নজরুলও উপস্থিত ছিলেন। শহরের গণ্যমান্য এবং সঙ্গীতজ্ঞ বহু লোক এসেছিলেন নজরুলের গজল ও ইসলামী গান শোনার জন্য।

হাকীম হাবিবুর রহমান ঢাকার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে ঢাকা থেকে কয়েকটি উর্দু পত্রিকাও প্রকাশিত হতো। ১৯ শতক থেকেই শুরু হয়েছে ঢাকায় উর্দু কাসিদা রচনার রীতি। রমজান মাসে কাসিদা রচনা এবং পরিবেশের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। সেকালের ঢাকায় সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল ঈদ, মহররম ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত মিছিল। এই মিছিলে জনসাধারণের সমাজ-চিন্তা ও সংস্কৃতি-চিন্তার বিশেষ প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন বিশেষ প্রাণবন্ত হয়ে উঠত বিভিন্ন হলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে। গান, আবৃত্তি ও নাট্যানুষ্ঠানের নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজন হতো। এসব কর্মকাণ্ডে হলগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব বজায় ছিল। হলগুলোতে প্রতিবছরই

নাট্যাভিনয় হতো। ছাত্রদের মধ্যে উদীয়মান নাট্যকারও ছিলেন। যেমন মন্মথ রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। অধ্যাপকদের মধ্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদের অভিনয় শিক্ষা দিতেন এবং তিনি নিজে নাটকও পরিচালনা করতেন। অধ্যাপকবৃন্দও নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' আয়োজিত 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয়ে অপূর্ব কুমার চন্দ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আব্দুল ওদুদ প্রমুখ অংশ নেন।

নাট্যাভিনয়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। মঞ্চে মহিলাদের অভিনয়ে দর্শন বা সঙ্গীত শ্রবণ সেকালে দুর্লভ ঘটনা ছিল বললেই চলে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'স্মৃতিকথায়' অনেকটা দুঃখের সঙ্গেই বলেছিলেন-- 'আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের চার বছরে আমি প্রকাশ্যে ছাত্রীকণ্ঠ শুনেছিলাম একবার মাত্র -- শুধু মেয়েদেরই জন্য আয়োজিত এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়।'

শুধু মেয়েদের দ্বারা অভিনীত নাট্যানুষ্ঠানের কথাও জানা যায়। 'দীপালী' সঙ্ঘ আয়োজিত 'ডাকঘর' (১৯২৯) অভিনীত হয় জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। বলধা গার্ডেনের জমিদার বাড়িতেও জমিদার নগেন্দ্র চৌধুরী রচিত শৃঙ্গার রসাত্মক নাটিকার অভিনয় হতো এবং সেখানে পুরুষ কিংবা নারী সব চরিত্রের অভিনয় মেয়েরাই করত। জমিদারের স্বনির্বাচিত অতিথি ছাড়া আর কারও সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।

নজরুল ইসলাম সুস্থাবস্থায় শেষবারের মতো ঢাকায় আসেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ১২ ডিসেম্বরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে। সেদিনই নজরুলের পরিচালনায় তাঁর লেখা সঙ্গীত বিচিত্রা 'পূবালী' প্রচারিত হয়। বলাবাহুল্য ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠায় ঢাকায় সংস্কৃতিচর্চায় আর এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

১৯৩০ সালের দিকে ঢাকার মঞ্চে মহিলাদের অংশগ্রহণ বা নৃত্যানুষ্ঠানের কথা জানা যায়। সে বছর ৭ ডিসেম্বরে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় এ বিষয়ে বিশেষ তথ্য প্রকাশ পায়–

"সম্প্রতি ঢাকায় নারী নৃত্যের উদ্বোধনের বার্তা পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ঢাকা আর কতকাল ঢাকা থাকিবে?"

প্রকৃতপক্ষে ত্রিশের দশক থেকেই শুরু হয় ঢাকার অগ্রযাত্রা। ঢাকা বর্তমানে আর শুধু ঢাকা নয়। উন্মুক্ত, স্বাধীন, অবারিত এবং সর্ব বিষয়ে অগ্রগামী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ঢাকা আজ বিশিষ্ট অবস্থানের অধিকারী।

সেকালের ঢাকায় শুভাগত সুধীবৃন্দ

উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকেই শুরু হয় ঢাকার নবযুগ। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই নবজাগরণের পেছনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও উল্লেখযোগ্য ঘটনার অবদান লক্ষ করা যায়। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি আরও কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ঢাকার শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে- পগোজ স্কুল (১৮৪৮), জগন্নাথ কলেজ (১৮৫৮), মহিলা বিদ্যালয় ইডেন স্কুল (১৮৭০), ঢাকা মাদ্রাসা (১৮৭৩), মেডিক্যাল স্কুল (১৮৭৫) প্রভৃতি। ১৮৬০ সালে, ঢাকায় বাংলা ছাপাখানা প্রচলন হওয়ার পর ঢাকায় সাহিত্য-চর্চার দ্বার উন্মোচিত হয়। বিভিন্ন সাময়িকপত্র বা সাহিত্য-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হ'তে শুরু করে। এসব পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে, অনেক সাহিত্যিকের আগমন ঘটে। কালীপ্রসন্ন ঘোষের ন্যায় অনেক সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে সাহিত্য-আড্ডা গড়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত অনেক সুধীব্যক্তি ঢাকায় কর্মব্যাপদেশে অথবা সাহিত্য-সংস্কৃতি-চর্চার তাগিদে অনেকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য না এলেও অনেক সুধীব্যক্তি ঢাকায় আগমন করেন। তাঁদের শুভাগমনে ঢাকা এবং ঢাকাবাসী ধন্য হয়েছিল– তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শুভাগমন বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করছি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার তূর্যবাদক মধুসূদন দত্ত। ১৮২৪-এর ২৫ জানুয়ারি যশোরের সাগরদাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সুখ-দুঃখের টানা পোড়নে বিপর্যস্ত ছিল। মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩) জীবনের শেষ কয়েক বছর নানা ব্যাধিতে বিশেষ কাতর হয়ে পড়েন। 'পীড়িতাবস্থাতে এবং সাংসারিক ব্যয় নির্বাহার্থে' তাঁকে নিজ আইন-ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকতে হয়েছিল। মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁকে বিভিন্ন সময় কলকাতার বাইরেও ছুটে যেতে হয়। এ সময় এই মোকদ্দমা উপলক্ষেই তিনি ঢাকায় আগমন করেন।

মধুসূদনের ঢাকা আগমনের অনেক আগেই তাঁর কাব্যের বাণী এখানে এসে পৌঁছেছিল। শুধু তাই নয়, সমকালীন অন্যান্য অপ্রধান কবির ন্যায় ঢাকার কবি হরিশচন্দ্র মিত্রও মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর রচিত 'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা' (৩০ বৈশাখ, ১২৭০, মে ১৮৬৩ ইং), 'কীচকবধ কাব্য' (১৮৬৬) এবং অন্যান্য কাব্যে অমিত্রাক্ষার ছন্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। হরিশ্চন্দ্র মিত্রের একটি কবিতায় বলা হয়েছে– 'উপমা কল্পনায় শ্রীমধুসূদন'। তাঁর সম্পাদিত 'মিত্রপ্রকাশ' পত্রিকার শ্রাবণ ১২৭৭ সংখ্যায় অমিত্রাক্ষর এবং মিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে বিতর্কের সূচনা হয়। পরবর্তী দুটি সংখ্যায় এর অনুকূলে এবং প্রতিকূলে বিভিন্ন পত্র প্রকাশ পায়। 'মিত্র প্রকাশ' পত্রিকা প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১২৭৭) 'এডুকেশন গেজেট' প্রেরিত এক পত্রে মাইকেল মধুসূদন

দত্ত সম্পর্কে বলা হয়—

"উত্তরকালে যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হইবেন, মাইকেলের উদয় হইতে তিনি বঙ্গভাষায় নতুন ভাব দেখিতে পাইবেন।"

পরোক্ষভাবে এখানে বলা হয়েছে যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন দত্ত নবযুগের প্রবর্তক।

মধুসূদন দত্তের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে মধুসূদন ১৮৭৩ সনে ঢাকায় এসেছিলেন।[২] কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মধুসূদন এক মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় আসেন।[৩] ঢাকায় তিনি প্রায় ১০ দিন অবস্থান করেন। কোলকাতায় পৌছে তিনি বন্ধু গৌর বসাককে এক চিঠিতে লিখেছিলেন- I was nearly dead some weeks ago and had to go to Dacca where I was detained nearly 10 days and got back with much difficulty.[8]

১৮৭১ সনে ঢাকায় মধুসূদনের অবস্থান বা কার্যাবলী সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়নি। তবে এসময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সভায় মধুসূদনের যোগদান বিষয়ে কৌতুহলোদ্দীপক এক সংবাদ 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হয় ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৭১ তারিখে। এডুকেশন গেজেটে ঢাকার হিন্দু 'হিতৈষিণী' পত্রিকা থেকে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করা হয়। সংবাদটি হচ্ছে-

"গত শনিবার ঢাকায় জ্ঞানকরী সভায় বহু-বিবাহ নিরাময় বিষয়ের আন্দোলন হয়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মনুবচনে বহুবিবাহের ব্যবস্থায় স্থুল উল্লেখ করিয়াছিলেন। তথায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম- দত্তজ মহাশয় মন্বাদি শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া তাহা বুড়িগঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।"[৫]

এই সভা সম্পর্কে অন্য কোনো তথ্য কোথাও পাওয়া যায়নি।

পরবর্তী বৎসর, ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মধুসূদন দত্ত পুনরায় ঢাকায় আসেন। এসময়ে ঢাকায় মধূসূদনের অবস্থানকাল জানা যায়নি, তবে ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে যে তাঁকে বিশেষ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল সে বিষয়ে কিছু সংবাদ আমরা পাই।

'ঢাকা প্রকাশে'র ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক অনাথবন্ধু মৌলিক মধূসূদনের ঢাকা প্রবাসের একটি বিবরণী লিখেছিলেন। সে বিবরণী[৬] সূত্রে জানা যায় যে, মধুসূদন ঢাকায় পোগোজ সাহেবের বাসায় অবস্থান করেন। পোগোজ সাহেবের বাসস্থানটি বর্তমানে

১. নগেন্দ্র নাথ সেন- মধুস্মৃতি। কলিকাতা ১৩৬১, পৃঃ ৩৯৭।

২. যোগীন্দ্রনাথ বসু-মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত- কলিকাতা ১৯২৫।

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- মধুসূদন দত্ত (সাহিত্য সাধক চরিত মালা) কলিকাতা ১৩৫২, পৃঃ ৯০-৯১।

৪. নগেন্দ্র সোম- প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৮।

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়- প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০।

৬. নগেন্দ্রনাথ সোম- মধুস্মৃতি গ্রন্থে বিবরণীটি উদ্ধৃত হয়েছে, পৃঃ ৩৯৭।

আর্মেনিয়ান স্ট্রিটে অবস্থিত আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসী ভবন। অনাথ বন্ধু মৌলিকের বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঢাকায় মধূসুদনের অভ্যর্থনার জন্য দুটি সভা হয়, একটি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে এবং অন্যটি ঢাকা পোগোজ স্কুলে। পোগজ স্কুলের সভায় ঢাকার বিশিষ্ট অধিবাসীবর্গ ও জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। এই অভ্যর্থনা সভার একটি বিবরণ ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। বিবরণীটি নিম্নরূপ ঃ

শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক তাঁহাকে একখানি আড্রেস দেন। তখন একজন বক্তৃতাকালীন বলেন যে, "আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহা গৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।" মাইকেল মধুসূদন এর উত্তরে বলেন, "আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যে [মনি] বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো, আমি সুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।[৭]

এই অভ্যর্থনা সভায় যে অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয় তার কোনো প্রতিলিপি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। নগেন্দ্রনাথ সোমের মতে, 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই অভিনন্দনের খসড়া প্রস্তুত করেন।[৮] ঢাকাবাসীদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন-

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা-জানি
পূর্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষী (থাকে এইখানে)
নিত্য-অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্বল আমি, তেই বুঝি আমি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি ভাগ্যবতি!

৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত- পৃঃ ৯১।
৮. নগেন্দ্রনাথ সোম- প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৭।

মধুসূদনের জীবনচরিত রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে, মধুসূদন এসময় 'রোগে জীর্ণ ও ঋণভারে অবসন্ন' থাকায় নিজের দুর্দশার উল্লেখ করে তিনি ঢাকাবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু আরো মন্তব্য করেন যে, "অসহ্য ক্লেশ না হইলে অভিমানী মধুসূদন, সাধারণের নিকট, এরূপ ভাবে সাহায্যের জন্য ইঙ্গিত করিতেন না।"[৯]

অনাথবন্ধু মৌলিকের বিবরণীতে আমরা আরো একটি তথ্য জানতে পারি যে, 'ঢাকা প্রকাশ' কার্যালয়েও মধুসূদন দত্তের অভ্যর্থনার জন্য একটি 'পার্টির' আয়োজন করা হয়েছিল। কবি গোবিন্দরায় সেসময় 'ঢাকা প্রকাশের' সম্পাদক ছিলেন এবং অনাথ বন্ধু মৌলিক ছিলেন সহকারী সম্পাদক। অনাথ বন্ধুর বিরণীতে আমরা নিম্নলিখিত আরেকটি তথ্য জানতে পারি :

> একদিন মাইকেল তাঁহার বাসায় হরিশচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ক গল্প করিতে করিতে সেখানেই একটি কবিতা লেখেন এবং কবি হরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে একটি কবিতা লিখিয়া মাইকেলকে দেন। কবিতা দুটি আমার 'হিন্দু-হিতৈষিণী'তে ছাপা হইয়াছিল। সে সময় ঐ কাগজের সম্পাদক হরিচন্দ্র ও তাঁহার সহকারী ছিলেন রাধারমণ ঘোষ।[১০]

অনুমান করা যায় ঢাকায় মধুসূদন দত্তের অবস্থান স্বল্পকালীন হলেও ঢাকাবাসীরা তাঁর আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি রাখেননি। এই সূত্রে মধুসূদন ঢাকার বিশিষ্ট সাহিত্যিকবর্গ ও সুধী সমাজের সংগেও পরিচিত হন। ঢাকা ও ঢাকাবাসীদের উদ্দেশ্য করে রচিত তাঁর কবিতায় তিনি ঢাকাকে 'বঙ্গ-অলঙ্কার' রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং প্রতি ঘরে বৈভব ও বিদ্যার সহাবস্থান লক্ষ্য করেছেন। শুধু তাই নয়, মধুসূদন ঢাকাবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে সগৌরবে বলেছিলেন 'আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।'

নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩)

নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরী কুমিল্লার হোমনাবাদের জামিদার ছিলেন। তাঁর সমাজসেবা ও সাহিত্যানুরাগের কথা সুবিদিত। ১৮৮৫ খ্রিঃ মাতার মৃত্যুর পর তিনি জমিদারি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে- 'রূপজালাল' (১৮৭৬) এবং 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' (১৮৮৭)। তাঁর সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে বলা হয়– 'বঙ্গের একপ্রান্তে আধুনিক শিক্ষাবঞ্চিত এক বিদুষী মহিলার এরূপ সাহিত্য সাধনা বিস্ময়কর।"[১১]

১৮৭৪ সালের শেষদিকে তিনি চিকিৎসা উপলক্ষে ঢাকায় আসেন এবং কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি শুধু 'বিদ্যানুরাগিনী ও বিষয়কার্যে পারদর্শিনী ছিলেন না, সৎকার্য ও দানধর্মে সমুৎসাহিনী' ছিলেন।[১২] ঢাকায় অবস্থানকালেও তাঁর দানশীলতা অব্যাহত ছিল।

ঢাকার সংবাদপত্র 'ঢাকাপ্রকাশের' তিনি একজন 'অনুগ্রাহিকা গ্রাহিকা' ছিলেন। তিনি

৯. যোগীন্দ্রনাথ বসু- প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০৬।
১০. নগেন্দ্রনাথ সোম- প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৭।
১১. ওয়াকিল আহমদ- উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খন্ড, ঢাকা ১৯৮৩, পৃঃ ৩৮৪

নিয়মিত 'ঢাকা প্রকাশে'র গ্রাহক-চাঁদা প্রদান করতেন। শ্রাবণ (১২৮১) মাসে বার্ষিক চাঁদা ৬ টাকা আট আনা প্রদান করা সত্ত্বেও ঢাকা ত্যাগের পূর্বে, সম্ভবত মাঘ মাসে 'ঢাকা প্রকাশে'র দুই বৎসরের অগ্রিম মূল্য এবং এ পত্রিকার 'অনুকূলার্থে অতিরিক্ত আরো ২৫ টাকা দান করেন'। 'ঢাকাপ্রকাশ ' 'ঢাকাপ্রকাশের অনুগ্রাহিকা গ্রাহিকা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেন ঃ

'ঢাকা প্রকাশ' এই নিমিত্ত উক্ত চৌধুরাণী মহোদয়কে কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে এবং ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করিতেছে, ইনি আরোগিনী ও দীর্ঘজীবিনী থাকিয়া বিবিধ সৎকার্যানুষ্ঠান দ্বারা স্বদেশের হিতসাধনে অধিকতর পরিসমর্থা হউন।[১৩]

১৮৭৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী রচিত 'গদ্যপদ্যময় অভিনব কাব্য– রূপজালাল' গ্রন্থটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের মুদ্রাকর ছিলেন গিরিশ যন্ত্রের মুন্সি মাওলা বকস্ এবং এই পুস্তকের বিক্রেতা ছিল 'ঢাকা ন্যাসনেল ডিপজিটরী।' এর প্রায় এক বৎসর আগে ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী যখন ঢাকায় ছিলেন, সম্ভবত তখন এ-গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে মুদ্রাকর বা পুস্তক বিক্রেতার সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ ঘটে।

১৮৮৭ সালে ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী রচিত 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' ঢাকার বাঙ্গালা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এই ১৮৮৭ সালের ৯ জানুয়ারী সংখ্যা 'ঢাকা প্রকাশে' তাঁর রচিত তিনটি গান প্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় ঃ

ইঁহার সুবিস্তৃত জমিদারীর প্রজাগণ সম্প্রতি ৮ আইনের মাহাত্ম্যে বিদ্রোহী হওয়ায় ইঁহার মনের আবেগে যে কতকগুলি দুঃখ গীতি ইঁহার হৃদয় হইতে বিনিসৃত হইয়াছে, আজ আমরা তাহার গুটি তিনেক গান পাঠককে উপহার দিলাম। এই গানে গবর্ণমেন্টের জ্ঞানোদয় হইবে কিনা, বলিতে পারি না কিন্তু অনেক ভুক্তভোগীর হৃদয়ানল উচ্ছলিত হইবে সন্দেহ নাই।[১৪]

'ঢাকা প্রকাশে'র উদ্ধৃত তিনটি গানে মূল বক্তব্যই হচ্ছে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহে দুঃখ প্রকাশ করা। ফয়জুন্নেছা একটি গানে লিখেছেন ঃ

করেগো দরখাস্ত, দুখে করে গো দরখাস্ত।
যত ভদ্র তব অধীনস্থ
ক্ষুদ্র ভূমি নিয়ে সব, এতকাল প্রজাদের
ভক্তিতে মনে ছিল সুস্থ।
সে প্রজা বিদ্রোহী হ'লে মহারাণীর আইন বলে
ঘটাইলে তা এইকালে, কালিরাজায়
মানী জনার উচ্চপদ হল ন্যস্ত।

'ঢাকা প্রকাশ'ও জমিদারদের পক্ষে কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ

"আমরা গবর্ণমেন্টকে সাবধান করি, তিনি যদি এদেশের ও নিজের মঙ্গল চান, তবে

১২. ঢাকা প্রকাশ, ১৭ জানুয়ারি, ১৮৭৫।

১৩. ঢাকা প্রকাশ ৫ মাঘ ১২৮১, ১৭ জানুয়ারি, ১৮৭৫।

১৪. ঢাকা প্রকাশ, ৯ জানুয়ারি, ১৮৮৭; ২৬ পৌষ ১২৯৩।

তাহার ঘোরতর অত্যাচার হইতে বাঙ্গালার জমিদারকুলকে বিমুক্ত করুন। সর্ব্বাগ্রে ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের জমিদার শাসনী বিধানগুলি রহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।[১৫]

'ঢাকা প্রকাশ' এ প্রকাশিত আরেকটি সম্পাদকীয়তে প্রজাহিতৈষী কয়েকজন জমিদারের নাম উল্লেখ করা হয়। তন্মধ্যে নবাব ফয়জুন্নেছারও নাম রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়— "ফয়জনন্নেছা চৌধুরাণী বিলক্ষণ বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী।"[১৬]

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)

ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের অন্যতম হোতা কেশবচন্দ্র সেন ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যহানির কারণে তিনি কলেজের পাঠ ত্যাগ করেন। কিশোর বয়সেই তিনি দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং প্রচলিত শিক্ষার বাইরেও ধর্মশিক্ষা প্রদান করেন। রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা পাঠ করে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মমতে অনুরক্ত হন। ১৮৫৭ খ্রিঃ তিনি ব্রাহ্ম ধর্মমতে দীক্ষিত হন এবং আজীবন ব্রাহ্ম ধর্মমত প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ব্রাহ্ম ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র একধিকবার ঢাকায় আসেন।

১৮৬০ থেকে ১৮৭০ খ্রিঃ-এর মধ্যে কলকাতায় যে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে, তার প্রভাব ঢাকায়ও পরিলক্ষিত হয়। কেশবচন্দ্র সেনের ঢাকায় আগমন এবং তাঁর উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা ঢাকার সামাজিক আন্দোলনে বিশেষ ইন্ধন যোগায়। ১৮৬৫ সালের শেষ দিকে তিনি ঢাকায় প্রথম আগমন করেন। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেন যে— "কেশবচন্দ্র সেনের 'উন্মাদিনী বক্তৃতা-শক্তি' ঢাকার যুবসমাজকে মাতিয়ে তোলে"।[১৭] দলে দলে যুবক ব্রাহ্মসমাজের দিকে ধাবিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন ঢাকায় আগমনের পর কলকাতার অনুসরণে এখানে 'সঙ্গতসভা' স্থাপন করেন। এই সভার উদ্দেশ্যে ছিল– 'চরিত্রের উন্নতি সাধন এবং বিশ্বাস-অনুযায়ী কাজ' করতে লোকদের উৎসাহ-প্রদান।[১৮]

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে (চৈত্র, ১২৭৫) দ্বিতীয়বার ঢাকায় আগমন করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে– এবার তিনি প্রায় একমাস কাল এখানে অবস্থান করেন।[১৯] তাঁর এবারের ঢাকা আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল ধর্মমত প্রচার। 'ঢাকাপ্রকাশে'র এক সংবাদে জানা যায় তিনি একদিন খাজে আবদুল গনি মিয়ার বাসভবনে 'ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য' বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি ঐ বক্তৃতা শোনার উদ্দেশ্যে সমবেত হলেও সেখানে সকলের স্থান সঙ্কুলান হয়নি। 'ঢাকাপ্রকাশ' এ বিষয়ে মন্তব্য করে– "ঈদৃশ সমারোহে টিকেট প্রণালী অবলম্বন করা নিতান্ত কর্তব্য" (২১ মার্চ ১৮৬৯)।

১৫. ঢাকা প্রকাশ-২১ নভেম্বর, ১৮৮৬।
১৬. ঢাকা প্রকাশ- ১২ই সেপ্টেম্বর- ১৮৮০।
১৭. শিবনাথ শাস্ত্রী-রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ-কলকাতা ১৯৫৭, পৃঃ ২৩৪।
১৮. মুনতাসীর মামুন- উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র-৪র্থ খণ্ড-ঢাকা ১৯৯১ পৃঃ ১০।
১৯. শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রাগুক্ত-পৃষ্ঠা ২৭৬।

বৎসর দুই আগে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর কয়েকজন সহচরের উদ্যোগে নগর-সঙ্কীর্তন বা সঙ্গীতসহ নগর পরিভ্রমণ কলকাতায় প্রচলিত হয়। কেশবচন্দ্র সেনের ঢাকায় আগমনের পর, এখানেও সঙ্কীর্তন শুরু হয়। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী কালীপ্রসন্ন ঘোষ ঢাকায় কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা এবং নগর-সঙ্কীর্তনের প্রশংসা করে বলেন—

> "স্বনামধন্য কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার কতিপয় শিষ্যসহ ঢাকায় আগমন করিলেন। কেশব ইংরেজীতে ও তৎপরে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ঢাকার সকল সম্প্রদায়ের লোক মোহিত ও বিস্মিত হইল। ব্রাহ্মধর্মের জয়পতাকা ঢাকার নগর সঙ্কীর্তনে প্রথম উত্তোলিত হইল। যাহারা কোনো অংশেও ব্রাহ্ম নহে, তাহারাও নগর সঙ্কীর্তনে বহির্গত, ঋষিবেশে সুশোভিত, রিক্তপদ, কেশবচন্দ্রকে ধর্মপুরুষ মনে করিয়া নমস্কার করিল।[২০]"

কেশবচন্দ্র সেন সেবছরই ১৮৬৯ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় পুনরায় আসেন। এবার তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল– 'পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের প্রতিষ্ঠা'। উক্ত সমাজগৃহের প্রতিষ্ঠাকার্য ৫ ডিসেম্বর ও ৬ ডিসেম্বর সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। 'ঢাকাপ্রকাশ' এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন—

> "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তৎকালে যেরূপ হৃদ্যরূপে একটি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সকলেরই তাহা সবিশেষ মনোহারিণী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অনেকেই তৎশ্রবণে বিগলিতচিত্ত এবং সাশ্রুনয়ন হইয়াছিলেন। আরমানিটোলাস্থিত সমাজবাটির চত্বরে সংক্ষিপ্তরূপে উপাসনা করিয়া সকলে ব্রহ্ম-সঙ্কীর্তন করিতে করিতে রাস্তায় বহির্গত হইলেন" (১২ ডিসেম্বর, ১৮৬৯)।

পরবর্তী দিবস অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর, কেশবচন্দ্র সেন কয়েকজন ইউরোপীয়ান ও আরমেনিয়ানের উপস্থিতিতে, এক সভায় 'মনুষ্যের প্রকৃত জীবন' বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি এবার ঢাকায় কতদিন অবস্থান করেন, সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তবে এটা নিশ্চিত যে– ঢাকায় কেশবচন্দ্রের আগমনে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সম্প্রচার ও প্রসার ঘটে। শুধু তাই নয়, তাঁর সুচিন্তিত বক্তৃতা শুনে স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই মহৎ চিন্তার খোরাক খুঁজে পান।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৬৮ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদের জন্য পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ হবার পর সরকারি চাকুরীতে যোগদান করেন। প্রায় ছয়ত্রিশ বছরকাল তাঁর সরকারি চাকুরী-জীবনে তিনি পূর্ববঙ্গের যশোহর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন। ঢাকা তাঁর কর্মস্থল না হলেও তিনি সম্ভবত দু-একবার ঢাকায় আগমন করেন। ঢাকায় তাঁর আগমন এবং ঢাকাবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা প্রদানের কথা কবি নবীন সেন তাঁর "আমার জীবন" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।[২১]

---

২০. শিবনাথ শাস্ত্রী প্রাগুক্ত-রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃঃ ২৭৬।

২১. নবীন চন্দ্র সেন- আমার জীবন- তৃতীয় ভাগ- নবীনচন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ১৫১-১৫৩।

"আমার জীবন" গ্রন্থে নবীন সেন ঢাকায় তাঁর আগমন কাল প্রসঙ্গে লিখেছেন– "আমার কেবল 'অবকাশ রঞ্জিনী'র প্রথম ভাগ ও 'পলাশির যুদ্ধ' মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল" এবং তখন ছিল 'বসন্ত কাল'। কবির 'অবকাশ রঞ্জিনীর' প্রথমভাগ এবং 'পলাশির যুদ্ধ' গ্রন্থ দুটির প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৭১ (১ বৈশাখ, ১২৭৮) এবং ১৮৭৫ (১ বৈশাখ, ১২৮২)। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'অবকাশ রঞ্জিনী' দ্বিতীয় খণ্ড (মাঘ, ১২৮৪) ১৮৭৭ সনে প্রকাশিত হয়। অনুমান করা যায়, 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হওয়ার পর এবং 'অবকাশ রঞ্জিনী' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পূর্ববর্তী কোনো এক সময়ে অর্থাৎ ১৮৭৫ অথবা ১৮৭৬ এর বসন্তকাল (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাসে) তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকায় আগমন কালে তিনি চট্টগ্রামে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে এবং পরে কমিশনারের পার্সন্যাল এ্যাসিসটেন্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন।[২২]

কবি নবীন সেন ঢাকায় মাত্র দুদিন ছিলেন। এই দুদিনের মধ্যেই ঢাকার 'বিশ্রাম গৃহ বা Recreation Room' -এ তাঁর জন্য এক বিশেষ অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়। ঢাকার গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগমে হল ঘরটি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সন্ধ্যায় শুরু হয়ে রাত ১০টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। 'আমার জীবন' গ্রন্থে নবীন সেন বিনয় প্রকাশ করে লিখেছিলেন 'ইঁহারা সকলে আমার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলাম।' কারণস্বরূপ, তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁর রচিত 'অবকাশ রঞ্জিনী'র দ্বিতীয় খণ্ড, রঙ্গমতী, রৈবতক কুরুক্ষেত্র, প্রভাস প্রভৃতি গ্রন্থ তখনও প্রকাশিত হয়নি।

নবীন সেনের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কে কে উপস্থিত ছিলেন তা জানা যায়নি। তবে উক্ত সভায় গঙ্গাচরণ সরকার, অভয় চন্দ্র বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সুধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নবীন চন্দ্র সেন অভ্যর্থনাসভা সম্পর্কে লিখেছেন—

> নিমন্ত্রিত ভদ্রমন্ডলী চলিয়া গেলে তখনকার ঢাকার সবজজ গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়, অভয়বাবু ও অক্ষয়বাবু প্রমুখ কতিপয় পূজনীয় ব্যক্তি ও বন্ধু আমার কবিতার আবৃত্তি শুনিতে চাহিলেন। কি আবৃত্তি করিয়াছিলাম মনে পড়ে না। গঙ্গারাম বাবু আমার আলাপে ও আবৃত্তিতে পূর্ববঙ্গের গন্ধ না পাইয়া বড় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তাহার পর কিছুক্ষণ সাহিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনার এবং গঙ্গাচরণ বাবুর নানাবিধ সরস গল্পের পর সভা ভঙ্গ হইল।[২৩]

গঙ্গাচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৮৮) ঢাকায় সাবজজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঢাকার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর পুত্র, বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে এবং 'সাধারণী' পত্রিকা সম্পাদনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুর পিতা অভয়চন্দ্র বসু একজন সাহিত্যামোদী ব্যক্তি ছিলেন।

নবীন চন্দ্র সেন তাঁর ঢাকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন–

> 'ঢাকা দেখিয়া কিছুমাত্র সুখী হইতে পারি নাই। দেখিবার বড় কিছু ছিল না। রাস্তাগুলি অতিশয় সঙ্কীর্ণ এবং এত সেঁতসেঁতে ও দূর্গন্ধময় যে, দুটি দিন মাত্র থাকিতে আমার

২২. ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- নবীন চন্দ্র সেন- সাহিত্য সাধক চরিতমালা- ৪১, চৈত্র ১৩৫১, পৃঃ ৮
২৩. নবীন চন্দ্র সেন - প্রাগুক্ত- পৃ. ১৫৩।

কষ্ট বোধ হইয়াছিল। শ্রীমতী বুড়িগঙ্গা দেবীকে দেখিয়া আমার হাসি পাইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গবাসী গামলায় করিয়া বুড়িগঙ্গা পার হয় বলিয়া দীনবন্ধু যে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন তাহার অর্থ পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। তখন বসন্তকাল। শ্রীমতীর কলেবর এত সঙ্কীর্ণ যে, তখন তাঁহাকে অতিক্রম করিবার জন্য গামলারও প্রয়োজন ছিল না।[২৪]

তবে নবীন সেন বিভিন্ন সুধী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ- পরিচয়ে যে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন- "ঢাকা পূর্ব্ব রাজধানীর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিতা, এবং ভদ্রস্থান। এত শিক্ষিত ও সুসম্পন্ন লোক পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোনও নগরে নাই।"

১৯০৯ সনের ২০ জানুয়ারী নবীন চন্দ্র সেনের পরলোক গমনের পর ঢাকার তৎকালীন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশে' নবীন চন্দ্র সেনের জীবনী এবং তাঁর পরলোক গমন সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই শোক-লেখনীতে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেন- 'বঙ্গের কাব্য গগনে যিনি পূর্ণ শশীরূপে সমুদিত ছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের সেই প্রিয় পুত্র কবিবর নবীন চন্দ্র সেন গত শনিবার তাঁহার স্বজন ও স্বদেশবাসীকে কাঁদাইয়া মর্ত্তলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। .... নবীন চন্দ্র দেশের কি ছিলেন তাঁহার প্রতিভাই বা কি কিরূপ ছিল, বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে এমন লোক অতি অল্পই আছেন, যিনি সে সকল বিষয় অবগত নহেন।'[২৫]

এ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩)

সমাজ সংস্কারক এ্যানি বেসান্ত ১৮৪৭ সালে লন্ডন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা উইলিয়াম পেজ উড ছিলেন একজন চিকিৎসক। ১৮৬৬ সালে এ্যানি রেভারেন্ট ফ্রাংক বেসান্তের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েক বছর পরই তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। ১৮৮৯ সালের মে মাসে তিনি থিওসোফিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দেন এং ম্যাডাম ব্লাভাৎস্কির একনিষ্ঠ ছাত্রী হিসেবে অচিরেই ঐ সংস্থার একজন উল্লেখযোগ্য কর্মী হয়ে ওঠেন।

১৮৯৩ সালে ১৬ নভেম্বর তিনি প্রথম ভারতে আসেন। এ সময় তিনি মাদ্রাজসহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি। ১৮৯৫ সালে তিনি বেনারসে অবস্থান করে ভগবৎগীতা অনুবাদের কাজ শেষ করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বেনারসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ'। তিনি ১৯০৭ সালে থিওসোফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে মাদ্রাজে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ভারতের বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার কর্মে এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর বিশেষ অবদান পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৩ সালে ২১ সেপ্টেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয়।

১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই অলোকসামান্যা মহিলা ঢাকা নগরে পদার্পণ করেন। ঢাকায় তিনদিন অবস্থান করে তিনি স্থানীয় নর্থব্রুক হলে তিনটি বক্তৃতা প্রদান করে শ্রোতৃবর্গের পরিতৃপ্তি বিধান করেন। টিকেট দ্বারা শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়।

---

২৪. নবীন চন্দ্র প্রাগুক্ত - পৃ. ১৫২।
২৫. ঢাকা প্রকাশ ১৮ মাঘ ১৩১৫।

'ঢাকা প্রকাশে' প্রকাশিত এক সংবাদে মন্তব্য করা হয়- 'যে স্বর-সুধাপান করিবার জন্য সকলে উদগ্রীব ছিলেন, সে সুধা সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে যখন শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল, তখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সকলে নিশ্চল নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া ধন্য হইয়া যাইতে লাগিলেন'।

এ্যানি বেসান্তের বক্তৃতা তিনটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- "জড় জগতের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ বিচার", "ভারতবাসীর জন্য কিরূপ শিক্ষা প্রয়োজনীয়" ও "থিওসফি মত এবং তৎসাহায্যে এ হিন্দু সমাজোচিত আচার ব্যবহারাদির সার্থকতা সম্পাদন।" ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ সংখ্যায় 'ঢাকায় বিবি বেসান্ত' শিরোনামের সংবাদে এ্যানি বেসান্তের বক্তৃতা সম্পর্কে মন্তব্য করে- "যে সকল গুরুতর বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং যেরূপ সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় ও সরলভাবে সকল কথা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ঙ্গম করা হইয়াছে, লিখিয়া তাহার আভাস প্রদান প্রয়াসও বিড়ম্বনা মাত্র ."

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)

বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) বাংলা সাহিত্য ও বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে বিশেষ অবদান রাখেন। ৮ বছর বয়সে পিতৃহীন হবার পর তিনি নানা দুঃখ-কষ্টে জীবন অতিবাহিত করেন। পরে তিনি সাহিত্য-চর্চা, রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও নাট্যাভিনয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

রাজকৃষ্ণ রায় ১২৯৪ সালের মাঝামাঝি ধনধনিয়া ৩৮নং মেছুয়াবাজার রোডে 'বীণা-রঙ্গভূমি' নির্মাণ করেন এবং বীণা থিয়েটার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। এই রঙ্গভূমিতে প্রথম অভিনীত হয় রাজকৃষ্ণ রচিত পৌরাণিক নাটক 'চন্দ্রহাস'। বীণা-রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমকালীন 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় বলা হয়—

> "সাধারণ থিয়েটারে যে যে কুরুচি আছে, তাহাই দূর করা তাঁহার উদ্দেশ্য; সুতরাং এ থিয়েটারে বারাঙ্গনা নাই, পুরুষ দ্বারা স্ত্রী অংশ অভিনীত হয়। আর ইহাই এ থিয়েটারের নূতনত্ব"।[২৬]

বাংলার নাট্যশালায় ইতিহাসে এক্ষেত্রে বীণার রঙ্গভূমি বিশেষ ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে। কলকাতায় সমকালীন "বেঙ্গল", "স্টার' ও "এমারেল্ড" এ তিনটি রঙ্গভূমিতে মহিলা অভিনেত্রী দ্বারা নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ছিল। ১৮৮৮ সনের মার্চ মাসে ঢাকায় বীণা থিয়েটার কয়েকটি নাটক অভিনয়ের জন্য আসে। এই অভিনয়ে রাজকৃষ্ণ রায় নিজেও অংশগ্রহণ করেন। অভিনেত্রী বর্জিত নাট্যাভিনয়ে জনসাধারণের উৎসাহ বা টিকেট বিক্রয় সন্তোষজনক না হওয়ার আশংকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের একটি আবেদন-পত্র 'ঢাকা প্রকাশ'- এ প্রকাশিত হয়। আবেদনপত্রটি নিম্নরূপ—

> "ঢাকাস্থ শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী ভদ্র সমাজের নিকট বিনীত নিবেদন—
>
> বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত, সুপ্রসদ্ধি কবি এবং ইদানীন্তন নাট্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত

২৬. অনুসন্ধান- ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৭ (২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৪),. রাজকৃষ্ণ রায়- 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (৫০) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা-১৮।

বাবু রাজকৃষ্ণ রায় স্বপ্রণীত 'প্রহলাদ চরিত্র' প্রভৃতি ভক্তি রসপূর্ণ অভিনয় ও যারপর নাই উপাদেয় কতিপয় নাটকের অভিনয় প্রদর্শনের জন্য ঢাকায় সমাগত হইয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগী এবং ভক্তি অথবা ভাব বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী, আমরা ভরসা করি, সেই সমুদয় উদার চরিত সহৃদয় ব্যক্তিরা ঢাকায় রাজকৃষ্ণ বাবুর সম্মান করিয়া স্বজাতীয় কবি ও কাব্যের সম্মান করিবেন।

একান্ত বশংবদ

শ্রীকালী প্রসন্ন ঘোষ"।[২৭]

ঢাকায় বীণারঙ্গভূমি বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করেন– প্রহলাদ চরিত্র, তারকাসুর বধ, বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী ও সীতারাম। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়– 'অভিনয় ক্রিয়া সর্ব্বাংশেই উত্তম হইয়াছে'। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়- নাটকে দৃশ্যপট ও মঞ্চসজ্জার দোষে সৌন্দর্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। কারণ স্বরূপ বলা হয়– 'নাটক গৃহটির পরিসর কম বলিয়া বড় বড় ছিনগুলি খাটান যায় না'। 'ঢাকা প্রকাশ' আরো মন্তব্য করে–

"এবার রাজকৃষ্ণ বাবু একটি কাজ করিয়া ভদ্র পরিবারের বিশেষ ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ লাভ করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে পূর্ব্বে ভদ্র পরিবারের দেখিবার উপযুক্ত স্থান ছিল না, রাজকৃষ্ণ বাবুর জন্য সে অভাব দূর হইল। এখন অসূর্যম্পস্যা ভদ্রমহিলাগণও অবাধে নাট্যামোদ উপভোগ করিতে সমর্থন হইতেছেন"।[২৮]

দর্শকের সারিতে ভদ্রমহিলাদের আকৃষ্ট করার অন্যতম কারণ ছিল মঞ্চে মহিলা অভিনেত্রীদের অনুপস্থিতি। ঢাকা এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করে। ইতঃপূর্বে ঢাকায় 'কলকাতার স্টার থিয়েটার' নাট্যাভিনয়ের জন্য আসে। সমকালীন সংবাদপত্রে সে সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—

"কলিকাতার স্টার থিয়েটার কতকগুলি বেশ্যা লইয়া অভিনয় করিবার জন্য ঢাকায় গিয়াছিল, কিন্তু তথাকার ভদ্রলোকদিগের বোধ হয়, কলিকাতার লোক অপেক্ষা ঢাকার লোকেরা অধিক নীতি পরায়ণ।"[২৯]

স্ত্রী চরিত্রে পুরুষের অভিনয় দর্শক সমাগম কম হওয়ায় রাজকৃষ্ণ রায় অর্থ সঙ্কটের সম্মুখীন হন। এমনকি এক আনা, দুই আনার টিকেটের ব্যবস্থা করেও তিনি বিশেষ লাভবান হননি। ফলে ১২৯৭ সালের শেষদিকে তাঁর এই বীণা রঙ্গভূমি ঋণের দায়ে হস্তান্তরিত হয়।

রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক নাটক, উপন্যাস ও কবিতা রচনা করেন। তাঁর রচিত ৭০টি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ৩ খণ্ডে সমাপ্ত 'ভারত কোষ' (১৮৮০-১৮৯২)।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক স্বামী বিবেকান্দ (১৮৬৩-১৯০২) তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছে দীক্ষালাভের পর সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে নতুন এক জীবনাদর্শ

২৭. ঢাকা প্রকাশ- ১৩ চৈত্র, ১২৯৪।

২৮. ঢাকা প্রকাশ- ২৭ চৈত্র, ১২৯৪।

২৯. সাহিত্যসাধক চরিতমালা– রাজকৃষ্ণ রায় গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২১।

প্রচার করে বেড়ান। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একাধিকবার যুক্তরাষ্ট্র ও প্যারিসে গমন করে বিভিন্ন বক্তৃতায় তাঁর জীবনাদর্শ প্রচার করেন। অসামান্য বাগ্মীরূপেও তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ (পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত) ১৯০১ খ্রিঃ-এর ১৯ মার্চ মাসে একবার ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকার সঙ্গে কলকাতা বা বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল ফুলবাড়িয়া রেলষ্টেশন। সেইদিন এই রেলষ্টেশনে স্বামী বিবেকানন্দকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন (১৯৮৬) প্রকাশিত 'উদ্দীপন' সূত্রে এই অভ্যর্থনার বিস্তারিত সংবাদ জানা যায়। বলা হয়েছে– ষ্টেশনের ভেতরে ও বাইরে তিল ধারণেরও ঠাঁই ছিল না। সমবেত স্বেচ্ছাসেবকদল তাঁকে ভিড় আগলে, সসম্মানে ষ্টেশনের বাইরে নিয়ে আসে। ঢাকায় তখন মটর গাড়ির সংখ্যা ছিল খুবই কম। জনসাধারণের একমাত্র যানবাহন ছিল ঘোড়ার গাড়ি। উপস্থিত সকল শ্রেণীর জনগণের উল্লাসধ্বনির মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জন্য বিশেষভাবে সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সমাগত জনতা রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল; বিবেকানন্দ তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিতে বারণ করে বললেন– "জয়ধ্বনি যদি নিতান্তই দিতে হয়, তবে, যেন তা' শ্রীরাম-কৃষ্ণের নামেই দেওয়া হউক। আমিতো পরমহংস দেবের দাশানুদাস। এ-ধ্বনি তো আমাকে সাজে না"।

ঢাকার সমকালীন সংবাদপত্র 'ঢাকাপ্রকাশ' এই অভ্যর্থনার ভিন্নচিত্র প্রকাশ করে :

"৯ই-চৈত্র অপরাহ্ন সর্বজন-পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকায় পদার্পণ করেন। ঢাকার পক্ষে, পূর্ববঙ্গের পক্ষে সেই দিন বড়ই শুভদিন গিয়াছে। কিন্তু ঢাকার শিক্ষিত সমাজের দূরদৃষ্ট পূর্ব্ববঙ্গীয় সমাজের দূরদৃষ্ট ঢাকাবাসীরা স্বামীজির আগমন সম্বন্ধে পূর্বে কোনো আভাস পান নাই। সাদর অভ্যর্থনার জন্যও কোনো আয়োজন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক স্বামীজি অনাহূত অবস্থায় ঢাকা আসেন নাই, ইহাই সুখের বিষয়" (ঢাকা প্রকাশ, ২১ এপ্রিল ১৯০১)।

স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে সুশোভিত ঘোড়ার গাড়ি ধীরগতিতে এগিয়ে গেল ফরাসগঞ্জের দিকে। ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁর বিশিষ্ট ভক্ত বাবু মোহিনীমোহন দাসের বাড়িতে অবস্থান করেন। বিবেকানন্দ যে কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন, ততদিন সেখানে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে তিনি প্রতিদিন বৈঠক করতেন, আলোচনায় বসতেন এবং নানা উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে উপস্থিত সকলকে পরিতৃপ্ত করতেন।[৩০]

'ঢাকা প্রকাশে'র উক্ত সংবাদে অভিযোগ করা হয় যে– স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন বা সাক্ষাৎ সর্বসাধারণের জন্য অবারিত ছিল না। ঢাকায় অবস্থানকালেই তিনি ঢাকার অদূরে অবস্থিত হিন্দুদের তীর্থস্থান লাঙ্গলবন্ধে গিয়েছিলেন। সেখানেও তাঁকে এক নজর দেখার জন্য প্রচুর জন-সমাগম হয়েছিল। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি দু'টি জনসভায় বক্তৃতা দেন– একটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল জগন্নাথ কলেজের প্রাঙ্গণে এবং অপরটি পোগোজ স্কুলে।

৩০. মউদুদুর রশীদ– স্বামী বিবেকানন্দের ঢাকা ভ্রমণ, সচিত্র বাংলাদেশ, ৩০ জানুয়ারি ১৯৯১

সেকালে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করেই স্বামী বিবেকানন্দ ইংরেজী ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দের অনেকেই তাঁর প্রজ্ঞা এবং বাগ্মিতার বিশেষ প্রশংসা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ইংরেজী ভাষায় ভাষণ প্রদান করায় এবং তাঁর ভাষণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতি বিশেষ কটাক্ষ করায় 'ঢাকাপ্রকাশ' তার বিরূপ সমালোচনা করে। প্রসঙ্গক্রমে কিছু অসমীচীন মন্তব্যও করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকায় প্রায় এক পক্ষকাল অবস্থানের পর তিনি সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের তীর্থস্থানে যান। সেখান থেকে তিনি গৌহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

'ঢাকা প্রকাশের' অসৌজন্যসুলভ মন্তব্য সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, মানবতার সেবায় নিবেদিত এই মহর্ষির আগমনে ঢাকাবাসীর অনেকেই প্রীত ও ধন্য হয়েছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)

শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও লোকসাহিত্য-সংগ্রাহক গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) ঢাকা জেলার বগজুড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তাঁর শিক্ষাজীবন কাটে। কর্মজীবনে তিনি কুমিল্লায় এবং কলকাতায় অবস্থান করেন। কুমিল্লায় অবস্থানকালে তিনি পল্লীর আনাচে কানাচে ভ্রমণ করে প্রাচীন বাংলা পুঁথি এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৮৯৬ সালে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ইতিহাস-গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থটি একটি মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করে দীনেশচন্দ্র সেনকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

দীনেশচন্দ্র সেন আন্তরিকতা এবং যথেষ্ট সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু এ গ্রন্থের কিছু বক্তব্য ও কোনো কোনো তথ্য ঢাকার বৈষ্ণব সমাজের প্রতিনিধিবর্গের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৩৩৯ সালের ৮ই ভাদ্র, ১৫ই ভাদ্র, ২২শে ভাদ্র, ২৯শে ভাদ্র ও ৫ই আশ্বিন সংখ্যা 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় যোগেন্দ্র ঘোষ তত্ত্বভূষণ 'সাহিত্যিকের হস্তে মহাপ্রভুর চিত্র' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র কঠোর সমালোচনা প্রকাশ করেন। এ সময়ে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের আচার্য্য প্রতিনিধিবর্গ 'বৈষ্ণব ধর্মের গ্লানিকর পুস্তকের বিরুদ্ধে বঙ্গের মহামান্য গর্ভণমেন্ট বাহাদুরের নিকট একটি সম্মিলিত আবেদন উপস্থিত' করেন।[৩১] 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়– ঐ সমুদয় পুস্তকের প্রচার রহিত করাই নাকি উক্ত আবেদনের মর্ম।

ঢাকায় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'প্রতিবাদকল্পে' ১৩৩৯ সালের ২২শে ফাল্গুন ঢাকায় ন্যাশনাল কলেজ প্রাঙ্গণে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। শান্তিপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায়

৩১. ঢাকা প্রকাশ- ১ চৈত্র, ১৩৩৯।

প্রকাশিত এ সভার বিবরণীতে জানা যায়—

"প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা ও সাহিত্য সেবক যোগেন্দ্র মোহন ঘোষ মহাশয় দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি পুস্তক হইতে দোষযুক্ত স্থানসমূহ দর্শন করান এবং গোবিন্দদাসের কড়চা বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়া উহার ভাষা-ভাব, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং যাবতীয় আভ্যন্তরীণ ঘটনা লইয়া গুরুতর অসঙ্গতি ও ভ্রম প্রতিপাদন করেন।"৩২

প্রকাশ থাকে যে, এ সময়ে ১৯৩২ সালে দীনেশচন্দ্র সেন কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে তিনি 'History of Begali Language and Literature' (১৯১১) গ্রন্থখানি রচনা করেন এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (১৯২৩) ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' (১৯২৬) সম্পাদনা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন।

দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি বক্তৃতা প্রদানের আমন্ত্রণক্রমে ঢাকায় আসেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের দান'। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর, এই চারদিন তিনি ৪টি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথম দিন ঐ বক্তৃতা সভায় সভাপতিত্ব করেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার। পরবর্তী তিন দিন সাম্প্রদায়িক গোলযোগে তিনি ভীষণ ব্যস্ত থাকেন, ফলে তিনি সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাঁর বদলে পরবর্তী তিন দিন সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় এই বক্তৃতার বিবরণীতে দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তৃতার সারমর্ম এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়। দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তৃতার সপ্রশংস সমালোচনার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। আমরা সমালোচনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি করছি–

" বক্তৃতায় দীনেশ বাবু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, লোকে সাধারণত আলাওলের 'পদ্মাবতী', দৌলত কাজীর 'লোর চন্দ্রাণী' এবং সৈয়দ মর্তুজা, আকবর সাহা প্রভৃতি কবিদের দানের কথাই বেশী করিয়া জানে। কিন্তু তাহাদের সে সাহিত্য প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যের সহিত সর্বপ্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। আলোয়ালের 'পদ্মাবতী' 'সিকান্দর নামা' প্রভৃতি কাব্য পাণ্ডিত্যে খুব বড় কিন্তু কবিত্ব হিসাবে কবিকঙ্কণ চণ্ডী কি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পংক্তিতে দাঁড়ায় না। মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের প্রায় ৮০ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদেরও কেহ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায় শেখর প্রভৃতির সমকক্ষ নহেন। কিন্তু মুসলমানগণের পল্লীসাহিত্য হিন্দু কবিদের যে কোন রচনা হইতে বড় বই ছোট নহে।

অতঃপর দীনেশবাবু পল্লীসাহিত্য হইতে মুসলমান কবিগণ রচিত গীতিকাব্যগুলির বিশ্লেষণ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। এই গীতিকাগুলির অধিকাংশই এখনও প্রকাশিত হয় নাই। দীনেশ বাবু যখন আয়রা বিবি, আয়না বিবি, মদিনা মামুদ প্রভৃতির করুণ মর্মস্পর্শী কাহিনীগুলি বর্ণনা করেন, তখন শ্রোতৃবর্গ তাহা মুগ্ধ ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া শুনিয়াছিলেন। ডঃ এস. কে. দে (ডঃ সুশীল কুমার দে) এবং ডঃ শহীদুল্লাহ এ সকল কাব্যের বৃত্তান্ত শুনিয়া সভায় বলিয়াছিলেন যে, এই গাথা-সাহিত্য তাঁহাদের কাছে অতি

৩২. ঢাকা প্রকাশ- ১ চৈত্র, ১৩৩৯।

অদ্ভুত ও অভিনব বলিয়া মনে হইতেছে। উহাদের সৌন্দর্য্যের তাঁহারা ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই পল্লী গাথাগুলি উদ্ধার করিবার জন্য সকলের সমবেত হইয়া চেষ্টা করা উচিত এইরূপ মত প্রকাশ করেন। মুসলমানেরা বাঙ্গালা সাহিত্যে এত বড় দান দিয়াছেন অথচ সেই অপূর্ব্ব দান এ পর্যন্ত অবজ্ঞাত ও অপরিচিত ছিল এই কথায় তাঁহারা বিস্ময় প্রকাশ করেন।

দীনেশ বাবু দেখাইয়াছেন, এই গাথা সাহিত্য বাঙ্গালীর নিজস্ব সাহিত্য। ইহাতে বাঙ্গালী চরিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের লেশমাত্র নাই। এই গাথাসাহিত্য হইতে চরিত্রগুলির নাম বাদে তাহা হিন্দু বা মুসলমানের রচনা বুঝা যায় না। সেই ভারতীয় নারী, যাহাদের প্রস্তর মূর্ত্তি বরহুত, শাঁচী এবং অমরাবতী প্রভৃতির মন্দিরে পাওয়া যায়, যাহাদের চিত্র অজন্তা ও বাঘ প্রভৃতি গুহার চিত্রকরেরা আঁকিয়াছিলেন, সেই মহিয়সী ভারতীয় নারীরা এই সকল পল্লীগাথায় চিত্রিত হইয়াছেন। যুগ যুগান্তরের নানা বিপ্লব ও অবস্থা বিপর্যয়েও সেই নারীমূর্ত্তির শ্রী টুটিয়া যায় নাই। এই সমস্ত গাথ্য সাহিত্যে প্রেমের যে আত্মত্যাগী উচ্চ আদর্শ ফুটিয়াছে, পৃথিবীর কোন সাহিত্যেও তাহার শতাংশের একাংশও ফুটে নাই।

দীনেশ বাবু দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালার সহজিয়া মত দ্বারা মুসলমানগণ কতদূর প্রভাবিত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বপর্যন্ত হিন্দু মুসলমানের এই মিলনের চেষ্টা পূর্ণভাবে চলিতেছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যে সেই মিলনচিহ্ন সুস্পষ্ট, ইহার বহু উদাহরণ দীনেশবাবু দিয়াছেন।"[৩৩]

ঢাকার মখদুমী লাইব্রেরি এন্ড আহসানউল্লাহ বুক হাউসের কর্মাধ্যক্ষ মোহাম্মদ কাসেমের আগ্রহে দীনেশচন্দ্র সেনের এই বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। দীনেশচন্দ্র সেন ১৯৩৮ সালে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।[৩৪] ভুমিকাতে ভূলক্রমে লেখা হয় '১৯৩৭ সনের নভেম্বর মাসে (সেপ্টেম্বর মাসের পরিবর্তে) আমি উক্ত (ঢাকা) বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি বক্তৃতা প্রদান করি'। কিন্তু, গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে ১৯৩৯-এর ২০ নভেম্বর দীনেশচন্দ্র সেন পরলোক গমন করেন। 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' গ্রন্থটি অবশেষে ১৯৪০ -এর অক্টোবর মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।[৩৫]

শশাংক মোহন সেন (১৮৭২-১৯২৮)

শশাংকমোহন সেন (১৮৭২-১৯২৮) একাধারে কবি, সাহিত্য-সমালোচক ও শিক্ষাবিদ। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় আইন-শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করে চট্টগ্রামেই তিনি আইনব্যবসায় রত থাকেন। ১৯১৮ সালের দিকে শশাংক মোহন সেন সম্ভবত প্রথম ঢাকায় আসেন। তিনি ঢাকায় ১৩২৪ সালের ৩০ চৈত্র এবং ১৩২৫ এর ১লা বৈশাখ-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য- সম্মিলনে'র সাহিত্যশাখায় সভাপতিত্ব করার

৩৩. ঢাকা প্রকাশ- ১০ আশ্বিন ১৩৪৪।
৩৪. ভূমিকায় প্রদত্ত তারিখ- বেহালা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮'।
৩৫. ঢাকার বিজয়া প্রেসে মুদ্রিত, পৃঃ ৪+২১৬, মূল্য তিন টাকা।

জন্য আমন্ত্রিত হন। এই সময় তিনি ঢাকায় আসেন এবং সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। এই অভিভাষণ সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশ' সপ্রশংস মন্তব্য প্রকাশ করে। ১৯২৮ সালে ১৬ই এপ্রিল তারিখে শশাংক মোহন সেনের পরলোকগমনের পর 'ঢাকা প্রকাশ' এক শোকবার্তায় এই প্রশংসাসূচক উক্তি করে—

"ঢাকায় তাঁহার অভিভাষণ যাঁহারা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার সাহিত্য সাধনার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই বক্তৃতা পাঠেই সার আশুতোষ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষায় এম. এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার কালে তাঁহাকে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।"[৩৬]

'ঢাকা প্রকাশ'-এ প্রকাশিত উক্ত শোকবার্তায় শশাংক মোহন সেন কে- 'একজন প্রকৃত সাহিত্য সাধক' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। শশাংকমোহন সেন 'বঙ্গবাণী', 'বাণীমন্দির' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) প্রায় ৪০টি গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছেন। কর্মজীবনে তিনি যেমন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, তেমনি, তিনি কর্মব্যপদেশে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক প্রদান করে প্রথম সম্মানিত করেন। তাঁর শেষ সম্মাননা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত (১৯৩৬) ডি. লিট. ডিগ্রি লাভ। তিনি ১৯২৫ সালে মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু তিনি তখন ঢাকা শহরে এসেছিলেন কিনা সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্যার যদুনাথ সরকার-কে ডি. লিট. (ডক্টর অফ লিটারেচার) উপাধি এবং শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও শ্রী জগদীশ চন্দ্র বসুকে 'ডক্টর অফ সাইন্স' উপাধি প্রদান উপলক্ষে এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।[৩৭] এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত হতে পারেন নি, কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ'-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট উপাধি দানের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। কৌতুকের বিষয় 'ঢাকা প্রকাশ' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কে এই বিশেষ সম্মাননা প্রদর্শনে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ করে। সমালোচনাটি নিম্নরূপ—

"সেই তালিকার মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম দেখিয়া রুচির প্রশংসা করিতে পারিতেছি না বলিয়া দুঃখিত। তালিকায় প্রকাশিত অপরাপর সুধীবর্গের তুলনায় নীতি ও যোগ্যতার দিক দিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি প্রদান করা যাইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

---

৩৬. ঢাকা প্রকাশ- ২৩ বৈশাখ, ১৩৩৫; ৬ মে, ১৯২৮।

৩৭. M. A RAHIM— 'The History of the University of Dacca'- 1981, Page-225

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চরিত্রহীন, গৃহদাহ প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করিয়া ডি-লিট উপাধি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছেন। এমতাবস্থায় 'লন্ডন রহস্য' প্রণেতা মিঃ রেনলড্স্ আজ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে কি উপাধি প্রদান করিলে শোভন হইতে পারে, সে চিন্তায় কেহ কেহ যে উষ্ণমস্তিষ্কে অসংখ্য বিনিদ্ররজনী যাপন করিতেন না এমন নহে।[৩৮]

'ঢাকা প্রকাশ'-এর এই বিরূপতা সত্ত্বেও শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, ঢাকাবাসীরাও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। ঢাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান সংগঠন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে এ সময়ে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে। ১৯৩৬ সালের ৩১ জুলাই তারিখে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর দশম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে মূল সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমন্ত্রিত হন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে তাঁকে এই সম্মাননা প্রদানের জন্য 'মুসলিম-সাহিত্য সমাজ'কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন—

"মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দশম অধিবেশনে আমাকে আপনারা সভাপতি নির্বাচন করেছেন। যদিও এর নাম দিয়েছেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', তথাপি এই নির্বাচনের মধ্যে একটি পরম ঔদার্য আছে। আমি হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজের অন্তর্গত, আমি বহু-দেবতাবাদী অথবা একেশ্বরবাদী এ প্রশ্ন আপনারা করেন নি। শুধু ভেবেছেন আমি বাঙ্গালী, বঙ্গসাহিত্যের সেবায় প্রাচীন হয়েছি। অতএব, সাহিত্যিক দরবারে আমারও একটি স্থান আছে। সেই স্থানটি অকুণ্ঠচিত্তে আমাকে দিয়েছেন। আমিও সানন্দে সকৃতজ্ঞ মনে সেই দান গ্রহণ করেছি। ভাবি, সকল বিষয়েই আজ যদি এমন হতে পারত। যে গুণী, যে মহৎ, যে বড় সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক কৃশ্চান হোক, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য যা-ই হোক, স্বচ্ছন্দে সবিনয়ে তাঁর যোগ্য-আসন তাঁকে দিতে পারতাম– সংশয় দ্বিধা কোথাও কণ্টক রোপন করতে পারতো না।"[৩৯]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সভাপতির অভিভাষণে হিন্দু মুসলমানের মিলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আরো বলেন—

"--- যাঁরা প্রাচীনপন্থী যাঁরা পিছনে ছাড়া সুমুখে চাইতে জানেন না, তাঁদের জাগরণ কি মুসলিম কি হিন্দু সকল সমাজেরই বিঘ্নস্বরূপ। হিন্দুদের সম্বন্ধে এ কথা আমি বহুবার বহুস্থানে লিখেছি, মুসলিম সমাজের সম্বন্ধেও অসংশয়ে বলতে পারি, এ জাগরণ হয় যদি নবীনের– আসুক সে শ্রাবণের পূর্ণিমা জোয়ারের মতো সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে, তবু তাকে আমি দু-হাত তুলে সম্বর্ধনা করে নেবো। জানবো, এদের হাতে সমস্তই হবে শুভ এবং সুন্দর। এদের হাতে হিন্দু মুসলিম কারও ভয় নেই। এদের হাতে আমরা দুজনেই হবো নিরাপদ। আমার আশঙ্কা শুধু প্রাচীন পন্থীদের সম্বন্ধে।[৪০]"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ অভিভাষণটি 'বুলবুল' পত্রিকার ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র-১৩৪৩, পৃঃ ৩২৩-৩৩০)-য় প্রকাশিত হয়।

---

৩৮. ঢাকা প্রকাশ- ২৭ পৌষ, ১৩৪২।

৩৯. খোন্দকার সিরাজুল হক– 'মুসলিম সাহিত সমাজ ঃ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম'– জুন, ১৯৮৪, পৃঃ ১৭৫।

৪০. খোন্দকার সিরাজুল হক- মুসলিম সাহিত্য সমাজ ঃ সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম- জুন- ১৯৮৫, পৃঃ ১৭৫।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি পরলোক গমন করেন। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা তাঁর পরলোক গমনের পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে লিখেছিল—

"সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ মানুষের মত কাটাইয়া গিয়াছেন। দেশ সেবা ও জনসেবা ছিল তাঁহার আদর্শ। তাঁহার বৈঠকখানায় প্রত্যহ সান্ধ্য বৈঠক বসিত– যেখানে চলিত পল্লীর সুখ দুঃখের আলাপ আলোচনা। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালার সাহিত্য জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল।[৪১]"

শরৎচন্দ্র ঢাকায় কত দিন অবস্থান করেছিলেন জানা যায়নি। তবে ঢাকা ট্রেনিং কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ'র আমন্ত্রণক্রমে একদিন ট্রেনিং কলেজ ও আর্মানীটোলা গভর্মেন্ট হাই স্কুল পরিদর্শনে আসেন। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান তখন আর্মানীটোলা স্কুলের ছাত্র। তিনি তাঁর এক স্মৃতিচারণে সে ঘটনার মনোজ্ঞ বর্ণনা দেন।

"(শরৎচন্দ্র) কয়েকটি ক্লাশ ঘুরেছিলেন। আমাদের ক্লাশেও এসেছিলেন। আমাদের ভুগোল পড়াচ্ছিলেন শামসুদ্দিন সাহেব। ব্ল্যাকবোর্ডের উপর ভারতবর্ষের একটি রিলিফ ম্যাপ টাঙ্গানো ছিল। রিলিফ ম্যাপে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ভৌগোলিক সীমারেখা দেখানো হয় না, দেখানো হয় পাহাড়-পর্বত, নদীনালার অবস্থান। নানা রং ব্যবহার করে উঁচু নীচু অবস্থা এবং স্রোতধারা বুঝানো হয়। ক্লাশে ঢুকতেই ম্যাপটি প্রথম শরৎচন্দ্রের চোখে পড়লো, তিনি শামসুদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন– এটা কি হে? শামসুদ্দিন সাহেব বললন, "এটা ভারতবর্ষের ম্যাপ।"

শরৎচন্দ্র আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কিরকম ভারতবর্ষের ম্যাপ? এরকম এবড়ো থেবড়ো কেন?" শামসুদ্দিন সাহেব বললেন, 'এটা রিলিফ ম্যাপ। শরৎচন্দ্র বললেন, "রিলিফ"? রিলিফ আবার কি? তুমি তো ব্যাপারটা আরো ঘুরিয়ে দিলে হে। তুমি কি ছাত্রদের মাথা এভাবে ঘুরিয়ে দাও?' আমরা ক্লাশের ছাত্ররা তাদের বাক্যালাপ খুব উপভোগ করেছিলাম।'[৪২]

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১) একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিক, ধর্মনেতা ও দেশকর্মী। তিনি ছিলেন দেশ ও জাতির জন্য নিবেদিত-প্রাণ সমাজকর্মী। তাঁর বিভিন্ন রচনায়ও এই দেশপ্রেমের আদর্শ বিশেষ ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অনলপ্রবাহ' (১৯০০) তদানীন্তন ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করার জন্য ভারতবর্ষ থেকে যে মেডিক্যাল মিশন প্রেরিত হয়, তিনি তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। মুসলিম জাতির জাগরণের জন্য মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং মুন্সী মেহের উল্লাহ্–এর ন্যায় তিনিও বাংলার নগরে নগরে ও গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন এবং

৪১. ঢাকা প্রকাশ- ৯ মাঘ, ১৩৩৪, ২৩-১-৩৮।

৪২. সৈয়দ আলী আহসান- 'আর্মানীটোলা স্কুলে আমি'- আর্মানীটোলা প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলনী- ১৯৯৩ স্মরণিকা।

বক্তৃতা দিতেন। তাঁর বাগ্মীতায় জনসাধারণ বিশেষ ভাবে মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ হতো। এ সম্পর্কে 'বার্ষিক সওগাত' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়–

"বাগ্মীতায়ও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। এই ক্ষমতাবলে তিনি বাংলার বহুবিধ স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়া মৃতপ্রায় মুসলমান জাতির প্রাণে চেতনা সঞ্চার করিয়াছেন।"[৪৩]

আমরা অনুমান করি, ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঢাকায় একাধিকবার এসেছিলেন এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। সে সম্পর্কে আমরা বিশেষ কোনো তথ্য না জানলেও 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার সূত্রে ১৯০৪ সালে তাঁর ঢাকা সফরের কিছু সংবাদ অবগত হই।

১৩১১ সালের ৯ই ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ন সাড়ে ৪ ঘটিকায় ঢাকার ইসলামপুরে অবস্থিত 'ডায়মন্ড রঙ্গমঞ্চে' মুসলমান সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন। এই সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সাহিত্যিক ও সুবিখ্যাত বাগ্মী কালী প্রসন্ন ঘোষ। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় এই সভার একটি বিবরণী প্রকাশিত হয় ঃ

"সভাক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত মৌলভী ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব হিন্দু ও মুসলমানের একতা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ সুললিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের তৃপ্তি বিধান করিয়াছিলেন। বক্তৃতাকালে মৌলভী সাহেব বলিয়াছিলেন– "ভারতে হিন্দু ও মুসলমানগণ এক-বৃন্তে দুটি ফুল বা একই দেহের অঙ্গান্তর মাত্র। এক দেহের উভয় অঙ্গ মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইবে না, বিদ্বেষ প্রণোদিত না হইলে, কেমন করিয়া একথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে? ভারতের জীবনী শক্তি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখ সম্পদ এই দুই জাতির এক-প্রাণতার উপরই একমাত্র নির্ভর করে। দেশের কল্যাণ কামনা হৃদয়ে লইয়া যিনি ক্ষণকালের তরেও ভারতের বর্তমান অবস্থা নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, এক বাক্যে তিনি বলিবেন– মৌলভী সিরাজী সাহেবের উল্লিখিত উক্তি ভারত সন্তান মাত্রেরই হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা একান্ত কর্তব্য।"[৪৪]

পরদিন অর্থাৎ ১০ই ভাদ্র মঙ্গলবার (১৩১১ সালে) ঢাকার জগন্নাথ কলেজ গৃহে অনুষ্ঠিত মুসলিম সমাজের এক সভায়ও ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'ইসলামের সভ্যতা ও সমাজ সম্বন্ধে একটি সুললিত বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সফরে তিনি কতদিন ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন তা জানা যায় নি।

আমরা ঢাকায় উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সুধী ব্যক্তির শুভাগমনের বর্ণনা দিয়েছি। আরো অনেক সুধীর সমাগমে ঢাকাবাসী ধন্য হয়েছিল, যাঁদের কথা এখানে বলা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ঢাকায়একাধিকবার এসেছিলেন। এঁদের দু'জনকেই সম্বর্ধনা জানিয়ে ঢাকাবাসীরা ধন্য ও গৌরবান্বিত হয়। এ গ্রন্থের অন্যত্র আমরা তার বিবরণী প্রকাশ করেছি।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় বড়লাট অর্থাৎ ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আগমন একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকায় পৌঁছেন। ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ বাহাদুরের অতিথি হিসেবে তিনি 'আহ্সান মঞ্জিলে' অবস্থান করেন। তাঁকে

৪৩. বার্ষিক সওগাত-১৩৩৩।
৪৪. 'ঢাকা প্রকাশ'- ১২ ভাদ্র, ১৩১১।

অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। দেশী-বিদেশী, বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সমাগম হয় 'আহ্সান মঞ্জিলে'। পানাহার ও আমোদ প্রমোদেরও নানা ব্যবস্থা ছিল। ঢাকাকে মনোরমভাবে সুসজ্জিত করা হয়। ঢাকার সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশে' এর কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা প্রকাশিত হয়।

অপরাহ্নে নাগরিক সম্বর্ধনার বিপুল আয়োজন করা হয়েছিল। লর্ড কার্জনকে ঢাকা জেলা বোর্ড ও ঢাকা পৌরসভা, মুসলিম সম্প্রদায়, স্থানীয় জনসাধারণ এবং জমিদারদের পক্ষ থেকে মোট চারটি মানপত্র দেয়া হয়।

ঢাকার ফরাশগঞ্জের রূপলাল হাউসের যোগেশচন্দ্র দাস 'শান্তি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি রূপলাল হাউসে 'শান্তি সাহিত্য সম্মিলনী' নামে যে সাহিত্যিক চক্র গড়ে তুলেছিলেন, তারই উদ্যোগে এই রূপলাল হাউসে ঢাকায় আগত বিভিন্ন গুণী ব্যক্তির সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। নজরুলকে যে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল তা আমরা জানি। এখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার অমৃতলাল বসু এবং নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করকে যে বিশেষ সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল তার কিছু দুস্প্রাপ্য চিত্রও সংগৃহীত হয়েছে।

ঢাকায় ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও এসেছিলেন। গবেষক অনুপম হায়াৎ ঢাকার নবাব পরিবারের কয়েকটি ব্যক্তিগত ডায়েরী উদ্ধার করে সুধী সমাগমের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

খাজা সামসুল হকের ডায়েরী থেকে জানা যায়, মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ২ মার্চ ১৯২০ তারিখে ঢাকায় আগমন করেন।

> "খিলাফত কমিটি তাঁদেরকে এক বিরাট সংবর্ধনা দেয়। প্রায় ১০ হাজার লোক স্টেশনে হাজির হয়। স্বেচ্ছাসেবকরা দু'জন নেতাকে হাতির পিঠে চড়িয়ে শহরে বিরাট মিছিল করে। সন্ধ্যায় গভর্ণমেন্ট হাউসে তাঁদের সংবর্ধনা উপলক্ষে এক পার্টি দেয়া হয়। ঢাকার করোনেশন পার্কে মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এ সভায় নওয়াব হাবিবুল্লা সভাপতিত্ব করেন।"[৪৫]

খাজা মওদুদের ডায়েরী থেকে জানা যায়, মাওলানা শওকত আলী এবং মহাত্মা গান্ধী ১৫ ডিসেম্বর ১৯২০ তারিখে ঢাকায় আগমন করেন। তাঁদের সংবর্ধনা জানানোর জন্য বিপুল আয়োজন হয়। সন্ধ্যা ৬ টায় সংবর্ধনা সভা শুরু হয়। পরবর্তী দিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর গান্ধী এবং মাওলানা শওকত আলী ন্যাশনাল মাদ্রাসা পরিদর্শনে যান এবং তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

এর কয়েকদিন আগে ১২ ডিসেম্বর ১৯২০ তারিখে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক।[৪৬]

দেশ বিভাগের পূর্বে জওয়াহের লাল নেহেরু সম্ভবত ১৯৪৬ সনে ঢাকায় আসেন এবং পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দেন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন কিন্তু ঢাকায় আসেননি। ভৈরব-আখাউড়া হয়ে সিলেট গিয়েছিলেন।

৪৫. অনুপম হায়াৎ– নওয়াব পরিবারের ডায়েরীতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি; ডিসেম্বর ২০০১, ঢাকা, পৃঃ ১০৬।
৪৬. অনুপম হায়াৎ– প্রাগুক্ত; পৃঃ ১১৩।

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের সম্মাননা ও সংবর্ধনা

পূর্ববঙ্গের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করেছেন 'আমার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস-সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা-প্রবাহ চুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে।' সম্ভবত ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে তিনি যখন জমিদারী কাজ দেখাশোনার জন্য শিলাইদহে এসে বসবাস শুরু করেন, তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নিবিড় সম্পর্কের সূত্রপাত। আমরা জানি, শিলাইদহ, পদ্মা তথা পূর্ববঙ্গের মানুষ ও প্রকৃতি রবীন্দ্র-সাহিত্য-সাধনার প্রেরণাস্বরূপ ছিল।

বাংলাদেশে তথা পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল অতিবাহিত করলেও তাঁর সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সফরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা সত্ত্বেও ঢাকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আরো লক্ষণীয় বিষয়, ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম আগমনের অনেক আগেই এই ঢাকা কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে আবিষ্কার করে— স্বীকৃতি দেয়।

১৮৯৮ সালে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসেন। কিন্তু তার অনেক আগে ১৮৭৫ সালে ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকায় স্বনামে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ঢাকায়-ই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকাটি ছিল একটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পত্রিকা। পাঠক মহলে এই পত্রিকাটি 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' নামে পরিচিত ছিল। ১২৮১-এর মাঘ সংখ্যা 'বান্ধব' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতার শেষে তাঁর পূর্ণনাম মুদ্রিত না হলেও নামের আদ্যক্ষর লেখা ছিল '-র'। কয়েকমাস পূর্বে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় কবি রচিত 'অভিলাষ' নামে একটি কবিতা বেনামীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

১২৮১ অর্থাৎ ১৮৭৪-৭৫ সালে ১৩ বছর বয়সেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গান রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। এ সময় অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সরোজিনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথের দু'টি কবিতাও সংযোজিত হয়। 'বান্ধব' পত্রিকায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ সংখ্যায় উক্ত নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয় এবং প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের কবিতা দু'টির প্রশংসা করে লেখা হয়— "আমরা এই নাটকখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে আর কিছু না বলিয়া ইহার দুইটি কবিতা পাঠকবর্গকে উপহার দিব। আমাদিগের নিশ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি তাহা পাঠ করিবেন তিনিই গ্রন্থকারকে সু-কবি বলিয়া প্রশংসা করিবেন, সহৃদয় বলিয়া ভালবাসিবেন এবং স্বদেশবৎসল বলিয়া তাঁহার নিকট শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার বশে বদ্ধ হইবেন।"

সমালোচক কবিতাটির প্রকৃত রচয়িতা কে সে-বিষয়ে সম্ভবত অবহিত ছিলেন না। তবে রবীন্দ্রনাথকে একজন সমালোচক এই প্রথম 'সুকবি' আখ্যায় আখ্যায়িত করেন।

সেক্ষেত্রে মন্তব্যটি অবশ্যই তাৎপর্য্যপূর্ণ। 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির দীর্ঘকালীন সম্পর্ক ছিল। ঠাকুরবাড়িতে 'বান্ধব' পত্রিকার প্রচারও ছিল নিয়মিত। এই পত্রিকার মাঘ ১২৮১ (১৮৭৫, জানুয়ারি– ফেব্রুয়ারি) সংখ্যায় কালীপ্রসন্ন ঘোষের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়— 'নীরব কবি'। কবি ও কবিতা সম্পর্কে রচিত এই প্রবন্ধটি এক অর্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেকালে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ বা আলোচনার সংখ্যা খুবই কম ছিল। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'বান্ধব' পত্রিকার এই প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনিও 'নীরব কবি' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এ প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রবন্ধের 'নীরব কবি' শিরোনামটি চিরকালের জন্য সংযুক্ত হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী' ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। 'বান্ধব' পত্রিকার মাঘ ১২৮৫ সংখ্যায় 'কবিকাহিনী'র প্রথম প্রকাশিত সমালোচনা আত্মপ্রকাশ করে। সমালোচনাটি দুষ্প্রাপ্য এবং তা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণেও গুরুত্বপূর্ণ। উন্মেষপর্বের রবীন্দ্র সাহিত্যের এই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনার বিশেষ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি তাঁর 'জীবন স্মৃতির খসড়া' পাণ্ডুলিপিতে সমালোচনাটির উল্লেখ করে লিখেছেন— 'বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বান্ধব' পত্রে এই কাব্যসমালোচনা উপলক্ষ্যে লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম।' এ সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরোক্ষ সম্মাননাও বটে।

রবীন্দ্রনাথের নাটিকা 'রুদ্রচণ্ড' ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়। 'বান্ধব' পত্রিকার আষাঢ় ১২৮৮ সংখ্যায় নাটিকাটির একটি সমালোচনা স্থান পায়। এ সমালোচনায় সমালোচকের ভবিষ্যদ্বাণী '(তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িবে)' বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অন্যদিক 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনাগুলি রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনারও দ্বার উম্মোচন করে।

১৮৯৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ আসেন। ঢাকাবাসীদের পক্ষ থেকে অতিথিদের আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি ঘটেনি। এ-কথার সত্যতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যেও সুস্পষ্ট– 'অতিরিক্ত মাত্রায় আদর অভ্যর্থনা উপভোগ করিয়া আমরা বরযাত্রীর মতো অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছি। গৃহস্বামীর অতিথি হইয়া সর্বদা সহস্র খুঁটিনাটি ধরিয়া সেবকদলকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিতেছি, কত অসঙ্গত আদেশ পালনে অনুজ্ঞা প্রচার করিয়া ক্ষুদ্র-নবাবরূপে প্রতিভাত হইতেছি।'

সমিতির অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন এমন একজন ব্যক্তি জানান যে, রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় এসে বলেছিলেন— 'ঢাকার অন্যতম দর্শনীয় হচ্ছে কালীপ্রসন্ন বাবু'।

৩০ মে (১৮৯৮) তারিখে অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় ঢাকায় নাটকঘর বলে পরিচিত 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহে' এই সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ–অনুষ্ঠানে একটি

উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়েছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জী। সভাপতির সম্পূর্ণ ভাষণই ইংরেজী ভাষায় হওয়াতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকাংশের বাংলা অনুবাদ 'সুমধুর স্বরে প্রাঞ্জল ভাষায়' পাঠ করেন। সভাশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কালীচরণ ব্যানার্জী প্রমুখ অতিথিকে সভাস্থল থেকে তাঁদের আবাসস্থলে ঘোড়াগাড়িতে নিয়ে যাবার সময় ঘোড়ার পরিবর্তে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকেরাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়।

১ জুন তারিখে ঢাকার নর্থব্রুক হলে একটি 'ইভনিং পার্টি'র আয়োজন হয়েছিল। সে সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম-সঙ্গীত গায়ক চন্দ্রনাথ রায় (১৮৪৮-১৯২০) গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটি গান গেয়ে শোনান।

ঢাকার অধিবেশনে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ইংরেজীতেই বক্তৃতা প্রদান করা হয়। এতে সভার অনেকে বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। রবীন্দ্রনাথসহ অনেকে এ ব্যাপারে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু বক্তাগণ ইংরেজীতে বক্তৃতা প্রদানের তথাকথিত আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ন করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথ যে বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতার অংশবিশেষ তাৎক্ষণিকভাবে বাংলায় অনুবাদ করে শোনান, তা ছিল তাঁর একান্ত প্রতিবাদের প্রকাশ।

১৯২৬ সালে ঢাকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঢাকা আগমন। ঢাকায় তাঁর এই আগমন দ্বিতীয়বারের মতো হলেও এই আগমন নানাদিক থেকে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে দু'টি বক্তৃতা প্রদানের জন্য ঢাকায় আসেন। এ উপলক্ষে তিনি ঢাকায় কিছুদিন অবস্থানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সংবর্ধনার বিশেষ আয়োজন করা হয় এবং অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য 'রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতি'ও গঠিত হয়।

ঢাকার সমকালীন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ'-এ রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ ভ্রমণসূচী, বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার সংবাদ এবং রবীন্দ্রভাষণের সংক্ষিপ্তসার মুদ্রিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বছর জন্মগ্রহণ করেন, সেই ১৮৬১ সালেই ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ'-এর আত্মপ্রকাশ। ১৮৬১-এর ৭ মার্চ 'ঢাকা প্রকাশ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বিশ শতকের প্রায় ছয়ের দশক পর্যন্ত পত্রিকটি স্থায়িত্ব লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আর কোনো বাংলা সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে ঘটেনি। 'ঢাকা প্রকাশ'- এর এটি একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬-এর ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আগমন করেন। বিপুল জনতা নারায়ণগঞ্জের স্টিমার ঘাটে তাকে অভ্যর্থনা জানান। রবীন্দ্রনাথকে দেখার জন্য নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে এত লোক জড় হয় যে, কি ঘাটে কি জেটিতে একটুও স্থান ছিল না। রবীন্দ্রনাথ স্টিমার ঘাটে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ঘন ঘন আনন্দধ্বনি শোনা যায়। বিশিষ্ট কয়েকজন নেতা অগ্রসর হয়ে তাঁকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। জাহাজ ঘাটে সুসজ্জিত মোটর অপেক্ষা করছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর দলবলবহ সেই মোটরে চড়ে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। ঢাকা শহরের পূর্ব সীমান্তে একদল স্কাউট, বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক

ও শহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মোটর দৃষ্টিপথে দেখা মাত্র ঘন ঘন জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই অপূর্ব অভ্যর্থনা লাভ করে শহরে প্রবেশ করেন।

ঢাকার সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ'-এ এবং সাহিত্যিক আবুল ফজলের স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের এই আগমনের মনোজ্ঞ বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে 'ঢাকা প্রকাশ' একটি বিশেষ সম্পাদকীয়ও প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়টির সূচনা নিম্নরূপ— "স্বাগত হে, ভারতের গৌরব-রবি, স্বাগত। আপনি প্রতিভার জ্বলন্ত বিগ্রহ-বাণীর কাব্য নিকুঞ্জের কলকণ্ঠ। আপনার বেণুবীণাবিনিন্দিত সুমধুর কাব্যঝঙ্কারে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত মুখরিত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, জৈন, পার্শী, শ্বেত, কৃষ্ণ সকলেই জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে আপনাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মানের অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ধন্য হইতেছে।..."

৭ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নেই ঢাকায় 'নর্থব্রুক' হলে এবং 'করোনেশন' পার্কে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ঢাকার করোনেশন পার্কে তাঁকে প্রদত্ত সংবর্ধনার উত্তরে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে ঢাকার প্রাদেশিক সম্মেলনে তাঁর যোগদানের কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়। তিনি সেকালের সভায় ইংরেজী ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন— "আমি বহুকাল যাবত মাতৃভাষার পীযূষ ধারা পান করিয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মের পরিপন্থী ওই বিদেশী ভাষার শৃঙ্খলকে ভগ্ন করিতে সাহায্য করিতে পারিবে। আমার সেইদিনের চেষ্টা হয়তো কতকটা ফলবতী হইয়াছে। মাতৃভাষা আজ দেশে স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং জনসাধারণও স্ব স্ব অধিকার এবং কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।"

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেদিনের সে প্রত্যয় আজ স্বতঃসিদ্ধ সত্য। মাতৃভাষা বাংলা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় আসীন।

রবীন্দ্রনাথ ১৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যাহ্ন পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন। এই অল্প কয়েকদিনেই তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনেক সংবর্ধনা লাভ করেন। ৮ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় ঢাকার বিশিষ্ট মুসলমান ভদ্রমহোদয়গণ কবির সম্মানে একটি চা চক্রের আয়োজন করেন। এই চা চক্রটি ঢাকার নবাববাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী দিন ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার নর্থব্রুক হলে 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' রবীন্দ্র সংবর্ধনার আয়োজন করে। রবীন্দ্রনাথের দুই সহযাত্রী ইতালীয় পন্ডিত জোসেফ টুসি এবং কার্লো ফার্মিকি সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯২৫ সালে 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' নামে ঢাকায় একটি সংগঠন স্থাপিত হয়। এই 'সম্মিলনী'র সভাপতি ছিলেন ঢাকা কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ অপূর্ব কুমার চন্দ এবং এর অন্যতম সহসম্পাদক ছিলেন আবুল ফজল।

সেদিনই অপরাহ্নে জগন্নাথ কলেজে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক বিপুল জনসভায় কবি বক্তৃতা দেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন যে, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষাকেই সম্মান প্রদর্শন করা, কারণ বাংলা ভাষার তিনিও একজন সেবক। পল্লী সংগঠনের উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ছিল ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত দিন। সকালে ব্রাহ্মসমাজে সংক্ষিপ্ত সময় অতিবাহিত করে তিনি যান ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের সংবর্ধনা সভায়। দুপুরে আহারাদির পর দুপুর আড়াইটায় তিনি কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় যোগদান করেন। এরপর তিনি বিকালে চারটায় উপস্থিত হন মুসলিম হলে ছাত্র ইউনিয়নের আয়োজিত সংবর্ধনা সভায়। মুসলিম হলে ছাত্ররা রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এক অভূতপূর্ব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দোতলার একাংশে ছিল 'মুসলিম হল'। উক্ত ভবনের অন্যান্য অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বসত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি থেকে আরম্ভ করে হল পর্যন্ত সারাটা পথ সুগন্ধী পুষ্প দিয়ে সাজানো হয়। নানা রকমের ফুল, লতা, পাতা দিয়ে অসংখ্য কুঞ্জবন তৈরি করা হয়েছিল। আর তাতে অনেক খাঁচাবদ্ধ পাখি এমনভাবে রাখা হয়েছিল, যাতে খাঁচাগুলো দেখা না যায়। খাঁচায় আবদ্ধ পাখির কলকাকলি এবং অজস্র ফুলের সৌরভে এক অনিন্দ্যসুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আবুল ফজল তাঁর স্মৃতিকথায় আরও লিখেছেন 'অলিন্দে আর কার্নিসে ফুলভর্তি সাজি হাতে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল অনেক ছাত্রকে— কবি ঢুকবার সময় তারা তাঁর ওপর করবেন পুষ্পবৃষ্টি।'

যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী হল কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উপর চারপাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হতে থাকে। মুসলিম হলে তখন কোনো মিলনায়তন ছিল না। বিরাট ডাইনিং হলে কবির জন্য বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চে গিয়ে তাঁরা উপবেশন করলেন। গোপাল চন্দ্র রায় তার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আরও একটি নতুন তথ্য দিয়েছেন। সে বর্ণনায় বলা হয়েছে— 'সভামঞ্চে মাথার ওপর যে ক'টা ইলেকট্রিক পাখা ছিল সেই পাখাগুলো না চালিয়ে পাখাগুলোর ব্লেডের ওপর নানা সুগন্ধ ফুল স্তূপ করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ সভায় এসে বসলে এরা তখন ঐ পাখাগুলো চালিয়ে দিয়েছিল। ফলে পাখা চলার সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে ফুল পড়তে শুরু হয়েছিল।'

এই পুষ্পবৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আনন্দে এতটা অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর অভিভাষণে সে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এই পুষ্পবৃষ্টি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন— 'এই সভাগৃহে প্রবেশ করার পর হতে এ পর্যন্ত আমার ওপর পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। প্রাচীন শাস্ত্রে পড়েছি কৃতী ব্যক্তির ওপর পুষ্পবৃষ্টি হয়। এ পুষ্পবৃষ্টি যদি তারই সপ্রমাণ করে, তবে আমি আজ আনন্দিত।'

কবি তাঁর অভিভাষণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে কিছু কথা বলেন। তিনি বলেন— "বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও পরস্পরের বিচ্ছেদ দেখে নিতান্ত দুঃখিত, মর্মাহত ও লজ্জিত হই। ধর্মে ধর্মে বিরোধ হতে পারে না। কারণ, ধর্ম হল মিলনের সেতু আর অধর্ম বিরোধের। আমাদের অপরাধ স্বীকার করতে হবে, আমরা ধর্মের অবমাননা করেছি বিরোধ করে।"

মুসলিম হলের সভা সাঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা ক্লান্ত দেহে কার্জন হলে যান তাঁর নির্ধারিত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রবীন্দ্রনাথ The Meaning of Art বিষয়ে প্রায় এক ঘণ্টাকাল লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

তদানীন্তন উপাচার্য জে. এইচ. ল্যাংলী সাহেব সভাপতিত্ব করেন। সারাটা দিন একের পর এক অনুষ্ঠানে যোগদানের পর কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে পরবর্তী দু'দিন তাঁর সমস্ত কার্যসূচী স্থগিত করতে হয়।

১৩ ফেব্রুয়ারি (১৯২৬) রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় বক্তৃতার বিষয় উল্লেখ করা হয়— 'The Big and the Complex', কিন্তু পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি' পত্রিকায় 'Rule of the giants' শিরোনামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় এই বক্তৃতা-সভার একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়। তাতে লক্ষ্য করা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর সঙ্গে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় বক্তৃতা দুটির সারমর্ম প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর ঢাকা সফর শেষে ময়মনসিংহের পথে যাত্রা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে এখানে এলেও ঢাকা পৌরসভা, ঢাকার জনসাধারণ, করদাতা সমিতি, হিন্দু-মোস্লেম সেবক সঙ্ঘ, বিশ্বভারতী সম্মিলনী, ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ, কলেজিয়েট স্কুল, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, মুসলিম হল ছাত্র সংসদ, দীপালী সংঘ প্রভৃতি সংগঠন কবিকে সংবর্ধনা জানায়। প্রতিটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেই তিল ধারণের স্থান ছিল না। করোনেশন পার্কের সংবর্ধনায় কমপক্ষে দশ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। প্রকাশ, সে সভায় চারপাশের লোক কবিকে ভালভাবে দেখতে না পারায় মঞ্চের আংশিক মঞ্চসজ্জা খুলে ফেলা হয়। রবীন্দ্রনাথের এই ঢাকা সফর সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করে— 'কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কয়েকদিন এই সহরে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই কয়েকদিন ঢাকাবাসীর আনন্দোৎসবে দিন কাটিয়াছে, তখন সমস্ত সহরময় যেন একটা প্রাণের সাড়া অনুভূত হইয়াছিল।'

স্বল্পকালীন এই সফরে কবি পেয়েছিলেন সর্বস্তরের মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। আর বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন স্মৃতির এক অফুরন্ত ভাণ্ডার।

রবীন্দ্রনাথের এই সফরের প্রায় দশ বৎসর পরে ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় তাঁকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান। এবার তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিশেষ সম্মাননা প্রদানের জন্য। এই সম্মাননার উপলক্ষ ছিল কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি প্রদান। ১৯৩৬-এর ২৯ জুলাই এই উপাধি প্রদানের জন্য যে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতার জন্য তাতে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাঁর অনুপস্থিতিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক 'ডি-লিট' উপাধি প্রদান করেন।

আজ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে নেই। তবু, সারা বিশ্ব জুড়ে তিনি অহরহ অর্জন করছেন সকল প্রাণের ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং সর্বোপরি সম্মাননা। অমরত্বের বোধ করি এই এক অনন্য— অঙ্গীকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নজরুল

শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান। উনিশ শতকে ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং বিশ শতকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে ঢাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এটি অচিরেই একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ লাভ করে। অন্যদিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ঢাকায় এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে ওঠে।

আমরা জানি, ১৯২০ থেকে শুরু করে ১৯৪২ পর্যন্ত ছিল কাজী নজরুল ইসলামের মোটামুটিভাবে সক্রিয় ও ফলপ্রসূ আয়ুষ্কাল। ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক এবং সমকালীন সাহিত্যিক ও বিশেষ ব্যক্তিত্ব এই দুই দশকে ঢাকায় সংস্কৃতিচর্চায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, লীলা নাগ, আবুল ফজল, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ।

কবি নজরুল ইসলাম এসময় একাধিকবার ঢাকায় আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি প্রবাহে নিজেকে একাত্ম করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক এই সংস্কৃতি-প্রবাহে নজরুলের ভূমিকা বিচারই আমাদের এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য।

১৯২৬ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল প্রথম ঢাকায় আসেন। স্বাভাবিকভাবেই নজরুল অনুরাগীরা এবং নজরুল ভক্তবৃন্দ কবির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। নজরুল ঢাকায় এসেছিলেন হেমন্তকুমার সরকারের সঙ্গে এবং ঢাকায় কাছারীর নিকটবর্তী মোহিনীমোহন দাসের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কবির ঢাকা আগমনের সংবাদ পেয়ে আব্দুল কাদির, মোহাম্মদ কাসেম ও আব্দুল মজিদ (সাহিত্যরত্ন) সে বাড়িতে যান।

ঢাকায় সে বছরই ১৯২৬ এর ১৯শে জানুয়ারী 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। নজরুল এই সমাজ-প্রতিষ্ঠার সংবাদ জানতেন। তিনি 'সাহিত্য-সমাজ'-এর প্রগতিশীল চিন্তাধারার কথা শুনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং 'সাহিত্য সমাজে'র এক বৈঠকে মিলিত হতে চান। ২৭শে জুন রোববার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র চতুর্থ বৈঠক আহূত হয়, এই সভায় হেমন্তকুমার সরকারও আমন্ত্রিত হন।

সাহিত্য-সমাজের চতুর্থ বৈঠকে নজরুল ইসলামও একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষে 'কান্ডারী হুঁশিয়ার', 'আমরা ছাত্রদল', 'কৃষাণের গান' প্রভৃতি জাগরণমূলক কয়েকটি গান গেয়ে উপস্থিত সকলকে মোহিত করেন। আব্দুল কাদিরের মতে নজরুলের কণ্ঠে জাগরণী গানগুলি শুনে তরুণ সম্প্রদায়ের প্রাণে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, সে উদ্দীপনার একটা 'দুঃসাহসী প্রকাশ' কথাশিল্পী মোহাম্মদ কাসেমের সম্পাদিত মাসিক 'অভিযান"। সম্ভবত

মোহাম্মদ কাসেম একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা জানালে নজরুল 'অভিযান' নামে একটি কবিতা রচনা করেন, যা ১৩৩৩-এর ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে নজরুলের লেখা এটি প্রথম কবিতা। এ কবিতায় তিনি পরোক্ষ ভাবে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র প্রগতিশীল চিন্তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেন।

দ্বিতীয়বার ১৯২৬ সালেরই অক্টোবর মাসের শেষ দিকে নজরুল পুনরায় ঢাকায় আসেন। এবার তাঁর ঢাকা আগমনের উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি। তিনি ঢাকা বিভাগের মুসলমান কেন্দ্র থেকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ-প্রার্থী হন। মূলত নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যেই তিনি ঢাকায় আসেন।

আমরা জানি, মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের উদ্বোধক 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' ঢাকার সংস্কৃতি-অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ১৯২৬-এর ২০ জানুয়ারী 'শ্রদ্ধাস্পদ মৌঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর পৌরোহিত্যে' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উদ্বোধনী এক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরেক অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত সাহিত্য সমাজের সম্পাদকের মতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "চিন্তা-চর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও রুচি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নবীন-পুরাতন সর্বপ্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগ সাধন।" প্রথম বৎসরের কার্যক্রমেই আমরা দেখেছি, নজরুল সাহিত্য-সমাজের একটি বৈঠকে উপস্থিত হয়ে এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়েন। সাহিত্য সমাজের প্রথম বর্ষের পূর্তি উপলক্ষে ১৯২৭-এর গোড়ার দিকে যে বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন হয়, তাতে অংশগ্রহণে কবি আমন্ত্রিত হন। নজরুল সানন্দে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে উদ্বোধনী সংগীত রচনায়ও সম্মত হন।

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল মিলনায়তনে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন সকালের সম্মেলনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের কথা ছিল নজরুলের, কিন্তু তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারেন নি– সে সময়ে কবির স্টিমার পদ্মা নদীতে ভাসমান এবং সে স্টিমারে বসেই তিনি তখন উদ্বোধনী সঙ্গীতটি লিখেছিলেন। সে সভাগৃহে নজরুল যখন উপস্থিত হন, তখন কাজী আব্দুল ওদুদ 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ছিলেন। "প্রবন্ধের অপ্রিয় কথা শুন্‌তে শুন্‌তে মজলিস অনেকটা উগ্র হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়ে কবির আগমনে চাঞ্চল্যটা কথঞ্চিৎ কমে গেল।" প্রবন্ধ পাঠ শেষে নজরুল 'খোশ আমদেদ' নামক গানটি পরিবেশন করেন। নজরুল স্বরচিত গজল-গান গেয়ে সেদিনের সভা সাঙ্গ করেন।

পরদিন সকালের অধিবেশন শুরু হয় নজরুলের গজল-গান দিয়ে। গজলের পর তিনি তাঁর নতুন কবিতা 'খালেদ' আবৃত্তি করে শোনান। 'শিখা'য় প্রকাশিত বার্ষিক বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়– এই আবৃত্তি শুনে "কয়েকজন স্থিতিশীল মৌলবী সাহেবের চোখ দিয়ে নাকি অশ্রু বের হয়েছিল।" কার্যসূচী অনুসারে সমালোচনার জন্য বিভিন্ন বক্তাকে আহ্বান করা হয়। নজরুল ইসলাম বলেন,

> "আজ আমি এই মজলিসে আমার আনন্দবার্তা ঘোষণা করছি। বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়েছে। আজ আমি দেখেছি এখানে মুসলমানের নূতন অভিযান

শুরু হয়েছে। আমি এই বার্তা চতুর্দিকে ঘোষণা করে বেড়াব। আর একটি কথা, এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের, কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, মোঃ আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ কতকগুলি গুণী ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে, এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর আমি চাইনা।"

নজরুল এখানে নিজেকে মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে ঘোষণা করেন। পরোক্ষভাবে সমকালীন রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ-প্রদত্ত কাফের আখ্যা জনিত বেদনার কথাও প্রকাশ পেয়েছে।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র সূত্রে নজরুলের সঙ্গে কাজী মোতাহার হোসেনের পরিচয় ঘটে। মোতাহার হোসেন প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে 'সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। নজরুল এই অধিবেশনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ফলে, সংগীতে উভয়ের সাধারণ অনুরাগই তাঁদের দু'জনের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন করে। বয়সে মোতাহার হোসেন দু'বছরের বড় হলেও অল্প দিনের মধ্যে তাঁদের সম্পর্ক তুমি-তোমাতে রূপান্তরিত হয়।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে নজরুল ঢাকায় এসে মাত্র তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। এই স্বল্পকালীন অবস্থানের কারণে ঢাকার সুধী সমাজের সঙ্গে কবির যোগাযোগ স্বাভাবিকভাবেই ছিল সীমিত। কাজী মোতাহের হোসেন অবশ্য একটি অনুষ্ঠানে নজরুলের যোগদানের কথা জানিয়েছেন। জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর হলে নজরুলকে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। কবি সেখানে তাঁর কতকগুলি জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন। যার একটি হল– 'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে!'

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে নজরুল পুনরায় ঢাকায় আসেন। প্রথমে আবুল হোসেনের বাসায় ওঠেন এবং সম্মেলন সমাপ্ত হবার পর তিনি বর্ধমান হাউসে কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের সঙ্গেঁ থাকেন। দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন নজরুল ইসলাম, তাঁর রচিত 'নতুনের গান' গেয়ে। গানটি তিনি আবুল হোসেনের বাসায় বসে লেখেন।

নজরুল-জীবনীকার রফিকুল ইসলামের মতে, কবি ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা আসেন এবং তৃতীয় সপ্তাহে ২৪।২।২৮ তারিখে ঢাকা ছেড়ে চলে যান। প্রায় আড়াই সপ্তাহ ঢাকায় কবির অবস্থানকাল হলেও তাঁর দিনগুলো এত ব্যস্ত ও কর্মচঞ্চল ছিল যে, পরবর্তীকালে অনেকের কাছে তা দীর্ঘ কয়েকমাস বলে প্রতিভাত হয়েছে। এমনকি কাজী মোতাহার হোসেনও লিখেছেন যে কবি এ সময়ে মাসাধিককাল ঢাকায় থাকলেও বহু সুধী ও সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন এবং অনেক সাহিত্য-সভায়, মজলিশে অথবা আড্ডায় শরীক হন।

ঢাকায় অবস্থানকালে নজরুলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংকশাস্ত্রের একজন কৃতী-ছাত্রী ও সুন্দরী তরুণী ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে। নজরুল যেদিন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন, সেদিন ফজিলাতুন্নেসা 'নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সূত্রেই তাঁদের পরিচয় হয়। আব্দুল কাদিরের মতে, যে বাড়িতে ফজিলাতুন্নেসা ও তাঁর ছোট বোন থাকতেন

নজরুল সে বাড়িতে মাত্র তিনদিন গিয়েছিলেন। এই স্বল্প সময়ের পরিচয়েই কবি হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে যে কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তার পরিচয় আমরা পাই কলকাতা থেকে মোতাহার হোসেনকে লেখা চিঠিপত্রে, 'সঞ্চিতা' কাব্য গ্রন্থটি ফজিলাতুন্নেসার নামে উৎসর্গ করার প্রস্তাবে এবং ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে কলকাতায় বসে লেখা কয়েকটি প্রেমের কবিতায়। তিনি ১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসের গোড়ার দিকে (সম্ভবত ১৯২৮-এর জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে) হঠাৎ করে ঢাকায় আসেন সবান্ধব। এই আগমনটা এত নাটকীয় যে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং বুদ্ধদেব বসু এর মনোজ্ঞ বর্ণনা না দিয়ে পারেন নি। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন–

> কোলকাতায় খেলার মাঠে বুঝি মোহন বাগানের জিত হলো, না কি এমন আশ্চর্য কিছু ঘটলো, স্ফুর্তির ঝোঁকে 'কল্লোল' দলের চার-পাঁচ জন খেলার মাঠ থেকে শেয়ালদা স্টেশনে এবং শেয়ালদা থেকে একেবারে ঢাকায় চলে এলেন। নজরুলকেও ধরে নিয়ে এলেন সঙ্গে (বুদ্ধদেব বসু– নজরুল ইসলাম 'কবিতা নজরুল সংখ্যা' ১৩৫১, পৃঃ ১৯)।

নজরুল এ সময় ঢাকায় এসে কতদিন ছিলেন, তা জানা যায়নি। বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতির আড্ডায়' নজরুলের অবস্থানের আমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও কাজী মোতাহার হোসেনের ওখানেই কবি উঠেছিলেন। বুড়িগঙ্গা-তীরবর্তী জমিদার বাড়ী 'রূপলাল হাউসে ও কবি আমন্ত্রিত হন। এই 'রূপলাল হাউস' ছিল ঢাকার বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'শান্তি'র কার্যালয়। 'শান্তি' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, ৮ ফাল্গুন এখানে একটি অধিবেশন হয়। "সেই সভায় বাংলার বিদ্রোহী চারণ কবি কাজী নজরুল ইসলাম উপস্থিত হইয়া তাহার সুমধুর স্বরচিত সঙ্গীতে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে পরম আপ্যায়িত করেছিলেন। সম্মিলনীর পক্ষ থেকে কবিকে একটি অভিনন্দন পত্রও দেয়া হয় এবং তিনিও একটি সংক্ষিপ্ত উত্তরে সকলের আনন্দ বর্ধন করেন ('শান্তি' ৮ ফাল্গুন ১৩৩৪)।

বুদ্ধদেব বসু যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি হলের 'সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক' মনোনীত হন। নজরুলের সম্মানার্থে তিনি জগন্নাথ হলে একটি সভা আহবান করেন। বুদ্ধদেব বসু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

> তাঁর জন্য আমি জগন্নাথ হলে যে সভাটি আহবান করেছিলাম, তাতে ভিড় জমেছিল প্রচুর, দূর শহর থেকে ইডেন কলেজের অধ্যাপিকারাও এসেছিলেন, তাঁর গান ও কবিতা আবৃত্তি শুনে সকলেই মুগ্ধ; মৃত অথবা বৃদ্ধ অথবা প্রাতিষ্ঠানীভূত না হওয়া পর্যন্ত কবিদের বিষয়ে যারা স্বাস্থ্যকরভাবে সন্দিগ্ধ, সেসব প্রাজ্ঞদেরও মানতে হয়েছিল যে, লোকটার মধ্যে কিছু আছে (বুদ্ধদেব বসু– আমার যৌবন)।

১৯২৭ সালে বুদ্ধদেব বসু ও অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকার এই পত্রিকার কার্যালয়ে তরুণ লেখকদের একটি সাহিত্যিক আড্ডা গড়ে ওঠে, যা 'প্রগতি আড্ডা' নামে পরিচিত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে এই 'প্রগতি আড্ডা'র একটি প্রাণবন্ত বর্ণনা করেন। বুদ্ধদেব বসু একাধিকবার এই আড্ডায় নজরুলকে নিয়ে আসেন এবং তাঁর হাসি ও গান উপভোগ করেন। জনশ্রুতি আছে যে, নজরুল হারমোনিয়াম এবং পানের কৌটা পাশে রেখে তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা করতে পারতেন। এমনি একটি গান রচনার বর্ণনা দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু।

সামনে হারমোনিয়াম, পাশে পানের কৌটো, হারমোনিয়ামের ঢাকনার উপর খোলা থাকে তাঁর খাতা আর ফাউন্টেনপেন। তিনি বাজাতে বাজাতে গেয়ে উঠলেন একটি লাইন, তাঁর বড়ো বড়ো সুগোল অক্ষরে লিখে রাখলেন খাতায়, আবার কিছুক্ষণ বাজনা শুধু দ্বিতীয় লাইন তৃতীয়-চতুর্থ দর্শকের নীরব অথবা সরব প্রশংসায় চর্চিত হয়ে ফিরে ফিরে গাইলেন সেই সদ্য রচিত স্তবকটি; এমনি করে, হয়তো আধ ঘণ্টার মধ্যে 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরান পিয়া' গানটি রচনা করতে আমি তাকে দেখেছিলাম। দৃশ্যটি আমার দেবভোগ্য বলে মনে হয়েছিল। 'প্রগতি' তে প্রকাশিত নজরুলের লেখা সেই গানটিই বোধ হয় প্রথম (বুদ্ধদেব বসু– আমার যৌবন)।

আবুল হোসেন সম্পাদিত 'শিখা' পত্রিকার প্রথম বর্ষে 'আসিলে কে গো অতিথি' গানটি প্রকাশিত হয়। কাজী মোতাহার হোসেন সম্পাদিত 'শিখা' ২য় বর্ষ (১৯২৮) সংখ্যায় নজরুলের 'নতুন গান' অর্থাৎ চল্ চল্ চল্ গানটি মুদ্রিত হয়।

১৯২৬-এর গোড়ার দিকে (ফাল্গুন, ১৩৩২) ঢাকায় 'শান্তি' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। যোগেশ চন্দ্র দাস সম্পাদিত এ পত্রিকায় নজরুলের বেশ কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। আমরা দু'টি রচনার সন্ধান পেয়েছি– একটি হচ্ছে ফাল্গুন ১৩৩৪ সংখ্যায় 'কেন উচাটন মন পরাণ এমন করে' এবং ১৩৩৫-এর ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় 'দাড়ি-বিলাপ' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতা। 'দাড়ি বিলাপ' কবিতাটির পাদটিকায় লেখা ছিল 'কোনো অধ্যাপক বন্ধুর দাড়িবধ স্মৃতি'। অনেকের অনুমান, কাজী মোতাহার হোসেন এ অধ্যাপক বন্ধু। কিন্তু কাজী মোতাহার হোসেন এ সম্পর্কে সরাসরি কিছু না লিখে বলেছেন, এর উৎস সন্ধান "গবেষণার ডক্টরেট থিসিস হতে পারে। কিন্তু কাব্যবোধ বা রসাস্বাদনের দিক থেকে এর বিশেষ মূল্য নেই।"

১৯২৮-এর ঢাকা আগমনের প্রায় এগার বছর পর ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ১২ ডিসেম্বর নব প্রতিষ্টিত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নজরুল ঢাকায় আসেন। কবির এই আগমন উপলক্ষে তিনি ঢাকায় মাত্র কয়েকদিন ছিলেন। তবে ইতোমধ্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আব্দুল কাদির জানাচ্ছেন, "কবি একদিন বিশ্বদ্যিালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সকাল ১০টায় এসে বেলা ১২টা পর্যন্ত ছাত্রদের মজলিসে গান করেন। সেখান থেকে সোজা ফজলুল হক হলে গিয়ে অপরাহ্ন ৩টা পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের চাহিদা অনুসারে গানের পর গান ও কবিতা আবৃত্তি করে শোনান" (ঢাকায় নজরুল– আব্দুল কাদির)। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের অনুষ্ঠান সম্পর্কে অধ্যক্ষ তোফাজ্জল হোসেন তাঁর 'স্মৃতি কণা' গ্রন্থে লিখেছেন,

> আমরা সলিমুল্লাহ হলের ছেলেরা কবিকে এনে হলের মঞ্চে তুলে অপূর্ব আত্মতৃপ্তি লাভ করতে লাগলাম। কবি প্রথমে 'যাকে হাতদিয়ে মালা দিতে পার নাই কেন মনে রাখ তারে' এ গানটি গেয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। সলিমুল্লাহ হলের মিলনায়তনে তিল ধারণ করার জায়গা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা অধ্যাপকগণ ও কবি জসিমউদ্দিনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তি আহুত হয়ে এসেছিলেন।

কবি জসীম উদ্দীনের 'স্মৃতি কথা'য়ও ফজলুল হক হলের সে অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি সলিমুল্লাহ হলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি লিখেছেন–

'দুপুর বেলা ক্লাস করিতেছি– দেখিলাম ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম। মেয়েরা সবাই অনুপস্থিত। কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, ফজলুল হক হলে নজরুল এসেছেন। সবাই তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছে। বেলা ৩টার সময় ফজলুল হক হলে গিয়ে দেখি, ছেলে-মেয়েদের চাহিদা অনুসারে কবি গানের পর গান গেয়ে চলেছেন, কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন। কবির মুখ শুষ্ক; সমস্ত অঙ্গ ক্লান্তিতে ভরা। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সেই যে সকাল দশটায় কবি এসেছেন, বারোটা পর্যন্ত মুসলিম হলে থেকে তারপর ফজলুল হক হলে আগমন করেছেন, ইহার মধ্যে অনেক পেয়ালা চা আর পান ছাড়া কিছুই কবিকে খেতে দেয়া হয়নি। আমার তখন কাঁদতে ইচ্ছা হলো (জসীম উদ্দীন– ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়)।

পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন মুসলিম হলের মিলনায়তনে নজরুলের বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাজী আব্দুল ওদুদ। তিনি তাঁর 'নজরুল প্রতিভা' গ্রন্থে লিখেছেন–

আমার 'রবীন্দ্রকাব্য'-এ কবির সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য আছে; সেটি একটি নিছক সাহিত্যিক মন্তব্য। কবির প্রতিভার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির অভাব তাতে নেই, তবু সে মন্তব্যে কবি আহত হয়েছিলেন, সে কথা ব্যক্ত হয় ঢাকার 'মুসলিম হলে' অনুষ্ঠিত তাঁর এক সংবর্ধনায় তাঁর প্রতিভাষণে । আমাকে করতে হয়েছিল সে সভায় সভাপতিত্ব। কবির কথায় কোনো উষ্মা বা ক্ষোভ প্রকাশ পায় নি, আমার মন্তব্যের উল্লেখ করে তিনি বলতে চেষ্টা করেছিলেন, কতখানি আবেগ বেদনায় 'বিদ্রোহী'র চরণগুলি উৎসারিত হয়েছিল।

নজরুলের স্বকণ্ঠে গান বা কবিতা শোনার জন্য ঢাকার তরুণ সমাজ বিশেষভাবে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। কারণ, তখন নজরুলের বাণী এবং নজরুল স্বয়ং একই সঙ্গে উপস্থিত। দর্শকশ্রোতার সঙ্গে নজরুলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটতো। পরস্পর যেন ভাব বিনিময় করতো। বুদ্ধদেব বসু যার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন–

ঘর-ভর্তি লোকের উপস্থিতি তাঁকে বিব্রত করে না মুহূর্তের জন্য, বরং অন্যদের চোখে চোখে তাকিয়ে হাসির উত্তরে হাসি ফুটিয়ে, তিনি যেন নতুন প্রেরণা সংগ্রহ করেন।

প্রাণ প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ নজরুল যখন মঞ্চে বসে আবৃত্তি বা গান করেন, তখন তা হয়ে ওঠে অবিস্মরণীয় ঘটনা।

কাজী মোতাহার হোসেনের মতো একজন সঙ্গীত-রসিকের দৃষ্টিতেও আমরা লক্ষ করি–

আমি অনেকবার শুনেছি নজরুল কী গভীর আবেগে, মীড় মূর্ছনা প্রভৃতি অলঙ্কারকে ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, রাগ থেকে রাগান্তরে গিয়ে, আবার পূর্ব-রাগে ফিরে আসতেন। ভিতরের প্রবল আবেগ বাইরে সুরের নব নব প্রকাশে নিপুণভাবে বিকশিত হত– শুনে অবাক লাগতো। (কাজী মোতাহার হোসেন, স্মৃতিপটে নজরুল – নজরুল একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬, পৃঃ ১০২)।

তিরিশের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাহিত্য অনুষ্ঠানে বা সাহিত্য প্রতিযোগিতায় নজরুলের গান বা কবিতা অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। এটি সম্ভবত নজরুলের স্বকণ্ঠে গান বা আবৃত্তি পরিবেশনেরই পরোক্ষ প্রভাব। ১৯৩৯ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে বার্ষিক

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নির্ধারিত কবিতা ছিল নজরুলের 'কান্ডারী হুঁশিয়ার'। সলিমুল্লাহ হলের এক সাহিত্য সভায় নজরুলের 'শাতিল আরব' কবিতাটি আবৃত্তি করা হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী এক ছাত্র সে অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন–

> একবার সলিমুল্লাহ্ হলে একটি সাহিত্য সভায় জনৈক ছাত্র নজরুলের বিখ্যাত 'শাতিল আরব' কবিতাটি আবৃত্তি করছিল। আরবী-ফার্সী শব্দবহুল এই কবিতাটির শুদ্ধ উচ্চারণ ঐ ছাত্রটি করতে পারছিল না দেখে মোহিত বাবুর (মোহিত লাল মজুমদার) শিল্পীমন আহত হয়। তিনি নিজে থেকেই আসন ছেড়ে মঞ্চে উঠলেন এবং ছেলেটির হাত থেকে বইটি অনেকটা কেড়ে নিয়েই তাঁর অনন্য-সাধারণ দক্ষতা দ্বারা কবিতাটির আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে দিলেন (তোফাজ্জল হোসেইন- স্মৃতিকণা, পৃঃ ৪৮)।

অনুরূপ আর একটি তথ্য পাওয়া যায়- "একবার সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জন্য মোহিতলাল বেছে দিয়েছিলেন 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম' কবিতা।

নজরুল ইসলাম সুস্থাবস্থায় শেষবারের মতো ঢাকায় আসেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ১২ ডিসেম্বরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। সেদিনই নজরুলের পরিচালনায় তাঁর লেখা সঙ্গীত বিচিত্রা 'পূবালী' প্রচারিত হয়। বলাবাহুল্য, ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠায় ঢাকার সংস্কৃতি চর্চার আর এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

নজরুল তাঁর জীবদ্দশায় ঢাকায় শেষবারের মতো আসেন ১৯৭২ সালে ২৪ মে। তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণক্রমে। আসার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সংশ্লিষ্টতা বিচ্ছিন্ন হয়নি। ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধি দেয়া হয়। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার নজরুলকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। ২১ ফেব্রুয়ারী তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

এরপর নজরুলের স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি ঘটতে থাকে। সে বছরই ২৯ আগষ্ট রোববার সকাল ১০.১০ মিনিটে কবি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়। এখানেই চিরকালের জন্য 'ঘুমিয়ে আছে শ্রান্ত হয়ে' বাংলার বুলবুল কবি নজরুল এবং প্রথম বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

স্মৃতির আলোকে ঢাকার সামাজিক অনুষ্ঠান

আমার জন্ম ঢাকার রহ্মতগঞ্জ নামের ছোট্ট একটি মহল্লায়। মহল্লাটি গড়ে উঠেছিল মুঘল আমলে। সতেরো শতকের শেষ দশকে এই অঞ্চলে নবাব ইব্রাহীম খান বসতি স্থাপন করেন। তিনি ১৬৮৯-৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঢাকার সুবাদার ছিলেন। পরবর্তী সুবাদার রহমত খানের নামানুসারে রহ্মতগঞ্জের নামকরণ হয়।

রহমতগঞ্জের উত্তরে রয়েছে ওয়াটার ওয়ার্কস রোড– চকবাজার থেকে পোস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নামকরণের কারণ, সেকালের ঢাকার একমাত্র পানি সরবরাহের কেন্দ্র ছিল, এই সড়কের উপর অবস্থিত। বুড়িগঙ্গার পানি পরিশোধন করে তখন ঢাকার সর্বত্র পানি সরবরাহ করা হতো। রহ্মতগঞ্জেরই পশ্চিম পার্শ্বে হলো চাঁদনীঘাট। সুবাদার ইসলাম খাঁর শাহী বজরা 'চাঁদনী' এই ঘাটে বাঁধা থাকতো। সেই সূত্রেই এই ঘাটের নামকরণ হয় 'চাঁদনী ঘাট'। এটি ছিল সংরক্ষিত ঘাট। এই ঘাটে অন্য কোনো নৌযান ভিড়তে দেয়া হতো না; রহমতগঞ্জের পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে গনি মিয়া রোড, যার নামানুসারে 'গনি মিয়ার হাট' সমধিক পরিচিত। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী– বর্ষাকালে এই নদী, গনি মিয়ার হাট পর্যন্ত বিস্তৃত হতো। রহমতগঞ্জের আশে পাশে রয়েছে লালবাগ কেল্লা, ছোটকাট্‌রা ও বড় কাট্‌রা।

রহমতগঞ্জে আমরা নানাবাড়িতে বড় হয়েছি। আমাদের নানার নাম হাজী পিয়ার বখ্‌শ। আমরা তিনভাই মহল্লায় হাজী সাহেবের নাতি হিসাবে পরিচিত ছিলাম। আমাদের আব্বা ছিলেন কথা-সাহিত্যিক মোহাম্মদ কাসেম। মহল্লার লোকজন তাঁকে সম্মান করে বলতো– কবি সাহেব। আর তাঁদের কাছে ঢাকাই রসিকতায় আমরা ছিলাম– 'কবি সাহেবের লতা-পাতা'।

আব্বাজানের কর্মস্থল তখন ছিল কোলকাতা। কার্যব্যাপদেশে তিনি মাঝে মাঝেই কোলকাতায় যেতেন। তিনি ঢাকায় থাকুন বা না থাকুন, নানাভাই ছিলেন আমাদের একমাত্র অভিভাবক। তাঁরই নির্দেশে আমাদের তিন ভাই-এর খত্‌না একসঙ্গে সম্পন্ন হয়। এটা ছিল আমাদের বাড়িতে প্রথম সামাজিক অনুষ্ঠান। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমি ছিলাম একটু ভীতু প্রকৃতির। খত্‌না অনুষ্ঠান-এর সময় আমি ভয়ে হাত পা ছুঁড়ে কেঁদে কেঁদে চীৎকার করেছিলাম। নানাভাই তখন আমাকে পাঁজাকোলা করে ধরে, আমায় শান্ত করেন।

ঢাকাবাসীদের ভাষায় খত্‌নার অপর নাম 'মুসলমানী'। কেউ কেউ একে 'সুন্নত করা'ও বলতো। সেকালের ঢাকায় এটি ছিল বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান। জীবনে যাঁদের কখনো দেখিনি, এসময় তাদেরও উপস্থিতি দেখা দেল। প্রচলিত রেওয়াজ অনুসারে তাঁরা প্রায় সবাই বিস্কুট জাতীয় শুক্‌নো খাবার আমাদের জন্য নিয়ে আসেন। এই উপলক্ষে প্রথম গোসলের দিনটি মহা ধূমধামে পালিত হতো। ঢাকায় এটি 'মাথায় পানি দেওয়া' নামে পরিচিত। নানাভাই এবং নানী পরম উৎসাহে আমাদের গোসলের অনুষ্ঠানটির

আয়োজন করেন। ঢাকাবাসীদের এ জাতীয় অনুষ্ঠানপ্রিয়তায় আব্বাজানের সায় না থাকলেও তাঁদের আগ্রহে অনুষ্ঠানের পক্ষে তিনি সম্মত হন।

'মাথায় পানি দেওয়া' উপলক্ষে বিশেষ দিনটিতে সকল আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়া হয়। বৈদ্যুতিক বাতি তখনো আমাদের বাড়িতে আসেনি, তাই অতিথি অভ্যাগতদের জন্য মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য কোনো বাবুর্চিকে ডাকা হয়নি। আমাদের বড়নানী এবং পাড়া প্রতিবেশীর সহায়তায় আম্মাজানই রান্নার যাবতীয় আয়োজন সুসম্পন্ন করেন। ঢাকাবাসীরা এজাতীয় অনুষ্ঠানে গান বাজনার ব্যবস্থা করে থাকে। ভাড়াটে গায়িকা বা 'মেরাসিন'-দের ডাকা না হলে, লাউডস্পিকারের সাহায্যে 'গ্রামোফোন' বা কলের গান বাজানো হতো। নানীর বিশেষ আগ্রহে আমাদের বাড়িতে এ অনুষ্ঠানে লাউডস্পিকার আনা হয়। সারাদিন ধরে বাজানো হয় হিন্দী এবং কিছু বাংলা গান। শুধু তাই নয়, আমাদের তিন ভাইকে নতুন পোশাকে সাজিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে চকবাজার ঘুরিয়ে আনা হয়। ঢাকাবাসীরা এক্ষেত্রে পাগড়ী মাথায় বর-বেশে তাদের ছেলেদের সাজাতো। সেকালে, ঢাকায় খত্না উপলক্ষে, মেয়েদের কান-ফোঁড়ানো উপলক্ষে অথবা বিয়ে শাদীতে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র চকবাজারে কয়েক চক্কর ঘুরিয়ে আনার রেওয়াজ বহুকাল ধরে প্রচলিত ছিল।

আব্বাজান নিজেও বেশ কয়েকজনকে মধ্যাহ্ন-ভোজের দাওয়াত দিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন আব্বার বইয়ের দোকানের মোহাম্মদ আলী চাচা, পার্শ্ববর্তী দোকানের মালিক বিভূতিবাবু এবং সহপাঠী সৈয়দ আলী রেজা। অনেকেই খেলনা, বই এবং প্রসাধনী দ্রব্য উপহার দিয়েছিলেন। আত্মীয়-স্বজন যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই নগদ টাকা উপহার দেন। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য আমাদের বাড়ির পার্শ্ববর্তী ভাড়া-করা পড়ার ঘরটিকে ঝেড়ে মুছে আমরা নিজেরাই পরিষ্কার করেছিলাম।

ঢাকাবাসীদের অনুষ্ঠানপ্রিয়তা কিংবদন্তী তুল্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে 'বিবাহ' এদের কাছে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। ছেলেবেলায়, রহমতগঞ্জে, বেশ কয়েকটি বিবাহ-অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছিল। প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল 'পানচিনির' অনুষ্ঠান, যেখানে বরপক্ষ ক'নে বাড়িতে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহের প্রস্তাব দেয় এবং দেন-মোহর ও অন্যান্য 'দান-দেহাজের' বিষয় স্থির করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ঘটকের মারফতেই চূড়ান্ত হয়। মেয়ে-ঘটক বা 'মোতাসা'(পেশাজীবী ঘটক) এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ, বর বা ক'নে উভয়পক্ষের অন্দর-মহলে, এঁদের অবাধ গতিবিধি থাকে। এঁরাই পাত্র-পাত্রীর সংবাদ আদান-প্রদান করে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সেকালে ঢাকায় পর্দা বা অবরোধ প্রথা কঠোরভাবে পালিত হতো। কোনো পুরুষমানুষ কোনো কাজে ছাদে উঠলে, আশেপাশের বাড়ির মহিলাদের সতর্ক করে দেয়ার জন্য চীৎকার করে বলতো 'ছাদপার আদ্‌মী ওঠে.... ছাদ পার আদ্‌মী ও–ঠে।" 'পানিচিনি-'র অনুষ্ঠানকে যদিও 'পাকাকথা'র অনুষ্ঠান বলা হয়ে থাকে, তবুও এই 'মোতাসা'-রাই 'পাকা-কথা' অনুষ্ঠানে পূর্বাহ্নে 'লেন-দেন'-এর পাকা-ব্যবস্থা ক'রে রাখে। 'পাকা-কথা' অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বরপক্ষের এক প্রতিনিধি দল ক'নের

বাড়িতে যায়। সঙ্গে তাদের প্রচুর মিঠাই-মণ্ডা ও পান-সুপারি ইত্যাদি নিয়ে যেতে হয়। 'পাকা-কথা' অনুষ্ঠানের পর কন্যাপক্ষ তাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে পান-সুপারি ও মিঠাই-মণ্ডা-সহ সুসংবাদটি পৌঁছে দেয়। সেকালে, এই পান-চিনি অনুষ্ঠানে, বরের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। পান-চিনি অনুষ্ঠানে আপ্যায়নের ঘনঘটা একটু বেশিই হয়ে থাকে। এটাকে তারা 'খাস-আপ্যায়ন' বলেই ভূরি-ভোজনের বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকে, কারণ বরপক্ষকে এটাই তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক আপ্যায়ন, যা বিবাহের দিন 'আম' বা সাধারণ-আপ্যায়ন থেকে পৃথক। অবশ্য নিম্ন-বিত্তদের ক্ষেত্রে, এর কিছু ব্যতিক্রম হয়ে থাকে।

ঢাকাবাসীদের ভাষায় 'পয়সাওয়ালা' অর্থাৎ, উচ্চ-বিত্ত সমাজে, যৌতুক বা দান-দেহাজের ক্ষেত্রে বিত্ত-প্রদর্শনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বরকে প্রদত্ত আসবাবপত্র, গৃহস্থালির তৈজসপত্র এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিলাস-দ্রব্যও কুলির মাথায় চাপিয়ে বিয়ের দিন বা তার আগে, মিছিল করে বরের বাড়িতে বা মজলিশে পৌঁছে দেয়া হতো। সম্ভব হলে ব্যাণ্ড পার্টিও থাকতো। নিম্ন-বিত্ত সমাজে 'দান-দেহেজে'র বাহুল্য বা প্রদর্শন দেখিনি।

পুরোনো ঢাকায় বিয়ের অনুষ্ঠান ধূমধামের সঙ্গে পালিত হয়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনেরা বিয়ের কয়েকদিন আগেই সপরিবারে এসে হাজির হয়। ঢাকায় রিক্‌শা চালু হবার পর মহিলা বা অন্দরমহলের বাসিন্দারা রিকশায় করে আসতো। তবে, পর্দা-রক্ষার প্রয়োজনে, শাড়ি দিয়ে, রিকসাটিকে, ঘিরে রাখা হতো। রিকশা-প্রচলনের আগে, ঢাকার সাধারণ যান-বাহন ঘোড়ার গাড়িতে করেই সবাই আসতো। পুরুষ যাত্রী হ'লে,জানালা খোলা থাকতো। আর, মহিলা যাত্রীর ক্ষেত্রে জানালার খড়খড়ি তুলে দেওয়া হতো। মেহ্‌মানদের আগমনের সময়, আরেকটি বিষয় লক্ষ করেছি, তা হলো– বিয়েবাড়ির গৃহকর্তা রিকশা ভাড়া বা ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া নিজেই মিটিয়ে দিতেন।

বিয়ের তিনচারদিন আগে থেকেই মেহমানদের আগমনের প্রধান কারণ হলো– বিয়ের দু'তিনদিন আগে থেকে শুরু হয় বর বা কনের গায়ে হলুদের পালা। ঢাকাবাসীদের ভাষায় গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের নাম– 'হলদী' বা 'তেলাই'। আত্মীয়-পরিজনদের কলরোল আর চারপাশের গান বাজনার মধ্যে শুরু হয়– 'গায়ে হলুদ' ব' তেলাই অনুষ্ঠান। এটা ছিল বর বা কনের স্নানের পূর্বে গায়ে তেল বা হলুদ বাটা দিয়ে গা মার্জন করার অনুষ্ঠান। সাধারণত প্রথমে বরপক্ষের লোকজন তত্ত্ব ও মিষ্টি বা অন্যান্য গায়ে হলুদের উপচার নিয়ে ক'নের বাড়িতে যায়। এই উপচারের সঙ্গে অবশ্যই থাকতো দই এবং বেশ বড় আকারের দুটি মাছ। একটি বরের প্রতীক, অন্যটি কনের। সেকারণে বর-রূপ মাছের মুখে গুঁজে দেয়া হয় সিগারেট। অন্য মাছটির মুখ কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। মাছ যে কুটবে, তার উপঢৌকনস্বরূপ মাছের ভেতরে টাকাও দেয়া হয়ে থাকে। এই মাছ ভেজে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে আগত বরের বাড়ির লোকজনকে আপ্যায়িত করা হয়। এই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে, সাধারণত মেয়েরাই অংশগ্রহণ করতো। শুধু তাই নয়, এই অনুষ্ঠানের হলুদ কোটা বা বাটার দায়িত্বও বাড়ির মেয়েরা বা অতিথিরা পালন করে থাকে। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে, অধুনা-প্রচলিত হলুদ শাড়ি পরিধানের রেওয়াজ আমি সেকালে দেখিনি। গায়ে হলুদের দিন আচার অনুষ্ঠান-শেষে, আত্মীয় স্বজন ও দুই পক্ষের

অতিথিদের মুখেও হলুদ মাখামাখির পর শুরু হয়– রঙ্ ছিটানোর খেলা। বরপক্ষের লোকেরা পিচ্‌কিরীর রঙে বা আবীরের রঙে, অনেকটা নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরে যাবার সময় বলে যায় যে, পরবর্তী দিন বা বরের গায়ে হলুদের দিন তারা এর প্রতিশোধ নেবে।

বরের গায়ে হলুদের দিনও তত্ত্ব এবং উপচারাদি নিয়ে, কন্যার বাড়ি থেকে আগত মেহ্‌মানরা রং ছিটাছিটি ও হলুদ মাখামাখি অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে।

সেকালে বিবাহ উপলক্ষে ডেকোরেটার দিয়ে বিয়েবাড়ির তোরণ নির্মাণের রেওয়াজ খুব কমই ছিল। সাধারণত গলির মোড়ে, অথবা বিয়ে বাড়ির সামনে কলাগাছ স্থাপন করা হতো। তাতে গাঁথা হতো লাল নীল সবুজ কাগজের অনেকগুলো নিশান। বাড়ির সামনে সারাটা রাস্তা জুড়ে থাকতো দড়িতে ঝোলানো নানা রঙ্-এর ত্রিকোণাকার পতাকা। অনেকসময় বিয়ে বাড়ির বাইরে এবং ভেতরে নানা রং-এর কাগজ দিয়ে তৈরী শেকল ঝোলানো হতো। এসময় আরেকটি শিল্পকর্ম দেখা যেত। বাড়ির তরুণ যুবকেরা পাতলা রঙীন কাগজ কেটে বা টুক্‌রো করে তৈরী করত কাগজ-কাটা, নানা রংএর, জাফ্‌রী। এগুলো বাড়ির দরজা বা জানালার উপরে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। এই কাগজ-কাটা নকশাগুলো ছিল কত বিচিত্র!

বিয়ের আগে পাত্রপাত্রীর নিজ নিজ বাড়িতে অবিবাহিত অবস্থার শেষ অন্নগ্রহণ অনুষ্ঠানও বেশ ঘটা করে পালিত হয়। একে বলা হয় 'আইবুড় ভাত'। আইবুড় শব্দটি অবিবাহিত অর্থবাচক 'অব্যূঢ়' শব্দ থেকে এসেছে। পাত্রীর বাড়িতে এ অনুষ্ঠানকে অনেকে 'কুমারী ভাত'-ও বলে থাকে। বিরাট একটা ডালায় সাজানো হয় মাংস, মাছ, ডিম এবং পঞ্চব্যজন সহ পোলাও। পাত্র বা পাত্রীর বন্ধুবান্ধব এবং সমবয়সী আত্মীয় স্বজন চারপাশে গোল হয়ে বসে প্রথমে পাত্র বা পাত্রীর মুখে গ্রাস তুলে দিয়ে নিজেরা খেতে থাকে। আশে-পাশে হাস্যমুখর মুরুব্বীরা সে অনুষ্ঠানে আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে থাকে।

সেকালে, ঢাকাবাসীদের মধ্যে, বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র ছেপে দেয়ার বিশেষ প্রচলন ছিল না। সাধারণত মুখে মুখেই দাওয়াত দেয়া হতো। তবে, নিমন্ত্রিতদের বাড়িতে গিয়ে, দাওয়াত পৌঁছে না দিলে নিমন্ত্রিতদের অসম্মান করার সমতুল্য বিষয় ছিল। মহিলারা, অন্দরমহলে দাওয়াত দিতে এলে রাংতায় মোড়া 'লবঙ্গ' উপহার দিয়ে যেতো। সম্ভবত এটি নিমন্ত্রিতদের জন্য নিমন্ত্রণ পত্রের বদলে, দাওয়াতের সঠিক তারিখের 'স্মরনিকা'-রূপে বিলি করে বাড়ি বাড়ি দেওয়া হতো।

আব্বা বা অন্যকোন আত্মীয়ের সঙ্গে, বেশ কয়েকটি বিয়ের বরযাত্রীও হয়েছিলাম। অবস্থাপন্নদের বিয়েতে, বরযাত্রীরা মিছিল করে টমটম্‌গাড়ি হাঁকিয়ে চকবাজার ঘুরে, ক'নে বাড়িতে যেতো। বরের সঙ্গে আরো দুয়েকটি টম্‌টম্ গাড়ি ছাড়াও পেছনে থাকতো ঘোড়ার গাড়ির মিছিল। এই মিছিল চকবাজারের চারপাশে কয়েক চক্কর ঘুরে তারপর যথাস্থানে রওয়ানা দিত। কোন বরযাত্রী চকবাজারের চতুষ্পার্শ্বে কয় চক্কর ঘুরতো, তাতে বরপক্ষের মান-ইজ্জত বা বিত্ত প্রকাশ পেত। রাস্তার দু'পাশের লোক দাঁড়িয়ে, এক দুই, তিন ক'রে, চক্কর গুন্‌তে থাকতো। সাধারণ বিত্তের লোক হ'লে, অথবা কন্যাপক্ষের বাড়ি খুব কাছে হলে, বরযাত্রীরা, হেঁটেই রওয়ানা দিত। এরকম দু'য়েকটি বরযাত্রায় আমি শরীক

হয়েছিলাম। পদব্রজে বরযাত্রার সঙ্গে দু'য়েকটি হ্যাজাক-বাতিরও ব্যবস্থা থাকতো।

একটি ব্যতিক্রমধর্মী বরযাত্রায়ও শরীক হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেটি ছিল আব্বারই এক বন্ধুর বিয়ের বরযাত্রা। কন্যাপক্ষের বাড়ি ছিল নদীর ওপারে জিঞ্জিরায়। রহমতগঞ্জ থেকে, বরযাত্রীরা রওয়ানা হয়, বিরাট এক বজরায় করে। বজরাটি লাল সবুজ কাগজের নিশান দিয়ে সাজানো হয়েছিল। বজরার এক কোণে উর্দি-পরা ব্যান্ডপার্টির লোকেরা বাজনা বাজাচ্ছিল। নৌকায় বরযাত্রী হওয়ার আনন্দে আমার ন্যায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করছিল। বজরাটি জিঞ্জিরার কাছাকাছি যাওয়ার পর পট্‌কা ফুটানোর ধূম পড়ে যায়। সেকালে, বরযাত্রার সময় পট্‌কা ফোটানোর বিশেষ রেওয়াজ ছিল– তা পদব্রজেই হোক্ বা নৌকা কিম্বা টম্‌টম্ গাড়িতেই হোক্। বিয়ে উপলক্ষে 'হাউই' বাজি পোড়ানো এবং ফানুস উড়ানোরও রেওয়াজ ছিল। এটা অবশ্য বিত্তবানদের বিত্ত প্রদর্শনেরই একটি অঙ্গ।

সেকালে, বিয়ের আসরের জন্য এমন কোনো কম্যুনিটি সেন্টার বা হলরুম ছিল না; প্রায়ক্ষেত্রেই কন্যার বাড়ির নিকটবর্তী মসজিদে, নামাজের সময় বাদ দিয়ে, এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। অনেক সময় কন্যাপক্ষের বাড়ির নিকটবর্তী কোনো বাড়িতে বা কোনো কোনো বৈঠকখানায়, বিয়ের আসরের ব্যবস্থা করা হতো। সাধারণত, বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা কাজী সাহেব বা মসজিদের ইমামসাহেব সম্পন্ন করতেন। কন্যার সম্পতি বা 'এজিন' আনার জন্য কন্যার বাড়িতে অন্দরমহলের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, মুরুব্বীরা তা' নিজ কানে শুনে বিয়ের আসরে, কাজী সাহেবের কাছে ফিরে আসতেন। এজিন বা কবুল অনুষ্ঠানের যিনি প্রধান সাক্ষী হন, তাকে ঢাকাবাসীরা 'উকিল বাপ' বলে থাকে। সারা বছর বর কনের খোঁজ খবর নেওয়া, মাঝে মাঝে উপঢৌকন প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব এই উকিল বাপকে পালন করতে হয়।

মসজিদে বা বিয়ের আসরে বসেই 'কাবিন নামাহ্' লেখা হতো। আমার মামার বিয়েতে এই কাবিন নামাহ্ লেখার সময়, এক কৌতুকপ্রদ ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল। কাবিনে, বরের নাম লেখার পর কাজি সাহেব, কন্যার নাম জিজ্ঞাসা করেন। কন্যার পিতা তখন তাঁর নিজ স্ত্রীর নাম ভুলে বলে ফেলেন। বর, অর্থাৎ আমার মামা মুখের রুমাল সরিয়ে, পার্শ্ববর্তী সহচরকে ফিস্‌ফিস্ করে জানালেন যে– নামটি ভুল। যা হোক– কন্যার পিতা নিজের ভুল বুঝতে পেরে কন্যার প্রকৃত নাম কাজী সাহেবকে জানান। এ-ঘটনায় অনেকের মুখেই মুচ্‌কি হাসি দেখা দিয়েছিল।

সেকালের বিয়েতে, একটি আকর্ষণীয় ঘটনা ছিল 'প্রীতি-উপহার' বিতরণ। একজাতীয় পাত্‌লা ও স্বচ্ছ রুমাল-জাতীয় রঙ্গীণ বর্ডার আঁকা কাগজে, এই 'প্রীতি-উপহার' ছাপা হতো। এই প্রীতি-উপহার-পত্রে সাধারণ রঙীন কাগজেরও ব্যবহার দেখেছি। বর বা কন্যাপক্ষের তরুণ তরুণী, অথবা বালক-বালিকারা বর বা কনেকে লক্ষ্য করে, অভ্যর্থনা জানিয়ে, বিশেষ কবিতা রচনা করে রুমাল-সদৃশ এই প্রীতি উপহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করতো। সাধারণত প্রেসে মজুদ বিভিন্ন পুরোনো 'প্রীতি উপহার পত্র" দেখে বর বা কন্যার নাম যথাস্থানে উল্লেখ করে, ছাপার ব্যবস্থা করা হতো। তাছাড়া, কেউ কেউ নতুন ক'রে নিজেরাও পদ্য লিখে 'প্রীতি-উপাহার-পত্র' ছাপাতো। সমকালীন

বিষয়েরও প্রক্ষেপ এতে লক্ষ করা যেতো। যেমন– একটি উপহার-পত্রে দেখেছিলাম, দস্যু মোহনের ছদ্মবেশে বরের আগমন ঘটেছে বন্দিনী কন্যারূপী 'রমা' নামের মেয়েকে উদ্ধারের জন্য। কোনো কোনো প্রীতি-উপহার-পত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘনও লক্ষ করা যেতো। বরের আগমনের পরপরই উভয়পক্ষের লোকেরা, নিজ নিজ উপহার-পত্র বিলি করতো। এই প্রীতি উপহার-পত্র সংগ্রহ করতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ও তরুণ তরুণীরা বিশেষ তৎপর হ'তো।

আব্বাজানের সঙ্গে 'বজরা'তে ক'রে জিঞ্জিরায় এক বরযাত্রায় যাওয়ার পর তিনি, বিয়ের আসরে অভিনব এক 'প্রীতি-উপহার' বিলি করেন। তিনি পুস্তিকার আকারে প্রীতি-উপহার পত্র সঙ্কলন ও সম্পাদনা করে তা ঢাকা থেকেই ছেপে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটি বর বা কনেকে সম্বোধন করে লেখা, সনাতন-প্রকৃতির উপহার-পত্র ছিল না। এটি ছিল অনেকটা আশীর্বাণীর সঙ্কলন। পরবর্তীকালে, আব্বাজানের পুরোনো কাগজপত্রের মধ্যে তাঁরই সম্পাদিত অনুরূপ আর একটি আশীর্বাণী নির্ভর উপহার-পত্র আবিষ্কার করি। আব্বাজান যখন নারায়ণগঞ্জের 'সবুজ-বাংলা' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন, তখন পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারীর বিয়ে হয়। এই বিয়ে উপলক্ষে আব্বাজান সেই উপহারপত্রটি ছেপে বিলি করার ব্যবস্থা করেন। এ উপহার পুস্তিকায় মোহিতলাল মজুমদার, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী আবদুল ওদুদ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের আশীর্বাণী সঙ্কলিত হয়েছিল। একালে বিবাহে প্রীতি-উপহার-পত্র বিলি করার রীতি লোপ পেয়েছে। আমাদের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির মধ্যে এটিও একটি। একালের ন্যায় সুদৃশ্য রঙীন প্যাকিং কাগজে মোড়া বিয়ের উপহার প্রদান তখনো বহুল প্রচলিত হয়নি। সাধারণ বিত্তের মধ্যে বিয়ের উপহার প্রদান বিয়ের মজলিশেই সম্পন্ন হতো। কোনোরকম মোড়ক ছাড়াই ছাতা, হ্যারিকেন, টর্চলাইট, পশমী শাল ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার্য দ্রব্যাদি মজলিশে উপহার দিতে দেখেছি। নগদ-টাকা-পয়সাও বরের সামনে বিছানো একটি চাদরে বিয়ের উপহার হিসাবে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। একে 'সেলামী' বলা হতো। কারণ, টাকা প্রদানের সময় আত্মীয়স্বজনরা আত্ম-পরিচয় দিলে, বর তাকে 'সালাম' জানাতো।

মসজিদে অনুষ্ঠিত বিয়ের কাজকর্ম সম্পন্ন হলে খোরমা বা মিষ্টান্ন বিতরণ করা হতো। বরপক্ষের খাস অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকতো। বিত্তবান্‌দের মধ্যে পোলাও-কোর্মার ব্যবস্থা থাকলেও সাধারণভাবে, ছোলার ডাল-সম্বলিত গোশ্‌তের তরকারী ও ভাতের আয়োজন করা হতো। আহারাদি সম্পন্ন হলে বরপক্ষের সামনে একটি গাছের ডালে পানের খিলি ঝুলিয়ে দেয়া হতো। অতিথিরা পানের খিলি তুলে সেখানে বা থালায় টাকা বখশিস রাখতো।

বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবার পর বরকে অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হতো। অনেক বাড়িতেই এসময় বরের সঙ্গে কোনো পুরুষ-সহচরের প্রবেশাধিকার ছিল না। অন্দর-মহল যেন মহিলাদেরই রাজত্ব। সেখানে বিশেষ করে, শ্যালক-শ্যালিকাদের আধিপত্য অনেক, বরের কাছে ছিল যা ভীতিপ্রদ। অন্যান্য দেশের কথা জানি না, তবে বরের সঙ্গে শ্যালক-শ্যালিকার ঠাট্টার সম্পর্ক যেন বাঙালি সংস্কৃতিরই অঙ্গ। বিয়ের মজলিসে বা অন্দরমহলে প্রবেশের সময় শ্যালক-শ্যালিকা বা তরুণ-তরুণীদের সদর-দরজার

প্রতিবন্ধকতা পার হতে অনেক বরকে হিমশিম খেতে দেখেছি। গেট ধরা বা বরাগমনে বাধা সৃষ্টি ক'রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের অর্থপ্রদানের পরই এ অবস্থার নিষ্কৃতি ঘটে।

মজলিসে বা অন্দরমহলে বরকে জব্দ করার প্রথম প্রকরণ দেখেছি এক গ্লাস শরবত। অনেক সময় লবণাক্ত শরবত পরিবেশন করতেও দেখা গেছে। বরের সামনে যে শরবতের গ্লাস দেয়া হতো, তা ছিল উল্টো গ্লাস। অর্থাৎ গ্লাসের উপরে তস্‌তরির ঢাকনা থাকে না, তস্তরি থাকে উল্টো রাখা শরবত ভর্তি গ্লাসের নিচে। কৌশলে তসতরিসহ গ্লাস উল্টে শরবত পান করতে হয়। এখানে বরের বুদ্ধিমত্তার প্রথম পরীক্ষা হয়ে থাকে।

অন্দরমহলে স্ত্রী-আচার বা শ্যালক-শ্যালিকাদের উপদ্রব, কালের ব্যবধানে খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি। ষাট সত্তর বৎসর আগে বর কনের প্রাকবৈবাহিক মুখদর্শন সমাজ সমর্থিত ছিল না। তাই সেকালে অন্দরমহলে আয়নায় স্বামী-স্ত্রীর প্রথম শুভদৃষ্টি বা শাহ নজর উভয়ের জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল।

বিবাহ মানেই আনন্দ উৎসব। তাই বিয়ে উপলক্ষে বিনোদন অর্থাৎ গান-বাজনার ধূম পড়ে যায়। বিয়ে উপলক্ষে পুরোনো ঢাকায় কয়েকদিন ধরে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা লাউডস্পীকারে রেকর্ডের গান শোনার তিক্ত অভিজ্ঞতা অনেকেরই রয়েছে। লাউডস্পিকারের প্রচলন হওয়ার আগে বিয়ে বাড়িতে অতিথিদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য সঙ্গীতের বিকল্প ব্যবস্থা চালু ছিল। পুরোনো ঢাকায় 'মেরাসিন' নামে পরিচিত একদল গায়িকা দিন রাত গান গেয়ে শোনাতো। ঢোল ও করতাল বাজিয়ে তারা গান গাইতো। মনে পড়ে, আমার মামার বিয়েতে সেই দিন বাড়িতে মেরাসিন এসেছিল। এরা নিজেরা উর্দুতে কথা বলতো এবং হিন্দী বা উর্দু ভাষায় গান গাইতো। মাঝে মাঝে এরা গানের সঙ্গে নাচও পরিবেশন করতো। তখন এদের গানের আসরে ছোটদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। লুকিয়ে যারা তাদের নাচ গান দেখেছে, তাদের মুখে শুনেছি মেরাসিনরা পুরুষ মেয়ের বেশে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীসহ গান গায়।

বিয়ের পর বরের গৃহে বর ক'নের আগমন নিয়েও কিছু আনুষ্ঠানিকতা প্রচলিত ছিল। আঙ্গিনা বা উঠান অথবা বাড়ির ঘর-বিশেষে বরকনের জন্য পিঁড়ি বা আসনের সুসজ্জিত ব্যবস্থা করা হতো। গাড়ি বা বিশেষ শকট থেকে নামার পর পায়ে হেঁটে, কখনো বা ক'নেকে কোলে ক'রে নিয়ে সেই আসনে দাঁড় করানো হতো। ধান, দূর্বা, প্রদীপ ইত্যাদি দিয়ে সাজানো বরণডালা সঞ্চালন ক'রে নব-দম্পতিকে বরণ করা হয়। নববধুর আগমনকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনারূপে বিবেচনা ক'রে, দুধ এবং আলতা মেশানো পানি দিয়ে বধূর পা ধোয়ানো হতো। বিয়ের আসরে শাহ্ নজর না হয়ে থাকলে এ সময় শাহনজরের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে। এ পর্যায়ে পরস্পরের হাতে মিষ্টিমুখও করানো হয়।

বিবাহ -অনুষ্ঠানের পরদিন আরেকটি অনুষ্ঠান দেখেছি, যা' আমার কাছে বেশ কৌতুকপ্রদ মনে হয়েছিল। প্রথমে দেখলাম বর ক'নেকে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে এক কাঁদি ঝুলন্ত পাকা কলার নিচ দিয়ে নিয়ে যায়। তারপর দেখলাম, একটি পানিভর্তি মাটির হাঁড়িতে পাট-খড়ির দু'টো টুক্‌রা পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হলো। চারপাশের সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে থাকে– কখন ভাসমান শোলা বা পাটখড়ি দু'টি পাশাপাশি মিশে

যায়। সবাই শোলাদু'টিকে বর ও কনের প্রতীকরূপেই কল্পনা করে নেয়। আরো দেখেছি, মাটিতে বিছিয়ে রাখা হাঁড়িভাঙ্গার কয়েকটি টুক্রোর (ঢাকাবাসীরা বলে– চাড়া) উপর বর কনে হেঁটে যায়। তাদের পায়ের চাপে 'চাড়া'র টুকরা যত বেশি খন্ড খন্ড হয়ে যায়, ততই মঙ্গল। ধরে নেয়া হয় নববধূ ভাগ্যবতী এবং বহু সন্তান-সম্ভবা।

কোনো কোনো বিয়েতে বর কনের বুদ্ধিযাচাইয়ের একটি বিশেষ খেলাও দেখেছি। তা হলো মাটিতে ছোট্ট একটি গর্ত করে গর্তের দুপাশে বরকনে অর্থাৎ দুই প্রতিযোগীকে বসিয়ে দেওয়া হয়। গর্তটি পানিতে ভর্তি করার পর প্রথমে বর ও পরে কনে ঐ গর্তের ভেতর কড়ি, সোনার আংটি বা অন্য কোনো ছোট্ট বস্তু লুকিয়ে রাখে এবং প্রতিপক্ষকে তা খুঁজে বার করতে আহ্বান জানায়। বস্তুগুলো যে যত তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করে, সেই-ই জয়ী হয়।

বিয়ের পরদিন বরের বাড়িতে রঙ ছিটানোর খেলা বেশ জমে উঠে। এই রঙয়ের খেলা সৌহার্দ্য বিনিময়েরই খেলা।

বিয়ে উপলক্ষে ফুলের ব্যবহার সেকালের ঢাকায়ও প্রচলিত ছিল। তবে, সেকালে, ব্যাপক আকারে, ফুলের চাষ ছিল না এবং ফুলের দোকানও সর্বত্র নজরে পড়তো না। বিয়েতে বরের বাড়ি থেকে ক'নের বাড়িতে ডালা পাঠানো হতো। কাঁচা কাঁঠাল পাতা দিয়ে তৈরী এই সাজির ভেতরে থাকতো কন্যার জন্য তৈরী ফুলের হার, চুড়ি, মালা ইত্যাদি গহনা। পঞ্চাশ ষাটবছর আগে, দু'টি বিশেষ জায়গায় মালাকরদের ফুলের পসরা সাজিয়ে বসতে দেখেছি। একটি হচ্ছে– চকবাজারের মোড়, আর অন্যটি শাঁখারী বাজারের মোড়। ফুলের পসরা সর্বত্র ছিল না।

সেকালের ঢাকায় বিয়ের পর আর একটি অনুষ্ঠান পালিত হতো– যা 'ফিরোল্টা' (<ফির্ + উল্টা) নামে পরিচিত। এটি হচ্ছে, বিয়ের কয়েকদিন পর বরসহ কন্যার পিতৃগৃহে আনুষ্ঠানিক আগমন। এই অনুষ্ঠান 'ফিরানি' বা 'ফিরা নাইয়র'ও বলা হয়ে থাকে। কন্যার পিতৃগৃহে কয়েকদিন থাকার পর পুনরায় শ্বশুরবাড়িতে বর ও কনের প্রত্যাগমন ঘটে। বরপক্ষ থেকেও কয়েকজন নিকট আত্মীয় বা কুটুম্ব নব-বিবাহিতকে স্বগৃহে নিয়ে আসে। এই আত্মীয় স্বজনরা 'ফিরানি কুটুম' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই উপলক্ষে ভুরি-ভোজনের আয়োজন হয়ে থাকে।

পুরোনো ঢাকায় স্বচ্ছল বা বিত্তবান্ পরিবারের দুই বাড়ির বেয়াই বেয়ানের মধ্যে সোহার্দ্য-সম্প্রীতি রক্ষার বিশেষ রীতি প্রচলিত দেখেছি। সেটি হলো– বিশেষ মওসুম, পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ডালা পাঠানো। আম-জাম-কাঁঠালের মৌসুমে দেখেছি কয়েক ঝুড়ি বোঝাই নানারকমের ফলফলাদি কুলির মাথায় করে বেয়াই বাড়িতে পাঠাতে। রমজানের সময় নানারকমের ইফতারী দিয়ে ডালা সাজিয়ে পাঠাতেও দেখেছি। ঈদুল আজ্হা বা কোরবানীর ঈদ উপলক্ষে সবচেয়ে বড় গরুর আস্ত রান্ বেয়াই বাড়িতে না পাঠালেই নয়। শবে বরাতের সময় ধর্মীয় বিধান থাক বা না থাক্– লৌকিক আচার পালনের জন্য নানারকমের হালুয়া ছাড়াও বহুবিচিত্র রুটিও বেয়াই বাড়িতে পাঠানো হয়। কোনো কোনো রুটিতে আয়না এবং চুমকীও বসানো থাকতো। সবারই যে

এসব ডালা পাঠানোর সামর্থ্য থাকে, তা নয়। অনেক সময় মর্যাদা রক্ষার খাতিরে, ধার করে হ'লেও লৌকিকতা রক্ষার জন্য তা পালিত হ'তো।

সেকালের ঢাকায় নববধূর সন্তান সম্ভাবনায় সাধভক্ষণের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। এটি বাঙ্গালির গৃহবধূর একটি ঐতিহ্যগত অনুষ্ঠান। মধ্যযুগের কাব্যেও আমরা বিভিন্ন নায়িকার সাধভক্ষণের বিস্তৃত বর্ণনা দেখতে পাই। ঢাকায় বধূর গর্ভধারণের সাতমাসের সময় যে সাধভক্ষণের অনুষ্ঠান পালিত হয়, তাকে ঢাকাবাসীরা সাতাইশা বা হাতাইশা বলে। এ উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কেউ কেউ 'চুড়ি ও শাড়ি' ইত্যাদি সহ বিভিন্ন উপঢৌকন কিনে আনে। নতুন পোষাকে সজ্জিত বধূর সামনে সাজানো হয় নানারকমের ফলমূল, উপহার এবং খাদ্যদ্রব্য।

সন্তান ছেলে হোক্ বা মেয়ে হোক্ সে যেন স্বাস্থ্যবান ও সুশ্রী হয়, এই কামনায় সন্তান-সম্ভবা বধূর সামনে হাজির করা হয় কোনো সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান শিশু অথবা সুন্দরী তরুণী। সন্তান নির্ধারিত সময়ে জন্মের পর, যদি পুত্রসন্তান হয়, তবে বাড়িতে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে বাড়িতে আজানের ব্যবস্থা করা হতো। ঢাকায় প্রসূতিগৃহেও শুচিতা বা কুগ্রহের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিছু সংস্কার প্রচলিত ছিল। ঘরে আলোবাতাসের প্রবেশধিকার না থাকলেও ঘর গরম রাখার জন্য 'বড়শী' নামের বিশেষ মৃৎপাত্রের মধ্যে কাঠকয়লার আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা ছিল। নবজাত শিশুকে দেখার জন্য কোনো আগন্তুক প্রসূতিগ্রহে প্রবেশ করলে, বড়শীতে রাখা আগুনের উপর সরষে দানা ছিটিয়ে দেয়া হ'তো। বিশ্বাস ছিল, পোড়া সর্ষের দানা থেকে বেরুনো ধোঁয়ায় 'অপয়া' অর্থাৎ অশুচিতা অপসৃত হবে।

ঢাকায় নবজাত শিশুর আকিকাও বেশ ঘটা করে পালিত হতো। আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে আকিকার গোশ্‌ত-পোলাও খাওয়ানোর নিয়ম ছিল। অভ্যাগতদের মধ্যে অনেকেই নবজাতককে নগদ অর্থ বা উপহার দিয়ে দোওয়া করে যেত।

ঢাকাবাসীদের কাছে ছেলেদের খত্‌নার ন্যায মেয়েদের নাক বা কান ফোঁড়ানোও একটি বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল। এক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনরাও আমন্ত্রিত হতো। তাঁরা সাধ্যমতো উপঢৌকন দিয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতেন।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ চল্লিশ দশকের মধ্যে আমার দেখা ঢাকার বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো। বলাবাহুল্য, সংস্কৃতি সতত প্রবহমান। সেকারণে, কোনো কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান কালের অতলে হারিয়ে গেছে, কোনটি বা আজো প্রচলিত রয়েছে এবং অনুষ্ঠানের ধারাক্রম বা পর্যায়ও পরিবর্তিত হচ্ছে। অধিকাংশ অনুষ্ঠানই আজন্ম ধারণা বা বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত সংস্কার। ষাট সত্তর বছর আগে, আমাদের মহল্লায়, শিক্ষার আলো, তেমন বিস্তার লাভ করেনি বলেই- সেকালে ছেলে বুড়ো, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে কম বেশি, অনেকেই সংস্কারাচ্ছন্ন ছিল।

সেকালের ঢাকায় ঈদ-উৎসব

আরবি 'ঈদ' শব্দটির অর্থ উৎসব। মুসলমানদের জন্য দুটি ঈদ বা ধর্মীয় উৎসবের দিন চিহ্নিত রয়েছে। একটি হচ্ছে 'ঈদ-উল-ফিত্‌র' বা রোজার ঈদ, আর অপরটির নাম 'ঈদ-উল আয্‌হা'। শিশুদের কাছে এ দুটি ঈদ যথাক্রমে 'বড় ঈদ' বা 'ছোট ঈদ' নামে পরিচিত। দুটি ঈদে ধর্মীয় আবেগ তো রয়েছেই, তার চেয়েও বেশি রয়েছে উৎসবের অনুষঙ্গ।

মানুষ সমাজেরই একটি অঙ্গ। তাই যে কোনো ধর্মীয় উৎসবে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ উৎসব পালনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঈদ-উল-ফিতর, রমজান বা ঈদ-উল আযহা তার ব্যতিক্রম নয়। এসব উৎসব রমজানের সওয়ালের বা জিলহজ্জের চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কিত। তাই চাঁদ দেখা নিয়েই শুরু হয় উৎসবের আমেজ।

একালে, ঢাকার দিগন্ত ছেয়ে যাচ্ছে আকাশচুম্বী দালানে। কিন্তু সেকালে ঢাকার উঁচু দালান ছিল হাতেগোনা। হেকিম হাবীবুর রহমান তাঁর 'ঢাকা পাচাশ বারাস পাহলে' গ্রন্থে উনিশ শতকের শেষদিকে ঢাকার উঁচু দালানের মধ্যে নাম করেছেন, বড় কাট্‌রা, ছোট কাটরা, আহ্‌সান মঞ্জিল ও হোসেনী দালানের। তিনি সেকালে চাঁদ দেখার মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন সে গ্রন্থে। চাঁদ ওঠার অনেক আগেই লোকজন ভিড় করত এই উঁচু উঁচু দালানে। অতি উৎসাহীদের মধ্যে অনেকে চাঁদ দেখার জন্য নৌকায় করে যেত বুড়িগঙ্গায়। যুবক-বৃদ্ধ-শিশু সবাই যেত চাঁদ দেখতে। হেকিম হাবীবুর রহমানের মতে বৃদ্ধবয়সী লোকেরা নিজেদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার জন্য চাঁদ দেখতে যেতেন। চাঁদ দেখার পর চারদিকে আনন্দের জোয়ার বয়ে যেত। শিশুরা সচেষ্ট হতো, কে আগে চাঁদ দেখেছে তা বলার জন্য। চাঁদ দেখা যাওয়ার পর বন্দুকের গুলি ছোড়া হতো। তোপধ্বনিরও ব্যবস্থা ছিল। কৌতুক করে হেকিম সাহেব লিখেছেন, গুলি ছোড়া ও তোপধ্বনিতে চারদিক এমন সরব হতো যে বধিররাও জানতে পারত চাঁদ উঠেছে।[১] চাঁদ দেখার পর মুরব্বিরা বিশেষ মোনাজাত পড়তেন, আর ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ছুটত মুরব্বিদের সালাম করতে। যুবক বৃদ্ধরা পরস্পর আলিঙ্গন করত অথবা মোবারকবাদ বিনিময় করত।

আনুষ্ঠানিকভাবে চাঁদ দেখা যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হতো আহসান মঞ্জিল থেকে। রমজান মাসের সূচনা অথবা ঈদ-উল-ফিতর অনুষ্ঠান একান্তই ছিল চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। সে কারণেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তা একদিন আগে পরে অনুষ্ঠিত হতো। পাকিস্তান আমলে দেশের সর্বত্র বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যাতে একই দিনে ঈদ-উল-ফিতর উৎযাপিত হয়, সে কারণে সরকারিভাবে চাঁদ দেখার ঘোষণা দেয়া হতো। বিশেষভাবে গঠিত চাঁদ দেখা কমিটি একালেও চাঁদ ওঠার ঘোষণা দিয়ে থাকে।

১. হাকীম হাবিবুর রহমান 'ঢাকা পাচাশ বারাস পহলে' হাশেম সুফী অনূদিত, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৯।

রমজানের চাঁদ দেখার পরপরই এশার নামাজের সময় মুসল্লিরা মসজিদে যান তারাবীহ্র নামাজ পড়তে। হেকিম হাবীবুর রহমান লিখেছেন, তাঁর বাল্যকালে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষদিকে খুব কম মসজিদেই খতম তারাবীর আয়োজন করা হতো, কারণ শহরে হাফেজদের সংখ্যা বেশি ছিল না। এখন অবশ্য হাফেজদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায় মসজিদেই খতম-তারাবীর ব্যবস্থা হয়ে থাকে। খতম তারাবীর ক্ষেত্রে কোরান শরীফের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য অনেক মুসল্লি সারা রমজান মাস একই মসজিদে তারাবীর নামাজ আদায় করে থাকেন।

রমজানের সময় বাড়ির গৃহিণীরা বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠতেন নিজ নিজ রন্ধন ।ালায়। সেহরীর সময় বা ইফতারীর জন্য তাঁদের আয়োজন করতে হতো নানা রকমের খাদ্যবস্তুর। গৃহিণীরা ইফতারীর জন্য ঘরে তো কিছু প্রস্তুত করতেনই, আবার বাইরে থেকেও খাদ্যদ্রব্য কিনে আনাতেন। আজকাল হফত সামগ্রী প্রায় প্রতি গলিতে বা গলির মোড়ে বিক্রি হতে দেখা যায়। কিন্তু সেকালে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বসত ইফতারীর বাজার। ইফতারীর সবচেয়ে বড় বাজার এখনও যেমন চকবাজারে বসে, আগেও তেমনি বসত। ইতিহাসবিদদের মতে, চকবাজারের বাদশাহী মসজিদের সামনের চত্বরে সেই মুঘল আমল থেকেই বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বেচাকেনার বাজার বসেছে। রমজান মাসে ইফতারী বিক্রির সময়ে সে বাজার ছিল বেশ । চকবাজারের হফতারার মেলায় হাজার রকমের খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত। এমন কিছু খাদ্যবস্তুও ছিল, যা বছরের অন্য সময় কোথাও পাওয়া যেত না। এই যেমন নানা রকমের মোরব্বা, কাবাব, চিড়া-ওখ্ড়া, ফালুদা, শীরমল, নিমকপারা ইত্যাদি।

শুধু ঘরের ভিতরেই নয়, প্রতি মসজিদেই মাগরিবের নামাজ আদায়ের প্রয়োজনে সমবেত মুসল্লিদের জন্য ইফতারীর বিশেষ আয়োজন দেখা যায়। বিভিন্ন গৃহ থেকে মসজিদে ইফতার সামগ্রী প্রেরণের রেওয়াজ ঢাকায় অনেক দিন ধরে প্রচলিত হয়ে এসেছে। শিশুরা নিয়মিত রোজাদার বা নামাজী না হলেও তারা মসজিদে ভিড় করতো সেই ইফ্তারির আকর্ষণে। মসজিদে টুপি মাথায় দিয়ে অন্যান্য মুসল্লির সঙ্গে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো মাগরেবের আযানের। সে এক দৃশ্য বটে। শহরের বিত্তবানদের অনেকেই মসজিদে শুধু ইফতারী পাঠিয়ে ক্ষান্ত হতেন না, নিজেরাও শরীক হতেন সেই আম্-ইফতারিতে।

বিশিষ্ট গবেষক হাশেম সুফি জানিয়েছেন, ইসলামপুরের কাদের সরদার ১৯৩০-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বিশ রোজার দিন ইফতারীর সময় ঢাকার অনেক মসজিদে তবারক হিসাবে সম্পূর্ণ নিজ খরচে তেহারি বিতরণ করতেন। পুরানো ঢাকায় বিশিষ্ট আত্মীয়স্বজনের বাসায়, বিশেষ করে, বেহাই-বেহাইনদের বাড়িতে ইফতারি প্রেরণ এখনও একটি দর্শনীয় দৃশ্য। অনেকটা মিছিল করে বেশ কয়েকজন কুলির মাথায় ডালা সাজিয়ে নানা রকমের ইফতার-সামগ্রী পাঠানোর রীতি এখনও নজরে পড়ে। সরকারি উদ্যোগে এতিমখানার এতিমদের অথবা বিশিষ্ট মেহমানদের আমন্ত্রণ করে ইফতারি-আয়োজনের দৃশ্য মাঝে মাঝে টেলিভিশনের পর্দায়ও দেখা যায়। আর এক প্রকার ইফতারি অনুষ্ঠানের কথা হেকিম হাবীবুর রহমানের স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়।

"এখানে ছেলেদের ৮ বছর ও মেয়েদের ৬ বছর বয়স থেকে রোজা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা হতো। বাচ্চাদের মন খুশি করার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী প্রথম রোজা পালনের বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট খবর দেয়া হতো ও সন্ধ্যা পর্যন্ত মহিলা মেহমানেরা খোঞ্চার পর খোঞ্চা ইফতারী নিয়ে আসতেন। বাচ্চাদের বড় আগ্রহ সহকারে রোজা খোলানো হতো। প্রথমে বাদাম পিষে মিশ্রি মিশিয়ে চাটানো হতো। আত্মীয়স্বজনরা নগদ সালামী দিতেন। এককালে আমি বাচ্চাদের রোজার মিছিলও দেখেছি। কিন্তু মুসলমানরা আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য এই আনুষ্ঠানিকতাকে এখন বর্জন করে দিয়েছে।"[২]

রমজান মাসে ঢাকার আরেকটি ঐতিহ্য ছিল ভোর-রাতের 'কাসিদা গান'। এই গান গেয়ে রোজাদারদের ঘুম ভাঙ্গানো হতো। পাড়ার যুবকরা এই গানের আয়োজন করত। বিভিন্ন পাড়ার যুবকদলের মধ্যে এই গান রচনা ও গাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবও ছিল। কারণ ঈদের দিন শ্রেষ্ঠ দলকে পুরস্কৃত করা হতো।

ঈদ-উল-ফিতরের প্রধান অনুষ্ঠান হচ্ছে ঈদের নামাজ। এখন ঢাকার লোকসংখ্যা অনেক, ঈদের দিনে নামাজীর সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, বিভিন্ন ময়দান বা ঈদগাহ ছাড়াও মহল্লার প্রায় মসজিদেই ঈদের জামাতের ব্যবস্থা হয়। এমনকি কোনো মসজিদে বা ঈদগাহে একাধিকবারও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সেকালে ঈদগাহ ছাড়া বিশেষ বিশেষ মসজিদে এই যেমন চকবাজার মসজিদে এবং লালবাগ শাহী মসজিদেই বড় জামাতের ব্যবস্থা ছিল। গৃহকর্তাদের মধ্যে যাঁরা কেনা-কাটা ও নানান ঝামেলায় যথাসময়ে তৈরী হতে পারতেন না, তাঁরা বিশেষ বিশেষ মসজিদে যেতেন বিলম্বিত জামাতের উদ্দেশ্যে। বড় মসজিদে বা ঈদগাহে দূর-দূরান্ত থেকে নামাজীরা ঈদের নামাজ আদায় করতে আসতেন। আশেপাশের প্রতি পাড়া থেকে সবাই দল বেঁধে মসজিদে যেতেন। ছোট ছোট শিশুরা নতুন জামাকাপড় পরে মুরুব্বীদের পেছনে পেছনে তারা সারিবদ্ধভাবে মসজিদে যেতো।

সেকালে মসজিদের সামনে ভিখারীর সংখ্যাও কম ছিল না। নামাজীরা মসজিদের সামনেই জুতা রেখে ভিতরে যেতেন। জুতা হাতে নিয়ে মসজিদে ঢোকার প্রয়োজন ছিল না। নামাজ শেষ করেই ছেলেমেয়েরা ছুটত আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে মুরব্বিদের সালাম করতে। কারণ এই সালামের একটি বাড়তি আকর্ষণ ছিল মুরব্বিদের দেয়া কিছু সালামী অর্থাৎ কিছু অর্থ উপহার।

১৯৩৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ইমামতিতে কার্জন হলে মহিলাদের প্রথম ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায়, মহিলাদের জামাতে ইমামতি করতে তখন কেউ রাজি হননি।

সাধারণত তারাবীর নামাজের জন্য নিযুক্ত হাফেজ সাহেবই মসজিদে ঈদের জামাতে ইমামতি করেন। ঈদের জামাত, পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ বা জুমার নামাজ থেকে পৃথক। সে কারণে এককালে ঈদের নামাজে ইমামতিতে অনভ্যস্ত ইমাম সাহেবের কিছু দোষ ত্রুটির কথাও শোনা যেত। মসজিদে বা ঈদগাহে ঈদের নামাজেব ইমামদের জন্য চাঁদা তোলার রীতি বহুকাল ধরেই প্রচলিত রয়েছে।

২. হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।

ঈদ উপলক্ষে প্রতি বাড়িতেই বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। গৃহিণীরা সাধ, সাধ্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়ির লোকজন এবং মেহমানদের জন্য নানা রকমের খাদ্যের আয়োজন করে। খাদ্যরসিক হিসাবে ঢাকাবাসীদের একটি সুনাম রয়েছে। হেকিম হাবীবুর রহমান তাঁর স্মৃতিকথায় ঢাকাবাসীদের খাদ্য-বৈচিত্র্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিল্পরসিক শাহেদ সোহরাওয়ার্দী দেশ-বিদেশের রান্না বিষয়ক একটি গ্রন্থে ঢাকাবাসীদের বিশেষ খাদ্যকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সুস্বাদু খাদ্য বলে অভিহিত করেছেন।

ঢাকার ঈদ উৎসবের একটি বড় আকর্ষণ ছিল ঈদের মেলা। সবচেয়ে বড় মেলা বসত চকবাজারের আশপাশে। বিভিন্ন রকমের সামগ্রী নিয়ে ছিল মেলার পসরা। নিত্যব্যবহার্য বা ঘরের টুকিটাকি জিনিস ছাড়াও নানা রকমের খেলনার দোকান বসত। ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তা-ই ছিল বড় আকর্ষণ। ঢাকায় অবশ্য মহররম, ঈদ-উজ-জোহা বা চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষেও মেলা বসার ঐতিহ্য রয়েছে। তবে ঈদের মেলা ছিল বেশ বড় আকারের। বিনোদনের জন্য নাগরদোলা বা চরকি তো ছিলই, তা ছাড়াও ছিল ছোটখাটো সার্কাস বা ম্যাজিকের প্যান্ডেল।

ঢাকায় ঈদ উৎসবের আরেকটি আকর্ষণ ছিল ঈদের মিছিল। এই ঈদের মিছিলের সূত্রপাত কবে থেকে হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য জানা যায় না। তবে রাজা বাদশাহদের বৈভব ও বিক্রম প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে মিছিলের প্রচলন সর্বকালে এবং সর্বদেশেই প্রচলিত। মুঘল আমলেও রাজকীয় মিছিলের ব্যবস্থা ছিল বলে অনুমান করা যায়। ১৯ শতকের শুরুতে আলম মুসাওয়ার নামে এক চিত্রশিল্পীর আঁকা ঢাকার ঈদের মেলা ও মিছিলের কয়েকটি চিত্র জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। অনুমান করা হয় ১৯ শতকের এই ঈদের মিছিল নিমতলী প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে হোসেনী দালান, বেগম বাজার, চকবাজার হয়ে নিমতলী প্রাসাদে গিয়ে শেষ হতো। ১৯ শতকের মাঝামাঝি ঢাকার নায়েব নাজিমদের বংশ লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈদের রাজকীয় মিছিল লোপ পায়। মুসাওয়ারের আঁকা চিত্রে লক্ষ করা যায়, ঈদের মেলা বা মিছিলে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির লোকজনের সমাবেশ ছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঢাকায় পুনরায় ঈদের মিছিল চালু হয়। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই ছিল এই মিছিলের বিশেষত্ব। ঈদের মিছিল চকবাজার থেকে শুরু করে মিটফোর্ড রোড, ইসলামপুর, বাংলাবাজার ও নবাবপুর ঘুরে বংশাল রোড, জেল রোড হয়ে চকবাজার ফিরে আসত। এ মিছিল উপলক্ষে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক সমাগম হতো এই শহরে। ঈদের মিছিলে হাস্যকৌতুক ও আমোদ-প্রমোদের বিভিন্ন প্রকার আয়োজন ছিল। আমোদ-প্রমোদের পাশাপাশি সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা বা সামাজিক সমস্যার প্রতিফলনও ঈদের মিছিলে লক্ষ করা যেত। বিশেষ করে তিরিশের বা চল্লিশের দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার মঞ্চ তৈরি করা হতো এবং যুব-সম্প্রদায় বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ পরে অভিনয় করত। সামাজিক সমস্যা নিয়েও অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। অধুনা ঈদের মিছিলের সেই ঐতিহ্যকে পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টা চলছে।

সেকালে ঢাকার মাঠে-ময়দানে বিনোদনের অবকাশ ছিল খুবই কম। তবু ঢাকায় ঈদের বিশেষ একটি আকর্ষণ ছিল– ঢাকার বিভিন্ন মাঠে কাবুলিওয়ালাদের নাচ। একালে ঢাকায় কাবুলিওয়ালা দেখা যায় না বললেই হয়। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ঢাকার বংশাল এলাকায় এদের বেশ কিছু বসতি ছিল। তারা দল বেঁধে ঢাকায় এসে এই এলাকায় বাড়ি ভাড়া করে থাকত। এদের প্রধান দুটো পেশা ছিল ফলফলাদি ও হিং বিক্রি করা আর বেশ চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া। সম্ভবত তারা স্বদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে ঈদ উৎসবে যোগদান করত। তারা বিভিন্ন মাঠে দল বেঁধে ঢোলের আওয়াজের তালে তালে কাবুলী নাচ নেচে দর্শকদের চিত্তবিনোদন করত।

ঢাকায় সিনেমা হল প্রতিষ্ঠার আগে আভ্যন্তর বিনোদনের সুযোগ ছিল না বললেই হয়।

১৯১৪ সালে ঢাকায় প্রথম সিনেমা হল প্রতিষ্ঠিত হয় 'পিকচার হাউজ'। ১৯৩০ সালের মধ্যে ঢাকায় আরও তিনটি সিনেমা হল চালু হয়। ঈদ উপলক্ষে এসব সিনেমা হলে সারারাতব্যাপী একাদিক্রমে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রচলনের ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ লোকের কাছে এর পরিচিতি ছিল 'ফুল-সিরিয়াল'। এই ফুল সিরিয়ালে সাধারণত তিন চারটি হিন্দী ছবি প্রদর্শিত হতো।

সেকালে ঢাকার সংস্কৃতিতে কাওয়ালির আসরেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। সারা রাত ধরে কাওয়ালি শোনা ঢাকাবাসীদের জন্য ছিল বিনোদনের অন্যতম আকর্ষণ। ঈদ উপলক্ষেও ঢাকার নানা স্থানে শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে কাওয়ালি মজলিশের আয়োজন করা হতো।

সাহিত্যে ঈদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের সাহিত্যে অবশ্য ঈদ এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। ধর্মীয় বিধি-বিধান বর্ণনায় আলাওল তাঁর তোহফা কাব্যে 'রোজার ঈদ' এবং 'কোরবানীর ঈদ'-এর কথা বলেছেন। আধুনিক সাহিত্যে ঈদ এসেছে অন্যতম বিষয় হিসাবে। সম্ভবত সৈয়দ এমদাদ আলী 'নবনূর' পত্রিকায় 'ঈদ' শিরোনামে প্রথম কবিতা রচনা করেন। পরবর্তীকালে কায়কোবাদ, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবি ঈদ নিয়ে সাহিত্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তবে নজরুলের হাতেই লিখিত হয়েছে একাধিক কবিতা, গান ও নাটক। নজরুলের 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ' গানের সঙ্গে কে না পরিচিত! নজরুলের লেখা ঈদ বিষয়ক রচনার মধ্যে আমরা পাই— 'ঈদের চাঁদ' (কবিতা), 'ঈদ' (নাটিকা), 'ঈদ-উল-ফিতর' (রেকর্ড নাটিকা), 'ঈদ মোবারক' (কবিতা) এবং 'ঈদ মোবারক হোক আজি ঈদ মোবারক' (গান)। এছাড়া ঈদ উপলক্ষে বিচিত্র সাহিত্য-সম্ভার নিয়ে পাঠকের কাছে হাজির হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'ঈদ সংখ্যা'।

আমরা লক্ষ করে থাকি, সারা পৃথিবী জুড়েই বিভিন্ন উৎসব বা পালপার্বণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক বিশেষ সংস্কৃতি যার নাম বলা চলে 'কার্ড-সংস্কৃতি'। নববর্ষ, জন্মদিন, বিবাহ-বার্ষিকী ইত্যাদির পাশাপাশি ঈদ, পূজা বা খ্রিস্টমাসেও সুশোভিত কার্ডের মাধ্যমে চলে শুভেচ্ছা বিনিময়। মূলত ঈদ কার্ডের মধ্যেও নিহিত আছে ঈদ-উল-ফিতরের

তাৎপর্য। আর তা হচ্ছে মানুষের জন্য কল্যাণ-কামনা। ঈদে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন করে, অভিবাদন জানায় এবং সৌহার্দ্য বিনিময় করে। এক মাসের কৃচ্ছ্রসাধনার পর রোজা অবসানের আনন্দে সবাই কামনা করে 'শুভ ঈদ-উল-ফিতর'।

।।দুই।।

ঈদ-উল আযহাকে 'ছোট ঈদ' বলে অভিহিত করলেও এ ঈদের গৌরব কম নয়। ধর্মীয় বিধান এই যে, 'ঈদ-উল-ফিতরে'র দিন যেমন রোজা থাকা নিষিদ্ধ, তেমনি ঈদ-উল-আযহার দিন এবং তারপর তিনদিনও রোজা রাখা হারাম। অর্থাৎ ঈদ-উল-আযহার উপলক্ষে চারদিনই কোরবানি করা যায়। সেকালে অনেক গৃহিণী ঈদ-উল-আযহার দিন সকালে অর্ধদিবস রোজা রাখতেন এবং কোরবানীর মাংস খেয়ে রোজা ভঙ্গ করতেন।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয়, সেকালে ঢাকা শহরের অনেক বাড়িতে আঙ্গিনা বা উঠান না থাকায় কোরবানির পশুপ্রাণী যেমন রাস্তায়ই রাতভর রাখা হতো, তেমনি কোরবানির অনুষ্ঠানাদিও রাজপথে বা গলিতেই সাধিত হতে দেখা যেতো। প্রতিযোগিতার ধুম লেগে যেত– কে কত দামী ও কত বড় গরু কোরবানি দিতে পারে। সংখ্যা নিয়েও প্রতিযোগিতা হয়। মূলত তখন কোরবানির মাহাত্ম্য হারিয়ে যায় এই প্রতিযোগিতায়।

রাস্তায় আরও একটি মজার জিনিস দেখা যেত, তা হলো বিত্তবানদের বৈবাহিক বাড়িতে গোশত পাঠানোর ঘটা। বিরাট ঝাঁকা বা ডালার ওপরে গরুর আস্ত একটি 'রান' পাঠানো হতো বেয়াই বাড়িতে। সে এক মজার দৃশ্য। সুদৃশ্য সরপোশ বা ঢাকনা দিয়ে সম্পূর্ণ রানটি ঢাকা যায় না, এদিক ওদিক দিয়ে তা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ওপরে কাক-চিল ঘুরতে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। আর কুলির পিছনে একজন লোক লাঠি হাতে ছোটে ঐ কাক তাড়াতে তাড়াতে।

চুড়িহাট্টার পীর সাহেব একবার উত্তর ভারত থেকে কোরবানির জন্য আনিয়েছিলেন মস্ত এক উট; সে উট দেখার জন্য দর্শকের কি ভিড়! ছোট ছেলেমেয়েরা, যারা উটের শুধু নামই শুনে এসেছে, চোখে দেখেনি– তাদের চোখে মুখে সে এক মহাবিস্ময়ের অভিব্যক্তি। একালে যেমন মাঠে– ময়দানে, এমনকি রাস্তায় রাস্তায় গরুর হাট বসে, সেকালে তেমনটি ছিল না। সেকালে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল কম, কোরবানির পশু-প্রাণীর সংখ্যাও ছিল তেমনি সীমিত। ছেলেবেলায় নামকরা গরুর হাটের কথা শুনেছি– মিরপুরের গরু-ছাগলের হাট, সোয়ারী ঘাটের হাট, নদীর ওপারের জিঞ্জিরার হাট।

ঈদের সঙ্গে ভোজনের একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে; বিশেষ করে, তা যদি ঈদ-উল-আযহা হয়। এ সময় বাড়িতে বাড়িতে অঢেল গোশত দিয়ে বৈচিত্রপূর্ণ রান্নার মহড়া চলে। ঢাকাবাসীদের রান্নার গুণকীর্তন অনেক লেখকই করেছেন।

হেকিম হাবীবুর রহমান 'ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে' শীর্ষক গ্রন্থে ঢাকাবাসীদের তৈরি 'কাবাব' 'কোফ্‌তা', 'কালিয়া' ইত্যাদি নানারকমের মাংসজাত খাদ্যদ্রব্যের সংবাদ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ঢাকাবাসীরা যে কি রকম উদ্ভাবনী সৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তার বর্ণনা

দিতে গিয়ে তিনি এক 'কোফ্‌তা' সম্পর্কেই লিখেছেন ঃ

"ঢাকায় যেভাবে কোফতা তৈরি হয় তা অন্য কোনখানে খুব কমই দেখা গেছে। কাঁচা গোশতের কোফ্‌তা, সিদ্ধ গোশতের কোফ্‌তা, কাঁচা-সিদ্ধ গোশতের মিশ্রিত কোফ্‌তা, খাশ্‌তা কোফ্‌তা, কোফ্‌তার কালিয়া ও কোফ্‌তার কোরমা; তন্মধ্যে বুন্দিয়া– অর্থাৎ মটর-সমান থেকে দুই সের পর্যন্ত কোফ্‌তা তৈরি হতো। বেরেঞ্জী কোফ্‌তা, যার মধ্যে পনির আর ফলফলাদি ভরা হয়। মিঠা কোফ্‌তা যার চল এখন কমে গেছে। এমন সুবর্ণ আর সুস্বাদু কোফ্‌তা এখানে তৈরি হয় এবং অধিক পরিমাণে উত্তম কোফ্‌তা তৈরি করার লোক এখানে আছে– যা অন্য কোথাও নেই"।[৩]

কোরবানির গোশত দিয়ে নানারকমের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করার প্রবণতা গরিব লোকদের মধ্যেও দেখা যায়। হেকিম হাবীবুর রহমান বলেছেন, "বকরী ঈদে তো গরিব ঘরেও শিক আগুনে ওঠে।" গরিবদের মধ্যে গোশত বিলি করার যে বিধান, তার পিছনে রয়েছে আর্থ-সামাজিক কল্যাণবোধ। সারা বছর যাদের ভাগ্যে আমিষ জাতীয় খাদ্য জোটেনি, তাদের জন্যও বরাদ্দ হলো কোরবানির গোশত। কোরবানির এই গোশতের প্রত্যাশায় সুদূর গ্রাম থেকেও ছুটে আসে অনেকে এই শহরে। রোদে শুকিয়ে, আধাসিদ্ধ করে অথবা জ্বাল দিয়ে গোশত সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হতো। সে গোশতগুলো তারা গ্রামের পরিবারের সদস্যদের জন্য নিয়ে যেত।

রান্না করা গোশত কিভাবে দীর্ঘদিন রেখে খাওয়া যায়, তার ব্যবস্থাবিধি নানি-দাদিদের আয়ত্তে ছিল। তাঁরা বলতেন, কোরবানির গোশত দীর্ঘদিন ঘরে রেঁধে, মহররমের আশুরার দিন খেলে অনেক নেকি! সরল বিশ্বাসে শিশুরা তা মেনে নিত।

সবশেষে, আমরা বলতে পারি– একালেই হোক বা সেকালেই হোক– 'ঈদ-উল আযহার' শিক্ষা চিরন্তন ও শাশ্বত। 'ঈদ-উল আযহার' আদর্শ সর্বদাই মানুষকে উজ্জীবিত করবে ত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের কল্যাণ পথে।

৩. হাকীম হাবীবুর রহমান– প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।

দ্বিতীয় পর্ব

(উনিশ শতক)



উনিশ শতকে লালবাগ কেল্লা



'সদ্ভাবশতক' কাব্যের কবি এবং 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

শ্রীশ্রীহকনাম ॥

নেক বিবির কেচ্ছা ।

হক্কের হাকিম আল্লা বড় মেহেরবান ॥ পলকে করিল জেবা জমীন আছমান * আপনি মেহের করে বান্দাকে পেলায় ॥ সবাকে পেলায় নিজে আপে না হি খায় * কম জোরের জোর সেই জোলিল জর্ব্বার ॥ দেখিয়া বান্দার গুনা করেন ছত্তর * আপেবাদসা আপে গনি আপে কবিরাজ ॥ আপনি বিমারী দিয়া করেন এলাজ * বেকসের খাওন্দ সেহি গরিবের গনি ॥ কানার হাতের লাঠী লাড়কার জননী * দেনদারের ওয়ারেস নিধনের ধন ॥ এতিমের ছায়া সেই ভুকার জীবন * খেত ওলার লাঙ্গল সেহি নৌকায় মাজি ॥ সকলে পাঠাইল হারা আখেরের কাজি * হাজার সোকর তার মেহেরবানি পরে ॥ আপনার নুরে জেবা দোস্ত পয়দা করে * দিন আর দুনিয়ার বাদসা তাঁরে করে ॥ দুনিয়ার বান্দা জত সুপিলেন তাঁরে * উম্মত সুপে নাম রাখে নবি সরওয়ার ॥ আপনা কুদরতে ফের বকসেন জেওয়ার * হজরত ছিদ্দিক তাঁর হাতের হাতীয়ার ॥ হজরত ওছমান জান চাস ছিল তাঁর * ডাহিন হাতের বাজু আলী জোরয়ার ॥ বাম হস্তের বাজু ছিল হজরত উম্মর * ফাতেমা খাতুন হারকাল গলার উপর ॥ হাছেন হোছেন ছিল দুকানের দোর * হজরত আমির হামজা আর জে আর্বা ॥ছ

ঢাকার কবি গরীবুল্লাহ-রচিত 'নেকবিবির কেচ্ছা'র নামপৃষ্ঠা

নীল দর্পণং

নাটকং

নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকর-

ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতং

ঢাকা

শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৮২। ২ আশ্বিন

ঢাকা থেকে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)

احكام النبى

আহ্কাম নবি

এই কেতাবের নাম ॥ দিন ধনি

য়ারবধ্নি এহাতে তামাম : শ্রী জুত

মুন্সি নবি নওয়াজ খাঁ শাহেব ॥

সাএরি করিম দেক্ষে হাদিছের

কেতাব * ইশ্যার গঞ্জ থানাজিলে

নাছিরাবাদের ॥ সরিশা গ্রামেতে

ঘর করিনু জাহের : শ্রী জুত মৌলবি

আব্দুল ছোবহান ॥ যাহা করিলেন

ছেক্কে হাদিছ কোরান * শ্রী মুনশি

কাএদর জান শাহেবের দারাএ ॥

বাঙ্গালা করাই ছহি সাএরের কথাএ

আমি শ্রী মাহাম্মদ–জান শহর

ঢাকাতে ॥ মাহাম্মদি ছাপা খানা

জানে শহরেতে : মুনশি আলি

আকবর মিঞার দারাতে

ছাপাইয়া দিনু ধনি

এ প্রেসে তে

ঢাকায় মোহাম্মদী ছাপাখানায় মুদ্রিত একটি গ্রন্থের নামপৃষ্ঠা

প্রবোধসুধাকর।

প্রথমভাগ।

দোলেশ্বর নিবাসী

শ্রীআমিনদ্দিন কর্ত্তৃক

প্রণীত।

ঢাকা—গিরীশযন্ত্র।



ইং ১৮৭২। ২৮শা আক্টোবর।

মূল্য ৵০ আনা।

ঢাকা গিরীশ যন্ত্রে মুদ্রিত 'প্রবোধ সুধাকর'-এর নামপৃষ্ঠা

শ্রীশ্রী হক নাম •

তরফা।

নাজাতোল মোছলেমিন

ফারসি

শ্রী মাহাম্মদ ফয়েজদ্দিন

দিনদার মোছলমান দিগের ফায়দার কারণ

হাদিছ ও ফেকা মাছায়েল হইতে

তরজমা করিয়া

মোকাম ঢাকার বাঙ্গালাবাজারে [illegible]

শ্রীযুত মুনসি মাহাম্মদ খান সাহেবের

মোহাম্মদি প্রেসে প্রথমবার ছাপাইয়া

১৮৬৭ সনের ২৫ আইন অনুসারে

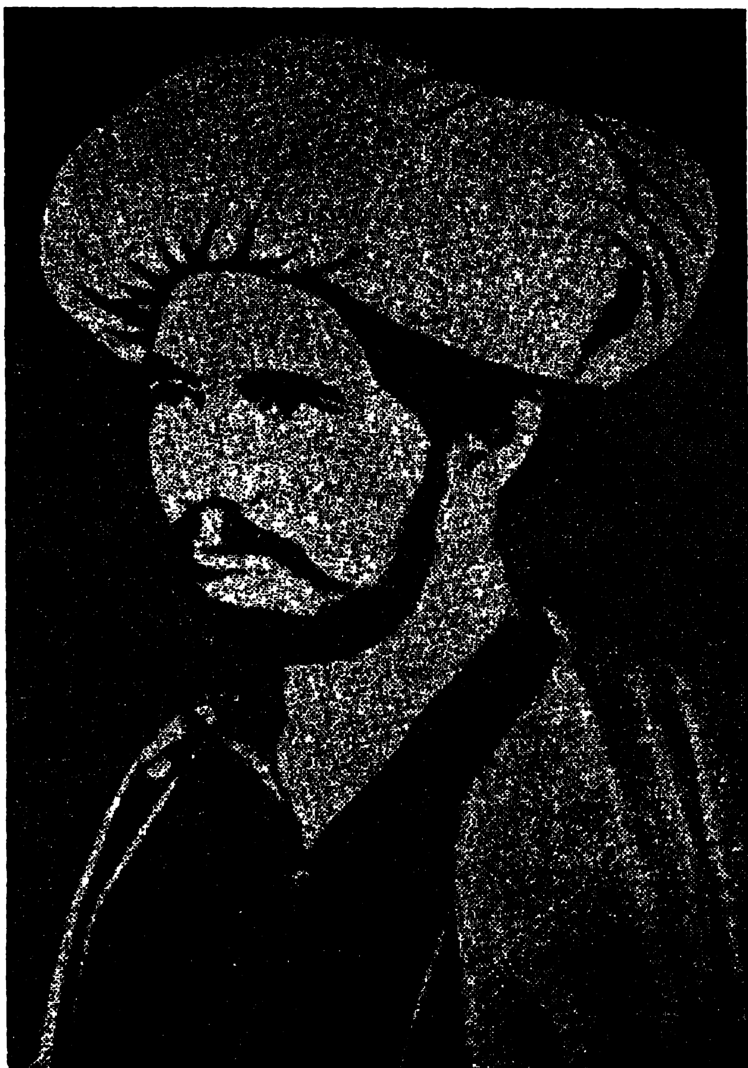
রেজেষ্টরি বহিতে দাখিল

করিলাম

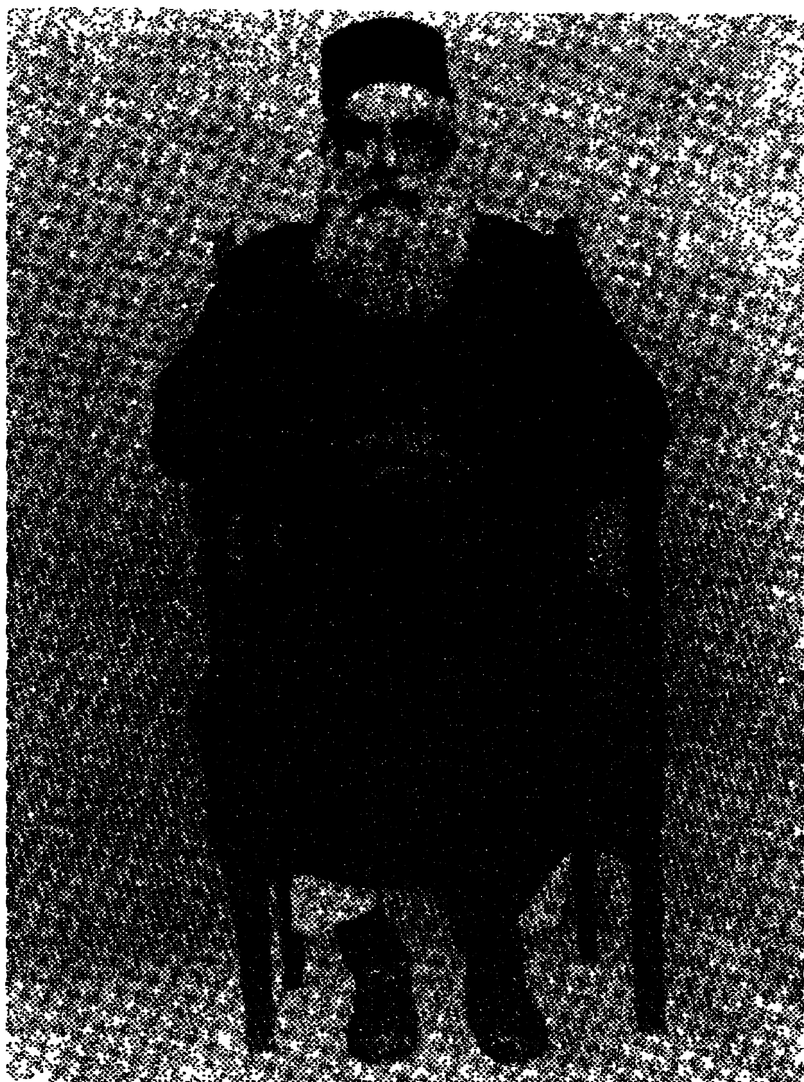
সন ১২৮৬ সাল ১৬ কার্ত্তিক ইংরাজি ১৮৭৯
সালের ১ নবেম্বর

دهاکه محمدی پریس
در شهر مطبع

ঢাকার কবি ফয়েজউদ্দিন রচিত গ্রন্থের নামপৃষ্ঠা



'ঢাকা সমাজ সম্মিলনী'র সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ওবেদী



'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আবদুল আজিজ

ঢাকাপ্রকাশ

সাপ্তাহিক।

'নিত্যং সাধো সত্যম্।'

১ ভাগ। ৫ সংখ্যা।	সন ১২৭০। ৪ বৈশাখ। শুক্রবার। ইংরাজী ১৮৬৩। ১৬ আপ্রিল	বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসমেত ৮ টাকা

বিজ্ঞাপন।

আমরা পূর্ব্বাবধি উল্লেখ করিয়াছি, যাঁহাদিগের নিকট গতবর্ষের ঢাকাপ্রকাশের মূল্য বাকীছিল, তাঁহাদিগের অনেকেই অনুগ্রহ করিয়া তাহা পরিশোধ করিয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহারা অদ্য পর্য্যন্ত পরিশোধ করেন নাই, উঁহাদিগের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা এই, তাঁহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই সেই মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

গত বর্ষের প্রাপ্ত মূল্য ঢাকাপ্রকাশে স্বীকার করা যাইল। ২ সংখ্যা হইতে রসীদ দেওয়া হইয়া থাকে।

বিজ্ঞাপন।

জেলা পাবনার অন্তঃপাতী পাবনী সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ৩০ ত্রিশ টাকা। শিক্ষকতা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আবেদনীয়।

জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী কোটচাঁদপুর সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ২০ টাকা। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরা আবেদনীয়।

ঢাকা
২৮ মার্চ
সন ১৮৬৩

আর এল মার্টিন এম,এ
পূর্ব্ববঙ্গের দক্ষিণ পূর্ব্ববিভাগস্থ
বিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্পেক্টর

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক ঢাকা মুদ্রাযন্ত্রে বিতরণার্থ প্রস্তুত আছে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ী লোক মূল্য না দিয়া বিতরণ করাইলে না। যাঁহারা উক্তপুস্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তিনি ঢাকা ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীব্রজসুন্দর মিত্র।

বিজ্ঞাপন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বসু তথা শ্রীযুক্ত মৌলবী এনায়েতুল্লাহ খাঁ ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় বরাবরেষু

যথা সম্মানং নিবেদনং

প্রায় তিন বৎসর কাল অতীত হইল মহাশয়েরা আমার নিকট হইতে ঢাকাপ্রকাশ গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্যাপি তাহার মূল্য পরিশোধ করেন নাই। আমি এবিষয়ে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া উত্তর পাইতেছি না। মহাশয়েরা উক্ত বিষয়ে সত্বরে এখনও জানাইতেছি, অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে আমার সমুদায় প্রাপ্য পরিশোধ করিবেন নচেৎ আমাকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে।

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ রায়।

ঢাকাপ্রকাশ

৪ ঠা বৈশাখ শুক্রবার।

১২৬৯ সালের অধিকার শেষ হইল। আমরা একণে ১২৭০ সালের অধীন হইলাম। যে অচিন্ত্য শক্তিমৎ পরম পুরুষের কৃপায় আমরা বায়ু, পক্ষ, মাস, বর্ষ নিয়ত এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।

মাণিকগঞ্জের যোগী সম্প্রদায়।

মাণিকগঞ্জে 'যোগী' উপাধিধারী কতকগুলি হিন্দু লোক আছে। কোন্ যোগ সাধন করিয়া তাহাদিগের ঐ উপাধি লাভ হইয়াছে, আমরা তাহা বলিতে পারি না। আমরা তাহাদিগের কেবল এই মাত্র 'যোগ সাধন' দেখিতে পাই, তাহারা বহুকালব্যাপিয়া একটী 'প্রকার' বিদ্যা সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে।

'ঢাকাপ্রকাশ'-এর প্রথম পৃষ্ঠা

3150

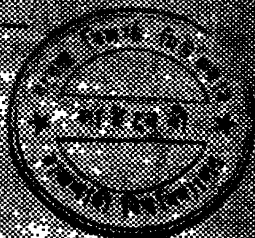
বান্ধব।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

[illegible]

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।



ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮১।

'বান্ধব' পত্রিকার ১ম খণ্ডের নামপৃষ্ঠা

মিত্র-প্রকাশ।

সাহিত্যবিষয়ক পত্র।

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয়মুদেত্বুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। } শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রী পরমাত্মনে নমঃ।

শ্রীবেচ্ছা সকলা যথা গণেশ কৃপায়,
গঙ্গাস্নানে যথা সর্ব্বতীর্থ ফল পায়,
এক ভক্তি করে যথা মুক্তি বিতরণ,
এক শান্তি যথা সর্ব্ব-তাপ নিবারণ।
সেইরূপ একমাত্র যাঁহার বন্দনে
সাধয়ে বলি তুষ্ট হন সর্ব্ব-দেবগণে,
কর-যোড়ে ভক্তিরস-গলিত-অন্তরে,
প্রণিপাত করি সেই সর্ব্বদেবেশ্বরে। ১

যাঁর স্তব বিনে, বেদবাক্য উচ্চারণ
অরণ্যে রোদন—মাত্র অরণ্যে রোদন;
শত শত যাগ যজ্ঞ ব্রত আচরণ
ভস্মে ঘৃতার্পণ—মাত্র ভস্মে ঘৃতার্পণ;
ভাগীরথী আদি নানাতীর্থাবগাহন
অঙ্গের মার্জ্জন—মাত্র অঙ্গের মার্জ্জন;
নিরন্তর স্তবে যাঁরে সর্ব্ব-দেবগণ
রে পামর মন! কর তাঁহারে স্তবন।
কি হবে কাঁদিয়া দুঃখ কৈলে এরণ্ডারে?
সে কবে বাসনা কার পুরাবারে পারে?
পূর্ণ-কাম হইবারে যদি আকিঞ্চন,
কর তবে কল্পতরু যতনে সেবন।

নবীনবীর প্রতি।

সুধাপানে অমরতা লভিত দিবধি
হৃদয়ে, লোভে হয়ে ব্যাকুলিত-চিত্ত
অসুর আকাশে যথা সেই রস পিতে,
দেবতাদি দেবারির তথা করিল
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

মিত্র প্রকাশ এর ১ম সংখ্যা

চকবাজারের কেতাবপট্টি

।। এক ।।

১৮৭৫ সালের দিকে কবি নবীনচন্দ্র সেন একবার ঢাকায় বেড়াতে এসেছিলেন। ঢাকায় তিনি মাত্র দু'দিন ছিলেন, কিন্তু ঢাকা দেখে কবি কিছুমাত্র সুখী হতে পারেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন-- 'দেখিবার বড় কিছুই ছিল না'। তাঁর মতে 'রাস্তাগুলি অতিশয় সংকীর্ণ এবং এত স্যাঁতসেতে ও দুর্গন্ধময়' ছিল যে, মাত্র দুটি দিন থাকতেই তাঁর বিশেষ কষ্টবোধ হয়েছিল। দীনবন্ধু মিত্র নাকি একবার বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, গামলা করেই ছোট্ট বুড়ীগঙ্গা নদী পার হওয়া যায়। সে কথা স্মরণ করে নবীনচন্দ্র সেন মন্তব্য করেন, বুড়ীগঙ্গার কলেবর এত সংকীর্ণ যে, তা পার হওয়ার জন্য গামলারও প্রয়োজন হয় না। এটি অতিশয়োক্তি, সন্দেহ নেই। বাংলার অন্যান্য নদীর তুলনায় বুড়ীগঙ্গা নদী হয়তো সেকালে ক্ষুদ্র কলেবর বা সংকীর্ণ ছিল। আর, ঢাকা নগরীও হয়তো ছিল 'সংকীর্ণ, স্যাঁতসেতে ও দুর্গন্ধময়'। কিন্তু, সে যুগের ঢাকা সারা পূর্ববঙ্গের মধ্যে যে সবচেয়ে উন্নতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল, সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। এমনকি নবীনচন্দ্র সেনও স্বীকার করেছিলেন যে, "এত শিক্ষিত ও সুসম্পন্ন লোক পূর্ববঙ্গের অন্য কোনও নগরে নাই।"[১]

প্রকৃতপক্ষে, ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী। ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সুবাদার ইসলাম খাঁ ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং এর নতুন নামকরণ হয় 'জাহাঙ্গীরনগর'। কিন্তু, তার বহু আগেও যে ঢাকার অস্তিত্ব ও অবস্থান ছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণাদি পাওয়া যায়। সুতরাং, ঢাকা মহানগরী দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক গুরুত্বের পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মুঘল শাসনামলের পর ব্রিটিশ শাসনামলে কলকাতায় রাজধানী স্থাপিত হলেও বাংলার দ্বিতীয় মহানগরী হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করে বাংলায় নবজাগরণের সূচনা হয়। 'কিন্তু ঢাকায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নব জাগরণের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। এই নবজাগৃতির ইতিহাসে ঢাকার কয়েকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ। এই ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির সূচনা হয়। ঢাকায় স্থাপিত কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ অবদান রাখে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-- ঢাকা কলেজ (১৮৪১), পগোজ স্কুল (১৮৪৮), জগন্নাথ কলেজ (১৮৫৮), মহিলা বিদ্যালয় ইডেন স্কুল (১৮৭০), ঢাকা মাদ্রাসা (১৮৭৩), মেডিক্যাল স্কুল (১৮৭৫) প্রভৃতি।

১৮৬০ সালে ঢাকায় বাংলা ছাপাখানা ('বাঙ্গালা যন্ত্র') প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঢাকার সাহিত্যচর্চার ধারা শুরু হয়, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। ব্রজসুন্দর মিত্র, ভগবানচন্দ্র বসু

১. নবীনচন্দ্রসেন 'আমার জীবন', বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ২৭০।

প্রমুখের প্রচেষ্টায় এই ছাপাখানা স্থাপিত হয়। ১৮৬০ সালেই এই 'বাঙ্গালা যন্ত্রে' মুদ্রিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ'। ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঢাকা নিউজ প্রেস'। এই প্রেসে ইংরেজী ছাপার ব্যবস্থা ছিল। এই ছাপাখানা থেকেই প্রকাশিত হয় ইংরেজী সংবাদপত্র-- 'ঢাকা নিউজ'। মুনতাসীর মামুন প্রদত্ত এক তথ্যে জানা যায় [২] -- ১৮৪৮ সালের দিকে ঢাকার ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা ছোট কাটরায় একটি মুদ্রণ-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

১৮৬৫ সালের দিকে ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' নামে প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নাট্যশালাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় নাট্যচর্চার সূত্রপাত হয়।

বাঙ্গালা যন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এই মুদ্রণ-যন্ত্রেই ঢাকার প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'কবিতাকুসুমাবলী' মুদ্রিত হয়। ঢাকার বিখ্যাত সংবাদ-সাময়িকী 'ঢাকা প্রকাশে'র কার্যালয়ও ছিল এই বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে। ক্রমান্বয়ে ঢাকায় আরও অনেক ছাপাখানা স্থাপিত হয়। ১৮৬০ সালেই প্রকাশিত হয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক'। উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকায় যে কয়েকজন সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, হরিশচন্দ্র মিত্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরিহর নন্দী ও গোবিন্দচন্দ্র দাস। কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকাটি এ সময়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে এবং অনেকেই একে 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' বলে আখ্যায়িত করে। ঢাকায় স্থাপিত বিভিন্ন ছাপাখানায় মুদ্রিত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাকে কেন্দ্র করে ঢাকার সাহিত্যিক ও পাঠক সমাজ গড়ে উঠে।

উনিশ শতকে মুসলমান-প্রধান ঢাকায় জারীর গান, শাহ মাদারের গান প্রভৃতি নানা রকমের গান দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্য-রসপিপাসুদের তৃপ্তি সাধন করতো। এসব গান মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

ঢাকার মুসলমান সমাজে উর্দু এবং ফারসিরও বিশেষ চর্চা লক্ষ করা যায়। ঢাকায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার আগে আরবি-ফারসি ও উর্দু পুঁথির ব্যাপক প্রচলন ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'গুলিস্তা', 'বোস্তাঁ', 'সিকান্দরনামা', 'লায়লা মজনু', 'পান্দেনামা', 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', 'ইউসুফ-জোলেখা' প্রভৃতি পাণ্ডুলিপি ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপির লিপিকাল উনবিংশ শতাব্দী। ড. মুহম্মদ হবিবুল্লাহ সম্পাদিত আরবি ফারসি ও উর্দু পাণ্ডুলিপির তালিকায় [৩] লিপিকর অথবা পুঁথির মালিক হিসেবে ঢাকার কয়েকজন অধিবাসীর নামও পাওয়া যায়। যেমন, একটি পাণ্ডুলিপির লিপিকর ছিলেন ঢাকাবাসী এক ছাত্র ফরজউদ্দিন (ঢা. বি. পুঁথি ক্রমিক ৭৭)। অন্য এক পাণ্ডুলিপির লিপিকর ঢাকার রহমতগঞ্জে সুজাত আলীর গৃহে বসে পুঁথি নকল করেন (ঢা. বি. ১৩০)। নূরী বাঙ্গালী রচিত একটি পাণ্ডুলিপির লিপিকর ছিলেন ঢাকার মাহুতটুলীর জনৈক সদরুদ্দীন আহমদ (ঢা. বি. ৪৭-৪৯)।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকায় বেশ কিছু কবি, সাহিত্যিক উর্দু বা ফারসিতে সাহিত্য চর্চায় রত ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, মির্জা গোলাম হোসেন আতিশ, খাজা আবদুল গাফ্ফার, সৈয়দ মাহমুদ আযাদ প্রমুখ। ঢাকার কবিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন

২. মুনতাসীর মামুন– ঢাকার আদি মুদ্রণের ইতিহাস, 'সমাজ নিরীক্ষণ- ৩৬', মে ১৯৯০, পৃঃ ৫।
৩. দ্রষ্টব্য- A. B. M. Habibullah- Descriptive catologuec of Persian, Urdu and Arabic mannscripts in the Dacca University Library, Vol. I + II.

নবাব পরিবারের সদস্য। কয়েকজন ছিলেন ঢাকার আদিবাসী [৪]। ঢাকার আদি অধিবাসী বলতে আমরা তাদেরই বুঝবো, যারা পুরুষানুক্রমে ঢাকা শহরে বসবাস করছিল। এদের অধিকাংশই মুসলমান। অমুসলমান অধিবাসীদের প্রধান অংশ ছিল ঢাকা শহরের আশেপাশে থেকে আগত। ঢাকার আদি অধিবাসীরা দুটি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল-- সুব্বাসী (বা সুখবাসী) এবং কুট্টি। সুব্বাসীরা উর্দু বা উর্দু-মিশ্রিত-বাংলা ভাষায় কথা বলতো, আর কুট্টিদের ভাষা ছিল বাংলা। তবে, ঢাকার আদি অধিবাসীদের বাংলা ভাষায় প্রচুর উর্দু-হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হতো। তাদের স্বভাবজাত রসবোধ নিয়েও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে।

রমজান, ঈদ-উল-ফিতর ও মহররম উপলক্ষে ঢাকার আদি অধিবাসীরা ক্বাসিদা রচনা করতো। সেহেরীর সময় রোজদারদের ঘুম থেকে জাগানোর জন্য বিশেষ ক্বাসিদা-পরিবেশনের প্রতিযোগিতা হতো। বিশ শতকের প্রর্থমার্ধেও এই প্রতিযোগিতার রীতি প্রচলিত ছিল।

ঢাকার মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মিশ্র ভাষারীতির কাব্য রচয়িতা। ঢাকার 'চকবাজারের কেতাবপট্টি' ছিল মুসলমানী পুঁথির প্রধান কেন্দ্র।

।।দুই।।

চকবাজারের কেতাবপট্টির নাম হয়তো অনেকেরই অজানা, কিন্তু কলকাতার 'বটতলা' প্রায় সকলেরই পরিচিত। উনিশ শতকে কলকাতার 'বটতলা' এবং ঢাকার চকবাজারের কেতাবপট্টি একসূত্রে গাঁথা।

'বটতলা'র বই আজকের যুগে তাচ্ছিল্য ও অবহেলার বস্তু হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলা বইয়ের ইতিহাসে বটতলার বই এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য। মধ্যযুগের হাতে-লেখা পুঁথি ও এ যুগের মুদ্রিত বাংলা বইয়ের মধ্যে বটতলার বই এক স্মরণীয় সেতুবন্ধন। শোভাবাজারের মোড়ে এক শান বাঁধানো বটগাছকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল 'বটতলার বেসাতি'। কবি আজহার আলী তাঁর প্রকাশিতব্য 'দেলবর গোলে রওশন' কাব্যের বিজ্ঞাপনে রসগ্রাহীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিলেন—

মধুরস কথা ভাই জানিবে তাহাতে।
বান্ধা বটতলায় তারে দিয়াছি ছাপাতে।।

কালের অতলে সে বটগাছ হারিয়ে গেলেও হারিয়ে যায়নি বটতলার বইয়ের ইতিহাস ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য।

বলা হয়ে থাকে, শ্রীরামপুর প্রেসের ভূতপূর্ব কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রথম বাঙ্গালী প্রকাশক, প্রথম বাঙ্গালী মুদ্রাকর ও প্রথম বাঙ্গালী পুস্তক-বিক্রেতা। তিনি প্রথম দেশীয় মালিকানায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে 'বটতলা'র হাটে পসরা সাজান। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকে অনুসরণ করে অনেকেই বাংলা বই প্রকাশ করে 'বটতলার হাটের হাটুয়া'

কানিজ-ই-বাতুল-ঢাকা শহরের উর্দু ও ফার্সি সাহিত্যে চর্চা (১৮০০-১৯৪৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রে গঠিত প্রবন্ধ, পৃঃ ৩।

হলেন। ১৮২০-এর দিকে বিশ্বনাথ দেব বটতলায় প্রেস স্থাপন করলেন। শোভাবাজারের বটতলার উৎসমূল থেকে শুরু করে চিৎপুর রোড ধরে বটতলার বেসাতি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। বটতলার বইয়ের প্রকাশকেরা চিৎপুর রোডকেই বটতলা বলে চিহ্নিত করতে থাকেন। শুধু চিৎপুর রোডই নয়, আশেপাশের অলিগলিও বটতলা নামে পরিচিত ছিল। 'লালবানু শাহাজামাল' গ্রন্থের প্রকাশক তাঁর বইয়ে দোকানের পরিচিতি দিয়েছেন এভাবে— 'চিৎপুর রোড বটতলায় বৃন্দাবন বসাকের লেন ১৯ নম্বর বাটিতে আমার দোকানে এ-বই পাইবেন।'

'বটতলার বেসাতি'তে কয়েকজন মুসলমান প্রকাশকও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এঁদের প্রচেষ্টায়ই বটতলার বইয়ের একটি প্রধান শাখা 'মুসলমানী পুঁথি' বিকাশ লাভ করে। ড. সুকুমার সেনের মতে ১৮৪০ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত ছিল বটতলার স্বর্ণযুগ। মুসলিম সমাজে পাঠকসৃষ্টি অথবা সাহিত্যিকের আবির্ভাব হতে আরও অনেক সময় নিয়েছে। তাই, বটতলার বইয়ের ক্ষেত্র যখন অধিকার করে নিচ্ছে সাহিত্যের বাজার, ঠিক তখনই মুসলমানী পুঁথি ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৬৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বটতলার বইয়ের দ্বিতীয় পর্ব প্রকৃতপক্ষে মুসলমানী পুঁথির স্বর্ণযুগ।

বটতলার মুসলমানী পুঁথির প্রভাব শুধু চিৎপুর রোডের বাইরে নয়, কলকাতার বাইরে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। ঢাকায় চকবাজারের আশেপাশের এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছিল 'কেতাবপট্টি'। এই কেতাবপট্টিই ছিল পূর্ববাংলায় মুসলমানী পুঁথির রচনা ও প্রকাশনার প্রধান কেন্দ্র। ভাষা, বিষয় ও আকৃতি-প্রকৃতির দিক থেকে বটতলার মুসলমানী পুঁথি ও কেতাবপট্টির মুসলমানী পুঁথিতে কোনো প্রভেদ ছিল না। আমরা জানি, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শাহ গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার লেখনীতে যে দোভাষী বা মিশ্র ভাষারীতির উদ্ভব হয়, মুসলমানী পুঁথির অবলম্বনও তাই ছিল। সাধারণ শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মুসলমানদের মুখের ভাষার কাছাকাছি ভাষায় রচিত হয়েছে এই সব মুসলমানী পুঁথি। আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য এই পুঁথির ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাদ্রী জেমস লঙ্ এ ভাষায় লিখিত গ্রন্থকে 'মুসলমান বাংলা' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

মুসলমানী পুঁথির বিষয় সাধারণত ছিল প্রণয়কাহিনী বা ধর্ম-উপদেশ। কোনো কোনো প্রণয়কাহিনীর উৎস ফারসি বা হিন্দুস্থানী হলেও অধিকাংশ প্রণয়কাহিনী লেখকের মৌলিক সৃষ্টি। এসব বইয়ের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো নেই, কিন্তু বইগুলোতে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা সমাজতত্ত্ববিদদের কাছে মুল্যবান তথ্যবিশেষ।

ঢাকার চকবাজার ও কলকাতার বটতলা-- উভয় স্থানের প্রকাশিত মুসলমানী পুঁথিই আরবি-ফারসি কেতাবের ন্যায় ডানদিক থেকে বাঁদিকে ছাপা হতো। প্রায় একই আকৃতির এ পুঁথিগুলো ছাপা হতো বেশ বড় বড় হরফে। বড় হরফে ছাপার প্রধান কারণ, গ্রাম গ্রামান্তরে তেলের বাতির স্বল্প আলোয় সামান্য অক্ষর-জ্ঞান-বিশিষ্ট পাঠকের পড়তে যাতে অসুবিধা না হয়, তাই। এসব পুঁথিতে প্রথমে সাদা অথবা রঙীন কাগজের প্রচ্ছদ থাকতো। চারপাশে ছিল লতাপাতার বর্ডার। উপরে বড় বড় করে লেখা থাকতো– 'আদত', 'আসল', 'ছহি বড়' ইত্যাদি। সেকালে প্রাচীন বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব নিয়ে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না। তাই, প্রত্যেক প্রকাশক নিজ নিজ সংস্করণে কিছু পরিবর্তন বা সংযোজন করে, গ্রন্থসত্ব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে

অথবা গ্রন্থের বিক্রয়বৃদ্ধির জন্য, এসব আকর্ষণীয় কথা ছেপে দিতো।

মুসলমানী পুঁথির দাম সব সময়ই ছিল কম, যার ফলে সাধারণ লোক সহজেই তা কিনতে পারতো। অন্যদিকে স্বল্পমূল্যের কারণে গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার ছিল অনেক।

কলকাতার চিৎপুর রোড ও তার আশেপাশের এলাকায় স্থাপিত বিভিন্ন ছাপাখানা ও বইয়ের দোকানকে কেন্দ্র করে যেমন মুসলমানী পুঁথির বাজার গড়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি ঢাকার চকবাজারের পশ্চিম দিকে স্থাপিত কয়েকটি বইয়ের দোকান এবং তার আশেপাশের কয়েকটি ছাপাখানাকে কেন্দ্র করে মুসলমানী পুঁথির বেসাতি শুরু হয়। চকবাজারের কেতাবপট্টিতে মুন্সী হায়দার জানের একটি দোকান ছিল। তিনি একজন পুঁথি রচয়িতাও ছিলেন। তাঁর রচিত 'খলিল গোলজার' কাব্যে নিজ-দোকানের পরিচিতি তিনি এভাবে দিয়েছেন[৫] --

এই কেতাবের যার দরকার হইবে।
নিজ দোকানে মেরা আসিলে পাইবে।।
মিয়া রবিউল্লাহ্ বটে ভগিনী জামাই।
দোকানে থাকেন সেই পাবে তার ঠাঁই।।
চওকের পশ্চিমধারে কেতাব পট্টিতে।
ঠিকানা বলিয়া দিনু সবার খেদমতে।।

চকপট্টিতে মুন্সী আলিমুদ্দিনেরও একটি বইয়ের দোকান ছিল। তিনি গোলাম মাওলা রচিত 'শাহরুমের কেচ্ছা', 'তজহিজ তকফিন' এবং 'জেবল মুলক ও মেহের জামাল' গ্রন্থ তিনটি প্রকাশ করেন। লেখক প্রকাশকের অনুরোধেই গ্রন্থগুলি রচনা করেন। 'শাহরুমের কেচ্ছা' গ্রন্থে প্রকাশক তাঁর দোকানের বিজ্ঞাপন এভাবে দিয়েছেন—

"এই কেতাব যাহার আবিশ্বক (আবশ্যক) হইবে তিনি অত্র শহরের চৌকবাজারের পশ্চিম অধিনের কেতাবের দোকানে তত্ত্ব করিলে পাইবে।"[৬]

বহু পুঁথির রচয়িতা এবং আজিজিয়া প্রেসের মালিক মুন্সি ফয়েজউদ্দিনেরও একটি বইয়ের দোকান মোগলটুলিতে ছিল। তাঁর রচিত 'তালেনামা' গ্রন্থে নিম্নরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—

"এই সকল কেতাব যাহাদের দরকার হইবে তাঁহারা মোকাম ঢাকায় মোগলটুলী আমার কেতাবের দোকানে শ্রীযুক্ত হাফেজ মনিরুদ্দিন ছাহেবের নিকট কিম্বা ঠাটারুবাজার আমার বাটিতে তালাস করিলে পাইবেন।"[৭]

লক্ষণীয় যে, চকবাজারের কেতাবপট্টি শুধু চকবাজারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আশেপাশের মোগলটুলী, বড়কাটরা, ছোটকাটরা, চাম্পাতলি, ইমামগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও বিস্তৃত ছিল। সেকালে পুস্তক-বিপনন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুস্তকালয়-কেন্দ্রিক ছিল না। তাই,

৫. হায়দার জান– খলিল গোলজার, ঢাকা, ১৮৭৪। পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮।

৬. গোলাম মওলা-শাহরুমের কেচ্ছা, ১৮৮০, নাম পৃষ্ঠা।

৭. ফয়েজউদ্দীন– তালেনামা, ৮ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৮৭৯, শেষ প্রচ্ছদ।

বইয়ের দোকান ছাড়াও ছাপাখানায় অথবা লেখক বা প্রকাশকের বাড়িতে বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েই ঢাকায় মুসলমানী পুঁথির এক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। এই ঐতিহ্য সৃষ্টিতে পুস্তক-বিক্রেতা ছাড়াও মুদ্রাকর অথবা লেখকের অবদান কম নয়।

ঢাকায় প্রথম বাংলা মুদ্রণ-যন্ত্র (১৮৬০) প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই ঢাকার ইমামগঞ্জে কবি হরিশচন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে 'সুলভযন্ত্র' (১৮৬৩) স্থাপিত হয়। মুসলমানী পুঁথি ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ হরফ এই ছাপাখানায় ছিল বলেই বেশ কিছু মুসলমানী পুঁথি এখানে প্রথম ছাপা হয়। এর প্রায় দশ বছর পর ১৮৭৩ সালে ঢাকায় মুসলমান প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুদ্রণ-যন্ত্র 'মুহম্মদী যন্ত্র' স্থাপিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুন্সী মুহম্মদ জান, যাঁর নিবাস ছিল ঢাকার মৌলবীবাজারে বা আগা ফজলে আলীর বাজারে। ১৮৭৬ সালে ছোট কাটরার চাম্পাতলির গলিতে মুন্সি ফয়েজউদ্দিনের মালিকানায় 'আজিজিয়া প্রেস' স্থাপিত হয়। ঢাকার আগা ফজলে আলীর বাজারে স্থাপিত হয় 'সাঈদী যন্ত্র' (১৮৭৯)। ১৮৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইমদাদুল এসলামিয়া প্রেস'। এর মালিক ছিলেন মোহাম্মদ এমদাদুল্লাহ্। মুসলমান মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত এসব ছাপাখানায় প্রচুর পরিমাণে মুসলমানী পুঁথি ছাপা হয়। এ সব মুসলমানী পুঁথি পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ মুসলমানের রস-পিপাসা মিটিয়েছে। তাই, শুধু ঢাকার সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনেই নয়, সারা বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনেও এসব পুঁথির অবদান রয়েছে।

ঢাকার কেতাবপট্টির আর একটি অবদান হলো, এই অঞ্চলের বইয়ের দোকান বা ছাপাখানাকে কেন্দ্র করে মুসলমানী পুঁথিকারদের একটি সাহিত্যিক চক্রের উদ্ভব। পুঁথিকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ফয়েজউদ্দিন, খোয়াজ ডাক্তার, মনিরুদ্দিন ডাক্তার, মোহাম্মদ জহিরুদ্দিন, হায়দার জান প্রমুখ। এদের মধ্যে ফয়েজউদ্দিন ও হায়দার জান পুস্তক ব্যবসায়ী ছিলেন। এঁরা দুজনেই কেতাবপট্টির সমৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ঢাকার পুঁথি রচয়িতাদের নিজেদের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল, যার ফলে সুযোগ পেলেই গ্রন্থে একে অন্যের প্রশংসা করতেন। যেমন,

(ক) খোয়াজ ডাক্তার ও মনিরুদ্দিন ডাক্তার সম্পর্কে কবি জহিরুদ্দিন—

আর এক দোস্ত মোর খোওাজ নামেতে
চুরিহাট্টা বিচে ঘর সহর ঢাকাতে।...
ভাই এর সমান জোড় রাখি তার।।
খোওাজ ডাক্তারের পুত্র মনিরুদ্দিন আর।
দুজাহানে ভাল কর পরওয়ার দেগার।।

(খ) ডাক্তার মনিরুদ্দিন প্রসঙ্গে হায়দার জান—

ডাক্তার মনিরুদ্দিন বড় দোস্তদার।
রহমতগঞ্জের বিচে মাকান তেনার।।
বড় মেহেরবান তিনি অতি গুণবান।

(গ) মোহাম্মদ ফয়েজুদ্দিন প্রসঙ্গে কবি শেখ ঘিনু—

মুন্সি ফয়েজউদ্দিন সাহেব ওস্তাদ আমার।
পাক্কা মোসলমান মর্দ্দ অতি নেক্কার।।

(ঘ) কবি শেখ ঘিনু মুন্সি জহিরউদ্দিন সম্পর্কেও লিখেছেন—

আর এক দোস্ত মুন্সি জহিরুদ্দিন নামেতে।
কি কব তারিফ তার রচনার বাতে।।
শুনিলে রচনা তার দেলে হয় খোশ।
যত শুনি তত খুশি বাড়ে খোস জোশ।।

।। তিন ।।

ঢাকার পুঁথিকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

(১) খোয়াজ ডাক্তার ঃ

খোয়াজ ডাক্তার ঢাকা শহরের রহমতগঞ্জ নিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম রৌশন এবং পুত্রের নাম মনিরুদ্দীন ডাক্তার।

খোয়াজ ডাক্তার শাহজাদা ফিরোজবক্ত ও শাহজাদী বেবাহার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে 'বেবাহার পুঁথি' রচনা করেছিলেন। ১২৬২ সাল অর্থাৎ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল। পুত্র মনিরুদ্দীন তাঁর 'চামানে নও বাহার' কাব্যে এসম্পর্কে লিখেছেন ঃ

বারস বাসটটি সনে পুঁথি বেবাহার।
ছাপাইয়া ছিলেন পূর্বে বাবাজান আমার।।

সম্ভবত 'বেবাহার পুঁথি' কলকাতায় ছাপা হয়েছিল। কারণ ১৮৬০-এর পূর্বে ঢাকায় কোনো বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় নি। 'চামানে নও বাহার' কাব্যটি 'বেবাহার পুঁথি' অবলম্বনে রচিত।

অনুমান করা যায়, খোয়াজ ডাক্তার ১৮৭৪ বা ১৮৭৫ সনেও জীবিত ছিলেন। তাঁর পুত্র মনিরুদ্দীনের 'চামানে নওবাহার' কাব্যটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন কবি খোয়াজ পরলোকগত। 'চামানে' নওবাহার' (১৮৮০) গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে এ তথ্যটি পাওয়া যায় ঃ

"এই কেচ্ছা যাঁহার দরকার হয় মোং ঢাকা রহমতগঞ্জ শ্রীমনিরুদ্দিন ডাক্তার ওং মৃত খোয়াজ ডাক্তার ছাহেবের বাটীতে তাল্লাস করিলে পাইবেন।"

(২) মনিরুদ্দিন ডাক্তার ঃ

মনিরুদ্দিন ডাক্তারের নিবাস ছিল ঢাকা শহরের রহমতগঞ্জ। তিনি কবি খোয়াজ ডাক্তারের পুত্র এবং তাঁর পুত্রের নাম মোহাম্মদ বেনজীর। মনিরুদ্দিন ডাক্তারের 'চামানে নওবাহার' কাব্যটি ১৮৮০ সনে প্রকাশিত হয়।

"চামানে নওবাহার" কাব্যের নামপৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পর্কে নিম্নলিখিত পরিচিতি রয়েছে ঃ

"এই কেচ্ছার নাম চামানে নাওবাহার অর্থাৎ বেবাহার নাটক। তছনিফ শ্রী মোনিরুদ্দীন ডাক্তারের মোং ঢাকা রহমতগঞ্জ! কাহিনী বেবাহা সাহাজাদি ও ফেরুজ-বক্ত সাহাজাদার রসিক বন্ধুগণের খাহেশ মতে রঙ্গরসে ও নানামত নানা রাগ রাগ্নিতে পরিপূর্ণ করিয়া পুষ্পের কুজার মত সাজাইয়া বন্দুগণের ছামনে রাখিয়া দিলাম এখন চামনে ছাএর করেন। পুস্তকের মালিক শ্রী আবদুল গোফুর ও শ্রী মহাম্মদ বেনাজির ওলদে শ্রীমোনিরুদ্দীন ডাক্তার এই পুস্তক মোং ঢাকা আগা ফজলে আলির বাজারে শ্রীজুত মুনশী মহাম্মদ জান ছাহেবের মহাম্মদি যন্ত্রে ছাপাইয়া ১৮৬৭ সনের ২৫ আইন অনুসারে রেজিস্টার বহিতে দাখিল করিলাম। বাং ১২৮৭ সন ২২ শ্রাবণ"। গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭০+২। দাম চার আনা।

কবির পিতা খোয়াজ ডাক্তার ১২৬২ সনে 'বেবাহার পুঁথি' রচনা করেছিলেন। সে পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে মনিরুদ্দীন ডাক্তার "চামানে নও বাহার" পুঁথি রচনা করেন।

"চামানে নও বাহার"-এর কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

দক্ষিণ মুলুকে সমুদ্রের তীরে 'সহর সোমুদ'। সে দেশের শাহ্‌জাদার নাম ফিরোজবক্ত। ফিরোজবক্ত 'রূপে গুণে মনোহর সুরুজের প্রায়'।

একদিন শাহজাদার সওদাগর-বন্ধু বাণিজ্যে যাবার আগে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে যে সে তার জন্য বিদেশ থেকে কি আনবে? শাহ্‌জাদা জানায় ঃ

পাও যদি কোন চিজ্‌ বেবাহা এমন।
আমার কারণ তুমি আনিবে তখন।

সওদাগর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দূর দেশে পাড়ি জমায়। তারপর একদেশে গিয়ে হাজির হয়। সে রাজ্যের মালিনীর মুখে শাহ্‌জাদী বেবাহার রূপবর্ণনা শোনে।

মালিনীর সহযোগিতায় সওদাগর বেবাহা সুন্দরীর এক চিত্র সংগ্রহ করে দেশে ফিরে গিয়ে বন্ধুকে উপহার দেয়। শাহ্‌জাদা সে চিত্র দেখে আসক্ত হয়ে সওদাগরসহ বেবাহা সুন্দরীর দেশের উদ্দেশে রওনা হয়। তারা দু'জনে মালিনীর শরণাপন্ন হয়। মালিনীর নির্দেশক্রমে শাহজাদা ফিরোজবক্ত নারীর ছদ্মবেশে মাছের দোকান দেয় এবং বিশেষ একদিন পুরুষ-বর্জিত বাজারে কন্যার আগমন হয়। ছদ্মবেশী শাহজাদাকে দেখে কন্যা আকৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় দিন শাহ্‌জাদা এক জহুরীর ছদ্মবেশে বাজারে যায়। সেখানেও কন্যা মূর্ছা যায়। তৃতীয় দিন কন্যা বাগানে শায়িত শাহজাদাকে দেখে পত্র লিখে রেখে আসে। ফিরোজবক্ত সে পত্রের জবাব লেখে এবং পরে বাগানে তাদের মিলন ঘটে। বিনোদিনী নামে এক সখী ঈর্ষান্বিত হয়ে সকল সমাচার কন্যার মায়ের কাছে জানায়। মা বেবাহাকে তিরস্কার করে শাহ্‌জাদাকে কোটালের হাতে বন্দী করায়।

জল্লাদকে একটি হীরক অঙ্গুরী উপহার দিয়ে শাহজাদা ফিরোজবক্ত পরিত্রাণ পায়। তারপর সে এক বাইজীর গৃহে আশ্রয় নেয়। সে বাইজীর মারফত কন্যার সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় এবং তারা পলায়নের পরিকল্পনা করে। কিন্তু ভুলক্রমে পুরুষবেশী কন্যা এক চোরের ঘোড়ায় আরোহণ করে। এদিকে শাহ্‌জাদা কন্যার সন্ধানে নানা দেশে ঘুরে বেড়ায়। আর চোরের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে 'দেশে দেশে ফিরে কন্যা উদাসিনী হৈয়া'।

তারপর পুরুষবেশী কন্যা এক দেশে গিয়ে পৌঁছলো। সেখানকার কাজি-জাদা তাকে দেখে পাগল হয়। সেখান থেকে কন্যা গেল সোলতান শাহার দেশে। সে দেশ থেকেও কন্যা কৌশলে পলায়ন করে। পথে খেয়া পার করার সময় নৌকার মাঝিও তাকে দেখে পাগল হয়।

পুরুষবেশী বেবাহা ঘুরতে ঘুরতে এক দেশে গিয়ে পৌঁছলো এবং সেখানে সে দেশের শাহজাদীকে বিবাহ ও বাদশাহী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে শর্ত দেয় ঃ

জানিবে আমার দেশে এই নীতি আছে।।
স্ত্রীপুরুষ এক সাল থাকি ভাতে ভাতে।
কদাচিৎ নাহি থাকি এক পালঙ্কেতে।।

বাদশাহী গ্রহণ করে সে রাজ্যের চার প্রান্তে বেবাহার চার মূর্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়। মূর্তির কাছে চোর, মাঝি ও কাজি-জাদা এসে হাজির হয়। চোরের যথাবিধি সাজা হয়।

তারপর শাহ্জাদা ফিরোজবক্তও একদিন সেখানে এসে হাজির হয় এবং বন্দী হয়। অবশেষে ফিরোজবক্ত ও বেবাহার মিলন হয়।

এ কাব্যের 'বেবাহা কন্যার বারমাসীটি' সুন্দর। গতানুগতিক কাহিনী ও রচনা-রীতি অনুসরণে যেখানে কবির কাব্যপ্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র সীমিত, সেখানে এ বারমাসী অংশে কবি স্বকীয়তা প্রকাশের কিছুটা সুযোগ পেয়েছেন।

(৩) মোহাম্মদ ফয়েজুদ্দীন ঃ

মোহাম্মদ ফয়েজুদ্দীনের আবাস ছিল ঢাকা শহরের 'ঠাটারু বাজার বীচে মসজিদের কাছে'। এ তথ্য কবির প্রায় সকল গ্রন্থেই পাওয়া যায়। আবদুল গফুর সিদ্দিকী কুমিল্লা নিবাসী ফয়েজুদ্দীন রচিত 'রাশিনামা' নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[৮] পরবর্তীকালে আবুল কাসিম মোহাম্মদ আদমউদ্দীনও 'পুথি সাহিত্যের ইতিহাস' প্রবন্ধে সে তথ্য দিয়েছেন।[৯] 'তালেনামা ও রাশিনামা' ঢাকার মোহাম্মদ ফয়েজুদ্দীনের একটি গ্রন্থের নাম। আবদুল গফুর সিদ্দিকী বা আবুল কাসিম মোহাম্মদ আদমউদ্দীন কবির আবাস সম্পর্কে তথ্যটি তাঁর কাব্যেই পেয়েছেন কিনা উল্লেখ করেন নি। তাছাড়া উভয় কবির গ্রন্থের নামের সাদৃশ্য দেখেও মনে হয় না যে তাঁরা ভিন্ন ব্যক্তি।

উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকার যে কয়েকজন কবি বা পুঁথিরচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দীনের গ্রন্থসংখ্যা সর্বাধিক।

১। ১৩০ ফরজের ছহি বয়ান (১৮৬৮)। "শ্রী মোহাম্মদ ফয়েজুদ্দীন কর্ত্তৃক অনুবাদিত"।। ঢাকা বাবুর বাজার সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশকাল ১২৭৫ সন ৩২ শ্রাবণ বা ১৮৬৮ খ্রিঃ ১৫ আগষ্ট। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০। দাম/ ১০ পয়সা।"

একশত ত্রিশটি মাছায়েল বা অবশ্যকরণীয় ফরজের বর্ণনা এ গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়।

২। তালেনামা... প্রথম ভাগ (১৮৬৭) গ্রন্থটির পূর্ণ নাম 'ছহি তালেনামা এবং ছাএতনামা ও রাশিনামা'। তিন খণ্ড একত্রে প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ— ঢাকা ১৮৬৭।

৮. আব্দুল গফুর সিদ্দিকী– মুসলমান ও বঙ্গ সাহিত্য- 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ১৩২৩।

৯. আবুল কাশেম মোহাম্মদ আদমউদ্দীন– পুথিসাহিত্যের ইতিহাস, মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন, ১৩৫২, পৃষ্ঠা ৫৩৮।

দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সনে। বিশ বছরের মধ্যে একটি গ্রন্থের ১২টি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া কম প্রশংসনীয় নয়।

গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত। মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দীন রচনা করেন প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ রচনা করেন যথাক্রমে জহিরুদ্দিন ও হায়দার জান।

মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দীন তালেনামা রচনা করেন "ফএজ রওশন" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে। ১২৭১ সালে তিনি কাব্যটি প্রথম রচনা করেছিলেন—

একহত্তর সনে পুথি লিখিনু তামাম।
আগুনে জ্বলিল কাপি না আসিল কাম।। (পৃষ্ঠা ২)

অনেক কষ্ট করে কবি ১২৭৩ সনে পুনরায় কাব্যটি রচনা করেন। কিন্তু এবারও—

রাজনগর মেলায় কিস্তি গরক হইল।
মাল আছবাব কাপি নদীতে ডুবিল।।

দুটি দুর্ঘটনার পরও কবি হতাশ হননি। তিনি ১২৭৫ সনে আবার তা লেখার চেষ্টা করেন। এবার তিনি কাব্যটি সমাপ্ত করে যথাসময়ে প্রকাশ করতে সক্ষম হন।

৩। নাজাতোল মোছলেমিন (১৮৭৯)। "আমি শ্রীমহাম্মদ ফয়েজদ্দিন দিনদার মোছলমানদিগের ফায়দার কারণ হাদিছ ও ফেকা তাছাওফ হইতে তরজমা করিয়া মোকাম ঢাকার আগা ফজলে আলির বাজার শ্রীযুত মুনসি মহাম্মদ জান সাহেবের মহাম্মদি প্রেসে প্রথমবার ছাপাইয়া ১৮৬৭ সনের ২৫ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি বহিতে দাখিল করিলাম সন ১২৮৬ সাল ১৬ কার্ত্তিক ইংরাজি ১৮৭৯ সালের ১ নভেম্বর"।। পৃষ্ঠাসংখ্যা— ৯৬।

'হামদ ও নাত' ছাড়া গ্রন্থে মোট ৫৭টি বিভিন্ন বিষয়ক বয়ান রয়েছে। কয়েকটি বয়ানের উল্লেখ করা যায়, যেমন ঃ

খোদাতালাকে চিনিবার বয়ান/ এনছান চিনিবার বয়ান/ বোআলি হেকিমের বয়ান/ আকায়েদ এলেমের বয়ান/ বেনামাজির গোরে আজাবের বয়ান/ মা বাপের তাবেদারির বয়ান/ সারাবির আজাবের বয়ান ইত্যাদি। 'সারাবির বয়ানে' কবি পরকালে মাতালদের আজাবের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

সারাবিকে খিচ্যা লিবে হাসর ময়দান।।
উলঙ্গ পিয়াসা ভুকা চক্ষু আন্ধা আর।
কলেজা ফাটিয়া জাবে মুক্কের মাঝার।।
আগুনের বেড়ি কড়ি হাতে গলে পাএ।
কবরে আগুন তার জ্বলিবে সদায়।। (পৃষ্ঠা ৯০)

উনবিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে ৭ম ও ৮ম দশকে ঢাকা শহরে মদ্যপানের বিশেষ ব্যাপকতা ঘটে। ১৮৭৮ সালে ঢাকা শহরে ১৬১টি মদের দোকান ছিল বলে প্রকাশ [১০]।

১০. ১৮৭৮ সনের ২৭ বৈশাখ তারিখের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় প্রকাশিত এ তথ্যটি অমৃত, ৬ কার্তিক, ১৩৭১ সন (উনিশ শতকের বাংলা একটি দিক-জয়ন্ত গোস্বামী) ৯১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

সম্ভবত মদ্যপানের ব্যাপকতা লক্ষ করেই কবি 'সারাবির আজাবের বয়ান'টি রচনা করেন।

৪। আহকামোচ্ছালাত (১৮৮০)। ঢাকা সুলভযন্ত্রে ঈশানচন্দ্র শীল কর্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশকাল ১২ চৈত্র ১২৮৬ সন বা ২৪ মার্চ ১৮৮০। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬১। দাম ।০ আনা।

সালাত বা বিভিন্ন নামাজের বিধি, নিয়ম ইত্যাদি এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

৫। তেরছদ্দির পুথি (১৮৮০)। "আমি শ্রীমাহাম্মদ ফএজুদ্দিন এই তেরছিদ্দির পুথি তৈয়ার করিয়া নিজ এতেমামে আপন হরফে কমপোজ করাইয়া ঢাকা সুলভযন্ত্রে ছাপাইয়া ১২৬৮ সনের ২৫ আইন অনুসারে রেজিস্টারি করিলাম। বাঙ্গালা ১২ চৈত্র ১২৮৬ সন। ২৪ মার্চ ১৮৮০। শ্রীইসানচন্দ্র সিল প্রিন্টার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।"

গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০। দাম তিন আনা।

এ গ্রন্থে হিজরী তের শতকে সমাজের দুরবস্থার চিত্র অংকিত হয়েছে। গ্রন্থের সূচি নিম্নরূপ ঃ

হামদ নাত/ বারমাসের হিসাবের বয়ান/ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি জোগের বয়ান/ কলি জোগের বয়ান/ কলির সন্ধ্যার বয়ান/ কলি জামানার হাল/ কলি জামানার বয়ান/ কলির বেটির বয়ান/ জরূ মুরিদার বয়ান/ মহল্লার ছরদারের এনছাফ/ মালের লালচের বয়ান/ মউতের আলামতের বয়ান/ রূপ নিকালিয়া মউতে ছওাল করিবার বয়ান/ খাতেমা কেতাব সায়েরের পরিচয়।

কবি বিভিন্ন বয়ানে সামাজিক দুর্নীতি বা বিশৃঙ্খলার বর্ণনা দিয়েছেন। উদাহরণ-স্বরূপ কলি যুগের বয়ান- এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যায় ঃ-

এই আইল কলি যুগ
সাগরিদে ওস্তাদ মারে ভাই মারে ভাই।
গৌরবেতে ভাব নাহি শাশুড়ি জামাই।।
এই আইল কলিযুগ।
বাপে পুতে হুড়াহুড়ি মায়ে ঝিয়ে ধন্ধ।
শাশুড়ি না মানে বউ বলে মন্দ মন্দ।।
রাজা হইল ধনলোভী রাইয়ত কাঙ্গাল।
কাজি অবিচার করে কারকুন বাঙ্গাল।।
এই আইল কলিযুগ।
সন্ন্যাস ছাড়িল যোগী মণি হইল ভোলা।
গিরস্তেরা হাল চষে খাটায় কামলা।।
এই আইল কলিযুগ।
আলমে আমাল নাহি ফিরে বাড়ি বাড়ি।
জোয়ানকালে বুড়া হইল পোলার মুখে দাড়ি।।
এই আইল কলিযুগ।

নেকিকাম পরিহরি পাপকাম করি।
নারী মারে পুরুষ পুরুষে মারে নারী।।
এই আইল কলিযুগ।
আপনা রাখিয়া হরে বেগানার মাল।
চিন্তায় জার জার নারী পুরুষ আবাল।।
এই আইল কলিযুগ।
আল্লাহর ফকির হীন গরিবে কহএ।
কলেমা ইমান রইলে কলিযুগ নএ।।
এই আইল কলিযুগ।। (পৃষ্ঠা ৯-১০)

তদানীন্তন ঢাকায় প্রতি মহল্লায় সরদার ও পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সরদারীর নামে মহল্লার সরদার যে অন্যায় অবিচার করে থাকতো তার পরিচয় 'মহল্লার ছরদারের এনছাফ' শীর্ষক বয়ানে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের ঢাকার সমাজচিত্র হিসেবে এ বয়ানটি বিশেষ মূল্যবান।

৬। নক্সে সোলামানী (১৮৮৪ খ্রিঃ)। আজিজিয়া প্রেসে (মোগলটুলী, ঢাকা) আবদুল আজিজ কর্তৃক মুদ্রিত। ১ম সংস্করণ, জুলাই ১৮৮৪। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৭। দাম ।০ আনা।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু জ্যোতিষশাস্ত্র। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় এ গ্রন্থ সম্পর্কে পরিচিতি নিম্নরূপ ঃ

"Translation of an Urdu book on Astrology."

৭। আদম-ফিল হাদিস (১৮৮৫)। লেখক কর্তৃক মোগলটুলী থেকে প্রকাশিত। ঢাকা আজিজিয়া প্রেসে মুদ্রিত। জুন ১৮৮৫। ১ম সংস্করণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০৯। দাম সাত আনা।

ধর্মীয় বিধি-নিয়ম এবং উপদেশাবলী এ গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়।

৮। মধুমালার পুথি (১৮৮৫) ঢাকা গিরিশ প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক মুন্সী শারাফউদ্দীন জুলাই ১৮৮৫। ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪। দাম দুই আনা।

প্রচলিত মধুমালার কাহিনী অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দীন রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটি একমাত্র প্রণয়োপাখ্যান। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু প্রধানত ধর্ম বা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ।

৯। চিকিৎসা রত্নাবলী (?)। এ গ্রন্থটির নাম আবুল কাসেম মোহাম্মদ আদমউদ্দীন উল্লেখ করেছেন।[১১] চিকিৎসা শাস্ত্রবিষয়ক এ গ্রন্থটির উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায় নি। গ্রন্থের নামকরণেও বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়।

১১. আবুল কাসেম মোহাম্মদ আদমউদ্দীন– পুথি সাহিত্যের ইতিহাস, মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন, ১৩৫২ সাল, পৃষ্ঠা ৫৮৩।

(৪) মোহাম্মদ জহিরুদ্দিন ঃ

ঢাকা শহরের পোস্তায় মোহাম্মদ জহিরুদ্দীনের নিবাস ছিল।[১২] কবির পিতার নাম তুফানি এবং দাদার নাম মেহের আলি।

মোহাম্মদ জহিরুদ্দীন একাধিক কাব্য রচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর পাঁচটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে ঃ

১। তালেনামা- দ্বিতীয় ভাগ (১৮৬৭)। 'ছহি তালেনামা এবং ছাএতনামা ও রাশিনামা' গ্রন্থটি ১৮৬৭ সনে প্রকাশিত হয়। এতে তিনটি ভাগ ছিল। প্রথম ভাগের রচয়িতা মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দীন; দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন মোহাম্মদ জহিরুদ্দীন এবং তৃতীয় ভাগ হায়দার জান রচনা করেন।

মোহাম্মদ জহিরুদ্দীন 'জওহরে তালেনামা' গ্রন্থ অবলম্বনে তালেনামার দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তু রাশির বর্ণনা ও তার তাৎপর্য। বিষয়বস্তুর জনপ্রিয়তার জন্য গ্রন্থটির বহু সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল।

২। এস্কে আজায়েব (১৮৭৭)— ১ম জেলেদ। এস্কে আজায়েব গ্রন্থের পূর্ণনাম 'এস্কে আজায়েব বা আগর ও গোল'। "সন ১২৮৪ সালের ১০ অগ্রহায়ণে কেতাব হইলো তামাম খোদার মেহেরে সহর কলিকাতা সাং মিশ্রিগঞ্জ করিম বক্স খানসামার লেনে ২০নং বাটিতে বরকতি ছাপাখানায় প্রস্তুত হইলো এইক্ষণ উক্ত ছাপাখানার মালিক শ্রীমহাম্মদ এসমাইল খাঁ ও শ্রীমহাম্মদ এছহাক খাঁ হেড মোনসি শ্রী আহমদ আলি খাঁ ছাহেবের দ্বারায় ছাপাইলাম"।। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩২, দাম বার আনা।

গ্রন্থটি দু' জেলেদ বা খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম জেলেদ কবি জহিরুদ্দীনের রচনা। দ্বিতীয় জেলেদের রচয়িতা কবি হায়দার জান। ১৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'আউওল জেলেদ' এবং ১৩৯ পৃষ্ঠা থেকে ২২৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'দোছরা জেলেদ'।

কবি হায়দার জানের অনুরোধে জহিরুদ্দিন হিন্দুস্থানী বা উর্দু কোনো কাব্যাবলম্বনে এ কাব্যের প্রথমাংশ অনুবাদ করেন। হায়দার জান গ্রন্থের প্রচ্ছদে জানাচ্ছেন ঃ

ফারসী জবান হৈতে হিন্দি জবানেতে।
তরজমা করিয়া ছিল এক সায়েরেতে।।
হিন্দীর জবান হৈতে বাঙ্গালা জবানে।
লোকের খায়েশ হেতু রচিনু এখনে।।

প্রথম জেলেদের কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

বাদশাহ্ মনসুর শাহ্ ও তাঁর উজির খোস্হাল— উভয়ে অপুত্রক। এক দরবেশের দোয়ায় উভয়ে সন্তানলাভ করেন। রাজার ঘরে জন্ম নেয় শাহ্জাদা লাল আর উজিরের ঘরে জন্মগ্রহণ করে যমজ পুত্রকন্যা মাহমুদ ও আগর।

বাদশার ফরজন্দ হৈল চান্দের মাফিক।
অন্ধকার ঘরে জেন উজ্জ্বল মাণিক।।

---

১২. হীন জহরুদ্দিন সবাকার পায়। ঘর নওাবের পোস্তা সহর ঢাকায়, এস্কে আজায়েব, জহিরুদ্দীন ও হায়দার জান -১৮৭৭, পৃষ্ঠা ৩।

আর উজিরের ঘরে—

আফতাব মাহতাব জোড়া যেন পয়দা হৈল।

একদিন শাহ্‌জাদা লাল পিতার অনুমতি নিয়ে শিকারে যায়, সাথে মাহমুদও যায়। শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে তারা তেলেছমাতের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। জঙ্গলে বসে মাহমুদ কাঁদতে থাকে। তারপর বাদশাহ্‌র কাছে এসে মাহমুদ সবিস্তার সকল কথা জানায়।

এদিকে লালদৈত্য শাহ্‌জাদাকে বন্দী করে রাখে। শাহ্‌জাদা দুটি কবুতরের মুখে 'মাহেপরওয়ার' পরীর রূপ বর্ণনা শুনে আসক্ত হয় ঃ

কবুতরের জবানি শুনিল যেই হাল।।
মাহে পরওয়ার পরীজাদী না জানি কেমন।
জানোয়ার তারিফ করে যাহার কারণ।।
না জানি কি রূপ আল্লা দিয়াছে তাহার।
এস্কের দামেতে দেল হৈল গ্রেফতার।।

এদিকে কবুতরের মুখে শাহজাদার রূপের কথা শুনে মাহেপরওয়ার পরীও আসক্ত হয়।

উথলে প্রেমের নদী হইল উদাস।।
আশুক মাশুকের দেল মজে এক ভাবে।

শাহজাদার অনুরোধে লাল-দৈত্য ময়ূরের রূপ ধরে পরীরাজ্যে যায় ও তার একটি পত্র পরওয়ার পরীর কাছে দেয়। পরীও দৈত্যের মারফত সে পত্রের জবাব দেয়। এদিকে দৈত্যের মহলে শাহজাদা একা ঘুরতে ঘুরতে এক কক্ষে গিয়ে দেখে ঃ

একটি আওরত সেথা বাহুত সুবন্ধ।
নেকের মাফিক ছবি বড়া আক্কেলমন্দ।।

শাহ্‌জাদা তাকে মাতৃ সম্বোধনে সন্তুষ্ট করে জানতে পারে যে তার নাম কুরসিয়া। কুরসিয়ার পুত্র গোল শাহা এসে লালকে দেখলেই যে হত্যা করবে, কেন সে এখানে এসেছে? তারপর সেখানে গোলশাহ্‌ যখন এসে পৌঁছয় তখন তাকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে শাহাজাদা রক্ষা পায়।

অবশেষে মাহেপরওয়ার পরী শাহাজাদার প্রেমে আকৃষ্ট হয়। বিভিন্ন ঘটনার পর তাদের শুভ পরিণয় ঘটে। গ্রন্থের ১ম জেলেদের এখানেই সমাপ্তি। দ্বিতীয় জেলেদে গোল ও আগরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত তিনটি গ্রন্থ দেখার সৌভাগ্য হয় নি। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় এ গ্রন্থগুলির বিবরণী পেয়েছি।

৩। ওমর উমাইয়া (১৮৮৪)। ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সনের জুলাই মাসে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৬। দাম দশ আনা। ঢাকা আজিজিয়া প্রেসে মুদ্রিত।

বেঙ্গল লাইব্রেরির (১৮৮৪) তালিকায় গ্রন্থটির কাহিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে— Story taken from urdu work "Amir Hamza".

৪। আয়েনুল মোমেনিন (১৮৯৬)। ১৮৯৬ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫৬। দাম তিন আনা।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু ধর্মীয় বিধি নিষেধ।

৫। আজাবুল কবর (১৯০০)। ঢাকা বেদব্যাস প্রেসে মুদ্রিত। ১৯০০ সনের আগস্ট মাসে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২। দাম দু' পয়সা।

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় গ্রন্থের পরিচিতি নিম্নরূপ—

Teaching of Islam relating of life after death.

(৫) হায়দার জান :

হায়দার জানের নিবাস ছিল ঢাকা শহরের মির্জামান্নার দেউড়ি। পিতার নাম করিমউল্লাহ্ ও দাদা মোহাম্মদ নাজের।

নানা মোহাম্মদ আবেদ ছিলেন নেক্কার।
লেখাপড়া শিখাইলেন খাতেরে আমার।।

কবির পেশা ছিল পুস্তক-ব্যবসায়। চওকের পশ্চিমধারে কেতাব পট্টিতে তাঁর বইয়ের দোকান ছিল।

কবি মোট চারটি কাব্য রচনা করেছেন— গোল আন্দাম, হায়রাতুল আখলাক, খলিল গোলজার ও এস্কে আজায়েব।

১। গোল আন্দাম। কবির প্রথম রচনা।[১৩] প্রকাশকাল জানা যায়নি। গ্রন্থের বিষয়বস্তু গোল আন্দাম পরীর প্রণয়কাহিনী।

২। হায়রাতুল আখলাক (১৮৬৭)। উর্দু 'হায়রাতুল আখলাক' গ্রন্থের এ অনুবাদটি "তালেনামা এবং ছাএত নামা ও রাশিনামা" গ্রন্থের তৃতীয় ভাগরূপে প্রকাশিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন যথাক্রমে মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দীন ও মোহাম্মদ জহিরুদ্দীন।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিভিন্ন রাশির তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও বর্ণনা।

৩। খলিল গোলজার (১৮৭৪)। "খলিল গোলজার/ অর্থাৎ ইব্রাহিম খলিলোল্লার কেচ্ছা/ আমি অধীন শ্রীহায়দার জান তরজমা করিয়া/ নিজ এহেতামামে স্বয়ং তদারক করিয়া/ এবং শ্রীযুত মুন্সী মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দিন ছাহেব অনেক অনেক/ ছহি করিয়া ঢাকা সুলভ/ যন্ত্রে প্রথম বার/ ছাপাইলাম"। বাঙ্গালা ২৫শে ভাদ্র ১২৮১, ইংরাজী ১৮৭৪ ৭ই সেপ্টেম্বর, ঈশানচন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। দাম সাড়ে চার আনা।

---

১৩. "পহেলা লিখিয়া ছিনু কেচ্ছা গোলেন্দাম,
হায়রাতুল আখলাক ফের করিনু তামাম,
তেছরাতে এই ফের খলিল গোলজার।"
— খলিল গোলজার, হায়দার জান-১৮৭৪। পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮।

হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর জন্ম থেকে শুরু করে ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর বিস্তৃত জীবনকাহিনী এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

৪। এস্কে আজায়েব (১৮৭৭)- দ্বিতীয় জেলেদ। ১৮৭৭ সনে প্রকাশিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় জেলেদ রচনা করেন হায়দর জান। ১৩৯ পৃষ্ঠা থেকে ২২৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় জেলেদ। প্রথম জেলেদ রচনা করেন মোহাম্মদ জহিরুদ্দীন।

প্রথম জেলেদের কাহিনী বাদশা মনুসর শাহের পুত্র শাহ্জাদা লাল এবং মাহেপরওয়ার পরীর প্রণয় কাহিনী। তাদের মিলনে বিশেষভাবে সাহায্য করে লাল দৈত্য এবং কুরসিরা পরীর পুত্র গোল শাহা।

দ্বিতীয় জেলেদের কাহিনী প্রধানত গোল শাহ্ ও আগরের প্রণয় কাহিনী। আগর মনসুর শাহের উজির-নন্দিনী।।

আগরের প্রকৃত পরিচয় অবগত হয়ে এবং তার রূপ দেখে গোল শাহ্ আসক্ত হয়। কিন্তু বার বার আগর তার প্রেম নিবেদন প্রত্যাখ্যান করে, কারণ সে পরীর পুত্র।

এদিকে আগরের যমজ-ভ্রাতা মাহমুদ গোল শাহের বোন গোলানার প্রতি আসক্ত হয়। উভয়ের প্রণয় শুভপরিণয়ে পরিণতি লাভ করে।

ভাই মাহমুদ পরী কন্যা গোলানাকে বিয়ে করেছে শুনে আগর আরও অসন্তোষ প্রকাশ করে। অবশেষে গোলেরই জয় হয়। আগর তার প্রণয়ে সাড়া দেয় এবং বিভিন্ন বাধাবিপত্তির পরে তাদের মিলন ঘটে—

আগরের গলার হৈল গোল শাহা হার।।
এই মতে খুশি হালে রহে চিরদিন।
হায়দার জান কহে কহো আমিন আমিন।।
আগর ও গোলের জেয়ছা হইল মিলন।
তেয়ছাই মিলাও আল্লা সবার কারণ।।

(৬) সৈয়দ জান ঃ

ঢাকা শহরের ঠাটারি বাজারে সৈয়দ জানের নিবাস ছিল। তাঁর দাদা খুব কামেল ছিলেন।

দাদাজির চরণেতে বহুত সালাম।
বড় কামেল ছিল আন খানকার নাম।।
মকাম আছিল তেনির সোনার গাএতে।।
দরবেশ কামেল অতি ছিল মারফতে।।

ছেলেবেলায় কবি মাতৃহীন হন। তখন তাঁর পিতা পুত্রসহ শহরে এসে বাস করতে থাকেন এবং পুত্রের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। কবি চাকুরীজীবী ছিলেন। সে কথা জানা যায় তাঁর কাব্যের এক ভনিতায় ঃ

পরের চাকুরী করি পেটের জ্বালায় ফিরি
ভাবনাতে দেল বেকারার।

কিন্তু তিনি কি চাকুরী করতেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য দেননি। কবির কাব্যের নাম নছিহত নামা'।

১। নছিহতনামা (১৮৬৮)। ঢাকা বাবুরবাজার সুলভ যন্ত্রে ঈশানচন্দ্র শীল প্রিন্টার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৮। দাম তিন আনা, ১২৭৫, ১৫ই অগ্রহায়ণ। শেখ সাদী রচিত ফারসি কাব্য 'পন্দেনামা'র অনুবাদ।

(৭) বশিরুদ্দিন আহমদ ঃ

বশিরুদ্দিন আহমদ ঢাকা জেলার অধীন রায়পুরা থানার চান্দেরকান্দি গ্রাম নিবাসী ছিলেন। তাঁর রচিত একটি মাত্র কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়— 'গোল শুনাহর চন্দ্রমুখী'।

১। গোল শুনাহর চন্দ্রমুখী (১৮৮০)। "ঢাকা আগা ফজলে আলীর বাজারস্থ মহম্মদী যন্ত্রে মুদ্রিত।" ১২৮৬ সন, ২৬শে পৌষ। পৃষ্ঠা সংখ্যা— ১০৩। দাম ৪ আনা।

কাব্যটি একটি প্রণয়োপাখ্যান। এ–কাহিনীর শেষে নায়ক-নায়িকার মিলনে অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। ঈসা পয়গম্বর আবির্ভুত হন এবং মৃত নায়ক-নায়িকাকে পুনর্জীবন দান করেন।

(৮) মোহাম্মদ ঘিনু ঃ

মোহাম্মদ ঘিনুর নিবাস ছিল ঢাকা জেলার লালবাগ থানার কেরানীগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী গ্রামে। পিতার নাম মানিক ব্যাপারী এবং পিতামহের নাম দোস্ত মহম্মদ। ঢাকার কবি মুনসি ফয়েজদ্দিন ও মুনসি জহিরউদ্দিনের অনুপ্রেরণায় তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। কাছাড় জেলায় তাঁর ব্যবসা ছিল। কবি শেখ ঘিনু দুটি কাব্যের রচয়িতা।

১। আশক কামাল (১৮৬৯) "ঢাকা বাবুরবাজার সুলভ যন্ত্রে ঈশানচন্দ্র শীল প্রিন্টার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৭৬ সাল ৪ঠা ভাদ্র, ১৮৬৯ ইং, ১৯শে আগষ্ট।" পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৭। দাম তিন আনা।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু একটি প্রণয়োপাখ্যান। কাহিনীটি মৌলিক বা অনুবাদ সে সম্পর্কে কবি কাব্যের কোথাও কোন মন্তব্য করেন নি।

'আশক কামাল'- এর কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

এক ছিল রাজা। তার এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা ছিল। সে কন্যা একদিন স্বপ্নে এক শাহজাদাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সে এক জঙ্গলে শাহজাদার দেখা পায়।

শাহ্জাদাকে দেখে কন্যা একটি ফুল হাতে নিয়ে তাকে দেখায়। তারপর সে ফুলটি আপন দাঁতে লাগায়। এভাবে কন্যা ফুলটি কানে পায়ে এবং অবশেষে বুকে লাগিয়ে নদীতে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

শাহ্জাদাও কন্যাকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয় এবং কন্যার বিরহে সে হাহাকার করতে থাকে। তখন তার বন্ধু উজিরজাদা তাকে জানায়—

কহিল ফুলের কথা করিয়া পছন্দ।।
দাঁতে লাগাইল ফুল দন্তরাজার বেটি।
কানে লাগাইল ফুল কণকপুরে বাটী।।
পায় লাগাইল ফুল পদ্মাবতী নাম।
বুকেতে লাগান রাজি শোন নেক নাম।।

একথা শুনে শাহজাদা আশ্বস্ত হয়। তারপর তারা দুজনে বেরিয়ে পড়ে কনকপুরের উদ্দেশ্যে। ঘুরতে ঘুরতে কনকপুরের এক মালিনীর গৃহে গিয়ে হাজির হয়। মালিনীর সহযোগিতায় এবং উজিরজাদার বুদ্ধিমত্তায় কন্যা ও শাহজাদার মিলন হয়।

কন্যা শাহাজাদাকে একান্ত গোলাম হিসেবে পাবার জন্য উজিরজাদাকে হত্যা করতে চায় ও তার জন্য বিষ-মাখানো ক্ষীর পাঠায়। কিন্তু উজিরজাদা তার সে চালাকি বুঝতে পারে। তখন শাহজাদা তার নির্দেশে কন্যার গৃহে নিশিযাপনকালে তার অলঙ্কারাদি খুলে উরুতে ত্রিশুলের চিহ্ন এঁকে দিয়ে চলে আসে।

তারপর চুরির অপরাধে দুজনে ধরা পড়লে উজিরজাদা রাজদরবারে প্রমাণ করে যে রাজকন্যা রাক্ষসী। রাজা কন্যাকে নির্বাসন দেয়।

উজির বলে শাহজাদা চলহ সকালে।।
বিবিকে লই সবে গেল জঙ্গলেতে।
আমরা চলনা যাই দোসরা রাহেতে।।
বিবিকে লইয়া সবে বনমধ্যে গিয়া।
বনবাসে দিয়া যবে আসিবে ফিরিয়া।।
তখন আমরা গিয়া পৌছিব সেথায়।
বিবিকে লইয়া যাব আপনা ডেরায়।।

উজিরজাদার পরামর্শমত শাহজাদা বন থেকে কন্যাকে উদ্ধার করে এবং কন্যাসহ তারা স্বদেশে ফিরে আসে।

২। আশক জঞ্জাল (১৮৭৯)। আশক জঞ্জাল বা জাহাবাকস তারাভানের পুঁথি। ঢাকা সুলভযন্ত্রে ১৫ই ফাল্গুন ১২৮৫, ইং ১৮৭৯, ২৬ ফেব্রুয়ারি, শ্রী হরিমোহন চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য। ১০ আনা মাত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৫। আকার ডিমাই, পাইকা হরফে মুদ্রিত।

কবি এ কাব্যটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ ব্যাপারীর অর্থানুকূল্যে প্রকাশ করেন। 'আশক কামালে'র ন্যায় এ গ্রন্থটিও একটি প্রণয় কাহিনী এবং মৌলিক রচনা। উভয় কাব্যেই গ্রন্থের উৎস সম্পর্কে কবি কোন ইঙ্গিত দেন নি। কবি ফারসি ও হিন্দীভাষা জানতেন। এ কাব্যে নায়ক নায়িকার কথোপকথনে তিনি ফারসি সংলাপ ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি হিন্দী গানও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'আশেক জঞ্জালে'র সংক্ষিপ্ত কাহিনী নিম্নে প্রদত্ত হলো।

মকমল শহরের বাদশা ছিলেন মহম্মদ সুলতান। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মনে

তাঁর অশান্তি। দিনরাত তিনি এবাদতে মগ্ন থাকেন। একদিন তিনি উজীরকে ডেকে রাজ্যে এক মাদ্রাসা নির্মাণের নির্দেশ দেন। সেই রাজ্যের মেছাল কাজীর ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। তার নাম জাঁহা বখশ আর বাদশার উজীর সুলতানের ঘরেও এক কন্যার জন্ম হয় যার নাম তারাভান। মাদ্রাসায় এরা দুজনেই পড়তে আসে সেখানেই তাদের পরিচয় ও প্রণয়। বহু বাধা-বিপত্তির পরে ঘটে তাদের মিলন ও বিবাহ।

(৯) মালে মুহম্মদ ঃ

মালে মুহম্মদের নিবাস ছিল ঢাকা শহরের দক্ষিণে অবস্থিত আবদুল্লাহপুরের বাঘাপুরে। কবির জন্মস্থান ছিল ঢাকা জেলার সোনার গাঁ পরগণার 'ডিঙ্গুর কান্দির গাঁয়ে'। পরবর্তীকালে তিনি পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করে এই বাঘাপুরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল 'শেখর নবু'। মালে মুহম্মদ পুস্তক-ব্যবসায়ী ছিলেন। ঢাকার মোগলটুলিতে তাঁর কেতাবের দোকান ছিল। তাঁর রচিত 'জরুরাতল ইসলাম' গ্রন্থের নামপত্রে উল্লেখ করা হয় ঃ

"এই কেতাব জাহার দরকার হইবে তাহার মোকাম ঢাকার মোগলটুলি আমার নিজ দোকানে শ্রীযুত হাফেজ মনিরুদ্দিন সাহেবের নিকট তালাস পাইবেন।"

কবি মালে মহম্মদ একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর রচিত কোন কোন গ্রন্থ কলকাতা থেকেও প্রকাশিত হয়।

(১) ছয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল। কাব্যটি ১২৩৫ সালে অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এ-গ্রন্থের নাম পৃষ্ঠায় প্রকাশকাল নিম্নরূপ ঃ

'শহর ঢাকায় শ্রীযুত মুনশি মোহাম্মদ জান সাহেবের মোহাম্মদি ছাপাখানায় মুদ্রিত। ১২৮২, ৯ শ্রাবণ; ১৮৭৫, ২৩শে জুলাই। পৃঃ ২১৬, মূল্য ১ টাকা'। মালে মুহম্মদ এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন ঃ

এই পুঁথি সাএরি ছিল আগুজমানার।
সমকৃত সাধু ভাষায় হইল তৈয়ার।।
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কসেল্লা।
তেকারণে অধীন করে ছলিছ বাঙ্গালা।।

মালে মুহম্মদ এখানে সংস্কৃত সাধু ভাষায় রচিত যে গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, তা সম্ভবত আলাউল রচিত 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্য। আরব্য রজনীর কাহিনী অবলম্বনে মধ্যযুগের দুজন কবি 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা করেন— একজন আলাওল আর একজন দোনাগাজী। আলাওল বা দোনাগাজীর কাব্য সহজলভ্য না থাকায় দোভাষী রীতিতে রচিত এ কাব্যটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

২। আহকামল জুম্মা। এ কাব্যের রচনাকাল জানা যায় নি। তবে অনুমান করা যায়, ১৮৫৯ সালের পূর্বেই গ্রন্থটি রচিত হয়; কারণ 'ছেরাতল মোমেনিন' নামে রচিত কবির এক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়—

আহকামল জুম্মা করেছিনু আগে
তাম্বিয়াতন নেছা করি মধ্যভাগে।

'তাম্বিয়াতন নেছা'র রচনাকাল জানা যায়, ১২৬৬ সাল ১১ আষাঢ়। মালে মুহম্মদ প্রথম 'আহকামল জুম্মা' গ্রন্থটি নিজেই প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৭৬ সালে পুনরায় প্রকাশ করেন। এই সংস্করণ ঢাকা ছোট কাটরার আজিজিয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। এ গ্রন্থের বিষয় জুম্মার মাহাত্ম্য বর্ণনা। আরবী পাঠ সহ মুদ্রিত। মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাহিনীরও অবতারণা লক্ষ্য করা যায়।

৩। তাম্বিয়াতন নেছা। রচনাকাল, ১১ আষাঢ়, ১২৬৬ সাল। এ গ্রন্থের একটি সংস্করণ ১৮৭৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। হরিহর প্রেসে তাজুদ্দিন মহম্মদ কর্তৃক মুদ্রিত এবং গৌরীচরণ পাল দ্বারা প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২। বাংলাদেশে নারীদের বেপর্দা চালচলন লক্ষ্য করে মালে মহম্মদ এ-গ্রন্থ রচনা করেন ঃ

এদেশে আওরত দেখি বদ্‌চাল।
তেকারণে থোড়া এয়ছা লিখিনু মেছাল।।

মহিলাদের আচার আচরণের বিভিন্ন বিধি-নিষেধ এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। লেখক রূপচর্চায় নিষেধ করেন নি, কিন্তু কপালের টিপ বা সিঁথিতে সিঁদুর সম্পর্কে লিখেছেন—

এসব পিন্দিবে যদি মমিনের আওরত।
কেয়ামত দিবে তারে আগুনের জিল্লত।।

৪। ছেরাতল মোমেনীন। এ গ্রন্থে রচনাকাল ১৪ মাঘ ১২৭৪ সাল। সম্ভবত ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২৬ বৈশাখ ১২৭৫। এ গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মীয় উপদেশ তুলে ধরা হয়েছে।

৫। জারুরাতল এসলাম। এ গ্রন্থের রচনাকাল ১২৭২ সাল। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল জানা যায় নি। ১২৮১ সালে কলকাতা হরিহর যন্ত্রে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। মুসলমানদের জ্ঞাতব্য বিভিন্ন বিষয় এ-গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

৬। নাসিহাতুন নেসা। ১৮৮২ সালে মোহাম্মদী যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

(১০) ফকীর গরীবুল্লাহ ঃ

পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দুই গরীবুল্লাহর সন্ধান পাই। প্রথম শাহ্ গরীবুল্লাহ ১৮ শতকের কবি। পশ্চিম বঙ্গের ভুরশুট পরগণায় তাঁর জন্ম এবং দোভাষী রীতির প্রথম কবি হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয় গরীবুল্লাহ উনিশ শতকের কবি এবং ঢাকা শহরের রহমতগঞ্জ নিবাসী। পিতার নাম রফিক মোল্লা। কবি বাল্যকালেই পিতৃহীন হন। ভাগ্যের অন্বেষণে গরীবুল্লাহ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। তিনি দুঃখ করে বলেন—

বুড়া এক মাতা আছে দুনিয়া উপরে।
আমার খাতেরে তিনি রাত্র দিন ঝুরে।।
নসীবেতে দুঃখ মেরা দেশে দেশে ফিরি।

মায়ের খেদমত আমি করিতে না পারি।।

গরীবুল্লাহ বিভিন্ন কাব্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর ওস্তাদ নেয়ামতউল্লাহর উল্লেখ করেন। গরীবুল্লাহ একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর রচিত প্রায় সকল গ্রন্থই কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১। রৌসনল মোমেনিন। ১৮৬৭ সালে এ-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা হরিহর প্রেসে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও উপদেশ। বিভিন্ন 'বয়ানে' লেখকের সামাজিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'এলেমের বয়ানে' শিক্ষার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। 'জুতাচোরের বয়ানে' মসজিদে জুতাচুরির নিন্দা করা হয়েছে। এক বয়ানে কলিকালের আওরতের সমালোচনা করা হয়েছে। 'জায়গা জমিনের বয়ানে' পরের সম্পত্তি অপহরণকারীকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করে বলেছেন— 'ইহার হিসাব দিতে হবে এক দিন/ সকলি পড়িয়া রবে না রহিবে চিন'।

২। দেলরৌসন। ১৮৬৮ সালে 'দেলরৌসন' গ্রন্থ কলকাতা হরিহর প্রেসে মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮, দাম আট আনা। সাধারণ নীতিকথা, সৎ-উপদেশ ছাড়াও এ গ্রন্থে নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাদি বিষয়ে ধর্মীয় রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি উপদেশ প্রসঙ্গে বিভিন্ন কাহিনীর অবতারণা করেছেন।

৩। ইবলিছনামার পুঁথি। ১৮৭০ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের একটি কপি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। ১৮৮০ সালের একটি সংস্করণ হরিহর যন্ত্রে মুদ্রিত হয়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০।

এ গ্রন্থে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও ইবলিশ শয়তানের কথোপকথনের মাধ্যমে লেখক বলতে চেয়েছেন যে, এ দুনিয়ায় যারা ব্যভিচারী, মদ্যপ, চরিত্রহীন, শরীয়তমতে চলে না এবং বিধর্মী রীতি পালন করে, তারা সকলে শয়তানের দোসর।

৪। নেকবিবির কেচ্ছা। ১৮৭৯ সালে এ-গ্রন্থের একটি সংস্করণ কলকাতা সিদ্দিকীয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। পৃঃ ২৮।

এ গ্রন্থের বিষয় সূচী— হামদ ও নাত/ বিবি ফাতেমার তাবেদারীর বয়ান/ দেলরওশন বিবির বয়ান/ দুই বহিন বিবির কেচ্ছা/ নেকবিবির বয়ান/ এবং কলিকালের আওরতের বয়ান।

উনিশ শতকের বেশ কিছু গ্রন্থে কলিকালের রমণী সম্পর্কে বিভিন্ন 'বয়ান' পাওয়া যায়। এসব বয়ানে নারী স্বাধীনতার নিন্দা করা হয়েছে।

৫। দেলারাম। এ গ্রন্থের একটি সংস্করণ ১৮৮২ সালে কলকাতা সিদ্দিকীয়া প্রেসে মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬।

গরীবুল্লাহর অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এটি ধর্মবিষয়ক বা নীতিমূলক গ্রন্থ নয়। গ্রন্থটি একটি হিন্দি কাব্য অবলম্বনে রচিত প্রণয়কাহিনী। এক হিন্দুস্থানী মিষ্টান্ন বিক্রেতার সুন্দরী কন্যা দেলারামের সঙ্গে বাদশাহজাদা জামালের প্রণয় কাহিনী এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

ঢাকার কেতাবপট্টিকে কেন্দ্র করে মুসলমানী পুঁথি রচনায় যে কয়েকজন লেখক

উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের পরিচয় আমরা সংক্ষেপে তুলে ধরলাম। এখানে শুধু মাত্র তাঁদের কথাই বলা হয়েছে, যাঁরা ঢাকা শহরের অধিবাসী ছিলেন বা যাঁদের বই কেতাবপট্টি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরে আরও অনেক পুঁথিকার রয়েছেন, যারা বৃহত্তর ঢাকা জেলার অথবা পূর্ববঙ্গের নিবাসী ছিলেন এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থাদি ঢাকার বাইরে প্রধানত কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকার কেতাবপট্টির পুঁথিকারদের প্রধান কীর্তি হল এঁরা মুসলমানী পুঁথির পাঠকশ্রেণী তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার ফলে ঢাকা ও আশেপাশের অঞ্চলে এসব পুঁথি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং বটতলার পাশপাশি চকবাজারের 'কেতাবপট্টি'ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

।। চার ।।

উনিশ শতকে ঢাকায় কেতাবপট্টির পুঁথিকারদের পাশাপাশি অন্যান্য মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্যসাধনার ধারাও অব্যাহত ছিল।

১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে বিভিন্ন সাময়িকপত্র বা সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হতে শুরু হলে বিভিন্ন পত্রিকায় মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের রচনাদি প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম 'পদ্যময়ী মাসিক কবিতাকুসুমবালী' পত্রিকায় 'এইচ্' নামযুক্ত ঢাকার জনৈক মুসলমান ছাত্রের কবিতা মুদ্রিত হয়। এ কবিতা সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায় নি।

ঢাকার 'চিত্তরঞ্জিকা' (১৮৬২) পত্রিকায়ও দুজন মুসলমান কবির কবিতা প্রকাশিত হয়। উভয়েই আপন পূর্ণনাম প্রকাশ না করে সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করেছেন— 'আহমদ' ও 'এইচ'।

কবি 'এইচ্'-এর কবিতার নাম ছিল "তুই জাতিভেদ সর্ব্ব অনিষ্ট কারণ"। নামের নীচে লেখা ছিল 'ময়মনসিংহবাসী'। লেখক পাদটীকায় জাতিভেদের অর্থ লিখেছেন— 'ধর্ম্মভেদ।' কবিতাটির নীচে 'চিত্তরঞ্জিকা'র সম্পাদক যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, এখানে তার উল্লেখ করা যায়—

"আমরা মুসলমান বন্ধুর পত্রখানা অবিকল প্রকাশ করিলাম। ইহাতে মিল দোষ বা যতি দোষ নাই। যদ্যপি আমাদের দেশস্থ মুসলমান মহাশয়গণ এই প্রকার বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাকরণে চেষ্টা করেন, যথেষ্ট আহ্লাদের বিষয়।"

আমাদের মনে হয় 'কবিতাকুসুমাবলী'র কবি 'এইচ' এবং 'চিত্তরঞ্জিকা'র কবি 'এইচ' অভিন্ন ব্যক্তি। সম্ভবত ইনি ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল নিবাসী 'উদাসী' (১৯০০) কাব্য-রচয়িতা আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০)।

গিরিজাকান্ত ঘোষ 'চিত্তরঞ্জিকার' দু'টি সংখ্যা উদ্ধার করেছিলেন। তাতে দেখা যায়, কবি আহমদ এই পত্রিকার একজন প্রধান লেখক। তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা 'চিত্তরঞ্জিকা'য় স্থান পায়। 'চিত্তরঞ্জিকা' বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তাই এই কবির দু'টি কবিতা এখানে উদ্ধৃত হলো।

(১) সমীরণ

আর কেন সমীরণ
গন্ধ লয়ে বারে বারে।
ভাসিতেছ মম দ্বারে।
গন্ধে মম নাই প্রয়োজন।
সখার সদনে যাও,
তারে নিয়ে গন্ধ দাও,
এ সৌরভে তোষ তার মন।
চিত্তে যার সুখ আছে,
রস রঙ্গ তার কাছে,
সুখদায়ী বটে সর্ব্বক্ষণ।
দরিদ্রের নহে কাজ
পরিতে রাজার সাজ
যদ্যপিও পায় সে কখন।
চিরদুঃখী এ বিরহী
তাহাতে কেমনে সহি—
ফুলবাণ দুঃসাধ্য দহন।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মোর
নয়ন হয়েছে ঘোর,
ধরা হয় শূন্য দরশন।
নাথে গন্ধ সমর্পিয়ে
পদাম্বুজ রেণু নিয়ে,
কর মন নয়নে অর্পণ।
মম কথা না কহিবে।
জানিলে সে নাহি দিবে
পদ্মরেণু করিতে হরণ।
তাপিত আহমদ্ কয়,
নয়নে কি ফলোদয়,
না হইলে সদয় সে জন।

(২) বসন্ত

এই যে বসন্ত পুনঃ হইয়ে উদয়

করেছে সুখেতে পূর্ণ স্বভাব হৃদয়।।
ফুটিয়াছে উপবনে কুসুম নিকর।
ধরিয়াছে ধরাতলে শোভা মনোহর।।
দেহ সরোবরে মম তবে এ সময়।
কেন চিত্তপদ্ম কলি ফুল্ল নাহি হয়।।
বহিতে রহিত আশ্বাস মলয়।
আশা ঘ্রাণ আর কারে করিবে আশ্রয়।।
এ সময় রসময় সমূহ সংসার।
কেন মম পঞ্চেন্দ্রিয় মক্ষিকা নিকর।
এই কালে হতবল, জীর্ণ কলেবর।।
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হেরে সে প্রিয় তপন।
তবু ফুল্ল হৈতে নারে কেন কুঞ্জ মন।।
জলদ সলিলে সর্ব্ব রসিল ধরায়।
দেহ সরোবর তবু শুষ্ক হ'য়ে যায়।।
হায়রে বসন্ত যেই সকলে সদয়।
দুর্ভাগ্য বলিয়া মোরে হবে কি নির্দ্দয়।।
পাত্রাপাত্রে যেই করে কৃপা বিতরণ।
তার কি উচিত হোতে আমায় কৃপণ।।
কর্ম্মাক্ষম জরাজীর্ণ দুঃখী যেই জন।
তারেই ত দাতা জন দেয় বেশী ধন।।
বিচ্ছেদে শীতের জ্বালা অসহ্যজনক।
কত বা গাইবে মম মানস কোরক।।
চিন্তা বাড়বাগ্নি দেহ-সরসী ভিতর।
অহরহ জ্বলে পুনঃ প্রচন্ড প্রখর।।
সেই তাপে তাপে চিত্ত রক্ত উৎপল।
মলিন বিবর্ণ যথা গ্রহণে গরল।।
শোক ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা বহে অনর্গল।
সান্ত্বনা পলাশ ছিন্ন করেছ সকল।।
হতাশ তরঙ্গ তায় অতীব ভীষণ।
জীবন মৃণালচয় করে উম্মুলন।।
করেছ দুঃখিত সবে তুমি পরিত্রাণ।
তবে কেন নাহি মোরে কর কৃপাদান।।

দেখ দেখ ঋতুরাজ তোমার কৃপায়।
আনন্দ উৎসবে মগ্ন সকলি ধারায়।।
তরুলতা বিহঙ্গম ভূচর খেচর।
আমি ভিন্ন কেবা আর করে আর্তস্বর।।
কি দোষে রোষিলে দামে ভুবনরঞ্জন।
ক্ষমি বদান্যতা গুণ কর প্রদর্শন।।
প্রফুল্ল করহে মম মানস নলিন।
পাঠাও তোষিতে তার সুযোগ্য অলিন।।
অজ্ঞান আহম্‌দ তবে কেন এত ভ্রম।
বসন্তে সাধিয়ে কেন কর পন্ডশ্রম।।
বসন্তের সাধ্যাতীত ফুটাতে কমল।
হর্ষেনা শরদ ভিন্ন কামনা সকল।।

কবি আহমদ সম্পর্কে গিরিজাকান্ত ঘোষ লিখেছেন [১৪]—

"কবি আহমদ কে ছিলেন জানি না। কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃত কবি বলিতে কোনরূপেই সংকোচ বোধ করি না। আহমদ প্রকৃতই কাব্য সম্পদের অধিকারী ছিলেন। ... আহমদের লেখায় উচ্ছ্বাস আছে, কষ্ট কল্পনা নাই; অথচ ভাষা প্রাঞ্জল ও চিত্তগ্রাহী। ... বলাবাহুল্য আহমদ কবির রবীন্দ্রিয় যুগের সাধনা নাই— তাহার কবিতার ভঙ্গিতে রবীন্দ্রিয় প্রভাব নাই— গুপ্ত কবির অনেকটা ঝাঁঝ আছে"।

'চিত্তরঞ্জিকা' পত্রিকায় কবি আহমদ— এর 'সমীরণ' নামে আরেকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি 'পারস্য হইতে অনুবাদিত'।

কবি আহমদের পূর্ণনাম সঠিক আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। উনিশ শতকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাদির মধ্যে 'আহমদ' নামের তিনজন কবির সন্ধান পাওয়া যায় ঃ—

১। ময়নউদ্দীন আহমদ ও রামনারায়ণ দাস— 'কবিতা কুসুমাঙ্কুর', ঢাকা ১২৮৩, ১লা আষাঢ়, মূল্য দুই আনা।

এই গ্রন্থে নীতিমুলক কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে।

২। সলিমউদ্দিন আহমদ— 'প্রেমাবলী'। ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৮৮৬, পৃঃ ৬৩, মূল্য আট আনা।

গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য, তবে বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় এ গ্রন্থের পরিচিতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 'কবি হাফিজের নীতিমূলক কবিতার অনুবাদ'।

৩। এ আহম্মদ— 'সংসার চমৎকার' ঢাকা ১৮৯১ পৃঃ ২৮, মূল্য ৬ পয়সা।

এই তিনজন কবির মধ্যে সলিমউদ্দিন আহম্মদ 'চিত্তরঞ্জিকা'র কবি আহম্মদ হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ উভয়েই পারস্য ভাষা থেকে কবিতা অনুবাদ করেছেন।

১৪. গিরিজাকান্ত ঘোষ– চিত্তরঞ্জিকা, "সম্মিলন", ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩২৮, পৃঃ ৭৬।

ঢাকা কলেজের ছাত্র নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪)র লেখা একটি দীর্ঘ কবিতা 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১০ চৈত্র ১২৯১)। কবিতাটি প্রখ্যাত প্রাচ্য-ভাষাবিদ এবং ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট মৌলবী ওবায়দুল্লাহ আল ওবেদীর বিয়োগ দুঃখে রচিত। নওশের আলী খাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'শৈশব কুসুম' (১৮৯৫) ও 'মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ঢাকা প্রকাশে' প্রকাশিত শোকগাথার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধার করা গেল—

ওবেদী দেশের হিত সাধিবার তরে,
পোষিত যে মহামন্ত্র আপন অন্তরে
হিন্দু আর মুসলমান
না হইলে একপ্রাণ
স্বদেশের সুখ আশা মরীচিকা সার
ভারতের ভবিষ্যতে কেবল আঁধার।

....

দেশের দুর্দশা কভু না হবে মোচন
ওবেদী জপিলে মন্ত্র 'সমাজ মিলন'।[১৫]

মৌলবী ওবায়দুল্লাহ আল ওবেদী ফারসি ও ইংরেজী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সৈয়দ কেরামত আলীর 'মখযুল উলুম' এবং রাজা রামমোহন রায়ের 'তোহ্ফাতুল মুওয়াহেদীন' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত ফারসি কাব্যের নাম 'দীওয়ান-ই-ওবায়দী'। তিনি প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নানা ছিলেন। ঢাকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জগতে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। তাঁরই উদ্যোগে ঢাকায় মুসলমানদের প্রথম সামাজিক সংগঠন 'সমাজ সম্মিলনী' (১৮৭৯) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্মিলনীকে কেন্দ্র করে ঢাকায় মুসলিম তরুণরা সংঘবদ্ধ হয়। ওবায়দুল্লার প্রেরণায় এখানে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত একটি উদার পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

ঢাকা কলেজের আর এক ছাত্র আবদুল আজিজ (১৮৬৭-১৯২৬) ওবায়দুল্লাহর মৃত্যুতে 'ওবেদী বিয়োগ' (মার্চ, ১৮৮৫, গিরিশযন্ত্র ঢাকা) নামে একটি কাব্য রচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি শিক্ষাবিদ্ হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। 'ওবেদী বিয়োগ' গ্রন্থ প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেন;

> "[ওবেদী বিয়োগ গ্রন্থে] যে সুন্দর মার্জিত ভাষা, বেগবান ছন্দ ও ভাব আছে সেকালের মুসলমান রচিত সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। ইতিহাসের দিক হইতেও এই পুস্তকখানির মূল্য অত্যন্ত বেশী; সেই পুঁথি-সাহিত্যের দোভাষী ভাষা-প্রপীড়িত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দাঁড়াইয়া এমন সুন্দর, সাধু, মার্জিত বাংলা লেখা মুসলমান লেখকদের পক্ষে সত্যই বিস্ময়কর।"[১৬]

---

১৫. 'ঢাকা প্রকাশ' ১০ চৈত্র, ১২৯২।

১৬. আবুল ফজল- ওবেদি বিয়োগ, 'বুলবুল', পৌষ-চৈত্র, ১৩৪০, পৃঃ ২৪১।

আব্দুল আজিজ 'কবিতা কলিকা' নামেও একটি কবিতা পুস্তক রচনা করেন।

ঢাকার মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে কায়কোবাদের (১৮৫৭-১৯৫৯) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় সমগ্র জীবন নিজ জন্মভূমি ঢাকার 'আগলা' গ্রামে বসবাস করলেও ঢাকার সাহিত্যচর্চার ধারায় তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁর বিশিষ্ট স্থান অনস্বীকার্য।

কায়কোবাদ ঢাকা মাদ্রাসায় মৌলভী ওবায়দুল্লাহর ছাত্র ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ্‌র সুপারিশক্রমে কায়কোবাদ ডাক-বিভাগে চাকুরী লাভ করেন।[১৭]

কায়কোবাদের প্রথম কাব্য 'বিরহবিলাপ' ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এবং এ সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য জানা যায়নি। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'কুসুমকাননে'র প্রকাশকাল ১৮৭৩, এ গ্রন্থটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ কাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত-সমালোচনায় 'ভারতী' (ফাল্গুন, ১২৮৮) পত্রিকা মন্তব্য করে— 'এই গ্রন্থখানিতে দুটি একটি মিষ্ট কবিতা আছে'। কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'অশ্রুমালা' ১৮৯৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ কাব্যগ্রন্থে স্বদেশ, স্বজাতি, প্রকৃতি ও প্রেমবিষয়ক কবিতাবলী সংকলিত হয়েছে। কবি এক সুন্দর ও নিরাভরণ কাব্যরীতির সম্মোহনকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তাঁর কবিতায়। কায়কোবাদের গীতিকবিতা একদিকে যেমন অন্তরঙ্গ, অন্যদিকে তেমন বহুমুখী। ১৮৯৬ সালের বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে কবি কায়কোবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় ঃ

"The writer has pro-Mohamedan Sympathies and speaks regretfully of relics of Mohamedan rule in India. As a writer, he is not without power".

সমকালীন পাঠক সমাজে 'অশ্রুমালা' বিশেষ প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়। কবি নবীনচন্দ্র সেন এ গ্রন্থের একটি কপি উপহার পেয়ে কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি পত্র পাঠান। তিনি কবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে লেখেন যে ঃ-

> "আপনার অশ্রুমালা পরম প্রীতি সহকারে পাঠ করিয়াছি এবং স্থানে স্থানে আপনার অশ্রুর সঙ্গে অশ্রু মিলাইয়াছি। জাতিভেদে সকলেই ভিন্ন হইতে পারে, অশ্রু অভিন্ন। যাহার অশ্রু আছে, তাহার কবিত্ব আছে; মানব রোদন মাত্রই কবিত্বময়; অতএব বলাবাহুল্য যে, আপনার কাব্যখানির স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্ব আছে"।[১৮]

সমকালীন ঢাকা গেজেট পত্রিকায় 'অশ্রুমালা' কাব্যের প্রশংসাসূচক একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক বলেন;

> "…. কবি কায়কোবাদ ভাষা গাঁথিতে জানেন, ভাব আঁকিতে জানেন, তাহার কবিতা কষ্ট কল্পনার জিনিষ নহে। তোতা পাখীর নাম পড়া নহে, তাহা প্রাণের জিনিষ–সহজ স্বাভাবিক প্রাণস্পর্শী"।[১৯]

---

১৭. Syed Murtaza Ali-PERSONALITY PROFILES, 'Obaidullah Al-obaidi Suhrawardy' 1965, P. 42.
১৮. ২রা এপ্রিল, ১৮৯৬ তারিখে লেখা এ পত্র 'মহাশ্মশান' কাব্য (৪র্থ সংস্করণ ১৩৩৪)এর পরিশিষ্ট থেকে উদ্ধৃত।
১৯. 'ঢাকা গেজেট'- ১৮ চৈত্র, ১৩০২।

সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূর' পত্রিকায় 'অশ্রুমালা'র একটি সুন্দর সমালোচনা প্রকাশিত হয় ঃ

> 'তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল, মর্ম্মস্পর্শী, ভাব পবিত্র, ছন্দ মনোহর। এমন বিশুদ্ধ ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা আমাদের অত্যল্প মুসলমান কবিই লিখিতে পারেন। সমালোচ্য কাব্যের বহুল কবিতাতেই কবির রচনা নৈপুণ্য, কবিত্ব, মাধুর্য্য ও ভাবসৌন্দর্য্য স্পষ্ট প্রতিভাসিত। কায়কোবাদের রচনা কি তীব্র মাদকতাপূর্ণ ও করুণ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অপেক্ষা অনুভব করাই সহজ।'[২০]

পরবর্তীকালে কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। এ ছাড়াও তিনি কয়েকটি আখ্যান কাব্য বা খণ্ড কাব্য প্রকাশ করেন। যেমন— 'শিব মন্দির' (১৩২৮), 'অমিয় ধারা' (১৩২৯), 'মহরম শরীফ' (১৩৪০) এবং 'শ্মশানভস্ম কাব্য' (১৩৪৫)।

ঢাকার রাজার দেউড়ী নিবাসী শেখ আবদোস সোবহান 'হিন্দু-মোসলমান' নামে এক বিতর্কমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। পুঁথির ছাপাখানার বাইরে মুসলমানদের কোন প্রেস না থাকায় আবদোস সোবহানকে মুদ্রাকরদের হাতে একাধিকবার লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। কারণ, তিনি এ গ্রন্থে তদানীন্তন বাংলাদেশের হিন্দু জমিদার ও হিন্দু-আমলাদের অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেন। ছাপাখানা বিভ্রাটে গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। পরে ১ম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে। লেখক মুদ্রাকরের হাতে তাঁর লাঞ্ছনার যে দুঃখজনক কাহিনী ১ম খন্ডের ভূমিকায় প্রদান করেছেন, তা কৌতূহলী পাঠকদের জন্য সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল।

শেখ আবদোস সোবহান 'হিন্দু-মোসলমান' গ্রন্থ রচনা করেন ১৮৮২ সনে। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি প্রথমে কলকাতার 'সুরভি ও পতাকা' সম্পাদক যোগেশচন্দ্র বসুর কাছে ছাপতে দেন। সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে লিখিত বলে যোগেশ বাবু তা ছাপতে অস্বীকার করেন। ১৮৮৭ সনের ৭ই ডিসেম্বর মাসে লেখক পুস্তকটি ছাপতে দেন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলকাতার ভিক্টোরিয়া প্রেসে। যোগেশ চন্দ্র বসু কেন গ্রন্থটি ছাপতে অসম্মত হন, তাও লেখক প্রেসের মালিককে জানান। তার উত্তরে তিনি লেখককে প্রবোধ দেন আপনি যা ছাপতে দেবেন আমরা তাই ছাপবো। বইটি সম্পূর্ণ ছাপা হয়, কিন্তু প্রেসের মালিক লেখকের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা আদায় করে নিয়ে বই না দিয়ে তাঁকে মারপিট করে তাড়িয়ে দেন। লেখক আদালতে মোকদ্দমা করেও কোন ফল পান নি। লেখকের কাছে পাণ্ডুলিপি বা বইয়ের কোন কপি ছিল না। "কতকাংশ হস্তলিখিত কাপী" ও "চেরাফাড়া কয়েক টুকরো প্রুফসিট" অবলম্বনে তিনি গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে সক্ষম হন। কয়েক বছর পর গ্রন্থের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ড পুনর্মুদ্রণে তাঁকে কম নাজেহাল হতে হয়নি। প্রথম খণ্ড ছাপা আরম্ভ হয় ঢাকার 'ভারতবান্ধব' ও 'সারস্বত প্রেসে'। "প্রেস অধ্যক্ষদের অসদ্ব্যবহারে" তিনি পাঁচ ফর্মা ছাপার পরই বাকি অংশ কলকাতাস্থ শেখ আবদুর রহিমের 'মিলন প্রেসে' ছাপতে দিতে বাধ্য হন। মিলন প্রেসে মুদ্রিত হয়ে ১৮৯১ সনে 'হিন্দু মোসলমান' গ্রন্থের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

---

২০. 'নবনূর- শ্রাবণ, ১৩১১।

'হিন্দু-মোসলমান' গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের বিষয় পরিচিতি, বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকা থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হলো;

"A violent attack on the Hindu community and the Congress. The writer gives thirteen instances of big Mahammaden Zemindars having been ruined and reduced to beggary by the wickedness, treachery, and black guardism of their Hindu amla. He also gives fifteen instances of the benevolent intention of Government to give Musalmans a share in offices under the state, having been fraustrated by the wickedness of Hindu officers and their amla. He asks his Co-religionists not to join Congress, where the Hindus will be in a majority."

শেখ আবদোস সোবহানের প্রথম গ্রন্থ 'কলির নারী চরিত্র' ১৮৮০ সালে 'ঢাকা নিউজ প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয়। লেখকের অপর গ্রন্থ 'আর্যধর্ম' (প্রকাশকাল অজ্ঞাত)। তিনি 'ইসলাম সুহৃদ' নামে একখানি মাসিক পত্রও সম্পাদনা করেন।

কুমিল্লার হোমনাবাদ নিবাসী নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী রচিত 'রূপজালাল' ঢাকা থেকে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। 'রূপজালাল' গদ্যে-পদ্যে রচিত একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর রচিত 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' ১৮৮৪ সালে ঢাকা বাংলা প্রেসে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটি ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক কবিতার সংকলন।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা কুমিল্লা নিবাসী হলেও ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল। আবদোস সোবহানের 'হিন্দু-মোসলমান' গ্রন্থের মুদ্রণকালে তিনি ১০০ টাকা অর্থ-সাহায্য প্রদান করেন, লেখক একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন। নওয়াব ফয়জুন্নেসা 'ঢাকা প্রকাশের'ও একজন গ্রাহিকা ছিলেন। তিনি ঢাকা প্রকাশের বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম প্রদান করতেন। 'ঢাকা প্রকাশ' এক বিশেষ সম্পাদকীয়তে ধন্যবাদান্তে মন্তব্য করেন [২১], "পূর্ববাংলার প্রাচীন সংবাদপত্র বলিয়াই হউক অথবা অন্য যে কারণেই হউক ঢাকা প্রকাশের প্রতি ইহার বিলক্ষণ অনুরাগ আছে।"

সিলেটনিবাসী আর্জুমন্দ আলীর 'প্রেমদর্পণ' ১৮৯১ সালে ঢাকা স্যামন্তক প্রেসে মুদ্রিত হয়। এটি মুসলমান রচিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস। এ-উপন্যাসে একজন মুসলমান যুবক ও হিন্দু রমণীর প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

লক্ষ করা যায়, উনিশ শতকের ঢাকার মুসলিম সাহিত্যসাধনার প্রধান অংশ মুসলমান পুঁথিকারদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও চকবাজারের কেতাবপট্টির বাইরে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের অবদানও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

২১. 'ঢাকা প্রকাশ', ১৭ জানুয়ারি ১৮৭৫।

মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী

যে কোনো সমাজেই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কোনও না কোনও সংগঠনকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকে বাংলাদেশের মুসলিম জাগৃতির ইতিহাস আলোচনায় কয়েকটি সমিতি বা সংগঠনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি'র কথা। ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড এলগিনের উৎসাহ ও সহযোগিতায় নবাব আবদুল লতিফ এ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।[১] ইংরেজ শাসনের সঙ্গে বাঙ্গালি মুসলমানের সহৃদয় সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা ঘটানোই ছিল মহামেডান লিটারারি সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য।[২] নবাব আবদুল লতীফ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই সোসাইটির সঙ্গে জড়িত থেকে মুসলিম সমাজের চিন্তাধারার উন্নতি ও বিকাশ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া মুসলমান সমাজের উন্নতি সম্ভব নয় জেনেই তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দেন।

পরবর্তী কালে ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (পরে 'সেন্ট্রাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' নামে পরিচিত) নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহামেডান লিটারারি সোসাইটর ন্যায় এই সমিতিও ইংরেজী শিক্ষার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ইংরেজ শাসনের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে এই এ্যাসোসিয়েশনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। লিটারারি সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ। অন্যদিকে, ধীরে ধীরে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠাই মহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।[৩] ১৮৮২ সালে এই এ্যাসোসিয়েশন তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড রিপনের কাছে প্রেরিত এক স্মারকপত্রে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও সরকারী চাকুরিতে তাদের দাবী প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সারা ভারতে 'ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশনে'র প্রায় ৫৩টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র পূর্ববঙ্গেই সমিতির ৮টি শাখা ছিল।[৪] সমিতির নাম মহামেডান সোসাইটি হলেও যে কোনো অমুসলমান এই সংগঠনের সদস্য হতে পারতেন।

উনিশ শতকে ঢাকায় দু'টি সংগঠন স্থাপিত হয়— 'সমাজ সম্মিলনী' ও 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'।

'ঢাকা সমাজ সম্মিলনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর।[৫] এর সম্পাদক ছিলেন মৌলবী ওবেদুল্লাহ্। জাতীয় উন্নতি সাধন ছাড়াও এই সম্মিলনীর একটি

১. "An East Bengali Worthy— Nawab Bahadur Abdul lateef "by his son A. F. M Abdool Ali, DACCA REVIEW, May 1911, Page 42.
২. আনিসুজ্জামান– মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৪ ঢাকা, পৃঃ ৮৬।
৩. আনিসুজ্জামান– প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮।
৪. সৈয়দ মর্তুজা আলী– 'Personality Profiles',- Syed Ammer Ali, DACCA 1969, Pages 37-38.

উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সাধন। সম্মিলনীর এই উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জানিয়ে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করে ঃ

"পাঠকবর্গ অবগত আছেন, ইদানীং হিন্দু ও মুসলমানদিগের ঐক্য সংস্থাপনার্থ স্থানে স্থানে নানারূপ অনুষ্ঠান হইতেছে। কিয়দ্দিবস হইল, ঢাকা 'সমাজ-সম্মিলনী' নাম্নী সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। ... . যাহাতে স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমানের একতা সংস্থাপনার্থ ঢাকার সমাজ সম্মিলনীর ন্যায় সভা সংস্থাপিত ও সভার উদ্দিষ্ট কার্য সুসমাহিত হয়, রচনা বক্তৃতাদিতে সম্মিলনের প্ররোচনা প্রদত্ত হইয়া যাহাতে উভয় জাতির মধ্যে একীভাব জন্মে, দেশহিতৈষিগণের সর্ব প্রযত্নে তদনুরূপ অনুষ্ঠান একান্ত কর্তব্য।"[৬]

ঢাকা 'সমাজ সম্মিলনী সভা'র সাহায্যার্থে নবাব আহ্সানউল্লাহ্ খাঁ বাহাদুর তিনশত টাকা প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে তিনি এই সভার 'অভিভাবক' হবেন বলে স্বীকৃত হন।[৭] ঢাকার 'পূর্ববঙ্গরঙ্গভূমি' গৃহে মাঝে মাঝে এই সভার অধিবেশন হতো। ১৮৮০ সালের ১৫ আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত এমনি এক সভায় একজন টোলের পণ্ডিত ও জনৈক সুশিক্ষিত মুসলমান 'জাতিসাধারণ সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা' ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দেন।[৮] এই সম্মিলনী এক বৎসরের বেশী স্থায়িত্ব লাভ করেছিল কি না আমাদের জানা নেই। ১৮৮০ সালের পরে এই সমিতির ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

'সমাজ সম্মিলনী সভা'র সম্পাদক মৌলবী ওবেদুল্লাহ্ বা ওবায়দুল্লাহ্ আল্ ওবায়দী সোহ্রাওয়ার্দী ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। ঢাকা মাদ্রাসা (পরবর্তী কালে 'ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ', বর্তমানে 'নজরুল ইসলাম কলেজ') ১৮৭৪ সালের ১৬ মার্চ স্থাপিত হয়। ইতঃপূর্বে তিনি হুগলী কলেজে ফারসি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। এ সময়ে সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন তাঁর একজন প্রিয় ছাত্র। মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ শুধু আরবী ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন না, ইংরেজী ভাষায়ও ছিল তাঁর অসাধারণ অধিকার। আমীর আলী ও মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্র যুগ্ম প্রচেষ্টায় ১৮৬৭ সালে সৈয়দ কেরামত আলীর 'মখযুল-উল্ম্' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ওবেদুল্লাহ্ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের ফারসি গ্রন্থ 'তুহফাতুল মুওয়াহ্হিদীন'-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত ফারসি কাব্য 'দীওয়ান-ই-ওবায়দী' ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঢাকা মাদ্রাসায় তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আব্দুল আজিজ (পরে খান বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত) ও কবি কায়কোবাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৫ সালে মৌলবী ওবায়দুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী তাঁর দৌহিত্র।

---

৫. 'নব-পঞ্জিকা (১২৮৭ সন) ১৮৮০ খ্রি.)- ঢাকা ইস্ট বেঙ্গল প্রেস, মার্চ ১৮৮০। পৃঃ ২৪-২৫।

৬. 'ঢাকা প্রকাশ'– ৭ বৈশাখ ১২৮৭ (১৮৮০ খ্রিঃ)।

৭. 'ঢাকা প্রকাশ'– ২৩ চৈত্র ১২৮৬ (১৮৮০ খ্রিঃ)।

৮. 'ঢাকা প্রকাশ'– ৭ ভাদ্র ১২৮৭ (২২ আগস্ট ১৮৮০)।

মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ ওবায়দীর বিয়োগ দুঃখে শোকার্ত হয়ে ঢাকা কলেজের তদানীন্তন ছাত্র নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি সুদীর্ঘ কবিতা প্রেরণ করেন। 'ঢাকা প্রকাশে'র ন্যায় ক্ষুদ্রায়তন পত্রিকায় উক্ত কবিতার সম্যক প্রকাশ সম্ভবপর নয় বিবেচনায় অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়।

মৌলবী ওবায়দুল্লাহর প্রিয় ছাত্র আব্দুল আজিজও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে 'ওবেদী বিয়োগ' নামে একটি শোকগাথা প্রকাশ করেন (ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে মুদ্রিত, মার্চ ১৮৮৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮, দাম ছ' পয়সা)।

'সমাজ সম্মিলনী' ক্ষণস্থায়ী হলেও তা ঢাকার তদানীন্তন মুসলমান সমাজে যে বিশেষ চেতনা সঞ্চারে সক্ষম হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নব্যশিক্ষিত তরুণ ছাত্রসমাজ আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছুদিনের মধ্যে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠনের নাম 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'।

'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' বা Dacca Mohamedan Friends Association ১৮৮৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯] মুসলমান সমাজের হিত সাধনই এই সমিতি বা সম্মিলনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নানা কারণে প্রথম কয়েক বৎসর সম্মিলনীর কার্যাবলী প্রধানত মুসলমান সম্প্রদায়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেই সীমাবদ্ধ থাকে।

সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণীতে সম্মিলনীর সম্পাদক আব্দুল মজিদ বি. এ. লিখেছিলেন ঃ "বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিলেও সেই সময় সম্মিলনী কেবল শৈশবাবস্থায় থাকায় এবং স্থানীয় লোকসমূহ হইতে যথোপযুক্ত সহানুভূতি না পাওয়াতে বিশেষত এক কালে সেই উচ্চতর আশা সম্পন্ন হওয়া কষ্টকর বিধায়, সভা গত বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিতে যত্নবতী হইয়াছিলেন।" সম্মিলনীকে প্রথম বৎসর বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্য ও সহানুভূতি এবং সভ্যগণের পরিশ্রম ও চেষ্টায় সম্মিলনী সে বাধা অতিক্রমে সক্ষম হয়।

সম্মিলনীর সাধারণ সভ্যের মাসিক চাঁদা নির্ধারিত হয়েছিল ন্যূনপক্ষে দু'আনা। প্রতিষ্ঠাকালে চাঁদা-দাতা সভ্যের সংখ্যা ছিল ২৩ এবং মাসিক আয় ছিল মাত্র সাড়ে চার টাকা। কার্যনির্বাহক বা অধ্যক্ষ সমিতির সদস্য সাধারণ সভ্যগণের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হতো। অধ্যক্ষ সমিতির সম্মতিক্রমে 'অশক্তিপ্রযুক্ত চাঁদা না দেওয়া সত্ত্বেও' কয়েকজনকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল। এক বৎসর পর সম্মিলনীর সভ্যসংখ্যা হয় ৪৩ এবং তৃতীয় বৎসরে সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১০২।

নিম্নলিখিত কয়েকজনকে নিয়ে 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হয়েছিল ঃ-

মৌলভী হিম্মত আলী বি. এ.— সভাপতি ও প্রতিনিধি

৯. The First Annual Report of the Dacca Mohamedan Friends Association : 1883, ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণ ১৮৮৩ সাল, গিরিশচন্দ্রের মুদ্রিত ১৮৮৪। পৃষ্ঠা. ১।

"আব্দুল মজিদ— সম্পাদক ও প্রতিনিধি

" হেমায়েত উদ্দিন— সহকারী সম্পাদক ও প্রতিনিধি

" জোহাদর রহীম— সহকারী সম্পাদক ও প্রতিনিধি

" মকবুল আহমদ— কোষাধ্যক্ষ

" আজাদ আলী— মফস্বল প্রতিনিধি

" মদচ্ছের হোসেন— মফস্বল প্রতিনিধি

"সৈয়দ হযরত আলী— মফস্বল প্রতিনিধি

" মাহাম্মদ ফাজেল— মফস্বল প্রতিনিধি

" নওয়াজেস আলী— মফস্বল প্রতিনিধি এবং

" মাহাম্মদ ছাদেক— মফস্বল প্রতিনিধি।

সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, পরবর্তীকালে 'মৌলভী জোহাদর রহীম সাহেব' সভ্যশ্রেণী থেকে অবসর গ্রহণ ও কর্মচারীপদ পরিত্যগ করেন এবং সে পদে মৌলভী আজমল আলী সাহেব নিযুক্ত হন।

সম্ভবত ঢাকা মাহুতটুলির মুন্সি নূরবক্স সাহেবের বাসায় সম্মিলনীর দফতর ছিল। তাই প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণীর শেষ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ঃ-

বিজ্ঞাপন

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর নিকট কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে অথবা কোন পত্র লিখিবার আবশ্যক হইলে ঢাকা কলেজে অথবা ঢাকা মাহুতটুলী শ্রীযুক্ত মুন্সি নূরবক্স সাহেবের বাসায় সম্পাদকের নিকট লিখিলেই হইবে।

আব্দুল মজিদ

সম্পাদক।

সম্মিলনীর সভাপতি জনাব হিম্মত আলী ১৮৮১ সনে হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ঢাকা কলেজে বি. এল. ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। উক্ত কলেজ থেকে তিনি ১৮৮৬ সালে বি. এল. পাশ করেন।[১০]

জনাব আব্দুল মজিদ নোয়াখালী জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৪ সালে বি. এ. এবং ১৮৮৬ সনে বি. এল. পাশ করেন।

জনাব হেমায়েতউদ্দীন ১৮৮৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। তিনি বরিশালের একজন সুপরিচিত শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। পরে তিনি খান বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।[১১]

জনাব জোহাদর রহীম বা জাহাদুর রহীম জাহিদ (পরে স্যার জাহিদ সোহরাওয়ার্দী

১০. মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্.... সেকালের গ্রাজুয়েট, 'মাসিক মোহাম্মদী' মাঘ ১৩৪৭। পৃষ্ঠা ২৮৩-২৮৪
১১. সৈয়দ মুর্তাজা আলী... সেকালের মুসলমান গ্রাজুয়েট- 'মাহেনও' অগ্রহায়ণ ১৩৭৩। পৃঃ ৮।

নামে খ্যাত) ১৮৮৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। তিনি মৌলবী ওবায়দুল্লাহর জামাতা এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পিতা।

জনাব আজমল আলী বা মকবুল আহ্‌মদের কোন পরিচিতি পাওয়া যায়নি। ১৮৮৬ সন পর্যন্ত ঢাকা কলেজ থেকে যাঁরা বি. এ. বা বি. এল. পাশ করেছিলেন, তাঁদের নামের তালিকায় এ দু'জনের নাম নেই।

কার্যনির্বাহক সভার সভ্য না হলেও সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আব্দুল আজিজ (পরে খান বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত)। তিনি ১৮৮৬ সনে বি. এ. পাশ করেন। আব্দুল আজিজ দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন।

সাহিত্যিক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদও ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন। ১৮৮০ সনে তিনি সম্মিলনীর কাজে ঢাকায় কিছুদিন অবস্থান করেন। আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন ;

> "ঢাকা শহরে কিয়দ্দিবস থাকিয়া তত্রত্য মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর কাজের অনুষ্ঠাতা বন্ধুদিগের অনুরোধে— বিশেষতঃ অক্লান্ত কর্মী সমাজসেবী বন্ধুবর খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল আযিয, বি. এ. মরহুমের সঙ্গে থাকিয়া সমিতির মেম্বর সংগ্রহ ও চাঁদা আদায় করিতে লাগিলাম। তাঁরা অনেকদিন আমাকে ঢাকায় আটকাইয়া রাখিলেন"।[১২]

পরে আর একবার ঢাকায় এসে তিনি ৬ মাস সম্মিলনীর কাজে সহযোগিতা করেছিলেন।

মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ বালিকাদের শিক্ষার জন্য 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র অনুরোধে 'তোহ্‌ফাতুল মোস্‌লেমিন' নামে একটি গ্রন্থ্‌ রচনা করেন। মৌলবী মেয়েরাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ্‌ রচিত হয়।[১৩] অন্যত্র ('পাক-পাঞ্জতন'-এর ভূমিকায়) রেয়াজউদ্দীন আহমদ লিখেছেন ঃ

> "মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী। (তোহ্‌ফাতুল মোসলেমিন গ্রন্থের) ছাপার আংশিক ব্যয় প্রদানপূর্বক অনেকগুলি পুস্তক গ্রহণ করিয়াছিল"।[১৪]

সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ যে ঢাকাস্থ্‌ 'ইষ্টার্ণ বেঙ্গল প্রেসে'র কর্তৃপক্ষ সভার অনুষ্ঠানপত্র অর্ধমূল্যে মুদ্রিত করেন।

প্রথম বৎসর "ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র সাধারণ সভার চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভার অধিবেশনের জন্য ঢাকা মাদ্রাসার তদানীন্তন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্‌ সাহেব মাদ্রাসাগৃহ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। ৪র্থ অধিবেশনে বরিশাল নিবাসী মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে একটি ভাষণ প্রদান করেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রথম বৎসর সম্মিলনীর প্রধান কার্য ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার।

---

১২. মোহাম্মদ ইদরিস আলী রচিত 'মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (পৌষ ১৩৬৫) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত পৃঃ ২৬।

১৩. সৈয়দ এমদাদ আলী– 'মোজাম্মেল হক ও রেয়াজউদ্দীন' মাসিক মোহাম্মদী', ১৩৪০, পৃঃ ৪৩২।

১৪. প্রাগুক্ত 'মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৩।

সে উদ্দেশ্যে প্রথম বার্ষিক শ্রেণী থেকে শুরু করে ৫ম বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা নির্বাচন এবং উক্ত পাঠ্যতালিকা অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। বাংলা এবং উর্দু— দু'ভাষার মাধ্যমেই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। পরীক্ষার নিয়মাবলী নিম্নরূপঃ—

১। "বঙ্গবাসী যে কোন মুসলমান মহিলা নির্বাচিত পুস্তকের পরীক্ষা নিয়ম মত দিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

২। মহিলাগণ আপন আপন অন্তঃপুরে থাকিয়া স্ব স্ব অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

৩। মৌখিক পরীক্ষক অভিভাবকের সম্মতিক্রমে সম্মিলনী কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

৪। কোন পরীক্ষার্থিনী পরীক্ষার সময় পুস্তকের, কোন ব্যক্তির অথবা অন্য কোন প্রকারের সাহায্য গ্রহণ করিলে তাঁহার পরীক্ষা গৃহীত হইবে না।"

পরীক্ষার এই নিয়ম অনুসারে ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ এবং কলকাতা থেকে মোট ৩৭ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল— ১৪ জন উর্দু ভাষায় ও ২৩ জন বাংলা ভাষায়। তন্মধ্যে উর্দু বিভাগে ১২ জন এবং বাংলা বিভাগে ২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল। প্রথম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা ১৮৮৩ সালের ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। কৃতী ছাত্রীদের বিভিন্ন পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। মৌলবী রেয়াজউদ্দীন আহমদ পুরস্কারের জন্য তাঁর রচিত 'বোধোদয় তত্ত্ব' ১১ কপি এবং 'পদ্যপ্রসূন' ৭৫ কপি উপহারস্বরূপ প্রদান করেন।

সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বৎসরে কলকাতা, হুগলি, ঢাকা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থান থেকে অনেক বালিকা পরীক্ষা দেয়। পুরস্কার বিতরণী সভায় ৮০/৯০ টাকা মূল্যের নানারূপ দ্রব্য পুরস্কার প্রদত্ত হয়। ১৮৮৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভার একটি বিবরণ 'ঢাকা প্রকাশে' প্রকাশিত হয় ঃ

> "আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া বিগত ২৯শে অগ্রহায়ণ রবিবার ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিকী পুরস্কার প্রদর্শন সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। সভাস্থলে যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহাতে আমাদের দৃঢ় প্রতীতী জন্মিয়াছে, ঢাকার মুসলমান সমাজ নির্জীব নহে। ঢাকার প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী বৃদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ গোলাম মোস্তফা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌলবী গোলাম মাওলা, মৌলবী জেয়াউদ্দীন আহম্মদ, ছৈয়দ হাসান আলী, মৌলবী রেজায় করিম, চৌধুরী আব্দুল গফুর প্রভৃতি জমিদার এবং মৌলবী আবুল খায়ের মহাম্মদ ছিদ্দিক এম. এ. সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ঢাকা মাদ্রাসা ও পণ্ডিত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন, সংস্কৃত অধ্যাপক ঢাকা কলেজ ইত্যাদি গণ্যমান্য লোক ও বহুতর মুসলমান ছাত্র সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সুবিজ্ঞ সভাপতির ক্রীড়াময়ী ভাষা, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মহোদয়ের সারগর্ভ সংক্ষেপ উক্তি এবং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের তেজস্বিনী বক্তৃতা সমস্তই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।........
>
> মাত্র দুই বৎসরে সম্মিলনীর কার্যক্ষেত্র যেরূপ প্রশস্ত, আয় যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে সভার অনুষ্ঠাতৃদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া পারিনা।

আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে ঢাকা মুসলমান সমাজের শিরোভূষণ শ্রীযুক্ত নবাব আবদুল গনি বাহাদুর এই হিতকর কার্যে তাঁহাদের সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন।"[১৫]

'ঢাকা প্রকাশে' প্রকাশিত এই সংবাদের শেষাংশে ঢাকার নবাব বাহাদুরদের সাহায্য ও সহানুভূতি যাচঞা করা হয়। 'ঢাকা সমাজ সম্মিলনী'র সাহায্যার্থে নবাব আহসানউল্লাহ্ খাঁ-যেমন ৩০০ টাকা দান করেছিলেন, সুহৃদ সম্মিলনীর বরাতে অনুরূপ কোনও দানের কথা জানা যায় না। তার কারণ হয়তো এই যে, 'সমাজ সম্মিলনীর' সঙ্গে যেমন ছিলেন মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্, 'সুহৃদ সম্মিলনীর' সঙ্গে যুক্ত ছিলনা অনুরূপ কোনও ব্যক্তিত্ব। এই সম্মিলনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন যাঁরা— তাঁরা ছিলেন কলেজের ছাত্র অথবা সদ্য-স্নাতক কয়েকজন প্রাণদীপ্ত তরুণ যুবক। তাঁদের ছিল না বিত্ত অথবা পদমর্যাদা, কিন্তু তাঁদের ছিল উদ্যম, কর্মস্পৃহা এবং সমাজসেবার অদম্য আগ্রহ।

'সুহৃদ সম্মিলনী' জনসাধারণের কাছ থেকেও খুব বেশী সাহায্য পায়নি। ১৮৮৬-৮৭ সালের অনুষ্ঠান পত্রের শেষ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সাহায্যতালিকা দেখলেই তা বুঝা যায়। তাতে সর্বোচ্চ সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫ টাকা। সম্মিলনী স্ত্রীশিক্ষা ছাড়া অন্য কোন জনহিতকর কাজে ব্রতী ছিল না বলেই হয়তো এর ক্রিয়াকর্মে সাধারণের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, স্ত্রীশিক্ষার জন্য পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন ও পরীক্ষা গ্রহণের এরূপ ব্যবস্থা সমসাময়িককালে বহু সমিতি বা সম্মিলনীরই কার্যপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত এজাতীয় সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'শুভসাধিনী সভা' (প্রতিষ্ঠা- ১৮৬৯), 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা' (প্রতিষ্ঠা- ১৮৭০), 'গৈলা ছাত্র সম্মিলনী সভা' (প্রতিষ্ঠা- ১৮৮০)।

১৮৮৬ সালের শুরুতে সম্মিলনী নতুন কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব করে। '১৮৮৬-৮৭ সালের অনুষ্ঠানপত্রে' সম্পাদক মুসলমান সমাজের তদানীন্তন অবস্থা ব্যাখ্যা করে সুহৃদ সম্মিলনীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমান জাতির সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন। বিদ্যাশিক্ষাই জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় বিবেচনায় সম্মিলনী ১৮৮৬ সালের দিকে কার্যক্রম স্ত্রীশিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে পুরুষ শিক্ষার উন্নতি বিধানেও মনোযোগী হয়। কৌতুহলী পাঠকদের জন্য ১৮৮৬-৮৭ সালের অনুষ্ঠানপত্রের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

"... ভ্রাতৃগণ! আপনারা বঙ্গীয় মুসলমানদিগের বর্তমান দূরবস্থার কথা একবার নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখেন কি। বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণ কি নিমিত্ত অবনতির চরম সীমায় সমুপস্থিত হইয়াছেন আপনারা কখনও তাহার প্রকৃত কারণানুসন্ধান করিয়া থাকেন কি? "শিক্ষা" এই শব্দটি উচ্চারণ করিতে অন্তঃকরণে স্বতঃস্বতই একটি অচিন্ত্যনীয় ও অভাবনীয় ভাব সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। বিদ্যাশিক্ষাই মনুষ্য জাতির উন্নতির একমাত্র উপায়। ইহার অভাবে কেহ উন্নত অবস্থাপন্ন হইতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও পারিবে না। আজ উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে সর্বত্র উন্নতির যে একটি প্রবল তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছে, যে তরঙ্গের অভিঘাতে পৃথিবীর এক প্রান্ত

১৫. 'ঢাকা প্রকাশ'- ৬ পৌষ ১২৯২ (২০ ডিসেম্বর ১৮৮৫)।

হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আলোড়িত হইয়াছে, তাহাও কেবল বিদ্যা শিক্ষারই প্রভাবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গের নির্জীব মুসলমান-বৃন্দের মধ্যে সেই অমূল্য পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব।... বর্তমান সময় বঙ্গের মুসলমান অধিবাসীগণের অবস্থা যাহাতে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইতে পারে, যাহাতে তাঁহাদের অসহ্য দারিদ্র্য যন্ত্রণা বিদূরিত এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা অপনীত হইতে পারে, যাহাতে তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী হইয়া জ্ঞানালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইতে পারে, যাহাতে তাঁহারা বঙ্গের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারেন, এই সকল গুরুতর কার্য সম্পাদনের জন্য "মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী" কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবার হইতে আমরা কর্তব্য পথে আরও একটু অগ্রসর হইব এরূপ মনে করিয়াছি। অর্থাৎ আমাদিগের সভার আয়ের কিয়দংশ জাতীয় পুরুষশিক্ষার নিমিত্ত প্রযোজিত হইবে।.... ঝিনুক দ্বারা সমুদ্র সিঞ্চন আর এই সভার এহেন সামান্য আয়ের দ্বারা মুসলমানদিগের পুরুষশিক্ষার উন্নতি বিধান করা উভয়ই সমান। এই নিমিত্ত আমরা সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার মুসলমান ভ্রাতাদিগের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, আপনারা জাতীয় অভাব দূরীকরণার্থে, জাতীয় উন্নতি সম্পাদনার্থে, পবিত্র মহম্মদীয় নীতির অনুমোদিত এরূপ একটি গুরুতর কার্যে সাহায্য প্রদান করিতে অগ্রসর হউন। হায়! আপনাদের পূর্বাবস্থার সহিত বর্তমান দুরবস্থার তুলনা করিয়া কি কখনও আপনারা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন না? আজ মুসলমানগণ আপনাদের দুরবস্থা পরম্পরায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট আসন লাভ করিবার অনুপযুক্ত। ইহা অপেক্ষা ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? স্মরণ করিতেও বিজাতীয় মর্মবেদনায় নিপীড়িত ও নিরাশার তীব্র বিষে বিকলচিত্ত হইতে হয়। আর কতকাল আমরা এই অজ্ঞান তামসে সমাচ্ছন্ন থাকিব? ... পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবকদিগের স্বধর্মের প্রতি যেরূপ অনাস্থা এবং অনাদর, তাহা স্মরণ করিলেও অভাবনীয় মর্মপীড়ায় নিপীড়িত হইতে হয়। পূর্ব পুরুষদিগের অবিশ্রান্ত ধর্মাচরণের সহিত আমাদের উদাসীনতার তুলনা করিলে তাঁহাদের বংশধর বলিয়া গৌরবান্বিত বিবেচনা করা দূরে থাকুক, আপনাদিগকে তাঁহাদিগের সহিত একজাতীয় জীব বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ হয়। ... বৈষয়িক কার্যানুরোধে এদেশীয় মুসলমান বালকদিগকে মাতৃভাষা বাঙ্গালা এবং রাজভাষা ইংরেজী পড়িতে হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে স্কুলসমূহে ধর্মশিক্ষার কোন প্রকার বন্দোবস্তই নাই। তাই মুসলমান অভিভাবকগণ বালকদিগের ইংরেজী এবং বাঙ্গালা শিক্ষার বিরোধী; বাস্তবিক ধর্ম শিক্ষার অভাবেই আধুনিক শিক্ষার দ্বারা আমাদের সমাজবন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া উঠিতেছে ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ধর্মপ্রবণ প্রাচীন সম্প্রদায় যে এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি? এই সকল শোচনীয় অভাব

১৬. 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠান পত্র। পৃঃ ১-৭। অনুষ্ঠান পত্রের শেষে সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হয় 'আবদুল মজিদ বি. এ.। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত এই অনুষ্ঠান পত্রে সম্পাদকের নাম আব্দুল মজিদ কলমের কালিতে কেটে লেখা হয় 'আবদুল আজিজ' এবং তাঁর নীচে ইংরেজিতে স্বাক্ষর"Abdul Aziz Sec. সম্ভবত : ১৮৮৬ সালে বি. এ পাশ করার পর আবদুল আজিজ কিছু দিনের জন্য সম্মিলনীর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

দূরীকরণার্থে "মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী" আমাদের সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার কোন প্রকার উপায় অনুষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত বিধিমত যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বালকদিগের স্মরণ করা আবশ্যক যে, সম্মিলনীর সহায়তা অপেক্ষা নিজ নিজ চেষ্টার উপরই তাহাদের ধর্মশিক্ষা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে।"[১৬]

১৮৮৬-৮৭ সালে সম্মিলনী পুরুষ-শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কারণ সম্ভবতঃ অর্থাভাব। সে বছর 'সভার আয় ছিল ২৩৩ টাকা ২ আনা ৫ পাই এবং ব্যয় ১৪০ টাকা ৪ আনা ২ পাই [১৭]। ১৮৮৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী জগন্নাথ স্কুলের গৃহে সুহৃদ সম্মিলনীর ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণীতে প্রকাশ, ১৮৮৬-৮৭ সালে সম্মিলনীর প্রযত্নে কলকাতা, হুগলি, বরিশাল, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ থেকে ৪৭ জন বালিকা বাংলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

১৮৮৭ ও ১৮৮৮ সালে সম্মিলনীর কর্মপরিকল্পনা আরও সম্প্রসারিত হয়। 'ঢাকা প্রকাশ' সূত্রে জানা যায় ঃ-

"সম্মিলনী ১৮৮৭ সনে ৬ জন ছাত্রকে এবং একটি পাঠশালাকে মাসিক সাহায্য প্রদান করিয়াছে। এ বৎসর তাঁহারা ৯ জন ছাত্রকে এবং একটি পাঠশালাকে মাসিক সাহায্য দিতেছেন। তন্মধ্যে ২ জন ছাত্র কলেজে, ১ জন মেডিকেল স্কুলে, ২ জন আরবি ও অপর ৪ জন ইংরেজি ও বাঙ্গালা পড়েন। এতদ্ব্যতীত পীড়িত ও অসহায় দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করাও সম্মিলনীর অন্যতম কর্ত্তব্য। সম্মিলনী ২/ ৩ জন পীড়িত ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন এবং কর্ম্মচারীগণ তাহাদের শুশ্রূষা করিয়াছেন। কলিকাতা এবং ঘোড়াশালে সম্মিলনীর ২টী শাখা সভা এবং বরিশাল টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে সম্মিলনীর এজেন্ট নিযুক্ত আছেন। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল মৌলবী সিরাজুল ইসলাম খাঁ বাহাদুর সাহেব কলিকাতাস্থ শাখা সভার সভাপতি।"[১৮]

'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র সপ্তম বৎসরে (১৮৮৮-১৮৮৯) কার্যনির্বাহক সভার গঠন নিম্নরূপ ছিল ঃ-

মৌলবী আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক এম. এ. (মাদ্রাসা কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট)— সভাপতি

" কাজী রাজিউদ্দীন (জমিদার) ও মৌলবী সৈয়দ আওলাদ হোসেন (স্পেশিয়াল সাব রেজিষ্ট্রার)— সহকারী সভাপতি

" আব্দুল মজিদ বি. এল (জজকোর্টের উকীল)— সম্পাদক

" অলিওর রহমান (শিক্ষক, ঢাকা মাদ্রাসা)— সহকারী সম্পাদক

" সৈয়দ আমজাদ আলী (ডেপুটি পোষ্টামাষ্টার জেনারেল, পার্সনাল অ্যাসিষ্টেন্ট)— সদস্য

" আব্দুস সালাম (শিক্ষক, ঢাকা মাদ্রাসা)— সদস্য

" হাফেজ আবদুল্লাহ্ (অধ্যাপক)— সদস্য

---

১৭. 'ঢাকা প্রকাশ'- ২ ফাল্গুন ১২৯৩ (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭)।

১৮. 'ঢাকা প্রকাশ'- ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৫ (ডিসেম্বর ১৮৮৮)।

"আব্দুল মুনিম (আরবী ও ফারসি অধ্যাপক)— সদস্য

"আবদুল ওয়াজিদ বি. এ. (শিক্ষক মাদ্রাসা)— সদস্য

"জহুরুল হক বি. এ. (মুসলমান রেজিষ্ট্রার কাজি)— সদস্য এবং

" মোহাম্মদ হাসান বি. এ. (রেজিষ্ট্রার অফিসের হেডক্লার্ক)— সদস্য।

এ ছাড়া এ সময়ে নবাব পরিবারের খাজে মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, খাজে মোহাম্মদ মনসুর সাহেব, খাজে আবদুল লতিফ সাহেব, জমিদার সৈয়দ গোলাম মোস্তফা সাহেব, সৈয়দ হাসান আলী সাহেব, কাজি জিয়াউদ্দীন সাহেব প্রমুখ ঢাকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণ সম্মিলনী সভার সভ্য[১৯] ছিলেন বলে জানা যায়।

প্রথম বৎসরের কার্যনির্বাহক সভার সঙ্গে তুলনায় সপ্তম বৎসরের কার্যনির্বাহক সভার একটি বিশিষ্টতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়, তা হচ্ছে এই সভার সদস্যগণ এই শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি অথবা বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সম্মিলনী শুধুমাত্র তরুণ যুবসমাজ বা ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নবাব পরিবারেরও কয়েক জন এ-সময়ে সম্মিলনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আমাদের দেশে জনহিতকর সংগঠনের আয়ু সাধারণত দীর্ঘ হয় না। কারণ প্রধানতঃ অর্থাভাব ও নিঃস্বার্থপরায়ণ কর্মীর অভাব। এ'দুটি কারণে 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র কর্মোদ্যমও ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৮৯ সাল থেকে এর ক্রিয়াকর্মের বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে আমরা শেষবারের মত সম্মিলনীর নাম দেখতে পাই।

১৯০৩ সালের দিকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলাকে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়। এসময় ঢাকার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯০৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় মুসলমানদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বলিয়াদীর জমিদার চৌধুরী কাজেমউদ্দীন আহম্মদ সিদ্দিকী।[২০] তাঁর প্রচেষ্টায় ২৫ শে জানুয়ারী (১৯০৪) 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 'ঢাকা প্রকাশ' সূত্রে জানা যায়ঃ

> "বালিয়াদীর খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত চৌধুরী কাজেম উদ্দীন আহাম্মদ সিদ্দিকী সাহেবের যত্নে গত ২৫ শে জানুয়ারী অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময়, উক্ত সাহেবের ঢাকা বেচারামের দেউরীস্থিত বাটীর প্রাঙ্গণে 'ঢাকা মহম্মদীয়ান ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ান এসোসিয়েসনে'র মেম্বরগণ কর্ত্তৃক ঢাকা ময়মনসিংহ আসামভুক্ত হওয়ার প্রস্তাবের প্রতিবাদ- জন্য একটি সভা আহূত হয়।... প্রায় ৩০০ জন সভ্য তথায় উপস্থিত ছিলেন।... মহসীন ফাণ্ডের উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইলে শিক্ষা লাভ সম্বন্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের অশেষ অনিষ্ট হইবে মনে করিয়া সকলেই বিশেষ ব্যাকুলতার সহিত গবর্ণমেন্টের নিকট বর্তমান প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন"।[২১]

লক্ষণীয় বিষয়, প্রধানতঃ শিক্ষলাভের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবার

---

১৯. 'ঢাকা প্রকাশ'-১৯ শে অগ্রহায়ণ ১২৯৫।

২০. "ঢাকা প্রকাশ'-২৬ শে পৌষ, ১৩১০, (১০ জানুয়ারি ১৯০৪)।

আশঙ্কায়ই মুসলমানেরা আসামের সঙ্গে ঢাকা-ময়মনসিংহ অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯০৪ সালেই ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড কার্জন ঢাকা-ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম সফর ক'রে জনসাধারণের প্রতিবাদের যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করেন। পূর্ব পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে তিনি আসাম ও পূর্ববঙ্গের সম্মিলিত প্রদেশ গঠন ও ঢাকায় প্রদেশের রাজধানী স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। সে প্রস্তাব প্রায় সর্বস্তরের মুসলমানের কাছে অভিনন্দিত হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর এই নতুন প্রদেশ গঠিত হয় এবং সে দিনই ঢাকার নর্থব্রুক হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় Mohomedan Provincial Union নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' সভার অস্তিত্ব লোপ পায়।[২২]

সুহৃদ সম্মিলনীর আয়ু মাত্র ২২ বৎসর। 'জাতির সার্বিক উন্নতি সাধন— এই মহৎ প্রেরণা নিয়ে কয়েকজন তরুণ যুবক যে সংগঠন গড়ে তুলেছিল, পরবর্তী কালে তার সঙ্গে যুক্ত হলেন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি। সংগঠনের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সম্মিলনীর অর্থাভাব ছিল। কিন্তু অভাব ছিল না কর্মীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী প্রথম দিকে স্ত্রীশিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী কালে পুরুষ-শিক্ষা এবং সমাজসেবার মধ্যে কর্মসূচী সম্প্রসারিত হয়। এমন কি শেষ দিকে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিয়ে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও সম্মিলনীর কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। তাদের সামর্থ্য ছিল ক্ষুদ্র, আয়ুও ছিল স্বল্পকালীন— তবু মুহূর্তের জন্য হলেও তারা সচকিত হয়েছিল, চোখ মেলে তাকিয়েছিল নিজেদের দিকে এবং বাইরের জগতের দিকে। ইতিহাসে যেমন কোন তুচ্ছ ঘটনাই তুচ্ছ নয়; ঠিক তেমনি, সমাজের জাগৃতির ইতিহাসেও 'সুহৃদ সম্মিলনী'র ন্যায় ক্ষুদ্র ও স্বল্পকালীন সংগঠনের অবদান নিতান্ত সামান্য নয়।

---

২১. 'ঢাকা প্রকাশ' ১৭ মাঘ ১৩১০ (৩১ শে জানুয়ারি ১৯০৪)।

২২. Ahmad Hasan Dani -Dacca 2nd edn. . 1962, Page 123.

উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্য-চর্চার ধারা

।। এক ।।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে হুগলীতে প্রতিষ্ঠিত এন্ড্রুজ সাহেবের ছাপাখানা বিশেষ স্মরণীয়। কারণ ১৭৭৮ সালে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত প্রথম বাংলা বই 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' এই ছাপাখানা থেকেই প্রকাশিত হয়। এ-গ্রন্থ দিয়ে বাংলা গ্রন্থ-প্রকাশের শুভ সূচনা হয়। ঢাকার সাহিত্যচর্চার ইতিহাসেও 'বাঙ্গালা যন্ত্র' প্রতিষ্ঠা অনুরূপ স্মরণীয় ঘটনা। এই মুদ্রাযন্ত্রকে কেন্দ্র করে ঢাকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। 'বাঙ্গালা যন্ত্র' প্রতিষ্ঠার পর আরও কয়েকটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এসব মুদ্রাযন্ত্রকে অবলম্বন করে বহু গ্রন্থ, সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

'বাঙ্গালা যন্ত্রে' মুদ্রিত হয় ঢাকার প্রথম সাপ্তাহিকপত্র 'ঢাকা প্রকাশ' (৭ই মার্চ ১৮৬১)। এই মুদ্রাযন্ত্রেই ছাপা হয় ঢাকার প্রথম সাহিত্যপত্র 'কবিতাকুসুমাবলী' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৭)। ঢাকায় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরই প্রথম যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তা একটি সাহিত্যপত্র। ঘটনাটি কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। অর্থাৎ, মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই ঢাকায় সাহিত্যচর্চার একটি পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। ঢাকায় দীর্ঘকাল জারিগান ও শাহমাদারের গানের পাশাপাশি মনসা-মঙ্গলের পালা, কৃষ্ণযাত্রার অভিনয়, নীলের গান, ভাটের গান, কবির গান প্রভৃতি ঢাকার রসিকজনের আনন্দের উৎস ছিল। ১৮৬০ সালের 'কবিতাকুসুমাবলী' পত্রিকায়ই আমরা কবিগানের কবিয়ালদের একটি চিত্র পাই[১] ঃ

কবিকর দল যত সাজাইয়া দল
বায়না পাবার তরে হতেছে চঞ্চল।
তারা এইবার আরো উচ্চসুরে গায়।
ঢোলের চাটির চোটে মাটি ফেটে যায়
চিতান নোহরা বাঁধা গীত বাজিতেছে।
মহল্লায় মহল্লায় গলা ভাঙ্গিতেছে।

এসময় ঢাকা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথির ব্যাপক প্রচলন ও বিস্তর ব্যবহার ছিল। আমরা জানি, ভারতীয় উপমহাদেশে কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পুঁথি-সংগ্রহের কাজে হাত দেয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব নেন। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকায় একজন কর্মচারী এসেছিলেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংগ্রহের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৯১

১. গিরিজাকান্ত ঘোষ- 'কবিতাকুসুমাবলী', ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৫

সালের শেষ দিকে তিনি স্বয়ং পুঁথি-সংগ্রহের জন্য ঢাকায়[২] এসেছিলেন। ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পুঁথিসমূহ কলকাতা এসিয়াটিক গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

ঢাকায় পত্রপত্রিকা প্রকাশের পূর্বে ঢাকার সাহিত্যিকগণ কলকাতার 'সংবাদ প্রভাকর', 'রসরাজ', 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[৩] এঁদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও হরিশচন্দ্র মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

।। দুই ।।

সাহিত্য-চর্চার ইতিহাসে সাহিত্য-মজলিশ অথবা সাহিত্য-সভার অবদান কম নয়। বিভিন্ন সাহিত্যিক-আড্ডাকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে এবং সেখানে নতুন সাহিত্য-চিন্তা অথবা সৃষ্টিশীল সাহিত্য-কর্মের সূচনা হয়।

লক্ষ্য করা যায়, ঢাকায় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর পরই 'ঢাকা প্রকাশ', 'কবিতাকুসুমাবলী', 'চিত্তরঞ্জিকা' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় দফ্‌তরে ঢাকার প্রথম সাহিত্যিক-আড্ডার উদ্ভব হয়। 'বাঙ্গালা যন্ত্রে'র যন্ত্রালয়ই ছিল 'ঢাকা প্রকাশে'র কার্যালয়। এই কার্যালয়ে সেকালের ঢাকার সাহিত্যিকবৃন্দ সমবেত হতেন। তাঁরা মজলিশী পরিবেশে সাহিত্য আলোচনা করতেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সাহিত্য-গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' তখন 'বাঙ্গালা যন্ত্রে' ছাপা হচ্ছিল।

'ঢাকা প্রকাশ' কার্যালয়ের আড্ডায়ও ঢাকায় কর্মরত দীনবন্ধু মিত্র আসতেন। এ-প্রসঙ্গে 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল[৪]—

> "যৎকালে দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ মুদ্রাঙ্কন করেন, তখন আমাদিগের যন্ত্রালয়েই অনেক সময় যাপন করিতেন এবং বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিতেন।"

'বান্ধব' পত্রিকার কালীপ্রসন্ন ঘোষকে কেন্দ্র করেও ঢাকায় একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-আড্ডা গড়ে ওঠে। এ আড্ডা অধিকাংশ সময় বসতো 'বান্ধব' কার্যালয়ে সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাড়িতে। 'বান্ধব কুটীর' নামে খ্যাত এই বাসভবনটি ছিল ঢাকার আর্মানিটোলার পূর্ব দিকে। কখনও কখনও আড্ডা বসতো অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা ঢাকা আদালতের সাবজজ গঙ্গাচরণ সরকারের বাসভবনে। গঙ্গাচরণ সরকারের বাসভবনে কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছাড়াও আরও অনেকে সে সাহিত্যিক-সান্ধ্য-আড্ডায় নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করতেন। 'বান্ধব' কার্যালয়ের সাহিত্যিক আড্ডায় কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গে যাঁদের বিশেষ সখ্যতাও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-সম্পাদক পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, রামায়ণের অনুবাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, নটরাজ অমৃতলাল বসু, 'সাধারণী' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার

২. ঢাকা প্রকাশ— ১৩ পৌষ, ১২৯৮।
৩. গিরিজাকান্ত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭।
৪. ঢাকা প্রকাশ— ৯ নভেম্বর, ১৮৭৩।

এবং গঙ্গাচরণ সরকার [৫]। কালীপ্রসন্ন ঘোষের এই আড্ডার আকর্ষণ এত তীব্র ছিল যে, দীনবন্ধু মিত্র যে কয়দিন ঢাকায় ছিলেন প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর "দুইজনে একস্থানে মিলিতেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গে আলাপ করিয়া রাত্রি ১১টা- ১২টা পর্যন্ত একত্র থাকিতেন[৬]।"

অনুমান করা যায়, ঢাকার সাহিত্য-অঙ্গনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ। তিনি ভাওয়াল রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদ লাভ করে জয়দেবপুর যাওযার পর 'বান্ধবের আড্ডা' ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তিনি জয়দেবপুর অবস্থানকালেও সেখানে 'সাহিত্য সমালোচনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় আসেন এবং প্রায় দশদিন এখানে অবস্থান করেন। এসময়ে 'পগোজ স্কুলে ঢাকা বাসীদের পক্ষ থেকে তাঁকে একখানি মানপত্র প্রদান করা হয়। অনেকের অনুমান মানপত্রের খসড়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক রচিত। এই অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে মধূসূদন বলেন— "আমি শুদ্ধ বাঙ্গালী নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটী যশোহর"। শুধু তাই নয়, তিনি পরিহাস করে বলেন, "আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক এক খানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যেমনি বলবৎ হয়, অমনি আর্শিতে মুখ দেখি।" (সাহিত্য সাধক চরিত মালা- ২৩)। সে সভায় হরিশচন্দ্র মিত্র, ঢাকা প্রকাশের সম্পাদক গোবিন্দ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলগৃহে এবং 'ঢাকা প্রকাশ' কার্যালয়ে তাঁর অভ্যর্থনার জন্যও দুটি সভার আয়োজন করা হয়। ঢাকার 'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকার এক সংবাদে জানা যায় যে, ঢাকার 'জ্ঞানকরী সভা'য় বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং মাইকেল মধূসূদন দত্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় মধূসূদন বহু-বিবাহের সপক্ষে রচিত মনুর শাস্ত্রাদি বুড়িগঙ্গায় নিক্ষেপের কথা বলেন।

১৮৭৫ সালে কবি নবীনচন্দ্র সেন যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তাঁকে স্থানীয় একটি সভাগৃহে অভ্যর্থনা জানানো হয়। উক্ত সভায় গঙ্গাচরণ সরকার, অভয়চন্দ্র বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সুধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

'ঢাকা প্রকাশ' সূত্রে আমরা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত কয়েকটি সাহিত্য-সভারও পরিচয় পাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর মৃত্যুতে ঢাকায় দুটি শোকসভার আয়োজন করা হয়— একটি কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গণে, যার সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ঢাকার আমলিগোলায় শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের গৃহেও এক শোকসভার অধিবেশন হয়। [৭] দুঃস্থ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থে, ঢাকার নর্থব্রুক হলে একটি সভার

---

৫. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়- 'বঙ্গভাষার লেখক', পৃ. ৯৪২-৪৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪৩।

৭. 'ঢাকা প্রকাশ'– ২৫ শ্রাবণ, ১২৯৮

আয়োজন করা হয। কালীপ্রসন্ন ঘোষ এ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সভায় কবির সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কবির সাহায্যার্থে একটি উপসমিতিও গঠিত হয়।[৮] হরিশচন্দ্র মিত্রের পরলোকগমনের পর ঢাকার পগোজ স্কুলে এক স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকার জজ আদালতের বিখ্যাত উকীল বাবু বরদাকিঙ্কর রায়। কলেজিয়েট স্কুলের পণ্ডিত বাবু প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্তী হরিশচন্দ্রের জীবন ও চরিত বর্ণন করেন[৯]।

।। তিন ।।

ঢাকার সাহিত্য-চর্চার ধারা আলোচনায় প্রথম যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭)। তিনি 'বাঙ্গালা যন্ত্রে'র সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলেও এই মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত ঢাকার প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'কবিতাকুসুমাবলী'র সম্পাদক ছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ সালের ১৩ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। আর্থিক অনটনের কারণে উচ্চশিক্ষা লাভে তিনি অসমর্থ হলেও সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ঢাকার নর্মাল স্কুলের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকার 'মনোরঞ্জিকা সভা'র অন্যতম উদ্যোক্তা অভয়াচরণ রায় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সহকর্মী ছিলেন। নর্মাল স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ 'এরাটুন' সাহেবের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার আকস্মিকভাবে চাকুরীতে ইস্তফা দেন। এ সময় ১৮৬০ সালে 'বাঙ্গালা যন্ত্র' প্রতিষ্ঠার পর 'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশিত হলে তিনি তাঁর সম্পাদক হন। এ-পত্রিকায় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'মনোরঞ্জিকা' পত্রিকার সঙ্গেও তিনি সম্ভবত যুক্ত ছিলেন। ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে 'ঢাকা প্রকাশ' প্রকাশিত হলে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি কিছুকাল 'বিজ্ঞাপনী' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'অস্বাস্থ্য নিবন্ধন বিজ্ঞাপনী পত্রিকার সম্পাদকতা' পরিত্যাগ করেন।[১০] ১৮৭০ সালের দিকে তিনি শারীরিক এবং আর্থিক কষ্টে দিন অতিবাহিত করেন। এসময় জনসাধারণের চাঁদার উপর নির্ভরশীল এক চাকুরীতে তাঁকে বহাল করা হয়। 'ঢাকা প্রকাশে' পাবর্তীচরণ রায় স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়—

> "তাঁহাকে (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার) কোন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে তাঁহার বর্ত্তমান পীড়ার উপশম হইবে, এই বিবেচনায় ঢাকা ব্রাহ্মস্কুলে আর শিক্ষকের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে ব্রাহ্মস্কুলে অল্পবেতনে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা গিয়েছিল। কৃষ্ণবাবুর সাহায্যার্থে অতিসহজে মাসিক এই ক্ষুদ্র চাঁদা সংগ্রহ হইতে পারিবে, কেবল এই ভরসাতে আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু

৮. 'ঢাকা প্রকাশ'– ২৭ চৈত্র, ১৩০৫।
৯. 'ঢাকা প্রকাশ '– ১২ মে, ১৮৭২।
১০. 'ঢাকা প্রকাশ'– ১০ বৈশাখ, ১২৭৩।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রায় ৪ মাস অতীত হইল, ইহার মধ্যে ২/ ১ জন ব্যতীত আর কেহই কৃষ্ণবাবুর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন না [১১]।"

১৮৭৪ সালে কৃষ্ণচন্দ্র যশোর যান এবং যশোর জেলা স্কুলে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকেন। তিনি শেষজীবন জন্মভূমি সেনহাটিতে দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'সদ্ভাবশতক (বা সদ্ভাবপূর্ণ কবিতাকলাপ)' ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের কবিতাসমূহ সূফী কবি সাদী ও হাফিজের ফারসি কবিতার অনুবাদ। এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা 'কবিতা কুসুমাবলী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সদ্ভাবশতকে'র ভূমিকার শিরোনাম ছিল 'কবিতা পাঠের উপকার'। 'সদ্ভাবশতক' রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। প্রবীণ লেখক রাজনারায়ণ বসু কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজমুদারকে 'ঢাকাই কাপড়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঢাকাই কবি' আখ্যা দেন।[১২] 'সদ্ভাবশতক' ছাড়াও কবি কৃষ্ণচন্দ্র 'মোহভোগ' (১৮৭১) ও 'কৈবল্যতত্ত্ব' (১৮৮৩) নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'মোহভোগ' গ্রন্থের প্রশংসা করে সমকালীন 'মিত্র প্রকাশ' (পৌষ, ১২৭৭) পত্রিকা মন্তব্য করে :

"এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি যে প্রণালীতে রচিত, বঙ্গভাষায় এরূপ কাব্য অত্যন্ত বিরল। নাটকের ন্যায় কাব্য-বর্ণিত-নায়কনায়িকা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের উক্তি প্রত্যুক্তি পৃথক ২ রাখিয়া প্রভাত, প্রদোষ ও অবস্থার অস্থায়িতা প্রভৃতি উৎপ্রেক্ষার বর্ণন করিয়া মূল প্রস্তাবের সঙ্গতি সাধন করার রীতি প্রায় কোন কবি অবলম্বন করেন নাই।"

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'কৈবল্য তত্ত্ব' গ্রন্থে কৈবল্য ও কৈবল্য লাভের উপায় বিষয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়, তা ব্রাহ্মধর্ম মতবিরোধী ছিল। সে কারণেই লেখক ভূমিকায় মন্তব্য করেন যে, "মহানুভব ব্রাহ্মগণ খিন্ন না হইয়া স্বমতপক্ষপাতিতা পরিত্যাগ -পূর্বক ইহার অনুবর্তন করিলে তাহাদের উপযুক্ত মহানুভবতা প্রদান করা হইবে।"

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার যে 'নর্মাল স্কুলে'র শিক্ষক ছিলেন সেই স্কুলটি ঢাকার ছোট কাটরায় স্থাপিত ছিল। এই স্কুলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ছিলেন 'স্যামুয়েল সি এরাটুন' সাহেব (কার্যকাল ১৮৫৭-১৮৭১)। ঢাকায় অনেক সাহিত্যিক তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এরাটুন সাহেব ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহেও সহযোগিতা করেন। স্কুল প্রশিক্ষণে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। তিনি 'বেকন প্রণীত কতিপয় গ্রন্থের প্রশ্নাবলী' নামে একটি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ঢাকা 'সুলভ যন্ত্রে' মুদ্রিত এ-গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (৯ জানুয়ারি, ১৮৬৫) পত্রিকা মন্তব্য করে— "প্রশ্নগুলি রীতিমত বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে।"

'বাঙ্গালা যন্ত্রে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ব্রজসুন্দর মিত্র (১২২৭-১২৮২) বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার-মূলক কাজে জড়িত ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন জনহিতকর কাজের মধ্যে রয়েছে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার, বিধবা-বিবাহের প্রচলন, মাদকাসক্তির প্রতিরোধ ইত্যাদি। তিনি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে

১১. 'ঢাকা প্রকাশ'– ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭০।

১২. 'ঢাকা প্রকাশ'– ১৫ মাঘ ১৩২৩।

'চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবরণ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঢাকায় 'বাঙ্গালা যন্ত্র' প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৮৬০ সালে এ-মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয় প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ'। এ গ্রন্থ দিয়ে উনিশ শতকে ঢাকায় সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত। দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) ঢাকায় তখন ডাকবিভাগে কর্মরত ছিলেন। কর্মব্যপদেশে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সফরকালে তিনি নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে যে তথ্য ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তা তিনি 'নীলদর্পণ' নাটকে তুলে ধরেন। 'ঢাকা-ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়র' সূত্রে জানা যায়, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ঢাকা জেলায় মাত্র দুটি নীলের কারখানা ছিল; কিন্তু ১৮৩৩ সনের দিকে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩। ঢাকা জেলার আটি, ফুলবাড়িয়া, একডালা, মানিকগঞ্জ, মির্জাপুর, পাইকপাড়া, দিঘলি, লৌহজং প্রভৃতি অঞ্চলে নীলের ফ্যাক্টরি ছিল। সমসাময়িককালের পত্রপত্রিকায় ঢাকা জেলার নীলকরদের অত্যাচারের বিভিন্ন কাহিনীও প্রকাশিত হয়[১৩]।

দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' প্রকাশের পর পরই তাঁর কর্মস্থল ঢাকা ত্যাগ করেন এবং তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাদি কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়। ঢাকায় 'নীলদর্পণে'র আত্মপ্রকাশ এবং বিভিন্ন সভা সমিতি বা মজলিশে দীনবন্ধু মিত্রের উপস্থিতি ঢাকার সাহিত্যচর্চার ধারায় যে অপরিসীম প্রেরণা যুগিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাংলা ভাষায় প্রথম কোরআন শরীফের অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় ঢাকায় কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি ঢাকা জেলার পাঁচদোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। ঢাকা থেকে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'হিতোপাখ্যানমালা' (১ম খণ্ড)। এর প্রকাশকাল ১৮৭১, ঢাকা গিরিশ প্রেসে মুদ্রিত। এ গ্রন্থে শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ থেকে বিভিন্ন নীতিগল্প সংকলিত হয়েছে। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি কোরআন শরীফ অধ্যয়ন ও অনুবাদে প্রবৃত্ত হন[১৪]।

ঢাকার সাহিত্যচর্চার ধারায় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পাশাপাশি হরিশচন্দ্র মিত্রের নাম উল্লেখ করতে হয়। এরা দুজনেই সমবয়সী ছিলেন, একই সঙ্গে 'বাঙ্গালা যন্ত্রে' মুদ্রিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং সমকালে সাহিত্য-চর্চা শুরু করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'ও এই দুজন তরুণ কবির কবিতা প্রকাশিত হয়। 'ঢাকা প্রকাশে'র মতে[১৫] 'হরিশচন্দ্র মিত্র পূর্ববাংলার একটি রত্নস্বরূপ'।

হরিশচন্দ্র মিত্র ১৮৩৮ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে পরলোকগমন করেন। অসচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তিনি নিয়মিত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হন। সতেরো বছর বয়সে তিনি ঢাকার একটি পাঠশালায় 'গুরু'র পদ লাভ করেন। ১৮৬০ সালে 'বাঙ্গালা যন্ত্র' স্থাপিত হলে তিনি সেখানে কম্পোজিটরের চাকুরী গ্রহণ করেন। ঢাকার প্রথম সাহিত্যপত্র 'কবিতা কুসুমাবলী' (১৮৬০) প্রকাশিত হলে, তাঁর কয়েকটি কবিতা এ-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। এ-পত্রিকাটি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সম্পাদনা করতেন, কিন্তু হরিশচন্দ্র মিত্র ছিলেন এর প্রকাশক। কিছুদিন তিনিও এ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। অনেকের মতে, 'চিত্তরঞ্জিকা' (১৮৬২) পত্রিকারও তিনি

---

১৩. দ্রষ্টব্য. সোমপ্রকাশ ২২ জুলাই ১৮৬১, ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬২।
১৪. 'গিরিশচন্দ্র সেন- আত্মজীবন', ১৩১০, পৃঃ ৯১।
১৫. 'ঢাকা প্রকাশ'- ৬ এপ্রিল, ১৮৭২।

সম্পাদক ছিলেন। হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়– 'অবকাশরঞ্জিকা' (১৮৬২), 'ঢাকা দর্পণ' (১৮৬৩), 'কাব্যপ্রকাশ' (১৮৬৪), 'হিন্দু হিতৈষিণী' (১৮৬৫) ও 'হিন্দুরঞ্জিকা' (১৮৬৮)। ১৮৭০ সালে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ঢাকার একটি উচ্চমানের 'সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা'– 'মিত্রপ্রকাশ'। পত্রিকাটি প্রায় দুই বৎসরকাল প্রকাশিত হয়। 'মিত্রপ্রকাশে'র পূর্বে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রপত্রিকায় তিনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'মিত্রপ্রকাশে'র অধিকাংশ রচনাই হরিশচন্দ্র মিত্রের লেখা। এ পত্রিকায় তিনি কবিতা, কাব্য, প্রহসন, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে হরিশচন্দ্র মিত্রের প্রথম গ্রন্থ 'শুভস্য শীঘ্রং' প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। ১৮৬১ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত এই বার বছরে তিনি প্রায় ৩৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– 'কবিতা কৌমুদী' ৩ ভাগ (১৮৬৩–৭০), 'বিধবাবঙ্গাঙ্গনা' (১৮৬৩), 'বীর বাক্যাবলী' (১৮৬৪), 'কীচকবধকাব্য' (১৮৬৬), 'নির্বাসিতা সীতা' (১৮৭১),'পদ্ম কৌমুদী', 'চারুকবিতা' ইত্যাদি। হরিশচন্দ্র মিত্র প্রহসন রচনায়ও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর রচিত প্রহসনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– 'শুভস্য শীঘ্রং' (১৮৬১), 'ম্যাও ধরবে কে'? (১৮৬২), 'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে' (১৮৬৩), 'হতভাগ্য শিক্ষক' (১৮৭২)।

সমকালীন প্রহসনের ন্যায় হরিশচন্দ্র মিত্রের প্রহসনের মুখ্য বিষয় ছিল মদ্যপান, পরদারগমন, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা। 'ব্যোমচাঁদ বাঙ্গাল' ছদ্মনামে রচিত তাঁর 'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে' প্রহসনে মদ্যপানে প্রশ্রয় দানের জন্য ইংরেজ সরকারকেও দোষারোপ করা হয়েছে। প্রহসনের একটি চরিত্র মাধবের উক্তি এরূপ—

> "পূর্বকালের রাজারা মদ্যপদিগের দন্ডবিধান করেন, ইংরেজ বাহাদুর এ বিষয়ে আরো প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করেছেন, এদিকে যে প্রজারা অসার, অকর্মণ্য হয়ে এককালে যে উচ্ছন্ন হচ্ছে, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও কচ্চেন না।"

এই প্রহসনে বেশ্যাসক্তির চিত্র এবং কারণ দু-ই তুলে ধরা হয়েছে। প্রসঙ্গত এ প্রহসনে পণপ্রথারও সমালোচনা করা হয়েছে। নাটকের একটি চরিত্র প্রমীলা বলে[১৬] ঃ

> "যেমন গরুর ব্যবসায়ীরা আপনার মনের মত দাম পেলে, পালা পোষা গরুটাকে কশাইয়ের কাছে বেচতেও পেছোয়না, তেমনি পণ পেলে এখানকার অনেক মা বাপ, কানাই হোক, আর কুঁজোই হোক, মেয়েটা সুখে থাকুক বা না থাকুক একটা যেমন তেমন বরের হাতে সোঁপে দেয়। বাপ! বাপের কাজ কল্লেম আর কি!"

হরিশচন্দ্র মিত্রের 'শুভস্য শীঘ্রং' প্রহসনটি বিধবা-বিবাহের সমর্থনে রচিত। 'হতভাগ্য শিক্ষক' নামের প্রহসনে একজন শিক্ষকের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের শেষে শিক্ষক-চরিত্র প্রবোধ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলে-"সর্বস্বান্ত হলেম, আর শিক্ষকতা! মজুরি করি, তাও কবুল, এরূপ শিক্ষকতার খুরে দন্ডবৎ।"

হরিশচন্দ্র মিত্রের রচিত প্রহসনগুলোর বিশেষ সাহিত্যকমূল্য না থাকলেও এ

১৬. ডাঃ জয়ন্ত গোস্বামী রচিত 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর প্রহসন' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৫৪৫।

গ্রন্থগুলোতে তাঁর সমাজ-সচেতনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থমালা ঢাকার সাহিত্যচর্চার ধারায় যে বিশেষ প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না।

হরিশচন্দ্র মিত্রের রচিত নাটকে মঞ্চোপযোগিতা বিশেষ ছিল না। তাঁর রচিত নাটক ঢাকার মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে কোন সংবাদ জানা যায়নি। তবে ঢাকার একজন পণ্ডিত ও সংস্কৃত-সাহিত্য-বিশারদ প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের রচিত 'মালতীমাধব' নাটকের মঞ্চায়নের সংবাদ জানা যায়।

'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশের প্রথম দিকে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন একজন সাময়িকপত্র সেবী, তাঁর নাম মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার মহাসম্পাদক পদে যোগদান করেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম কবিতা মাসিক 'কবিতাকুসুমাবলী' (১৮৬০) সম্পাদনা করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। কবিতা বর্জিত সম্পূর্ণ গদ্যমাসিক প্রকাশের উদ্যোগ নেন মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ১৮৬১ সালে 'গদ্যময়ী মাসিকপত্র' প্রকাশ করেন। 'গদ্যপ্রসূন' ও 'গদ্যমাসিক' পত্রিকা দুটি ক্ষণস্থায়ী ছিল। মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ঢাকায়। তিনি ঢাকা সূত্রাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত 'মনোরঞ্জিকা' পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন তিনি। ঢাকা বেঙ্গলী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গ্রন্থ–'কুমার সাহিত্য'। পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৪২ সনে ঢাকার আটপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৪ সালে পরলোকগমন করেন। তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ও পরে ঢাকা কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা সারস্বত সমাজের প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি। তাঁর নাট্যচর্চা সম্পর্কে 'ঢাকাপ্রকাশে' প্রকাশ [১৭] —

> "তিনি বাঙ্গালা ভাষায় নাটক রচনাতেও যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। ইসলামপুর নাট্য সমাজ 'মালতীমাধব' নাটকাভিনয়ে অভিলাষী হইয়া মহামহোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি ভবভূতি প্রণীত 'মালতীমাধব' নাটক বাঙ্গালায় লিখিয়া দিলেন। এই 'মালতী মাধবের' পাণ্ডুলিপি নষ্ট বা অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির মুখে এই গ্রন্থের প্রস্তাবনা সঙ্গীত 'ভগবতী ভারতী' আজও গীত হইতেছে। ইহাতেই বুঝা যায়, নাটক রচনায় তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।"

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'মালতীমাধব' সম্ভবত গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। তিনি ১৮৬৪ সালে 'পদ্যমঞ্জরী' নামে একটি পদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঢাকা সুলভযন্ত্রে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়।

হরিশচন্দ্র মিত্রের ন্যায় আরেকজন প্রহসন রচয়িতা সমকালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর নাম হরিহর নন্দী। তিনি ১৮৮০ সালে 'অপূর্বরহস্য' নামে একটি 'হাস্যপ্রধান' পত্রিকা এবং ১৮৮১ সালে 'সদানন্দ' নামে 'মাসিক বিদ্রূপপত্র' প্রকাশ করেন। এ দুটি পত্রিকায় ব্যঙ্গাত্মক রচনা বা প্রহসন প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত প্রহসনগুলি হচ্ছে— 'কলির বৌ হাড় জ্বালানী' (১৮৭৫), 'ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম' (১৮৭৭), 'হঠাৎ বাবু'

১৭. 'ঢাকা প্রকাশ'– ২৯ কার্তিক, ১৩২১।

১৮৭৮), 'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি' (১৮৭৯), 'ননদ ভাই বৌর ঝগড়া' (১৮৮০), 'কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানী' (১৮৮৪), 'অসৎ কর্মের বিপরীত ফল' (১৮৮৪), 'এমন কর্ম আর করবোনা' (১৮৮৬), 'নাতিন জামাই' (১৮৮৬), 'আর কি বলদ গাছে ধরে' (১৮৮৮), ঘোড়ার ডিম' (১৮৮৯), 'শিখছ কোথা? ঠেকছি যথা' (১৮৮৮), 'কলির কুলাঙ্গার' ১৮৮০) ইত্যাদি। কোনো কোনো প্রহসন ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থ।

হরিহর নন্দী রচিত এ প্রহসনগুলিতে সমকালীন সামাজিক সমস্যাসমূহই চিত্রিত হয়েছে, যথা— মাদকাসক্তি, বেশ্যাসক্তি, বিধবাবিবাহ, নব্যযুবক বা বাবু সম্প্রদায় ইত্যাদি। জয়ন্ত গোস্বামী তাঁর 'সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন' গ্রন্থে এসব সমস্যার আলোকে হরিহর নন্দীর প্রহসনগুলির মূল্যায়ন করেছেন। তিনি 'ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম' (১৮৭৮) গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে যে উক্তি করেছেন তা হরিহর নন্দীর অন্য প্রহসনগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য– 'সমাজমনের গতিপ্রকৃতির চিত্রে এর মূল্য সামান্য হলেও অস্বীকার করে চলে না' (পৃঃ ১২১৯)।

১৮৬৩ সালে ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হয় দুর্গাদাস কর রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক 'স্বর্ণশৃঙ্খল'। নাটকটি 'পান্ডবদিগের দ্যূতক্রীড়াঘটিত বীরকরুণ রসপূর্ণ'। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় এ গ্রন্থের প্রশংসা করে লেখা হয় ঃ

> "স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক। বর্তমান সময়ে কতকগুলি অসার ও ঘৃণিত নাটক পাঠ করিয়া আমাদিগের নাটকের প্রতি একটি ভয়ানক বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়াছে। স্বর্ণ শৃঙ্খল পাঠে তাহা অনেক দূরীভূত হইল। নাটককর্ত্তা ইহার স্থানে ২ বিলক্ষণ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন [১৮]।"

ঢাকায় নাট্যচর্চার পাশাপাশি যাত্রাগানেরও বিশেষ প্রচলন ছিল। 'বৈদ্যবংশীয় বিখ্যাত যাত্রাপালাকার ও পদকর্তা' কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) নদীয়ায় জন্ম ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও ঢাকায় তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। ঢাকায়ই তিনি বিভিন্ন যাত্রাগান ও পালাগান রচনা করে খ্যাতি-লাভ করেন। সংগীতবিশারদ হিসেবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। ঢাকায় তিনি বড় গোঁসাই নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা হচ্ছে 'নন্দহরণ', 'স্বপ্ন বিলাস', 'রাই উম্মাদিনী বা দিব্যোন্মাদ' বিচিত্র বিলাস' 'ভরতমিলন' 'গন্ধর্বমিলন' 'কালীয়দমন' 'নিমাইসন্ন্যাস' 'সুবল-সংবাদ' নন্দহরণ' প্রভৃতি। 'বিচিত্রবিলাস' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় যে বক্তব্য করা হয়, তা নিম্নে উদ্ধার করা গেল ঃ

> 'সম্প্রতি ঢাকার প্রসিদ্ধ "স্বপ্নবিলাস' ও 'রাই উন্মাদিনী" নামক যাত্রাগান রচয়িতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয় "বিচিত্র বিলাস" নামে আর এক নূতন যাত্রাগান রচনা করিয়াছেন।.... আমরা স্বীকার করি, সঙ্গীতগুলি উত্তম হইয়াছে। রাগ, রাগিণী ও পদবিন্যাস মন্দ হয় নাই। অনুপ্রাস, যমক, উপমান, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারের বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে এবং হাস্য, বীভৎস, রৌদ্র ও করুণ প্রভৃতি অনেকগুলি রসেরও সমাবেশ করা হইয়াছে। গানগুলিও

১৮. ঢাকা প্রকাশ– ১৫ শ্রাবণ, ১২৭০।

সহজ ভাষায় বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু 'রাই উন্মাদিনী' ও 'স্বপ্ন বিলাসে'র সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। যাঁহারা 'স্বপ্ন বিলাস' ও 'রাই উন্মাদিনী' গান শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে 'বিচিত্র বিলাস' নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। ইহাতে উক্ত গানদ্বয় হইতে অধিকাংশ ভাব, রাগ, রাগিণী, সুর ও তাল-মানাদি গ্রহণ করা হইয়াছে। রচনাও তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। যদিও 'বিচিত্র বিলাসে'র সরলতা গুণটি অপেক্ষাকৃত অধিক; কিন্তু ইহাতে অশ্লীলতা দোষ বিলক্ষণ আছে।.... যাহা হউক, আমাদের মতে 'স্বপ্ন বিলাস' প্রথম, 'রাই-উন্মাদিনী' দ্বিতীয় এবং 'বিচিত্র বিলাস' গুণেভাবে, রসে, অলঙ্কারে, তালে, মানে, রাগে, রাগিনীতে সর্ব্ব বিষয়ে তৃতীয় হইয়াছে। আমরা বিলক্ষণ জানি, তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালার একজন বিজ্ঞ, বহুদর্শী ও অদ্বিতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা- বিশারদ পণ্ডিত। 'স্বপ্ন-বিলাস' ও 'রাই উন্মাদিনী'ই ইহার প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু 'বিচিত্র বিলাস' তাহার নামানুরূপ হয় নাই।"[১৯]

'বেঙ্গল লাইব্রেরি'র তালিকা সুত্রে আমরা ঢাকা থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু নাটক ও নাটিকা প্রকাশিত হতে দেখি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব গ্রন্থে সামাজিক অনাচার ও দুরবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শশাঙ্ক বিহারী গুহ রচিত 'বাবার ছেলের মা' (১৮৮২) গ্রন্থে বহুবিবাহের কুফল তুলে ধরা হয়েছে এবং তৎকালিক সমাজে নারীর অধঃপতনের কারণ হিসেবে এই কুলীন-প্রথাকে দায়ী করা হয়েছে। ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয় জয়কুমার দাস রচিত নাটক 'এঁরা আবার সভ্য কিসে'? এই গ্রন্থে জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রামচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত 'ভারত মাতা' (১৮৮৩) গ্রন্থটি ঢাকায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক সভা উপলক্ষে রচিত। লর্ড রিপনের শাসনামলে সুদিন সমাগত– 'ভারত মাতা'র প্রতি এই আশ্বাসবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্যগগনে প্রধান যে নক্ষত্র উদ্ভাসিত হয়েছিল, তাঁর নাম কালীপ্রসন্ন ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মতো ১৮৯৮ সালে ঢাকায় এসে বলেছিলেন– 'ঢাকার দর্শনীয় জিনিস তিনটি, প্রথমে মা ঢাকেশ্বরী, তারপর কালীপ্রসন্ন বাবু ও দীননাথ বাবু।" ১৮৯৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যোগদান করেন এবং বাংলা ভাষায় প্রথম বক্তৃতা প্রদান করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে নতুন ধারার সূচনা করেন। এই সমিতির অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বপালন করেন এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি উদ্ধার করেন।[২০]

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৮৪৩ সালের ২৩ শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১০ সালের ২৯শে অক্টোবর পরলোকগমন করেন। তাঁর পরলোকগমনের পর সমকালীন 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায়[২১] শোকবার্তাসহ কালীপ্রসন্ন ঘোষের যে সংক্ষিপ্ত জীবন প্রকাশিত হয়েছিল, তা এখানে উদ্ধার করা গেল ঃ

১৯. 'সোম প্রকাশ'- ১ আষাঢ়, ১২৭৮। 'সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র' (বিনয় ঘোষ সম্পাদিত) ৫ম খন্ড থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৬৮২–৩।

২০. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত– স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ– 'সম্মিলন', অগ্রহায়ণ- পৌষ, ১৩২৭।

২১. ঢাকা প্রকাশ- ১৫ শ্রাবণ, ১৩১৭।

"বাঙ্গালা ১২৫০ সনের শ্রাবণ মাসে ঢাকা জিলার অধীন বিক্রমপুর পরগণার ভরাকর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শিবনাথ ঘোষ। শিবনাথ ঘোষ বরিশাল জিলায় পুলিশের দারোগা ছিলেন।

... কালীপ্রসন্নের পিতা শিবনাথ ঘোষের আপন বাড়িতেই একটি মক্তব ছিল, দুইজন অভিজ্ঞ মুন্সী উহাতে অধ্যাপনা করিতেন। কালীপ্রসন্ন যে ভবিষ্যতে বিশেষ কৃতী ও যশস্বী ব্যক্তি হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন, বাল্যকালেই তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। কালীপ্রসন্ন যখন তিন বৎসরের শিশু তখন তিনি মক্তবে পাঠাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হন। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যথানিয়মে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। তিনি মুন্সীর নিকট পারসি অভ্যাস করেন এবং একজন সুযোগ্য অধ্যাপকের নিকট বাংলা ব্যাকরণ পড়িতে থাকেন। চিরদিনই তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। তাঁহার যখন সাত বৎসর বয়স, তখন তিনি কলাপ ব্যাকরণের অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও কয়েকখানা পারসি গ্রন্থ মুখস্থ করিয়াছিলেন।

এই সময় তাঁহার পিতা শিবনাথ ঘোষ তাঁহাকে বরিশালে লইয়া যান, সেখানে যাইয়া তাঁহার ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ জন্মে এবং তিনি বরিশালের ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন।

১২৬০ সনে দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ ঢাকা আগমন করেন এবং এখানকার কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হইয়া পাঠাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হন। চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় ১৮৫৭ সনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু নানাকারণে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। অতঃপর শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা হইতে কলিকাতা যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া তিনি কোনো স্কুল বা কলেজে ভর্তি হইলেন না, আপনার ইচ্ছামতো ভালো গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া ঘরে বসিয়াই পাঠ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল কলিকাতা অবস্থানের পর তিনি পুনরায় ঢাকা আগমন করেন, এই সময় তাঁহার বয়স দ্বাবিংশ বৎসর। ঢাকা আগমন করিয়া তিনি মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে ছোট আদালতের হেডক্লার্কের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার কিছুদিন পর মাতৃভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হন এবং আমরণ মাতৃভাষার সেবাতেই তিনি পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী তাঁহার অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। 'প্রভাত চিন্তা', 'নিশীথ চিন্তা', 'নিভৃত চিন্তা', 'প্রমোদ লহরী', 'মা না মহাশক্তি', 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় চিরদিনই তাঁহার নাম বঙ্গদেশে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। বাস্তবিকই কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। ১২৮১ সনে তাঁহার সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র 'বান্ধব' প্রথম বাহির হয় এবং ঐ সময়েই ভাওয়ালের তদানীন্তন স্বনামখ্যাত ভূম্যাধিকারী রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর তাঁহাকে জয়দেবপুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন। জয়দেবপুরে

কালীপ্রসন্ন মাসিক ৮০০ টাকা বেতন পাইতেন। ২৭ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত ঐ কার্য্য নির্বাহ করিয়া জীবনের শেষ ভাগে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়দেবপুরে অবস্থানকালে তিনি সেখানে 'সাহিত্য সমালোচনী সভা' নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করাই কালীপ্রসন্নের জীবনব্রত ছিল, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সে ব্রত হইতে বিচ্যুত হন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যসেবার জন্য তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল তিনি সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া বঙ্গদেশের পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দ্বারাও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত আলাপ করিতে করিতে যেন স্বচ্ছন্দে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।"

কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রধানত গদ্য-শিল্পী। গদ্য রচনা দিয়েই তাঁর সাহিত্য রচনার সূত্রপাত। তিনি প্রথম 'পার্কারের জীবনচরিত ও আমেরিকায় সভ্যতা' নামে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অপহৃত হওয়ায় তা আর প্রকাশিত হয় নি।[২২] এর পর তিনি ২৫ বৎসর বয়সে 'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৬৯) নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সমকালীন 'পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এ গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে,[২৩] "বাঙ্গালা পদ্যে মধুসূদনের দ্বারা যেরূপ সংস্কার সংঘটিত হইয়াছে 'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাবে'র রচয়িতার দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যে সেরূপ এক পরিবর্তন ও সংস্কার সংসাধিত হইবে।"

কালীপ্রসন্ন ঘোষের জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'বান্ধব' (প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১২৮১) পত্রিকার সম্পাদনা। উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে 'বান্ধব' সহজেই সুধীসমাজে প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' ছাড়া আর কোনও পত্রিকা এর সমতুল্য ছিল না। সে কারণেই অনেকে এ পত্রিকাকে 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' নামে অভিহিত করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এ পত্রিকা সম্পর্কে বলেছিলেন— 'বঙ্গদর্শন যাহা করে নাই, বান্ধব তাহা করিবে।' 'বান্ধব' পত্রিকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী সম্পর্কে তদানীন্তন 'সোমপ্রকাশে' উল্লেখ করা হয়[২৪] — "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যেমন হৃদয়হারিণী, কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধমালাও তেমন হৃদয়হারিণী। কোনও একটি প্রবন্ধ পড়িতে আরম্ভ করিলে তাহার শেষ না করিয়া ত্যাগ করা যায় না"। এই প্রবন্ধসমূহ পরবর্তীকালে সংশোধিত আকারে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থসমূহ হচ্ছে— 'প্রভাত চিন্তা' (১৮৭৭), 'নিভৃতচিন্তা' (১৮৮২), 'নিশীথ চিন্তা' (১৮৯৬), 'ছায়াদর্শন' (১৯১০) প্রভৃতি। অসামান্য চিন্তাশক্তি-সম্পন্ন প্রবন্ধ রচনার জন্য কালীপ্রসন্ন ঘোষ পাঠক ও সমালোচকের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। তদানীন্তন 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকায় বলা হয়,

---

২২. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়– বঙ্গভাষার লেখক; পৃষ্ঠা ৯৪০।

২৩. তদেব, পৃঃ ৯৪১।

২৪. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়– বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৯৪৪।

কালীপ্রসন্ন 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ইমার্সন' এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় তাঁকে 'বঙ্গের কার্লাইল' বলে অভিহিত করা হয়। বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতি অনুসরণ করার জন্য তাঁকে 'পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর'[২৫] নামে চিহ্নিত করা হয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ গদ্যগ্রন্থ ছাড়াও কয়েকটি গানের বই এবং কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'পারিব না একথাটি বলিও না আর/ কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার' এই বহুল উদ্ধৃত ও জনপ্রিয় কবিতাটি কালীপ্রসন্ন রচিত 'কোমল কবিতা' (১৮৮৮) নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'সঙ্গীত মঞ্জরী' নামে তিনি পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এছাড়াও তাঁর রচিত অনেক গান ও কবিতা অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাগ্মিতার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাঁর বক্তৃতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে লিখেছেন–

> "কালীপ্রসন্নই এক প্রকার বাঙ্গালা বক্তৃতার পথপ্রদর্শক। কারণ, বাগ্মিকুলতিলক কেশবচন্দ্র যে কালে বাঙ্গালা বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন নাই; কালীপ্রসন্ন সেই সময় সর্বপ্রথম বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া দেশস্থ সকলকে মোহিত করেন, এবং অত্যুৎকৃষ্ট ইংরেজী বক্তৃতায় ভাষার ক্রীড়াবৈচিত্র্য ও উদ্দীপনার তরঙ্গ যতদুর উঠিতে পারে, ঐ উভয়ই যে বাঙ্গালা বক্তৃতায়, তাহা হইতেও অনেক বেশী উপরে উঠিতে পারে, ইহা প্রথম স্বশক্তির অনুভব করিয়া এবং কার্য্যে ফলাইয়া বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ বর্দ্ধন ও শক্তি বিস্তারে উপাসকের মত অনুরাগী হন।" (পৃঃ ৯৪২)

কালীপ্রসন্ন ঘোষের সম্পাদনায় নবপর্যায়ে যখন 'বান্ধব' প্রকাশিত হয়, তখন এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র বসু। ঢাকা সারস্বত সমাজের মুখপত্র "সারস্বত পত্র" পত্রিকাটিও তিনি কিছুকাল সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'নবীন সন্ন্যাস— দুই খণ্ড (১৮৭৩)। ঢাকার বিভিন্ন পত্রিকায় উমেশচন্দ্র বসুর বেশ কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। ঢাকার পত্রিকা 'ধূমকেতু'তে (১৯০৪-৫) উমেশচন্দ্র বসুর কয়েকটি রচনা আত্মপ্রকাশ লাভ করে। যেমন–– 'ইন্দ্র' (প্রবন্ধ), 'আহ্বান' (প্রবন্ধ), 'কুমারসম্ভব (কবিতা), 'নব্যবঙ্গের বাঙ্গালীরা' (প্রবন্ধ) 'আমি তুমি ও সে' (প্রবন্ধ), 'ভবের গাজন' ও 'ভবের চড়ক' (প্রবন্ধ), 'প্রাচীন মিশর' (প্রবন্ধ) ইত্যাদি।

'বান্ধব' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক দীনেশচরণ বসু (১৮৫১–১৮৯৮) কিছুদিন 'ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপেও জড়িত ছিলেন। তাঁর রচিত 'কবিকাহিনী' 'মানসবিকাশ' 'মোহিনী প্রতিমা' প্রভৃতি গ্রন্থ ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়।

স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। তিনি ১২৬১ সালের ৪ঠা মাঘ ঢাকা ভাওয়ালের জয়দেবপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২৫ সালে পরলোক গমন করেন। তিনি ঢাকা নর্মাল স্কুল ও ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষালাভ করেন এবং দীর্ঘকাল ভাওয়াল রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে তিনি বিপর্যস্ত হন, জন্মভূমি থেকে কর্মচ্যুত ও বিতাড়িত হন। অবশেষে ভাওয়াল রাজার বিরুদ্ধে বেনামীতে 'মগের মুল্লুক' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে মানহানির মামলায় জড়িত হন। তাঁর রচিত 'কুমকুম', 'প্রসূন', 'কস্তুরী', 'ফুলরেণু',

---

২৫. সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৭৭।

'প্রেম ও ফুল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বাসনাবিল কবি হিসেবে গোবিন্দচন্দ্র দাস বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর কবিত্ব উৎসারিত হয়েছে 'যৌবন সঙ্গিনী পত্নীর প্রেমে' ও পরবর্তীকালে এই 'প্রেম স্বপ্নের স্মৃতিপথে'।[২৬]

ঢাকা জুবিলী স্কুলের শিক্ষক নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৯০৪) কালীপ্রসন্ন ঘোষের সমসাময়িক সাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ঢাকার বিক্রমপুরের পশ্চিমপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি নিজেকে আমৃত্যু শিক্ষকতায় নিয়োজিত রাখেন। ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য তিনি পৈতৃক সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হন। ঢাকায় বিভিন্ন সমাজসংস্কার-মূলক আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষাসভা' এবং 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা'র সম্পাদক ছিলেন। শেষোক্ত সভার মুখপত্র 'মহাপাপ বাল্য বিবাহ' পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। তিনি 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' (তিন খন্ডে সমাপ্ত) গ্রন্থ প্রণয়ন করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। এটি বিভিন্নবিষয়ক সঙ্গীতের একটি সংকলন গ্রন্থ। তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশে'র মন্তব্য ঃ

> "সঙ্গীতমুক্তাবলী, গীতগ্রন্থ প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া নবকান্তবাবু বঙ্গীয় সাহিত্যবিশারদ কবিকুলের যে লুপ্তকীর্তি উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বীয় কীর্তি চিরদিন অটুট থাকিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।" (১৬ আশ্বিন, ১৩১১)।

'সঙ্গীতমুক্তাবলী' গ্রন্থে শুধু সঙ্গীতই সঙ্কলিত হয়নি, সঙ্গীতকারদের জীবনীও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম পূর্ণাঙ্গজীবনী এ-গ্রন্থে স্থান পায়। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এছাড়াও মহাত্মা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁর দুই ভ্রাতা নিশিকান্ত ও শীতলকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী রচনা করেন। ঢাকায় ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আরও দুটি গ্রন্থ "ঢাকা জেলার সংক্ষিপ্ত ভূগোল ও ঐতিহাসিক বিবরণ" এবং 'বাকেরগঞ্জ জেলার বিবরণ।' 'স্ত্রীলোকের রচনাবলী' নামে তাঁর একটি গ্রন্থ ১৮৭১ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অনুজ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯১০) একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'The Jatras or the popular Dramas of Bengal' শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। বিদেশ যাত্রার পূর্বে অগ্রজ ভ্রাতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনিও বিভিন্ন সমাজসংস্কারকমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন। 'অবলাবন্ধব' পত্রিকায়ও তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধানে' উল্লেখ করা হয় যে,[২৭] "তাঁর রচিত নারীজাতির হীনাবস্থা— বিষয়ক একটি ও বাল্যবিবাহবিষয়ক একটি গান পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজে এককালে খুব গীত হত।"

উনিশ শতকের ঢাকার সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দীননাথ সেন (১৮৩৯-১৮৯৮)-এর নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ কালীপ্রসন্ন ঘোষের পাশাপাশি দীননাথ সেনকেও ঢাকার দর্শনীয় ব্যক্তিত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। দীননাথ সেন ঢাকার

---

২৬. সুকুমার সেন-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৮৫।

২৭. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান- ১৯৭৬, পৃঃ ২৬৪।

মানিকগঞ্জের বায়রা গ্রামের মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কর্মজীবনে প্রথমে নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি এসিষ্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর ও জয়েন্ট ইন্সপেক্টর হন এবং পরিশেষে ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন। ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি। ঢাকার বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি কয়েকটি শিক্ষাসহায়ক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। এ গ্রন্থগুলি হচ্ছে— 'শিক্ষাদান প্রণালী', 'মানসিক গণনা', 'বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' এবং 'নীতিবিজ্ঞান'। 'ভারতবর্ষীয় কুটির' নামে তিনি একটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় (৯ পৌষ, ১২৭৩) এ গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে 'এই জ্ঞানগর্ভ মনোহর গল্পটি ইংরেজী হইতে অনুবাদিত'।

সুসাহিত্যিক গিরিশচন্দ্র বসু (১৮২৬-১৮৯৮) ঢাকার বিক্রমপুরের মালখানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারি অফিসে বিভিন্ন বিভাগে ও বিভিন্ন স্থানে চাকুরী করার পর শেষ জীবনে তিনি ঢাকায় বসবাস করেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৮৮৮ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক শক্তি।' বিক্রমপুর থেকে প্রকাশিত 'জন্মভূমি' নামক এক পত্রিকায় তিনি 'সিরাজদ্দৌলা' নামে এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, 'সেকালের দারোগার কাহিনী' (১২৯৫)।

ঢাকার নর্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক পণ্ডিত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'শব্দদীধিতি' নামে একটি সুবৃহৎ বাংলা অভিধান প্রণয়ন করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। এটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম অভিধান গ্রন্থ। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় গ্রন্থের প্রশংসাসূচক সমালোচনা প্রকাশিত হয় ঃ-

"বাঙ্গালা ভাষায় যে কয়েকখানি অভিধান বর্ত্তমান আছে, তত্তাবৎ অপেক্ষা এখানি বৃহৎ। অন্যান্য অভিধানে যে সকল শব্দ অপ্রাপ্য, এমন অনেক শব্দ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধুভাষানুধ্যায়ীদিগের পক্ষে এখানি বিলক্ষণ অনুকূল হইবে।"[২৮] শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভূগোলাঙ্কুর' (১৮৬৩) সম্ভবত স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ।

উনিশ শতকে ঢাকায় একজন মহিলা কবির নাম পাওয়া যায়– বসন্তকুমারী দাসী। তাঁর রচিত 'কবিতামঞ্জরী' ১৮৬৪ সালে ঢাকা সুলভযন্ত্র থেকে প্রকাশিত হয়। এই কবি সম্পর্কে আর কোনো তথ্য জানা যায়নি।[২৯]

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে ঢাকা থেকে কয়েকটি কবিতা পুস্তকও প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয় পূর্ণচন্দ্র দত্ত রচিত প্রণয়নমূলক কবিতা গ্রন্থ 'প্রেমতরঙ্গিনী'।

১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হয় অক্রুর চন্দ্র সেন রচিত 'জলাঞ্জলি'। ১৮৯৯ সালে প্রকাশ লাভ করে কালীকুমার দত্ত রচিত 'বাবু এক ধাক্কাতে কাবু'। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় অভিযোগ করা হয় যে, 'প্রেম তরঙ্গিনী' গ্রন্থের কোনো কোনো গানে অশ্লীল মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, শেষোক্ত দুটি গ্রন্থে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়।[৩০]

---

২৮. ঢাকা প্রকাশ– ১১ আষাঢ়, ১২৭১।

২৯. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য– মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি (১৮৫৩–১৮৬৭) কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ৮৭।

৩০. গ্রাহাম শ' 'Printing in Calcutta to 1800', পৃষ্ঠাঃ ১০৩-১০৪।

ঢাকার অন্যতম ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক বঙ্গচন্দ্ররায় (১৮৩৯-১৯২২) ঢাকার পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মমন্দিরের আচার্য ছিলেন। তিনি ১৮৬৫ সালে ঢাকার পগোজ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'শুভসাধিনী' এবং মাসিক 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত চিকিৎসা বিষয়ক দুটি গ্রন্থের নাম 'চিকিৎসা মহার্ণব' এবং 'বঙ্গদত্তবৈদ্যক বঙ্গচন্দ্ররায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন বিষয়ে বক্তৃতা।' এ গ্রন্থের প্রকাশ কাল ১৮৮৪।

ঢাকার আর এক কবির নাম পাওয়া যায় ভারতচন্দ্র সরকার। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা না গেলেও আমরা তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম পাই। ১৮৬৬ সালে তাঁর রচিত 'মদন ভস্ম' কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের একটি সমালোচনা 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে—

> মদনভস্ম— শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র সরকার ইহার প্রণেতা। ইহার আয়তন ১২ পেজি ফর্মার ৬০ পৃঃ, মূল্য দুই আনা। এখানি ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত। আমরা মদনভস্ম আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। কিন্তু শ্রমানুরূপ প্রীতি লাভ করিতে পারি নাই। ইহার রচনা অসরল, ভাব অস্পষ্ট।

[ঢাকা প্রকাশ-২১ শ্রাবণ, ১২৭৩

ভারতচন্দ্র সরকারের অপর কাব্য গ্রন্থের নাম 'জানকী প্রসঙ্গ' (১২৮২)।

সমাজসংস্কারক ও স্বভাব কবি রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় (১২৩২-১৩০৪) ঢাকার তারপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন, ফলে তিনি খুল্লতাত তারকচন্দ্রের গৃহে লালিত পালিত হন। তারকচন্দ্র ছিলেন গোঁড়া কুলীন ও বহুবিবাহের পক্ষপাতী। তিনি রাসবিহারীকে অপরিণত বয়সে চৌদ্দটি বিবাহ করতে বাধ্য করেন। ২৫ বছর বয়সে তিনি পিতৃব্যের কাছ থেকে পৃথক হয়ে কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। কৌলিন্য প্রথার সমালোচনা করে তিনি অনেক গান রচনা করেন। বহুবিবাহ নিষেধ আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে 'কৌলীন্য সংশোধন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি 'কুলকীর্তন' (১২৮২) নামে একটি নাটক রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের নাম 'রমণীমোহন' কাব্য (১৮৬২), 'বল্লালী সংশোধনী' (১৮৬৮), 'বিদ্যাবিধি', 'শৈশব জ্ঞানচন্দ্রিকা' (১৮৬৭), 'সীতার বনবাস', 'সঙ্গীত তত্ত্ব' (১৮৬৩) এবং 'বিবিধ সঙ্গীত' (১৮৯৫)।

ঢাকার আরো কিছু সাহিত্যিকের সন্ধান আমরা 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় পেয়েছি। এঁদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। তবে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই কবি সাহিত্যিকদের গ্রন্থ-পরিচিতি 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার পুস্তক সমালোচনায় পাওয়া যায়। এই সমালোচনাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

> (১) রামের বনবাস-শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তি প্রণীত। ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক আনা। এখানি পদ্যময়। ইহাতে রামের বনবাস বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের বিরচিত রামায়ণ পরিত্যাগ করিয়া কেহ যে ইহা পাঠ করিবেন, আমাদিগের এরূপ ভরসা হইতেছে না।

[ঢাকা প্রকাশ- ৩১ বৈশাখ ১২৭:

(২) বালকবোধ। এখানি গদ্য পুস্তক। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় এখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০। মুল্য চার আনা।

আমরা বালকবোধের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। ইহাতে মনুষ্য শরীরের কৌশল, অগ্নিজল, বায়ু, উদ্ভিদ ও জোতিষ্ক এই কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করিয়া এক একটি প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। অবলম্বিত বিষয় কয়েকটি যেমন উৎকৃষ্ট বালকবোধের ভাষাও তেমনি সরল হইয়াছে।

[ঢাকা প্রকাশ- ১৭ কার্তিক ১২৭১]

(৩) অবলাচরিত– মানিকগঞ্জের স্কুল ডিপুটি ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল গুপ্ত মহাশয় অবলাচরিতের প্রণেতা। এখানি ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। আয়তন ১২ পেজি ফর্মার ৪৯ পৃষ্ঠা।

অবলাচরিতে কয়েকটি অসামান্য মহিলার জীবনবৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। ইহার ভাষা সরল ও মধুর। বঙ্গীয় অবলাগণ এতৎপাঠে সবিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।...

[ঢাকা প্রকাশ- ১১ ভাদ্র ১২৭৩]

(৪) সংগীতমালা– ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ দে এইখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার গুপ্তের যত্নে ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ১৬ পেজি ফর্মার দুই ফর্মা। মূল্য এক আনা। ইহাতে পরমার্থঘটিত কতকগুলি সংগীত লিখিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি সংগীত বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

[ঢাকা প্রকাশ- ১৪ বৈশাখ ১২৭৬]

(৫) তত্ত্বকুসুম (পদ্য পুস্তক)। পোগাস স্কুলের ছাত্র দ্বারকানাথ ঘোষ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। মূল্য দুই আনা, ইহাতে ধর্মসংক্রান্ত অনেকগুলি উপদেশ লেখা হইয়াছে। .. কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের লেখাটুকুতে মধ্যে ২ ছন্দপতন হইয়াছে।

[ঢাকা প্রকাশ-১২ বৈশাখ ১২৭৭]

উনিশ শতকে ঢাকার মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের অবদান যে প্রধানত পুঁথিসাহিত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো সে বিষয়ে আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে (ঢাকার কেতাবপট্টি) আলোচনা করেছি। পুঁথি রচয়িতাদের বাইরে যে কয়েকজন মুসলমান সাহিত্যিক সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন, তাঁদের মধ্যে কায়কোবাদই প্রধান। যদিও কায়কোবাদের নিবাস ছিল ঢাকার অদূরে আগলা গ্রামে, তবুও তাঁর সাহিত্যসাধনা ঢাকার তথা সমগ্র বাংলার সাহিত্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না।

উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্যসাধনায় যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা সকলে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও, তাঁদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ অবদানেই ঢাকার সাহিত্য-অঙ্গন সমৃদ্ধ হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

'বান্ধব'–'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন'

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বঙ্গদর্শন' যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, তা সর্বজনবিদিত। প্রকৃতপক্ষে, এই পত্রিকা প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্যে যেন নবযুগের সৃষ্টি হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে'র গুরুত্ব শুধু সে–কারণেই নয়, 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সমালোচনা এবং সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের একটি সুন্দর পরিমণ্ডল গড়ে উঠে। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করে যেমন অনেক সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছিল, তেমনি 'বঙ্গদর্শন'কে অনুসরণ করেও অনেক রুচিশীল পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে 'বান্ধব' অন্যতম।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) 'প্রভাতচিন্তা' (১৮৭৭), 'নিভৃতচিন্তা' (১৮৮২), 'নিশীথচিন্তা' (১৮৯৬), 'ছায়াদর্শন' (১৯১০) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে চিন্তাশীল প্রবন্ধকার হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'বান্ধব' পত্রিকার প্রকাশ। ১২৮১ সনের আষাঢ় মাসে 'বান্ধব' পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ। 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশের আগে তিনি 'নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব' (৫ ডিসেম্বর, ১৮৬৯), 'সমাজ শোধনী' (১৮৭২), 'সঙ্গীত মঞ্জরী' (১৮৭২) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে পাঠক মহলে পরিচিত হন। এ সময় তিনি ঢাকার ছোট আদালতে রেজিষ্ট্রার হিসাবে চাকুরি করতেন। ২২ বছর বয়সে ১৮৬৫ সালে ঢাকার ছোট আদালতের এই সামান্য চাকুরি দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয়। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি ঢাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েন। 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশের আগে তিনি 'শুভ সাধিনী' নামে একটি স্বল্পায়ু পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১২৮৪ সালে জয়দেবপুরে ভাওয়ালের রাজদরবারে প্রধান অমাত্য হিসাবে কাজে যোগদান করেন। তিনি ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন অর্থাৎ ১২৮৩ সাল পর্যন্ত 'বান্ধব' পত্রিকা নিয়মিত তিন বৎসর প্রকাশিত হয়। 'বান্ধবে'র মুদ্রণকার্য তদারক করতেন কালীপ্রসন্ন বাবুর মাতুল-ভ্রাতা ফুলচন্দ্র বসু। ফুলচন্দ্র বসুর মৃত্যু এবং ভাওয়ালের রাজদরবারে কালীপ্রসন্ন ঘোষের যোগদানের কারণে 'বান্ধব' পত্রিকা ১২৮৪ সালে প্রকাশিত হয়নি। এ-সময় সারদারচণ ঘোষ 'বান্ধবে'র কর্মাধ্যক্ষ সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন[১]। সারদাচরণ বাবুর সহযোগিতায় ১২৯৫ সালে 'বান্ধবে'র চতুর্থ বর্ষের সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষের কর্মস্থল ঢাকার বাইরে মফস্বল হওয়ায় পত্রিকাটি রচনা ও অর্থ উভয় সংকটের সম্মুখীন হয়। ১২৮৬ সালে কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি। ১২৮৭ থেকে ১২৮৯ পর্যন্ত 'বান্ধব' নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে পুনরায় বন্ধ

১. অমৃতলাল চক্রবর্তী-বান্ধব স্মৃতি, 'মোহাম্মদী', আষাঢ়, ১৩৫৯ (পৃঃ ৫৫৬)।

হয়ে যায়। ১২৯১ সালে 'বান্ধব' আবার নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১২৯২-৯৩ সালে ২৪টি সংখ্যার পরিবর্তে মাত্র ১২টি সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। ১২৯৪ সালে মাত্র পাঁচটি সংখ্যা এবং ১২৯৫ সালে মাত্র দু'টি সংখ্যা বেরিয়ে 'বান্ধবে'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 'বান্ধব' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ সারদাচরণ বাবুর মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর স্থলে যোগ্যতর কোনো লোক খুঁজে পাননি।

'বান্ধব' পুনরায় নব-পর্যায়ে ১৩০৮-এর ফাল্গুন থেকে ১৩১৩-এর ভাদ্র পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ঢাকার সাহিত্যিক উমেশচন্দ্র বসু নব পর্যায়ের 'বান্ধবে'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

১২৮১ সালের আষাঢ় মাসে 'বান্ধব' পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রকাশের পরই সুধী মহলের মধ্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনায় 'বান্ধব' পত্রিকার অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হয়। এই পত্রিকাগুলো হচ্ছে- 'মধ্যস্থ' (১২৮১ আষাঢ়), 'এডুকেশন গেজেট' (শ্রাবণ (১২৮১), 'সাপ্তাহিক সমাচার' (ভাদ্র, ১২৮১), 'বিদ্যোদয়' (জুলাই, ১৮৭৪), 'হালিশহর পত্রিকা' (ফাল্গুন, ১২৮১), 'জ্ঞানাঙ্কুর' (অগ্রহায়ণ ১২৮১), 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' (শ্রাবণ ১২৮১), 'ভারত সংস্কারক' (আষাঢ় ১২৮১), 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (শ্রাবণ, ১২৮১) এবং 'বঙ্গদর্শন' (শ্রাবণ ১২৮১)। 'বান্ধব' পত্রিকার এই সমালোচনাগুলোর মধ্যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সমালোচনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

> "ইহা একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র। পশ্চিম বাঙ্গালায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্ব বাংলার সেরূপ ছিল না। ঢাকা হইতে এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের প্রকাশারম্ভ হইয়াছে দেখিয়া, আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। পত্র আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে অন্য কোন পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে বাংলার একখানি সর্বোৎকৃষ্ট পত্রমধ্যে গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।"

শুধু তাই নয়, ১২৮২ সালের চৈত্রমাসে 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ' প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন ঃ

> "যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্যদর্শন প্রভৃতি দ্বারা তাহা পূরিত হইবে, অতএব, বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই।"

'বান্ধব' পত্রিকার ১ম সংখ্যায় সম্পাদক পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, "বাংলার প্রতি যাহাতে বাঙ্গালীর অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং স্বদেশ বলিয়া যাহাতে দেশীয়দিগের মনে মমতার সঞ্চার হয়, অবশ্যই তদর্থে ইহার নিয়ত চেষ্টা থাকিবে।" এ-উক্তি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্বাদেশিকতাই ছিল 'বান্ধবে'র মূল সুর। তাই, 'বান্ধব' পত্রিকায় বাংলার ইতিহাস ও বাঙ্গালি সংস্কৃতি বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ-জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ ১-বঙ্গের ইতিবৃত্ত ঘটিত কথা (১ম খণ্ড), ২-প্রসিদ্ধ তিতুমির (খণ্ড ৬), ৩-বঙ্গে দ্বাদশ ভৌমিক (৬), ৪-রাজা

কংসনারায়ণ (৬–৭), ৫– বাঙ্গালীর সিংহল বিজয় (৯), ৬– বঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা (৫), ৭– দিনাজপুরের প্রস্তর স্তম্ভলিপি (৬), ৮– বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন (১১), ৯–কবিগান (২), ১০– আহার ও বাঙ্গালী (১)। এছাড়া, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ এ–পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যেমন ঃ

১– বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ বিষয়ের প্রস্তাব (৬ষ্ঠ খন্ড), ২– কাব্য–কবি–বাঙ্গালা কবি (৫), ৩– গোবিন্দ দাস (২), ৪– রামেশ্বর ভট্টাচার্য (৬), ৫– সদানন্দ দাস (৬), ৬– বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিসম্প্রদায় (৭), ৭– ঘনরাম চক্রবর্তী (৫), ৮– বঙ্গভাষার উচ্চারণের অভিধান (৪)।

'বান্ধব' পত্রিকার আর একটি বিশিষ্টতা ছিল যে, এতে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার অনুসরণে নিয়মিত সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। যেমন— 'সমালোচক ও সমালোচনা' (১ম), 'কাব্য ও পাঠক (৬), 'লেখক পাঠক ও সমালোচক' (৭), 'গদ্যবাক্য ও ছন্দ' (৮)।

'বান্ধব' পত্রিকার ১৩৮১-র মাঘ সংখ্যায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ রচিত 'নীরব কবি' শীর্ষক আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাহিত্য সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে 'বান্ধব' পত্রিকার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ' ১২৮১ অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির রচয়িতার নাম ছিল না, কিন্তু সেখানে লেখা ছিল 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত'। ১২৮১-র মাঘ সংখ্যা 'বান্ধবে' রবীন্দ্রনাথের 'হোক্ ভারতের জয়' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির শেষে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ নাম মুদ্রিত ছিল না, শুধু ('র') লেখা ছিল এবং পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়, হিন্দুমেলা উপলক্ষে কবিতাটি রচিত। পণ্ডিতগণ এবিষয়ে নিঃসংশয় হয়েছেন [২] যে, ১২৮১-র ১লা ফাল্গুন (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) তারিখে হিন্দুমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি আবৃত্তি করেন। সেকালে খুব কম বাংলা মাসিক পত্রিকাই নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হতো সেকারণেই ১লা ফাল্গুন তারিখে পঠিত কবিতা মাঘ সংখ্যা 'বান্ধবে' প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ ফাল্গুন মাসের কোনো এক সময়ে 'বান্ধব' বাজারে আত্মপ্রকাশ লাভ করে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ-নামাঙ্কিত না হলেও তাঁর আদ্যক্ষর-চিহ্নিত এই কবিতা রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বনামে লিখিত কবিতা। এটি জনসমক্ষে পঠিত তাঁর প্রথম কবিতা। এ সম্পর্কে সমকালীন 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি নিম্নরূপ ঃ

> "প্রায় ৩০০ হিন্দু ভদ্রলোক মেলার স্থলে উপস্থিত হন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র একটি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিয়া উহা মুখস্থ পাঠ করিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করে।"[৩]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সমকালীন পূর্ববাংলার আর একটি পত্রিকা— 'অমৃতবাজার পত্রিকা' 'বান্ধবে'র অনুরূপ গৌরবের অধিকারী হয়। উক্ত পত্রিকার ১২৮১ সালের ১৫

২. প্রশান্তকুমার পাল-রবিজীবনী ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩৪-৩৫।

৩. রবিজীবনী, ১ম খন্ড থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৩৪।

ফাল্গুন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণ নামসহ 'হিন্দুমেলায় উপহার' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। 'বান্ধব' পত্রিকায় 'হোক ভারতের জয়' কবিতাটির প্রকাশ বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল মন্তব্য করেন 'বান্ধব সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গে ঠাকুর বাড়ির দীর্ঘকালীন সম্পর্ক ছিল, তাই হিন্দুমেলায় কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটির জন্য সেটি সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না'।[৪]

১২৮১ র মাঘ সংখ্যা 'বান্ধব' পত্রিকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়— 'নীরব কবি'। প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি কবি ও কবিতা সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা তখন খুব কমই রচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি এই প্রবন্ধ এবং পরবর্তীকালে বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙালী কবি কেন' (পৌষ. ১২৮২) প্রবন্ধের প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি ১২৮৭-র ভাদ্র সংখ্যায় 'বাঙ্গালী কবি নয়' এবং আশ্বিন সংখ্যায় 'বাঙালী কবি নয় কেন' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে প্রবন্ধ দুটি সংশোধিত আকারে 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' নামে 'সমালোচনা' (১৮৮৮) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের এ প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রবন্ধের 'নীরব কবি' শিরোনামটি চিরকালের জন্য সংযুক্ত হয়ে আছে।

১২৮৩ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বান্ধবে' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সরোজিনী' নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'জ্বল জ্বল চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয় এবং কবিতাটি সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হয় ঃ

> "আমরা এই নাটকখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে আর কিছু না বলিয়া ইহার দুইটি কবিতা পাঠকবর্গকে উপহার দিব। আমাদিগের নিশ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি তাহা পাঠ করিবেন তিনিই গ্রন্থকারকে সুকবি বলিয়া প্রশংসা করিবেন, সহৃদয় বলিয়া ভালবাসিবেন এবং স্বদেশবৎসল বলিয়া তাঁহার নিকট শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার বশে বদ্ধ হইবেন।"

সমালোচক কবিতাটির প্রকৃত রচয়িতা কে সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে এখানে যে মন্তব্য করা হয় তা রবীন্দ্র-সমালোচনার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কবিকাহিনী' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। 'বান্ধব' পত্রিকায় মাঘ ১২৮৫ সংখ্যায় 'কবিকাহিনী'র একটি বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থের প্রথম প্রকাশিত সমালোচনা। 'বান্ধব' পত্রিকার এই গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষেরও প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনিই প্রথম রবীন্দ্রসমালোচকের আসন অধিকার করেন। সমালোচনাটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে গুরুত্বপূর্ণ এবং দুষ্প্রাপ্য বিধায় এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করা গেল ঃ

> "কবিকাহিনী। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

৪. তদেব, পৃঃ ২০৫।

শব্দের কবিতার শরীর গঠন, ছন্দে উহার ভঙ্গি কিংবা গতির ঠাম, কিন্তু ভাগবত রসই উহার প্রাণ। নিম্নলিখিত পদাবলীতে কবিতার শব্দ আছে ও ছন্দ আছে, কিন্তু প্রকৃত কবিতা নাই। যথা—

"আয়লো অলি, সবায় মিলি
কুসুম তুলি, মনের সুখে।"

অথবা-

"বকুল বনে, আকুল মনে
দুকূল উড়ায় গোকুল চোরে।
বাজলো বাঁশী, গলায় ফাঁসি,
ঘরে আসি কেমন কো'রে।"

এই ললিত পদাবলীতে শ্রুতিরঞ্জন হয়, কিন্তু মানব-হৃদয়ের অন্তঃস্থল কখনও স্পৃষ্ট কিংবা আলোড়িত হয় না। বাঙ্গালি, দুর্ভাগ্যবশত, তরলমতি বালিকাদিগের মতো, এইরূপ পদাবলীরই ভক্ত এবং এই নিমিত্তই এদেশে ঈশ্বর গুপ্ত ও হরিশ মিত্র প্রভৃতি ললিতপদ-ব্যবসায়িদিগের এত আদর ছিল। আর এক শ্রেণীর পাঠক ললিতপদ অপেক্ষা পদ-বিন্যাসের মুন্সিয়ানা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। তাঁহারা "আয়লো অলি কুসুম তুলি" শুনিবার জন্য অধীর হন না, এবং বকুল-বনেও দুকুল উড়াইতে ভালোবাসেন না। তাঁহাদের রুচি 'নিপট কপট শঠ লম্পট ঝম্পটে।' দাশু রায় তাঁহাদিগের কালিদাস, গোবিন্দ অধিকারী তাঁহাদিগের জয়দেব এবং বর্তমান কালের যাত্রাওয়ালাবর্গ তাঁহাদিগের কবিসম্প্রদায়। এই তিন শ্রেণীর পাঠক রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনীতে অণুমাত্রও সুখানুভব করিবেন না। কিন্তু যাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন একখানি আভরণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহাতে যথার্থই কবিতা আছে। যে কবিতা ঘনান্ধ নভোমণ্ডলে দামিনীর মত রূপের ছটায় নয়ন ধাঁধা দেয়, রবীন্দ্রনাথের লেখায় সে কবিতা দৃষ্ট হইবে না। যে কবিতা প্রগল্‌ভা রসিকার মত আপনার ভারে আপনি দুলিয়া পড়ে, ইহাতে তাহার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে না। কিন্তু যে কবিতা, শিশিরসিক্ত কমল-কলির মত কথা না কহিয়াও মনুষ্য-হৃদয়ের সহিত নীরবে কথোপকথন করে- যে কবিতা ফোটে ফোটে হইয়াও ফোটে না, অথচ অপরিস্ফুট সৌন্দর্যে মনঃ প্রাণ কাড়িয়া লয়, এই কবি-কাহিনীর প্রায় সর্বত্রই সেইরূপ প্রীতিময়ী পবিত্র কবিতা সুরুচিসম্পন্ন পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে। এদেশের কত সহস্র কবিই ভালবাসা প্রসঙ্গে কত সহস্র কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু কবি কাহিনীতে অতি অল্প কএকটি পংক্তিতে ভালবাসা কিরূপ বর্ণিত ও সুচারুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করুন।

"একি দেবি কল্পনা, এত সুখ প্রণয়ে যে
আগে তাহা জানিতাম না! ত!
কি এক অমৃতধারা ঢেলেছ প্রাণের পরে
হে প্রণয় কহিব কেমনে?
অন্য এক হৃদয়েরে হৃদয় কর গো দান,

সে কি এক স্বর্গীয় আমোদ।
এক গান গায় যদি, দুইটি হৃদয়ে মিলি
দেখে যদি একই স্বপন,
এক চিন্তা এক আশা, এক ইচ্ছা দুজনার
একভাবে দুজনে পাগল,
হৃদয়ে হৃদয়ে হয়, সে কি গো সুখের মিল,
এজনমে ভাঙ্গিবে না তাহা।
আমাদের দুজনের হৃদয়ে হৃদয়ে দেবি,
তেমনি মিশিয়া যায় যদি—
একসাথে এক স্বপ্ন দেখি যদি দুইজনে
তা হইলে কি হয় সুন্দর!
নরকে বা স্বর্গে থাকি, অরণ্যে বা কারাগারে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা হয়ে—
কিছু ভয় করি নাকো— বিহ্বল প্রণয় ঘোরে
থাকি সদা মরমে মজিয়া!
তাই হোক্— হোক্ দেবি আমাদের দুইজনে
সেই প্রেম এক কোরে দিক্।
মজি স্বপনের ঘোরে, হৃদয়ের খেলা খেলি
যেন যায় জীবন কাটিয়া।”

পুনশ্চ,
“নিশীথে একেলা হোলে, এইরূপ কতগান
বিরলে গাইত কবি বসিয়া বসিয়া।
সুখ বা দুখের কথা, বুকের ভিতরে যাহা
দিন রাত্রি করিতেছে আলোড়িত প্রায়,
প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুরুভারে
জীবন হইয়া পড়ে দারুণ ব্যথিত।
কবি তার মরমের প্রণয় উচ্ছ্বাস কথা
কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া।
পৃথিবীতে হেন ভাষা নাইক, মনের কথা
পারে যাহা পূর্ণভাবে করিতে প্রকাশ।
ভাব যত গাঢ় হয়, প্রকাশ করিতে গিয়া,
কথা তত নাহি পায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া,

বিষাদ যতই হয়, দারুণ অন্তর্ ভেদী
অশ্রুজল তত যায় শুকায়ে যেমন!”

বাবু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শোভাবর্ণনেও প্রশংসনীয়। গ্রন্থারম্ভে মহা প্রকৃতির যে একটি স্তোত্র রহিয়াছে, তাহা উচ্চশ্রেণীর কবিযোগ্য না হইলেও মনোহর; কিন্তু আমরা সেটি উদ্ধৃত না করিয়া, হিমাচল বর্ণনার আরম্ভভাগ নিম্নে তুলিয়া দিলাম। যাঁহাদিগের হৃদয় আছে এবং হৃদয়ে প্রকৃতির প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি আছে, তাঁহারা এই বর্ণনা পাঠ করিয়া মোহিত হইবেন।

“কি সুন্দর সাজিয়াছ ওগো হিমালয়,
তোমার বিশালতম শিকরের শিরে
একটি সন্ধ্যার তারা! সুনীল গগন
ভেদিয়া, তুষার শুভ্র মস্তক তোমার!
সরল পাদপরাজি আঁধার করিয়া
উঠেছে তাহার পরে; সে ঘোর অরণ্য
ঘেরিয়া হুহুহু করি তীব্র শীত বায়ু
দিবানিশি ফেলিতেছে বিষণ্ন নিশ্বাস!
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্তমান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদ চূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া এল উজ্জ্বল তুষার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে।
সিন্ধুর বেলার বক্ষে গড়ায় যেমন
অযুত তরঙ্গ কিছু লক্ষ্য না করিয়া,
কতকাল আইলরে, গেল কতকাল
হিমাদ্রি, তোমার ওই চক্ষের উপরি।
মাথার উপর দিয়া কত দিবাকর
উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া।
গম্ভীর আঁধারে ঢাকি তোমার ও দেহ
কতরাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে পোহায়ে
কিন্তু বল দেখি ওগো হিমালয় গিরি,
মানুষ–সৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে
কি দেখিছ এইখানে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে?
যা' দেখিছ যা' দেখেছ, তাতে কি এখনো
সর্বাঙ্গ তোমার গিরি, উঠেনি শিহরি?'

বাঙ্গালা কবিতার পঙ্কিল জলে এইরূপ নির্মল পুষ্প কি প্রীতিপ্রদ! ইহাতে সৌন্দর্য আছে, চ সে সৌন্দর্যে কোন অংশেও রুচির বিকার-সম্ভাবনা নাই। ইহাতে সৌরভ আছে, অথচ সৌরভে কোন অংশেও মানসিক স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা নাই। ভাষা ইহার কোথাও ভাবর্ধনের জন্য কৃত্রিম কারুকার্যে বিভূষিতা হয় নাই; এবং ভাব-লহরী ক্ষীণসলিলা স্বিনীর ক্ষীণলহরীর মত, যার পর নাই মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইলেও, কোন স্থানে া-শূন্য হইয়া পড়ে নাই। এইরূপ নির্মল কবিতায় অনুরাগ জন্মিলে বঙ্গীয় কাব্যশাস্ত্রের াগতি না হইয়া উপকার হইবে এবং যাহারা কবিতায় ইদানীং বীতস্পৃহ, তাহাদিগের মনেও কাব্যে পুনরায় প্রীতির সঞ্চার হইতে থাকিবে।

কবিকাহিনী-রচয়িতা অমিত্রাক্ষার পদ্য রচনায় মাইকেলের ন্যায় সর্বত্র মিল্টনের সরণ এবং হেম বাবুর ন্যায় সংস্কৃত কবিদিগের ছন্দানুবর্তন না করিয়া, কোন কোন ন কিয়ৎপরিমাণে এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যদি তাঁহার কবিতা সুন্দর না ত, তাহা হইলে এইরূপ পদ্য কাহারও নিকট ভাল লাগিত না। কিন্তু তাঁহার পদ্য নেই কেন না হউক, উহা কবিতার গুণে উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে।"[৫]

এ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র খসড়া ্লিপিতে সমালোচনাটির উল্লেখ করে লিখেছিলেন ঃ

> "বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বান্ধব' পত্রে এই কাব্যসমালোচন উপলক্ষ্যে লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম।'[৬]

রবীন্দ্রনাথের নাটিকা 'রুদ্রচণ্ড' ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়। 'বান্ধব' পত্রিকার আষাঢ় ৮৮ সংখ্যায় নাটিকাটির একটি সমালোচনা আত্মপ্রকাশ করে। সমালোচনাটি নিম্নরূপ ঃ

> "রুদ্রচণ্ড/ নাটিকা/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।
>
> বাবু রবীন্দ্রনাথ এদেশের একজন উদীয়মান কবি। বোধ হয়, তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িবে। তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচণ্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ। আমরা নিম্নে এই কাব্যের কতিপয় পংক্তি তুলিয়া দিলাম। আমাদিগের বোধহয় বাঙ্গালায় কেহই এমন জ্যোৎস্নাশীল, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারে না।
>
> অমিয়া! তাই যদি হ'ত পিতা, বড় ভাল হ'ত।
> কে জানে মনের মধ্যে কি হ'য়েছে মোর,
> বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি

বান্ধব, ৪র্থ খন্ড, ১০ম সংখ্যা পৃঃ ৪৬৪–৭।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– জীবনস্মৃতি। পৃঃ ২৫৬।

বর্ষিয়া সহস্রধারে অশ্রুজল রাশি,

বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ!"...[৭]

রবীন্দ্র-সমালোচনার ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন ঘোষ যে পথিকৃৎ হওয়ার দাবীদার, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ন্যায় 'বান্ধব' পত্রিকায়ও গ্রন্থ সমালোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। সমকালীন সাহিত্য বিচারে সমালোচনাগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী নাটক', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কবিকাহিনী' ও 'রুদ্রচণ্ড'- এর সমালোচনা ছাড়াও 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-সমালোচনা হচ্ছে ঃ ক- নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' (২য় খণ্ড ২-৪ সংখ্যা), খ- আধুনিক বাংলা নাটক নামে ১৩টি বাংলা নাটকের সমালোচনা (৩য় খণ্ড), গ- রজনীকান্ত গুপ্ত রচিত 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' (৩য়), ঘ- নবীনচন্দ্র সেনের 'রঙ্গমতী' (৬ষ্ঠ) ঙ-হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দশমহাবিদ্যা' (৭ম) ও চ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারটি গ্রন্থ (নব-২য়)। এছাড়াও মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের রচিত চারটি গ্রন্থের সমালোচনা 'বান্ধব' পত্রিকায় পাওয়া যায়— ১. মীর মশাররফ হোসেনের 'এর উপায় কি'? (৩য়), ২. মোজাম্মেল হকের 'কুসুমাঞ্জলি' (৭ম) ৩. শেখ ফজলল করীমের 'পরিত্রাণ কাব্য' (নব-২য়) এবং আবদুল করিমের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (নব-১ম)। 'নবনূর' পত্রিকার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'বান্ধব' পত্রিকার মন্তব্যটি নিম্নরূপ ঃ

> "নবনূরের মত সাহিত্যপত্র প্রকাশের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহাদিগের ধীরে ধীরে নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে এবং তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া পূজা করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছে। ইহা দেশের সৌভাগ্য।"[৮]

আমরা লক্ষ করেছি, 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশের আগে কালীপ্রসন্ন ঘোষের তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু, চিন্তাশীল প্রবন্ধ-লেখক হিসেবে তাঁর যে খ্যাতি, তা প্রধানতঃ 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের জন্যই। 'বান্ধব' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ রচনা করতেন। একই সংখ্যায় একাধিক রচনাও প্রকাশিত হয়েছে, কখনো স্বনামে, কখনো ছদ্মনামে। তিনি 'বান্ধব' পত্রিকায় কল্যাণভট্ট শর্ম্মণ, কালীবর বেদান্তবাগীশ, উদাসীন শ্রীল, ভোলানাথ সন্ন্যাসী, জ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। 'বান্ধব' পত্রিকায় তাঁর প্রায় ৭০টি রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর রচনার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল- (১) শক্তি (প্রবন্ধ)- ১ম খন্ড। (২) কুলবধূ- ১ম খন্ড। (৩) রাজা ও প্রজা (প্রবন্ধ)- ১ম (৪) ষটকারক (প্রবন্ধ)-১ম। (৫) লোকারণ্য (প্রবন্ধ)-১ম। (৬) মানব জীবন (প্রবন্ধ) ১ম। (৭) ব্যুৎপত্তিবাদ (প্রবন্ধ)-১ম। (৮) চোর চরিত (প্রবন্ধ)-১ম। (৯) নীরব কবি (প্রবন্ধ)-১ম। (১০) স্বার্থপরতার সূক্ষ্ম ভেদ (প্রবন্ধ)-১ম। (১১) মুখরা ভার্য্যা অথবা গৃহিণী রোগ (প্রবন্ধ)-১ম। (১২) ক্লিউপেট্রা-২য়। (১৩) প্রচলিত ও অপ্রচলিত মিথ্যাকথা-২য় খণ্ড। (১৪) ভালবাসে কে?-২য় খণ্ড। (১৫) লোকরঞ্জন-৩য় (১৬) সাধনা ও সিদ্ধি-৩য় (১৭) হর গৌরী (প্রবন্ধ)-৩য়। (১৮) অমৃত গরল-৪র্থ। (১৯) রসিকতা ও রসে

৭. উদ্ধৃত কবিতাংশ এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করা গেল না।

৮. বান্ধব, নবপর্যায় ২য় বর্ষ ভাদ্র ১৩১০। মুনতাসীর মামুন-এর 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র' ২য় খন্ড থেকে উদ্ধৃত; পৃঃ ২৬০।

কথা–৪র্থ। (২০) অমৃত (প্রবন্ধ)-৫ম (২১) চাটুকার (প্রবন্ধ)-৫ম। (২২) জীবনের ভার (প্রবন্ধ)–৫ম (২৩) বিবাহ–৫ম। (২৪) আগুন আর আকাঙ্ক্ষা–৭ম। (২৫) বিবাহ ও ব্যাকরণ রহস্য–৭ম। (২৬) চন্দ্রবদন– ৯ম খন্ড। (২৭) অযোধ্যার মন্তরা–নব–৩য় খন্ড। (২৮) কবি সুক্তি (কবিতা)–নব–৩য়। (২৯) গীতিলহরী নব–৩য়। (৩)) চাতক আর চকোর–নব–৩য়। (৩১) সীতা আর শকুন্তলা-নব–৩য়। (৩২) বৈদিক বাঙ্গালা ও বিধুমুখী ছন্দ-নব ৪র্থ। (৩৩) উপর নীচের মিলন কার্য–নব–৪র্থ।[৯]

'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রবন্ধাবলী পরবর্তীকালে পরিবর্তিত ও সংশোধিত রূপে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'বান্ধব' পত্রিকার মুদ্রণকার্য-তত্ত্বাবধায়ক সারদাচরণ ঘোষের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে, 'বান্ধব' কর্তৃপক্ষ লেখকগণকে নিয়মিত টাকা প্রদান করতো। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) এ–পত্রিকায় 'জীবন প্রভাত' উপন্যাসটি প্রকাশের জন্য ১২০০৲ টাকা পেয়েছিলেন।[১০]

'বান্ধব' পত্রিকায় ১২৮৫ সালের প্রথম দিকে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ সালে রমেশ দত্ত ত্রিপুরার এসিষ্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন। এবছরই তাঁর 'জীবনপ্রভাত' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'বান্ধব' পত্রিকায় আরও কয়েকটি উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। যেমন— (১) বিরজা– তারকানাথ বিশ্বাস (৩য় বর্ষ), (২) প্রতাপসিংহ– দামোদের মুখোপাধ্যায় (৫–৬), (৩) অভিশাপ– হরিহর শেঠ (নব-২য়)।

পূর্ববাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও উদীয়মান বেশ কিছু সাহিত্যিকের রচনা 'বান্ধব' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এঁরা হচ্ছেন নবীন সেন, শশাঙ্কমোহন সেন, কেদারনাথ মজুমদার, কৈলাসচন্দ্র সিংহ , দীনেশচরণ বসু, উমেশচরণ বসু ও সারদাচরণ ঘোষ। এছাড়াও আমরা 'বান্ধব' পত্রিকায় হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামপ্রাণ গুপ্ত, প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের রচনা প্রকাশিত হতে দেখি।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-চর্চার ইতিহাসে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও 'বান্ধবে'র একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সাময়িকপত্রকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকর্ষের দ্বার বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উন্মোচন করেন তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন 'বান্ধব' পত্রিকার মাধ্যমে। স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি যে অনুরাগ ও মমতা তাঁকে এই পত্রিকা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেই মমতা ও অনুরাগ 'বান্ধব' পত্রিকার সর্বত্র প্রতীয়মান। 'বান্ধব' তাই যথার্থই 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন'।

---

৯. মুনতাসীর মামুন রচিত 'কালীপ্রসন্ন ঘোষ (জীবনী গ্রন্থ)' গ্রন্থে 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত ৩৭টি প্রবন্ধের তালিকা রয়েছে। এখানে তার অতিরিক্ত ৩৩টি প্রবন্ধের তারিকা প্রদত্ত হল।

১০. অমৃতলাল চক্রবর্তী- বান্ধবস্মৃতি, 'মোহাম্মদী' আষাঢ় ১৩৮৯।

'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ও ঢাকার নাট্যচর্চার ধারা

ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ১৮৬০ সাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ১৮৬০ সালে ঢাকায় স্থাপিত হয় প্রথম বাংলা মুদ্রাযন্ত্র এবং প্রকাশিত হয় ঢাকার প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'নীল দর্পণ' ও ঢাকার প্রথম সাময়িকপত্র 'কবিতা কুসুমাবলী'। অনুমান করা হয় যে, ১৮৬০ সালের দিকে ঢাকায় নাট্যচর্চা বা নাট্যাভিনয়ও শুরু হয়।

১৮৬০ সালে ঢাকায় যে নাট্যাভিনয় হয়, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে, ১৮৬১ সালে ঢাকায় 'নীল দর্পণ' নাট্যাভিনয়ের একটি সংবাদ ইংরেজী 'হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। সংবাদটি নিম্নরূপ ঃ

> "The Dacca Correspondent writes... 'our native friends entertain themselves with occasional theatrical performances, and the NilDarpan' was acted on one of these occasions." [১]

'হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৮৬১ সালে 'নীল দর্পণে'র অভিনয়ের আগেও ঢাকায় নাট্যাভিনয় হয়েছে। অনুমান করা যায়, ১৮৬০ সালে ঢাকার যুবকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ঢাকায় নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হয়। এই তথ্যের ভিত্তিতে মুনতাসীর মামুন মনে করেন '১৮৬০-এর দিকে ঢাকা থিয়েটারের যাত্রা শুরু'।[২]

ঢাকার নাট্যচর্চার ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'-কে কেন্দ্র করে। 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' সম্ভবতঃ ১৮৬৫ সালে স্থাপিত হয়।

শিশির কুমার বসাক এক প্রবন্ধে প্রথম অনুমান করেন যে, ইংরেজী ১৮৬৫ সালে (বাংলা ১২৭২) ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' বা 'East Bengal Dramatic Hall' গড়ে উঠে।[৩] মুনতাসীর মামুন এই তথ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেন। তিনি অনুমান করেন ১৮৭০–৭২ সনের মধ্যে ঢাকায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে একটি স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপিত হয়।[৪] তাঁর অনুমানের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে যে, ১৮৭২ সালে ঢাকায় 'রামাভিষেক' (মনোমোহন বসু রচিত) নাটকের অভিনয়ের আগে এ রঙ্গমঞ্চে কোনো নাটক অভিনীত হয়েছিল কিনা তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বর্তমানে যেখানে জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত, 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' সেখানে স্থাপিত হয়েছিল। এর এক পাশে ছিল 'মন্ডি সাহেবের কুঠি' আর অন্যপাশে 'পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজ'। এই 'রঙ্গভূমি'র প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন মোহিনী মোহন দাস, অভয় দাস, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল চক্রবর্তী, মহেশ গাঙ্গুলী ও রাম চক্রবর্তী।

'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'র বাঁধা স্টেজ ছিল। অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় একথা উল্লেখ

---

১. Harkara-12th June, 1861; 'প্রতিভা' অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ পৃঃ ৩০৮ থেকে উদ্ধৃত।

২. মুনতাসীর মামুন– উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার পৃঃ ১০।

৩. শিশির কুমার বসাক-- ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস 'আজাদ'–১০ অক্টোবর, ১৯৬৪।

৪. মুনতাসীর মামুন– প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

করেছেন। তিনি তাঁর নাট্যদল নিয়ে নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্যে (মে-জুন ১৮৭৩) ঢাকায় পৌঁছে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাঁধা স্টেজে 'নীলদর্পণ' নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাট্যমঞ্চটি বেশ সুসজ্জিত ছিল। কলকাতা থেকে আসা চিত্রকর দিয়ে উক্ত মঞ্চে 'উত্তম চিত্র চিত্রিত' করা হয়।[৫] রঙ্গমঞ্চটি দেখতে কি রকম ছিল, সে বিষয়ে আর কিছু জানা যায় নি। তবে আমরা অনুমান করতে পারি যে, রঙ্গভূমিটি বেশ বড় ছিল এবং তাতে কমপক্ষে এক সহস্র লোকের সমাবেশ হতে পারতো। ১৮৭৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র এক সংবাদে প্রকাশ, বিখ্যাত 'রেঙ্গলার ব্যারিষ্টার' আনন্দ মোহন বসুর সম্মানার্থে 'বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভা'র উদ্যোগে 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' গৃহে একটি সভার অধিবেশন হয় এবং সে সভায় প্রায় সহস্রাধিক ভদ্রলোক উপস্থিত হন।

১৮৭২ সালের মার্চ মাসে ঢাকার নাট্যামোদী যুবকবৃন্দ 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করেন। এই আয়োজনের সংবাদ দিতে গিয়ে ১৮৭২ সনের ১৮ই মার্চ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন;

"... ঢাকার যুবকেরা উৎসাহী এবং সরলচেতা। তাঁহারা অভিনয় কার্য্যে যেরূপ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে অভিনয়টি সুচারুপূর্বক হইবার সম্ভাবনা। আমরা এক দিন ইহাদের কয়েকজন অভিনেতৃগণের অভিনয় দেখিয়াছিলাম এবং আমাদের বিবেচনায় উহা চমৎকার হইয়াছিল।... অভিনেতৃগণের মধ্যে ঢাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা আছেন। পাছে উহার দ্বারা কোন অমঙ্গল হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা উহাতে স্কুলের কোন ছাত্রকে প্রবেশ করিতে দেন নাই।"[৬]

লক্ষণীয় বিষয়, এই সংবাদের কোথাও অভিনীত নাটকটির নাম নেই। আমাদের অনুমান, নাটকটি 'নীলদর্পণ'। এই নাটকটির জন্য লং সাহেবের অর্থদন্ডের পর 'নীল দর্পণে'র মত নাটকের অভিনয় সংবাদ সগৌরবে প্রচারের দিন তখনো আসেনি। সে কারণে হয়তো এই সংবাদে 'নীলদর্পণে'র নাম করা হয় নি। তাছাড়া 'নীল দর্পণ' নাটকটি অবশ্যই স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী নয়। পক্ষান্তরে 'রামাভিষেক' নাটকের প্রদর্শনীতে স্কুলের ছাত্রদের জন্য অর্ধমূল্যের ব্যবস্থা হয়[৭]।

মনোমোহন বসুর রচিত 'রামাভিষেক' নাটক 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে ১৮৭২ সালের ৩০ শে মার্চ তারিখে অভিনীত হয়। 'রামাভিষেক' নাটক অভিনয় প্রসঙ্গে ১৮৭২ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশঃ-

"অভিনয় দেখিতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। অনেক অনেক প্রধান মুসলমান, ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট, পোগজ সাহেব এবং অন্যান্য কয়েকজন খৃষ্টান উপস্থিত হন এবং সকলেই অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব এমন আনন্দিত হন যে, তিনি বলেন, আবার যখন

৫. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮ই মার্চ, ১৮৭২; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত , পৃঃ ৭৪।

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৭৪।

৭. ঢাকা প্রকাশ- ১২ই মে, ১৮৭২।

অভিনয় হইবে তখন আমি মেম সাহেবদিগকে আসিতে বলিব।"[৮]

'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় এই নাটকের অভিনয়-সংবাদটি বিস্তৃততর। সংবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। উদ্ধৃতির প্রথমে 'পুনর্বার' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

"নাটকাভিনয়"

জঘন্য যাত্রাদির পরিবর্ত্তে এদেশে পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ আমোদক নাটকাভিনয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নাটকাভিনয় সংসৃষ্ট ব্যক্তি মাত্রই সুশিক্ষিত থাকায় এই নির্দ্দোষ আমোদ সর্ব্বসাধারণের মনস্তুষ্টিকর হইয়া থাকে সন্দেহমাত্র নাই। বিগত ১৮ই চৈত্র পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে রামাভিষেক নাটকের অভিনয় প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছে। অভিনীত নাটকখানি স্বভাবতই চিত্তচমৎকারক তাহাতে আবার অভিনেতৃক যথোচিত দক্ষতা সহকারে স্ব ২ বিষয় অভিনয় করিয়াছেন, সুতরাং এই অভিনয় সর্ব্ব-সন্তোষপ্রদ হইবে বিচিত্র কি? রাজা দশরথ ও রাজমহিষী কৌশল্যার পুত্রবাৎসল্য ও বিলাপ, রামের পিতৃভক্তি ও গাম্ভীর্য্য, লক্ষ্মণের বীরত্ব ও ভ্রাতৃভক্তি, সীতার পতিভক্তি ও পতিসহ বনগমন প্রার্থনা, কৈকেয়ীর প্রতি মন্থরার অসৎ পরামর্শ দান ও সেই কুপরামর্শে কৈকেয়ীর মনের হঠাৎ ভাবান্তরোৎপত্তি প্রভৃতি অভিনীত বিষয়গুলি স্বাভাবিকরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ২ অনেকে যাত্রাগানের সহিত নাটকাভিনয়ের তুলনা করিতেন। বোধ হয়, এক্ষণে সকলের অন্তঃকরণ হইতেই সেই ভ্রমের অপনয়ন হইয়াছে।

২য়তঃ। চিত্রপটগুলি আরও মনোরম। দেখিলে বোধ হয় যেন ঠিক সেই সময় ও সেই ২ অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে। আশু কেহই বুঝিতে পারিবেননা যে, এইগুলি চিত্রপট। বিশেষতঃ যবনিকাদ্বয় এমন নৈপুণ্যে চিত্রিত হইয়াছে যে, সাক্ষাৎই যেন অঙ্কিত স্থানগুলিকে সম্মুখবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। আর বিশেষরূপে মনোভিনিবেশ করিলে ঢাকার নদী তীরবর্ত্তী স্থানের প্রতিরূপকে প্রতিরূপ বলিয়া বোধ হয় না।

৩য়তঃ। সমবেত বাদ্যও শ্রুতিসুখকর হইয়াছিল।

প্রথমবারেই যখন এতদূর উত্তমরূপে অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন ক্রমে আরও উত্তম হইবে সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা এই অভিনয়ের উদ্যোগকর্ত্তাকে শত ২ ধন্যবাদ প্রদান করি।

[ঢাকা প্রকাশ, ২৬শে চৈত্র, ১২৭৮; ৬ই এপ্রিল, ১৮৭১]

'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'– তে 'রামাভিষেক' পরপর চার সপ্তাহ প্রতি শনিবার অভিনীত হয়। ২১ শে এপ্রিল ১৮৭২ তারিখে 'ঢাকা প্রকাশে' লেখা হয়;

'গতকল্য রঙ্গভূমিতে রামাভিষেক নাটকের চতুর্থবার অভিনয় হইয়াছে। সাধারণের নিমিত্তে এই শেষ অভিনয়।'

নাটকটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করায় কয়েক সপ্তাহ পরেই পুনরায় অভিনয়ের

---

৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়– প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।

ব্যবস্থা হয়। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা ১২ই মে ১৮৭২ তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদ পরিবেশন করে ঃ-

"গতকল্য অত্রত্য পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে রামাভিষেক নাটকের পুনর্বার অভিনয় হইয়াছে। তৎপর জামাই বারিক প্রহসনের কিয়দংশ অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া রামাভিষেকের শেষ অঙ্কটি পরিত্যাগ করা হয়। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। জামাইবারিকে পতি লইয়া বগী ও বৃন্দীর কলহ, ধৃত-চোরের রসিকতা সহকৃত উত্তর অত্যন্ত প্রীতিপদ হইয়াছে। বগীকে ঠিক একজন কলহ স্বভাবা স্ত্রীর ন্যায় দেখা গিয়াছিল, কোপনস্বভাবা সপত্নীরা অভিনয়স্থলে উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয় লজ্জিতা হইতেন। জামাই মন্ডলীর রামায়ণ ও গাজির গীত গান অত্যন্ত হাস্যেৎপাদক হইয়াছিল্। সঙ্ বাবু দর্শকমন্ডলীর কতদূর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা বলিতে পারিনা। এবার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে অর্দ্ধেক মূল্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছিল।"

ঢাকার 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয় বিশেষভাবে স্মরণীয় এই কারণে যে, এই নাট্যাভিনয়ে টিকিট বিক্রয়ের প্রথা প্রবর্তিত হয়। এর আগে সাধারণভাবে নাটক মঞ্চায়নের জন্য চাঁদা সংগৃহীত হতো এবং নাটক দর্শনের জন্য বন্ধু-বান্ধব ও গণ্যমান্য অতিথিদের নিমন্ত্রণ করা হতো। ফলে, যে কেউ ইচ্ছে করলেই নাটক দেখতে যেতে পারতেন না। যথার্থ নাট্যামোদীরা অনেকক্ষেত্রে নাটকদর্শনে বঞ্চিত হতেন। সে কারণেই ঢাকার নাট্য সমাজ টিকিট বিক্রয়ের প্রথা চালু করেন।

'রামাভিষেক' নাটক অভিনয়ের জন্য একটাকা, দুই টাকা, চার টাকা ও পাঁচ টাকার টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল। বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও টিকিট ক্রয়ের হাত থেকে রেহাই পান নি। ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট পগোজ সাহেব পাঁচ টাকা মূল্যের টিকিট ক্রয় করেন। অভিনয় শেষে তিনি বলেন যে, "অভিনয়ের টিকিট কিনতে যে পাঁচ টাকা ব্যয় হয়েছে তা তিনি সৎকার্যে লাগিয়েছেন।"

সংবাপত্রেও এই প্রথা অভিনন্দিত হয় ঃ

"আমাদের দেশে নাটক অভিনয়ের বিজ্ঞাপন প্রায় বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে হয়। যাহার ইচ্ছা সে উহা দর্শন করিতে পারে না। ঢাকার অভিনয়ে সেটি হইবে না। অভিনয় কর্তারা উহার নিমিত্ত টিকিট বিক্রয় করিবেন....। অভিনয় উৎপন্ন টাকা দ্বারা তাঁহারা দেশের সৎকার্যানুষ্ঠান করিবেন। প্রকৃত তাহারা টিকিট বিক্রয়ের প্রথা বাহির করিয়া দেশের একটি অভাব দূর করিতেছেন, তেমন সৎকার্যানুষ্ঠানের একটা প্রধান পথ বাহির হইতেছে। এরূপ অর্থ উপার্জন দ্বারা উপার্জনকারীদিগের গৌরব লাঘব না হইয়া প্রত্যুত বৃদ্ধি পাইবে।"[৯]

টিকিট বিক্রয়ের এই প্রথা প্রবর্তন বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। ১৭৯৫ সালে হেরাসিম লেবেদেফের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কলকাতায় প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হলেও বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে তা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র।

৯. অমৃতবাজার পত্রিকা-১৮ই মার্চ, ১৮৭২ ইং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

মূলতঃ ১৮৩৩-এর দিকে বাংলা নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হয়। ১৮৭২-এর ডিসেম্ব কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই যুগকে বলা হয় থাকে 'সং থিয়েটারের যুগ'। সৌখিন নাট্যশালার যুগে যে নাট্যাভিনয় হয়, তা প্রধানতঃ কোনও কোন অভিজাত বংশীয় ধনীর উৎসাহে বা সাহায্যে অনুষ্ঠিত হতো। নিমন্ত্রিত অতিথি ছ কারো সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। বৃহত্তর জনসাধারণ যে শুধু নাট্যাভিনয় দর্শ বঞ্চিত হতো তা নয়, অন্যদিকে নাট্যান্দোলন ও জনসাধারণের সঙ্গে তা যোগ-রহি ছিল। ১৮৭২ সনে কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয় যুগ-সূচনা।

ঢাকার 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে 'রামাভিষেক' নাটকের অভিনয়ে টিকিট বিক্রয় প্রথা অনুসরণ করেই কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটারে টিকিট বিক্রয় প্রথার প্রবর্তন হ এক্ষেত্রে 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' পথিকৃতের দাবীদার।

নাটক অভিনয়ে টিকিট বিক্রয়ের পেছনে লাভজনক কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ধন ব্যক্তিদের খোসামোদী না করে বা তাদের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী না হয়ে টিকিট-লব্ধ অর্থে নাটকের ব্যয় নির্বাহ ছিল এর উদ্দেশ্য। তাছাড়া এর ফলে বিভিন্ন নাট্যসমাজ নাট্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং নাটক রচনায় নাট্যকারগণও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

প্রকৃতপক্ষে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরেই বাংলা নাটকের স্বর্ণযুগের সূত্রপাত অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রল রায় প্রমুখ নাট্যকারের নাট্যচর্চা প্রধানতঃ সাধারণ রঙ্গালয়কে কেন্দ্র করেই বিকাশ প্র হয়।

১৮৭১ সালে 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার' নামে একটি নাট্যসমাজ গঠিত হয়। নাট্যগোষ্ঠী 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' গৃহটি ভাড়া নিয়ে তাঁদের নাট্য প্রচেষ্টার কাজ শুরু করে এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ব্যায়ামবীর পরেশনাথ ঘোষ, ব্যায়ামবীর শ্যামকান্ত ব রাধামাধব চক্রবর্তী, ডাক্তার রাজেশ্বর চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্র শংকর র আকমল খাঁ, ইউসুফ খাঁ প্রমুখ।[১০] 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটারে'র প্রযোজনায় উপেন্দ্র দাশ রচিত 'শরৎ সরোজিনী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী', মধুসূদ 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়।

'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'র ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা কলকাতার 'ন্যাশন থিয়েটার কোম্পানী'র বিভিন্ন নাট্যাভিনয়। ১৮৭৩ সালের মে মাসের গোড়ার দি অমৃতলাল বসু তাঁর 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানী' নিয়ে ঢাকায় আসেন এবং মাসখানেক অবস্থান করে কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। তাঁরা 'নীল দর্পণ' ও 'নব নাট অভিনয় করে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় 'নীল দর্পণ' নাটক অভিনয়ের অভিজ্ঞতার এভাবে লিখেছেন ঃ

"ঢাকা শহরে একটি বাঁধা স্টেজ ছিল। বেশী কাল বিলম্ব না করিয়া আমরা

১০. তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী– কলিকাতা ও ঢাকার নাটক ও নাট্যশালা, 'শারদীয়া স্বদেশ', ১৯৭২, পৃঃ ১৮

স্টেজে 'নীল দর্পণ' লইয়া অবতীর্ণ হইলাম। নবাব বাড়ীর ব্যান্ড ও মোহিনী বাবুর কন্সার্ট আমাদিগকে সাহায্য করিল। শহরের ছোট বড় সকলেই আমাদের অভিনয় দেখিতে আসিলেন— কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অভয় দাস, ডাক্তার কেদারনাথ ঘোষ, জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রাম্পিনী, পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট ওয়েদারল ও অন্যান্য অনেকে আসিলেন। এক রাত্রেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম।"[১১]

উক্ত নাট্যাভিনয়ের একজন দর্শক 'অমৃত বাজার' পত্রিকায় এক সপ্রশংস পত্র লেখেন— 'অভিনয় যে কতদূর সুন্দর হইয়াছিল বলা যায় না। চারি ঘন্টকাল অভিনয় দর্শন করিয়া আমাদের মনের যে কতদূর পরিবর্তন হইয়াছিল বলা বাহুল্য।'[১২]

'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারে'র অনুসরণে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'ন্যাশনাল থিয়েটার'ও এ সময় অভিনয় দেখানোর জন্য ঢাকায় আসেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ দলের সঙ্গে আসতে পারেননি এবং অর্ধেন্দু শেখর এই দল পরিচালনা করেন। কিন্তু দলের কয়েকজন অভিনেতা 'জ্বর রোগে' আক্রান্ত হওয়ায় 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র অভিনয় ঢাকায় বিশেষ জমেনি।

সম্ভবতঃ ১৮৮২-র দিকে গুন্নুবাই, আন্নুবাই ও নবারন নামে তিন বোন 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে হিন্দী নাটক মঞ্চায়নের উদ্যোগ নেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় 'ইন্দ্র সভা', 'যাদু নগর' প্রভৃতি নাটক সেখানে অভিনীত হয়। ঢাকায় মহিলাদের দ্বারা অভিনয় এই প্রথম এবং পেশাদার থিয়েটার হিসেবে এখানেও টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা হয়।

১৮৮১-র দিকে ঢাকায় কয়েকটি সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী গঠিত হয়। যেমন— 'নবাবপুর এমেচার থিয়েটার কোম্পানী', 'তাঁতীবাজার থিয়েটার কোম্পানী'। বিভিন্ন পাড়া বা অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন নাট্যসমাজের মধ্যে এ সময়ে একটা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। আঞ্চলিক পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই প্রধানতঃ তাঁরা নিজেদের এলাকায় অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে বিভিন্ন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ফলে 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' দীর্ঘদিন প্রায় অব্যবহৃত থাকে। তাছাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারের অভাবেও 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' গৃহটি জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ১৮৮৪ সালের দিকে সে রঙ্গভূমি সংস্কারের উদ্যোগ দেখা যায়। এ বিষয়ে 'ঢাকা প্রকাশে' দুটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ঃ-

(১) 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহের কার্যনির্বাহক কমিটি গত বুধবারের সভায় অবধারণ করিয়াছেন যে, ৮০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উক্ত গৃহের জীর্ণ সংস্কার করা হইবে এবং পুনরায় তথায় একখানি নাটকের অভিনয় হইবে। অভিনয়ার্থ 'উত্তর চরিত' নাটক মনোনীত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহটি ঢাকার টাউন হল, অধিকাংশ সভা সমিতিই প্রায় তথায় অধিবিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা রক্ষা করার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।'[১৩]

(২) 'এখানে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য লোক পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহে পুনরায় নাট্যাভিনয়

---

১১. বিপিন বিহারী গুপ্ত-পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়, পৃঃ ১২৯।
১২. অমৃতবাজার পত্রিকা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩।
১৩. ঢাকা প্রকাশ- ১৬ই বৈশাখ, ১২৯১।

করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এবার 'উত্তর রামচরিত' নাটক অভিনয় হইবে অবধারিত হইয়াছে। ঢাকায় সাধারণ সভা সমিতির অধিবেশন করিতে হইলেই 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'র প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠাতৃদের অমনোযোগে সম্প্রতি উহার বিলোপদশা আসন্নবর্তিনী। পুনরায় নাটকাভিনয় উপলক্ষে যদি গৃহটির পুন:সংস্কার হয়— দীর্ঘস্থায়িতার উপায় হইতে পারে, তাহা হইলে নাট্যামোদের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার একটি মহোপকার হয়; বলা বাহুল্য।'[১৪]

উনিশ শতকের শেষ দিকে 'ক্রাউন থিয়েটার' নামে একটি পেশাদারী নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারাই নাকি 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'র পুরোনো হলগৃহটি ভেঙ্গে নতুন গৃহ তৈরী করেন। এই গৃহটি 'নাটকঘর' নামে পরিচিত হয়। ১৮৯৮ সালে ঢাকায় যখন প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়, তখন সে অধিবেশন এই নাটকঘরে অনুষ্ঠিত হয় এবং অনুষ্ঠানের জন্য নাট্যগৃহটি সুসজ্জিত করা হয়। 'ঢাকা প্রকাশ' তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিল ঃ

"... অত্রত্য নাটকঘর প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। কয়েকখান পর-ছত্র দিয়া উহার পূর্ব দক্ষিণে আরও কতকটা বাড়ান হইয়াছে। রঙ্গিন পত্র নিশান পুষ্পপত্রাদি দ্বারা উহা সাজান হইয়াছিল। এই গৃহ সজ্জাতে ঢাকার শিল্পগৌরব কিছু প্রকাশ করিলে অন্ততঃ দরজাটা একটু ভালরূপ প্রস্তুত করিলে সুখের কথা হইত।"

'ক্রাউন থিয়েটার' প্রথমে স্থানীয় অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয়ের চেষ্টা করেন। পরে তারা কলকাতা থেকেও অভিনেত্রী নিয়ে আসেন। পুরুষ এবং মহিলা অভিনেতা-অভিনেতৃদের নিয়ে অভিনীত নাটক বিশেষ জনপ্রিয় হয়। কিন্তু, ক্রাউন থিয়েটারে নাট্যাভিনয় প্রায় সারা রাত ধরে চলত বলে ঢাকার রুচিবান নাগরিকেরা এর বিশেষ সমালোচনা করে। রঙ্গভূমির দক্ষিণে অবস্থিত পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ, পূর্বদিকে অবস্থিত ঢাকা ব্যাংকের সাহেব এবং ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল মন্ডী সাহেব স্বাস্থ্য ও শান্তিভঙ্গের কারণে এই নাট্যাভিনয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। পরে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট রাত এগারটা পর্যন্ত অভিনয়ের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেন। ফলে 'ক্রাউন থিয়েটারে'র পসার অনেক কমে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যে তারা এই নাট্যগৃহটি ইসলামপুরে স্থানান্তরিত করেন। এ ভাবেই 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'র অস্তিত্ব লোপ পায়।

ক্রাউন থিয়েটারের ব্যবসা যখন বেশ জমে উঠে তখন আর একটি থিয়েটার কোম্পানী ঢাকার নাট্যাভিনয়ের ব্যবসা শুরু করে, তার নাম 'ডায়মন্ড জুবিলী থিয়েটার'। ক্রাউন ও ডায়মন্ড উভয় থিয়েটারই ছিল পেশাদার থিয়েটার দল। এদের দুয়ের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা ছিল। যার ফলে উভয় কোম্পানী নতুন নতুন অভিনেত্রী আমদানী এবং আকর্ষণীয় নাচ প্রদর্শন বিষয়ে বিশেষ তৎপর হয়। বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত ঢাকায় এই পেশাদারী থিয়েটার টিকে ছিল।

আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ঢাকার নাট্যচর্চার ইতিহাস প্রণয়ন নয়। মূলত 'পূর্ববঙ্গ

১৪. ঢাকা প্রকাশ-১৪ পৌষ, ১২৯১

রঙ্গভূমি' কে কেন্দ্র করে ঢাকায় নাট্যচর্চা বা নাট্যাভিনয়ের যে ধারার সৃষ্টি হয় তার পরিচয় তুলে ধরাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার পর এই স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে অথবা এর বাইরে অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে সৌখিন ও পেশাদার নাট্য-গোষ্ঠী নাট্যাভিনয়ের যে আয়োজন করে তা ঢাকার সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারদের পাশাপাশি ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের নাট্যকারদের নাটক অভিনয়ের যে কয়েকটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে তার মূল্যও কম নয়। এ-প্রসঙ্গে 'ঢাকা প্রকাশে'র ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। 'ঢাকা প্রকাশ' ঢাকার থিয়েটারে পূর্ববঙ্গবাসীর নাটক অভিনীত হওয়া উচিত বলে মনে করত। উক্ত পত্রিকায়, এ বিষয়ে মন্তব্য করা হয়–

> "ঢাকার ক্রাউন থিয়েটারে তবু পূর্ববঙ্গবাসীর রচিত গ্রন্থের অভিনয় দেখা যায়; কিন্তু 'ডায়মন্ড' এ বিষয়ে একেবারে নির্বাক। আমরা অযথা প্রশংসার পক্ষপাতী নহি; কিন্তু যাহার যেটুকু প্রাপ্য সেটুকু দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত মনে করি না। . . . পূর্ববঙ্গের রঙ্গালয় পূর্ববঙ্গবাসীর অর্থেই পুষ্ট, পশ্চিম বঙ্গবাসীর নহে। অতএব যদি উহা দ্বারা পূর্ববঙ্গবাসীর কোন দিকেই কোনরূপ উন্নতি না হইল, তবে বারাঙ্গনার ভাব বিলাস দেখিতে বর্তমান শিক্ষিত সমাজ খুব আগ্রহান্বিত হইবেন, একথা যেন তাহারা স্বপ্নেও না ভাবেন।"[১৫]

উনিশ শতকে ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিকে' কেন্দ্র করে নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হলেও এই রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার আগেই ঢাকায় রচিত হয়েছে 'নীল দর্পণে'র মতো মহৎ নাটক। পরবর্তীকালে হরিশচন্দ্র মিত্র, হরিহর নন্দী প্রমুখ কয়েকজন নাট্যকার প্রহসন রচনায় খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু ঢাকার নাট্য আন্দোলনে এদের প্রত্যক্ষ কোনো অবদান ছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ, এ নাটক বা প্রহসনগুলির সামাজিক মূল্য যাই থাক না কেন সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ ছিল না।

১৫. ঢাকা প্রকাশ- ১লা আগষ্ট, ১৯০৯।

উনিশ শতকে ঢাকার মুদ্রণ ও প্রকাশনা

আমাদের দেশে যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজ অমাত্য, সেনাপতি বা কোনো ধনবান ব্যক্তি। মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের পরে পৃষ্ঠপোষকের রূপ বদলে গেল। হস্তলিখিত পুঁথির বদলে সাহিত্যের বাহন যেমন হলো মুদ্রিত গ্রন্থ, তেম সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হলো প্রকাশক ও মুদ্রাকর। সে যুগে প্রকাশক ও মুদ্রাকরদে পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য যে বিকাশলাভের বিশেষ পথ খুঁজে পেয়েছিল, সে ক অনস্বীকার্য। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তাই মুদ্রণ ও প্রকাশনার কথা একা উল্লেখযোগ্য বিষয়।

বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম স্থাপিত হয় ১৭৭৮ সালে। হুগলীতে এ ছাপাখানা প্রতি করেন এ্যান্ড্রুজ নামে একজন ইংরেজ। ১৭৭৮ সনেই হ্যালহেড রচিত "A Gramma of the Bengal Language" ছাপা হয়। ইংরেজীতে রচিত বাংলা ভাষার এ ব্যাকরণে প্রথম বাংলা হরফ মুদ্রিত হয়। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষ প্রয়োজনে এ গ্রন্থ রচিত। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ইংরে সিভিলিয়ান চার্লস উইলকিন্সকে বাংলা হরফ তৈরীর অনুরোধ জানান। পঞ্চানন কর্মকারে সহায়তায় উইলকিন্স ছেনিকাটা বাংলা হরফ তৈরি করেন।

উনিশ শতকের প্রথম দু'তিন দশকে বাংলাদেশে কয়েকটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ ১৮৫২ সালে সমাচার দর্পণে (২২ শে জানুয়ারি সংখ্যায়) প্রকাশিত এক সংবাদে জা যায় যে, তখন কলকাতায় দেশীয় মালিকের পরিচালনাধীনে ১১টি ছাপাখানা ছিল ঢাকায় প্রধান বাংলা মুদ্রাযন্ত্র 'বাঙ্গালা যন্ত্র' স্থাপিত হয় ১৮৬০ সনে। ইতোপূর্বে ১৮ সালে Kattra Press নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মুদ্রাকর ছিলে স্যামুয়েল বোস্ট। ১৮৫৬ সালের গোড়ার দিকে ঢাকায় আর একটি ইংরেজি মুদ্রা স্থাপিত হয় এবং এই যন্ত্রালয় থেকে ঢাকার প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিকপত্র Dacca Nev (২৬শে এপ্রিল ১৮৫৬) প্রকাশিত হতে থাকে। 'বাঙ্গালা যন্ত্র' পূর্ববঙ্গে স্থাপিত প্রথম বাং মুদ্রাযন্ত্র নয়। ১৮৪৭-৪৮ সালে রংপুরে 'বার্তাবহ যন্ত্র' স্থাপিত হয় এবং এ যন্ত্রেই মুদ্রি হয় পূর্ববঙ্গের প্রথম সাময়িকপত্র 'রংপুর বার্তাবহ'।

উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় যে কয়েকটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল, নি তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত করা গেল।

১৮৬০ সালে ঢাকায় বাঙ্গালা যন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের আগে ঢাকায় এই মুদ্রাযন্ত্রের কাজ শুরু হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন।[২] কিন্তু অনুমানের সপক্ষে কোনো প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

---

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম ভাগ) ২য় সং, ১৩৪৪, পৃঃ ৭৫-৭৬

২. হেমলতা সরকার, 'স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র', কলিকাতা, ১৯১৫, পৃঃ ৪৩৭।

বাঙ্গালা যন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ব্রজসুন্দর মিত্রের নাম বিশেষভাবে জড়িত। ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তাঁর অবদান প্রচুর। ধর্মশিক্ষা বিস্তার এবং বিভিন্ন সংস্কার কার্যে ব্রতী হয়ে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের অভাব উপলব্ধি করেন। ভগবানচন্দ্র বসু (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা) ও রাজকুমার বসুর সহযোগিতায় তিনি ঢাকায় 'বাঙ্গালা যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

বাঙ্গালা যন্ত্রের কার্যালয় দীর্ঘকাল ব্রজসুন্দর মিত্রের আরমানীটোলাস্থ্ বাড়িতে ছিল। এ মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় নি। হেমলতা সরকার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ—

> "ব্রজসুন্দর ও তাঁর বন্ধুগণ যখন এই মুদ্রাযন্ত্রটি ক্রয় করেন, তখন দেশের লোকেরা তাঁহাদিগকে অনেক নিন্দা করিয়াছিল। ভদ্র-লোকের সন্তান হইয়া ইঁহারা এমন দুষ্কার্য করিলেন বলিয়া বড়ই বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল।"[৩]

গিরিজাকান্ত ঘোষের মতে বাঙ্গালা যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র, ভগবানচন্দ্র বসু ও কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়।[৪]

বাঙ্গালা যন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ১৮৬০ সালে এই যন্ত্রে ৩টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়– (১) কবিতা কুসুমাবলী (মাসিকপত্র)– মে, ১৮৬০, (২) মনোরঞ্জিকা (মাসিকপত্র)– জুলাই ১৮৬০ এবং (৩) নবব্যবহার সংহিতা (মাসিকপত্র)– আগষ্ট ১৮৬০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙ্গালা যন্ত্রের নাম দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ-এর পাশে স্থান পায়। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই নাটকটি ১৮৬০ সালেই বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। নীলদর্পণ মুদ্রণকালে দীনবন্ধু মিত্র বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে নিয়মিত যেতেন এবং সেখানে অনেক সময় অতিবাহিত করতেন। 'ঢাকা প্রকাশ' সে সময়ের কথা স্মরণ করে লিখেছিল—

> "যৎকালে দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ মুদ্রাঙ্কণ করেন, তখন আমাদিগের যন্ত্রালয়েই অনেক সময় যাপন করিতেন এবং বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিতেন।"[৫]

'কবিতাকুসুমাবলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। তাঁব প্রায় ৬০টি কবিতা 'কবিতাকুসুমাবলী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। ১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর কবিতাবলী "সদ্ভাবশতক অর্থাৎ সদ্ভাবপূর্ণ কবিতাকলাপ" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'কবিতাকুসুমাবলী' পত্রিকার আর একজন নিয়মিত লেখক হরিশচন্দ্র মিত্র বাঙ্গালা যন্ত্রের কম্পোজিটার বা মুদ্রাকর ছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত থাকেন। তাঁর সম্পাদনায় কয়েকটি পত্রপত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

'নবব্যবহারসংহিতা' পত্রিকার সম্পাদক রামচন্দ্র ভৌমিক বাঙ্গালা যন্ত্রের একজন কম্পোজিটার ছিলেন এবং পরে তিনি এ-যন্ত্রের স্বত্বাধিকারীও

৩. হেমলতা সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩৭।
৪. গিরিজাকান্ত ঘোষ– '১২৬৭ সনের ঢাকার সাহিত্য', ঢাকা প্রকাশ, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫।
৫. 'ঢাকা প্রকাশ', ২৫ কার্তিক, ১২৮০ (৯ নভেম্বর ১৮৭৩)।
৬. গিরিজাকান্ত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বাঙ্গালা যন্ত্রের নাম যেমন স্মরণীয়, তেমনি স্মরণীয় 'ঢাকা প্রকাশে'র নাম। বাঙ্গালা যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকদের প্রচেষ্টায় ঢাকার প্রথম সাপ্তাহিক পত্র 'ঢাকা প্রকাশ' ৭ই মার্চ ১৮৬১ তারিখে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। সম্পাদক হিসেবে তাঁর বেতন ছিল মাসিক ২৫ টাকা (পরে বর্ধিত হয় ৩৫ টাকা)। এই যন্ত্রের হেড কম্পোজিটার বেতন পেতেন ৩০ টাকা। সাধারণ কম্পোজিটার বোধ করি ১০ টাকার বেশি পেতেন না। ঢাকা প্রকাশে কম্পোজিটারের জন্য নিম্নলিখিত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

"কম্পোজিটার চাই।

ঢাকা প্রকাশ কার্যালয়ে দশ টাকা বেতনে একজন কম্পোজিটার আবশ্যক। বাঙ্গালা ও ইংরেজী কম্পোজ ও কারেকশন করিতে পারে এবং যাহার চরিত্র ভাল, তেমন লোক চাই।

শ্রী গুরুগঙ্গা চৌধুরী।"

সেকালে পুস্তক মুদ্রণের ব্যয় কিরূপ ছিল সে সম্পর্কেও আমরা কিছু তথ্য জানতে পারি। ঢাকাপ্রকাশে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়ঃ—

"বিজ্ঞাপন

আমাদিগের এই বাঙ্গালা যন্ত্রের পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কণের পূর্ব নিয়ম পরিবর্ত করিয়া নিম্নলিখিত নূতন নিয়ম নির্দ্ধারিত করা হইল।

পাইকার প্রত্যেক ফর্মার মূল্য ৬ টাকা

ইংলিশের প্রত্যেক ফর্মার মূল্য ৫ টাকা

এতদপেক্ষা অল্প মূল্যে পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ করিয়া দেওয়া আমাদিগের সাধ্যাতীত।[৮] "

সে যুগের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মুদ্রাযন্ত্রের বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে মূল্যবান তথ্য ছাড়া অনেক কৌতুকপ্রদ সংবাদ পাওয়া যায়। ঢাকা প্রকাশে বাঙ্গালা যন্ত্রের একটি বিজ্ঞাপনে আমরা কবিতার ব্যবহার লক্ষ্য করি।

১৮৬২ সালেই এই মুদ্রাযন্ত্রে দুটি উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্র মুদ্রিত হয়— অবকাশরঞ্জিকা (মাসিকপত্র— সেপ্টেম্বর ১৮৬২) এবং চিত্তরঞ্জিকা (মাসিকপত্র— মে-জুন ১৮৬২)।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে হরিশচন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে ঢাকা ইমামগঞ্জে সুলভযন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এ মুদ্রাযন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ৭ই মার্চ ১৯৬৪ তারিখে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে বর্ণিত হয়েছে যে "শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মিত্র এ কোম্পানীর ঢাকাস্থ সুলভযন্ত্রে... বিক্রী হয়[১১]।"

৭. 'ঢাকা প্রকাশ' ২৫ বৈশাখ, ১৩০৬ (৭ মে ১৮৯৯)।

৮. 'ঢাকা প্রকাশ', ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭০ (২১ মে ১৮৬৩)।

১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশচন্দ্র মিত্র' (সাহিত্য সাধক চরিতমালা- ১৩৫২, থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৫।

সুলভযন্ত্র থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যথা— ঢাকা দর্পণ (সাপ্তাহিক পত্র, জুলাই ১৮৬৩), কাব্য প্রকাশ (মাসিক পত্র— জানুয়ারি ১৮৬৪), হিন্দু রঞ্জিকা (মাসিক পত্র— মার্চ ১৮৬৬) ও হিন্দু হিতৈষিণী (সাপ্তাহিক পত্র— মার্চ ১৮৬৫)।

হরিশচন্দ্র মিত্র হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি এ পত্রিকার সংশ্রব ত্যাগ করায় কয়েক মাস পরে উক্ত পত্রিকার ৭ই মে ১৮৭০ সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় ঃ

> "বিজ্ঞাপন। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মিত্র হিন্দু হিতৈষিণীর পূর্ব সম্পাদক ও সুলভযন্ত্রের পূর্ব তত্ত্বাবধায়কের প্রতি— আপনি অদ্য প্রায় ৮/ ৯ মাস যাবৎ হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকার ও সুলভযন্ত্রের কার্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন....[১২]।"

'ঢাকা দর্পণ' পত্রিকায় সুলভযন্ত্রের ঠিকানা ছিল ইমামগঞ্জ। ১৮৬৭ এর পরবর্তীকালে এ ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত গ্রন্থাদিতে সুলভযন্ত্রের ঠিকানা বাবুর বাজার। হরিশচন্দ্র মিত্রের পর ঈশানচন্দ্র শীল 'সুলভযন্ত্রের' তত্ত্বাবধায়ক হন এবং তিনিই তার মুদ্রাকর ও প্রকাশকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

'সুলভযন্ত্রে' মুসলমানী পুঁথি ছাপার প্রয়োজনীয় হরফাদি ছিল। তাই এ যন্ত্রে প্রচুর মুসলমানী পুঁথি মুদ্রিত হয়। যেমন—

ক) ১৩০ ফরজের ছহি বয়ান— মোঃ ফয়েজুদ্দিন (১৮৬৮)

খ) আহকামোচ্ছালাত— মোঃ ফয়েজুদ্দিন (১৮৮০)

গ) আসক কামাল— শেখ ঘিনু (১৮৬৯)

ঘ) তেরছদ্দির পুঁথি— ফয়েজুদ্দিন (১৮৮) এবং

ঙ) খয়রবরকৎ— আবদুল গফুর (১৮৭৬)।

ঢাকার কবি আবদুল গফুর তাঁর 'খয়রবকরৎ' গ্রন্থে অমুসলমানের মুদ্রাযন্ত্রে মুসলমানী পুথি ছাপার ফলে বিভিন্ন ত্রুটির জন্য কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। ১৮৮০ সালের দিকে মুসলমান পরিচালিত কোন মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় তিনি বাধ্য হয়ে তাঁর 'খয়রবরকৎ' গ্রন্থ সুলভযন্ত্রে ছাপতে দিয়েছিলেন। কবি আবদুল গফুর লিখেছেন ঃ

গলত দেখিলে তাকে সারিবেন আগে।
এই নিবেদন মোর মমিনের আগে।।
হিন্দু হস্তেতে পুথি হইলেক ছাপা।
গলতের কারণ এই নাহি কিছু ছাপা।।
হিন্দুর পেরেস ভিন্ন আর নাহি ঢাকা।
সর্বলোকে আছে পষ্ট নাহি এতে ঢাকা।[১৩]

'সুলভযন্ত্রের' মুদ্রণ-হার সম্ভবতঃ খুব কম ছিল, তাই এ ছাপাখানার এরূপ নামকরণ।

---

১২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- 'বাংলা সাময়িক পত্র (১ম খণ্ড)', ৩য় সংস্করণ, ১৩৫৫, পৃঃ ২০৪- পাদটীকা।

১৩. আবদুল গফুর, 'খয়রবকরৎ', ঢাকা সুলভ যন্ত্র, ১৮৭০, পৃঃ ৮৬।

সে কারণেই আমরা লক্ষ্য করি সে যুগের এক পয়সা মূল্যের দুটি সুলভ পত্রিকা এই মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল— কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'শুভ সাধিনী' (সাপ্তাহিক, ফেব্রুয়ারি ১৮৭১) এবং হিতকরী (সাপ্তাহিক, ফেব্রুয়ারি ১৮৭১)।

১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বালিয়াটি নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী বিজ্ঞাপনী যন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। বিজ্ঞাপনী যন্ত্র স্থাপনের সংবাদ ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয় [১৪]। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ ঃ—

> এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বংশীবাজারস্থিত নদীর পারের একতালা হাবেলীতে বালিয়াটি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক 'ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে গ্রেট, ডবল গ্রেট, স্মলপাইকা প্রভৃতি বিবিধ সুশ্রীক অক্ষর এবং ফুল বর্ডার ও হটপ্রেস ইত্যাদি অন্যান্য মুদ্রাঙ্কনোপকরণ সকল আছে। কেহ কিছু মুদ্রাঙ্কনার্থে আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলে আমরা অতি যত্ন ও ত্বরাপূর্বক উত্তমরূপে মুদ্রাঙ্কন করিয়া দিব....।
>
> ঢাকা বিজ্ঞাপনীযন্ত্র — কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
>
> ১২৭১, ৭ই ভাদ্র

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র থেকে ১৮৬৫ সনের মার্চ মাসে 'বিজ্ঞাপনী' নামে একটি সাপ্তাহিকী প্রকাশিত হয়। প্রায় এক বৎসর ঢাকা থেকে 'বিজ্ঞাপনী' নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে 'বিজ্ঞাপনী যন্ত্র' ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখান থেকে 'বিজ্ঞাপনী' প্রকাশিত হতে থাকে। ময়মনসিংহ থেকে দু'বৎসর প্রচারিত হওয়ার পর পত্রিকাটির প্রচার রহিত হয়। 'যন্ত্রাধ্যক্ষদিগের পরস্পরের অনৈক্য অপ্রণয় ও অবহেলা'ই নাকি প্রধান কারণ[১৫]।

সম্ভবতঃ ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে কবি হরিশচন্দ্র মিত্রের প্রচেষ্টায় গিরীশযন্ত্র স্থাপিত হয়। 'রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ' পত্রিকায় (২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬) নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়ঃ—

> "এখানকার [অর্থাৎ ঢাকার] হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকার জন্মদাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় উক্ত পত্রিকার সম্পাদকতা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং গিরীশযন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন [১৬]।"

গিরীশযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বালিয়াটি নিবাসী গিরীশচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং তাঁর নামানুসারেই এ মুদ্রাযন্ত্রের নামকরণ হয়। তিনি ইতিপূর্বে ঢাকায় বিজ্ঞাপনী যন্ত্রও স্থাপন

১৪. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংকলিত 'বাংলা সংবাদপত্রে বাংলা গ্রন্থ পরিচয়' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৬২) থেকে উদ্ধৃত (পৃঃ ২৩-২৪)।

১৫. 'ঢাকা প্রকাশ', ২৭ ডিসেম্বর ১৮৬৮।

১৬. ব্রজেন্দ্রনাথ, 'কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশচন্দ্র মিত্র', পৃ. ৪১।

করেছিলেন এবং কয়েক বৎসর পর তা ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়।

১৮৭০ সনে গিরীশ প্রেস থেকে হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় 'মিত্র প্রকাশ' নামে একটি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়।

১৮৭৪ সালে 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ গিরীশযন্ত্রের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। আশ্বিন ১২৮১ সংখ্যা থেকে 'বান্ধব' এই মুদ্রাযন্ত্রে নিয়মিত ছাপা হতে থাকে। ৫ম সংখ্যা (১২৮১) 'বান্ধবে' নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়ঃ—

> "বালিয়াটি" নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরীর 'গিরিশ যন্ত্র' নামে পরিচিত যন্ত্রালয় ঢাকা বাঙ্গালা বাজার আমার কর্তৃত্বাধীনে স্থাপিত হইয়াছে। এই যন্ত্রালয়ে সর্বপ্রকার মুদ্রাঙ্কনকার্য সুচারুরূপে অতি অল্প ব্যয়ে, অল্প সময়ে নির্বাহিত হয়। এতৎসম্বন্ধে কাহারও কোন পত্রাদি লিখিত হইলে অতঃপর আমার নিকট লিখিবেন[১৭]।
>
> ঢাকা বান্ধব কার্যলয়। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।"

ঢাকায় স্থাপিত মুদ্রাযন্ত্রসমূহের মধ্যে গিরিশ যন্ত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু সংখ্যক গ্রন্থ এ-প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা যায়ঃ—

১। ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী— রূপজালাল (১৮৭৬)

২। আবদুল আজিজ— ওবেদী বিয়োগ (১৮৮৫)

৩। আমিনুদ্দীন— প্রবোধ সুধাকর (১৮৭২) এবং

৪। ফয়েজুদ্দীন— মধুমালার পুঁথি (১৮৮৫)।

ইস্ট বেঙ্গল প্রেস বা 'পূর্ববঙ্গ প্রেস' সম্ভবত ১৮৭৪ সালে স্থাপিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ভিষক' (মাসিক— জানুয়ারি ১৮৮১) ও 'বঙ্গবন্ধু' (মাসিক— অক্টোবর ১৮৮৮) সাময়িকপত্র দুটি এ মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হয়। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত 'বান্ধব' পত্রিকার প্রথম দুটি সংখ্যা (আষাঢ় ও শ্রাবণ ১২৮১) ইস্টবেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত হয়। প্রিন্টার বা মুদ্রাকরের নাম ছাপা হয়— নবীনচন্দ্র দে।

ঢাকায় মুসলমান স্থাপিত প্রথম ছাপাখানা মোহাম্মদী যন্ত্র। এ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় আরও অনেক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় এবং মুসলমান লেখকদের অনেক বইও ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এ গ্রন্থসমূহের প্রায় সবই ছিল পুঁথি। সেকালে ঢাকায় কয়েকটি ছাপাখানা ও পুস্তকালয়কে কেন্দ্র করে পুঁথি রচয়িতাদেরও একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই কবিদের মধ্যে গরীবুল্লাহ, ফয়েজউদ্দীন, জহিরুদ্দীন ও হায়দার জানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুন্সী মোহাম্মদ জান ঢাকার বেগম বাজারের কাছে ফজলে আলীর বাজারে 'মোহাম্মদী যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এ মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ জানা যায় নি। তবে এ যন্ত্রে মুদ্রিত প্রাচীনতম যে গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার নাম 'জেজাঘ পর্বত'। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১২৮০ সালের ১৫ই পৌষ অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ।

---

১৭. 'বান্ধব', কার্তিক ১২৮১, প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ৪।

ফজলে আলীর বাজারেই মুন্সী মোহাম্মদ জানের বাসভবন ছিল। তাঁর চরিত্রের প্রশংসায় কবি আব্বাস আলী 'গোলজারে এসলাম' কাব্য লিখেছেন ঃ

"ছাপাখানার মালিক মুন্সী মোহাম্মদ জান
ঈমানে আমানে পাক নেক মোছলমান।।
তাহার খুবির কথা কি কহিব আর।
হক্কেতে বহুত খোস নাহক্কে বেজার।।[১৮]

মোহাম্মদী যন্ত্রে অনেক পুঁথি মুদ্রিত হয়েছিল। যেমন— জেজাঘ পর্বত (১৮৭৬), ছেরাজল এসলাম (১৮৭৭), ছিমতনের পুঁথি (১৮৭৯), মেছবাহল মছলেমিন (১৮৭৯), চামানে নওবাহার (১৮৮০) নাজাতোল মোছলেমিন (১৮৭৯), গোল শুনাহর চন্দ্রমুখি (১৮৮০), তাম্বিহোল মোমেনিন (১৮৮০) ও গোলজারে এছলাম (১৮৮১)।

"ছেরাজল এসলাম" গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় প্রকাশক জানাচ্ছেন— "আমি শ্রীমহাম্মদ জান যন্ত্রাধ্যক্ষ ও প্রিন্টার সহর ঢাকা-এ মহাম্মদি যন্ত্রে শ্রীমুন্সী কছিমদ্দিন কর্তৃকের অনুমতিতে মুনসী আলী আকবর কম্পুজ কারকের দ্বারাএ মুদ্রিত করিলাম।"। ছাপাখানার মালিক গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় নিজের নামের সঙ্গে সাধারণ কম্পোজিটারের নাম উল্লেখ করছেন তা তাঁর কম উদারতা নয়। শুধু যন্ত্রাধ্যক্ষ নয়, গ্রন্থকারেরাও সেযুগে ছাপাখানায় বিভিন্ন কর্মচারীর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করতেন। যেমন 'গোলজারে এসলাম' কাব্যে আব্বাস আলী লিখেছেন ঃ

"কম্পোজ করিল জান আবদুল আজিজ।
মধুর মতন তার জবান লাজিজ।
পেরেছম্যান লালু হয় বড় হুঁশিয়ার।
পেরেছ খেঁচিয়া কেতাব করিল তৈয়ার।।
রহিমদ্দি কালি দিল জানিয়া গরজ।
উঠায় মহাম্মদ আলেম জানিবে কাগজ।

সেযুগে কবি, মুদ্রাকর এবং ছাপাখানার বিভিন্ন কর্মচারীর মধ্যে যে বিশেষ সহৃদয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তার পরিচয় এ উদ্ধৃতিটিতে পাওয়া যায়।

সম্ভবত ১৭৭৮-৭৯ সালে ঢাকার আগা ফজলে আলীর বাজারে সাঈদী যন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। মুদ্রাযন্ত্রটির মালিক ছিলেন আবুল বাসেত। গোলাম মাওলা রচিত 'শাহ রুমের কেচ্ছা' (১৮৮০) গ্রন্থের নাম পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছে "সহর ঢাকা মহল্লা আগা ফজলে আলীর বাজারে শ্রীযুত মৌলবি আবদুল বাছেতের খরিদা ছাইদী যন্ত্রে মুদ্রিত।"

এ মুদ্রাযন্ত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয় ঃ আবদাবাতুন নেসা (১৮৭৯), শাহ রুমের কেচ্ছা (১৮৮০), তজবিজ তকফিন (১৮৮০), জাওহারে মাকনুন (১৮৮০) এবং জেবল মুলক ও মেহের জামাল (১৮৮১)।

আজিজিয়া প্রেস সম্ভবত ১৮৮২ সালে ঢাকার মোগলটুলিতে স্থাপিত হয়েছিল। আজিজিয়া প্রেসের মালিক ছিলেন মুন্সী ফয়েজউদ্দীন। এ তথ্য পাওয়া যায় আবদুর রহিম

---

১৮. আব্বাস আলী, 'গোলজারে এসলাম', ঢাকা ১৮৮১, পৃঃ ১৩৩।

রচিত 'দেল দেওয়ানা' কাব্যের নামপৃষ্ঠায় ঃ

"ঢাকা মোগলটুলী শ্রীযুত মুনসী মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দনিের আজিজিয়া প্রেসে অষ্টমবার মুদ্রিত হইল ৯ ফেব্রুয়ারি ১২৯০ সন। আবদুল আজিজ প্রিন্টার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।"

অনুমান করা যায়, মুদ্রাকর বা প্রিন্টার আবদুল আজিজও এ ছাপাখানার অংশীদার ছিলেন, তাই প্রেসের নামকরণ হয় তাঁর নামে।

আজিজিয়া প্রেস প্রতিষ্ঠার আগে মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দীন নিজে হরফ কিনে পুঁথি কম্পোজ করানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কম্পোজ করা হরফ তিনি বিভিন্ন প্রেসে ছাপতেন। ঢাকা সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত এমনি একটি পুঁথির নামপৃষ্ঠা নিম্নরূপ ঃ—

"আমি শ্রীমাহাম্মদ ফএজুদ্দিন এই তেরছদ্দির পুঁথি তৈয়ার করিয়া নিজ এতেমামে আপন হরফে কম্পোজ করাইয়া ঢাকা সুলভ যন্ত্রে ছাপাইয়া ১১৫৮ সনের ২৫ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করিলাম।"

মুন্‌শী মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দীন একজন পুঁথি রচয়িতাও ছিলেন। তিনি প্রায় ন'টি পুঁথি রচনা করেন। তাঁর নিবাস ছিল ঢাকা শহরে "ঠাঠারু বাজার বীচে মসজিদের কাছে।"

আজিজিয়া প্রেসে মুদ্রিত কয়েকটি পুঁথির নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ঃ দেল দেওয়ানা (১৮৮৩), সেকান্দার নামা (১৮৮৪), ওমর উমাইয়া (১৮৮৪), শের মশগুল (১৮৮৫), ইশকে গুলজার (১৮৮৬), হোশ নামা (১৮৮৭) এবং তেরছদ্দির পুথি (১৮৮০)।

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে ঢাকায় আরও কয়েকটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল, যেমন— রঘুনাথ প্রেস, ইমদাদুল ইসলামিয়া প্রেস, স্যামন্তক প্রেস, বেদব্যাস প্রেস, আদর্শ প্রেস, ভারত যন্ত্র, বান্ধব যন্ত্র, শীতল প্রেস, সারস্বত প্রেস ও ওরিয়েন্টাল প্রেস।

রঘুনাথ প্রেসে 'আর্যগৌরব' পত্রিকা মুদ্রিত হয়। কলিমুদ্দীন রচিত নসীহতুল কায়েবীন (১৮৮৫) গ্রন্থটিও এ ছাপাখানায় ছাপা হয়। বাংলা বাজারের স্যামন্তক প্রেসে ছাপা হয়েছিল মুসলিম বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'প্রেমদর্পণ' (আর্জুমন্দ আলী রচিত– ১৮৯১)। ইমদাদুল ইসলামিয়া প্রেস ইসলামপুরে স্থাপিত ছিল। এই প্রেসে প্রধানতঃ পুঁথি ছাপা হতো। এ ছাপাখানায় মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'পানি-কৌরীর পুঁথি' (১৮৯৬), আলমাস ও গোলরায়হান (১৮৯৭), ভূমিকম্পের পুঁথি (১৮৯৭)। শীতল প্রেসে পাক্ষিক পত্রিকা 'রত্নাকর' (১৮৮৪) ছাপা হয়। আদর্শ প্রেসে ছাপা হয় এ আহমদ রচিত কবিতা পুস্তক 'সংসার চমৎকার' (১৮৯১)। বেদব্যাস প্রেসে ছাপা একটি পুঁথির নাম 'আজাবুল কবর' (১৯০০)। ভারতবান্ধব প্রেস ও সারস্বত প্রেসে শেখ আবদুল সোবহানের 'হিন্দু-মোসলমান' গ্রন্থের (১ম খণ্ড, ১৮৯১) কয়েকটি ফর্মা ছাপা হয়েছিল। এ'গ্রন্থের ২য় খণ্ড (১৮৮৮) ছাপা হয় ওরিয়েন্টাল প্রেসে।

ঢাকায় সে যুগে মুসলমান স্থাপিত ছাপাখানাগুলি ছিল মূলত পুঁথি ছাপার কেন্দ্র। পুঁথি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রন্থ এ ছাপাখানাগুলিতে মুদ্রিত হয় নি। তাই লক্ষ্য করা যায়

যে, আর্জ্জুমন্দ আলী, শেখ আবদুস সোবহান, ফয়েজুন্নেসা চৌধুরানী, কায়কোবাদ প্রমুখ সাহিত্যিকেব রচনা অমুসলমান পরিচালিত ছাপাখানায়ই ছাপা হয়েছিল।

সেকালে পুঁথি ছাড়া অন্যান্য বইয়ের বাজার বিশেষ সুবিধার ছিল না, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখককেই নিজ ব্যয়ে বই প্রকাশ করতে হতো। গ্রন্থ-স্বত্বাধিকারী বা মূল প্রকাশকের নাম প্রায়ই গ্রন্থে থাকতো না। মুদ্রাকরের নামই প্রকাশক হিসাবে ছাপা হতো। প্রথম দিকে ছাপাখানাগুলিতেই পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকতো।

'সোমপ্রকাশে'র একটি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়— "নীলদর্পণ নামে যে গ্রন্থ ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র, ডি রোজারিয়ার লাইব্রেরি, বাঙ্গলা যন্ত্র (ঢাকা), চিপ লাইব্রেরি, এই কয় স্থানে বিক্রয় হইতেছে[১৯]।" পরবর্তীকালে ঢাকায় বিভিন্ন প্রকাশনা কেন্দ্র ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার পর ছাপাখানায় পুস্তক-বিক্রয়ের ব্যবস্থা লোপ পায়। সেকালের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি পুস্তকালয়ের সংবাদ পাই ঃ

১। নন্দকুমার গুহ কোম্পানী পুস্তকালয় (সোমপ্রকাশ– ১২ ডিসেম্বর ১৮৬৪)।

২। কে. সি. ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স, ইসলামপুর, ঢাকা (ঢাকা প্রকাশ, ৪ মার্চ, ১৮৭০)।

৩। এন কে. চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোং— (ঢাকা প্রকাশ, ১৭মে, ১৮৭৪)।

৪। মতিলাল চক্রবর্তীর পুস্তকালয়, ইসলামপুর, ঢাকা (ঢাকা প্রকাশ, ১৭মে, ১৮৭৪)।

৫। ন্যাশনাল ডিপজিটারী, ঢাকা (বান্ধব, মাঘ-ফাল্গুন, ১২৮২)।

৬। পূর্ব্ববঙ্গ পুস্তকালয়, ইসলামপুর, (ঢাকা প্রকাশ, ৩০ মার্চ ১৮৭৭)।

৭। স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, (ঢাকা প্রকাশ, ২৮ মার্চ ১৮৮০)।

কে. সি. ঘোষের দোকানে ইংরেজী বাংলা নানা ধরনের পুস্তক পাওয়া যেতো। কলকাতা থেকে নিয়মিত পুস্তক আমদানীর ব্যবস্থা ছিল। এন. কে. চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে ইংরেজী বাংলা পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও 'নানাবিধ নাটক, কাব্য. প্রহসন, ব্রাহ্ম ধর্মের ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত' থাকতো[২০]। সে যুগেও অর্থ বইয়ের প্রচলন ছিল। পণ্ডিত মতিলাল চক্রবর্তী বিভিন্ন স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের অর্থ পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁর দোকানে এ সমস্ত অর্থ-বই বিক্রি হতো। পরবর্তীকালে মতিলাল চক্রবর্তী এই দোকান তুলে দেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ পুস্তকালয় নামে নতুন করে একটি পুস্তকালয় স্থাপন করেন। ন্যাশনাল ডিপজিটারী সম্ভবত ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর রূপজালাল গ্রন্থটির প্রকাশক। বান্ধব পত্রিকার মাঘ-ফাল্গুন ১২৮২ এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ সংখ্যায় ঢাকা ন্যাশনেল ডিপজিটারীর নামে এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ঢাকা স্টুডেন্টস লাইব্রেরীর এক বিজ্ঞাপনে প্রকাশ এই পুস্তকালয়ের ম্যানেজার ছিলেন ঢাকা মাদ্রাসার হেডমাষ্টার শ্রীরাজেন্দ্র মোহন দত্ত।[২১]

১৯. 'সোমপ্রকাশ', ২২ নভেম্বর, ১৮৬০।
২০. 'ঢাকা প্রকাশ', ১৭মে, ১৮৭৪।
২১. 'ঢাকা প্রকাশ', ২৮ মার্চ ১৮৮০।

লক্ষ্য করা যায় অধিকাংশ পুস্তকালয়ের অবস্থান ছিল ইসলামপুরে। বইয়ের দোকানের সংখ্যা অবশ্য খুব কম ছিল। চকবাজারের পশ্চিম দিকে কয়েকটি পুঁথির দোকান ছিল। এই এলাকাকে বলা হতো কেতাবপট্টি'। হায়দার জান নামে জনৈক কবি তাঁর 'খলিল্ গোজরান' কাব্যে কেতাবপট্টির বর্ণনা দিয়েছেন :

এই কেতাবের যার দরকার হইবে। নিজ দোকানে মেরা আসিলে পাইবে।। মিয়া রবিউল্লাহ বটে ভাগিনী জামাই। দোকানে থাকেন সেই পাবে তার ঠাঁই।। চওকের পশ্চিম ধারে কেতাব পট্টিতে। ঠিকানা বলিয়া দিনু সবার খেদমতে[২২]।।

সে যুগে শুধু অর্থ বইয়ের প্রচলন শুরু হয়েছিল তা নয়— অসৎ ব্যবসায়ীরও সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত আমরা সেকালের সাময়িকপত্রে প্রকাশিত দুটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি :

ক) ঢাকায় একজন পুস্তক বিক্রেতা পুস্তকের গাঁটের সঙ্গে লুকাইয়া আফিং চালান আনিয়া বিক্রয় করিত। তজ্জন্য তাহার দণ্ড হয়[২৩]।

খ) পরের পাঠ্য গোপনে ছাপাইয়া প্রায়শ দোকানদারেরা লাভ করে। ঢাকায় অনেকগুলি প্রেস হইয়াছে, যাহাতে অতি অসুলভে পরের বই ছাপাইয়া কারবার চালান হয়। কানাই বৈরাগী নামক একজন পুস্তক বিক্রেতা এই কাজে বহুকাল যাবৎ লোকের পরিচিত। সম্প্রতি মৃত রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষা ছাপাইয়া ধরা পড়ায় তাহার ১ বৎসর ও তাহার সঙ্গী ২ ব্যক্তির ৮ মাস ও ৬ মাস ফাটক হইয়াছে। ছাপা-খানাওয়ালা প্রভৃতিকে ছাড়া উচিত হয় নাই[২৪]।

ঢাকায় মুদ্রণ ও প্রকাশনার গোড়ার কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এটি নয়, বলা বাহুল্য। একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে যে ঢাকায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর পরই এখানে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে। বহু গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে, অনেক সাময়িকপত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রকে কেন্দ্র করে পাঠক-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন পুস্তকালয়ের শো-কেসে দেশী বিদেশী বই শোভা পেয়েছে, এমন কি মুসলিম অবরোধবাসিনীও স্বরচিত গ্রন্থ প্রকাশ করে সাহিত্য-অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ঢাকা প্রকাশের (২০শে অগ্রহায়ণ ১২৯৩) ভাষায় বলা চলে, ঢাকা তখন সত্য সত্যই 'পূর্ববঙ্গের উদয়াচল'।

---

২২. হায়দার জান, খলিল গোজরান, ১৮৭৪, পৃঃ ৬৭-৮।
২৩. 'অনুসন্ধান', ১৫ পৌষ, ১২৯৫।
২৪. 'ঢাকা প্রকাশ', ২ শ্রাবণ, ১৩০৫।

উনিশ শতকে ঢাকার সাময়িক পত্র

বাঙ্গালা যন্ত্র (১৮৬০) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার বিদ্বৎসমাজ সংস্কৃতিচর্চায় বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেন। প্রথম বছরেই অর্থাৎ ১৮৬০ সালে এই যন্ত্রে দীনবন্ধু মিত্রের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'নীলদর্পণ' এবং তিনটি মাসিক পত্রিকা (কবিতা কুসুমাবলী, মনোরঞ্জিকা ও নব-ব্যবহার সংহিতা) মুদ্রিত হয়। পরবর্তী বৎসর বাঙ্গালা যন্ত্রের পরিচালকদের প্রচেষ্টায় ঢাকার প্রথম সাপ্তাহিক পত্র 'ঢাকা প্রকাশ' (৭ মার্চ, ১৮৬১) প্রকাশিত হয়। বলা চলে, এই মুদ্রাযন্ত্রকে কেন্দ্র করে ঢাকার সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে এক নতুন যুগসূচনা হয়।

বাঙ্গালা যন্ত্রকে অনুসরণ করে ঢাকায় আরও কয়েকটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। যেমন– নূতন যন্ত্র, সুলভ যন্ত্র, গিরিশ যন্ত্র, পূর্ববঙ্গ প্রেস ও শীতল প্রেস। এই মুদ্রাযন্ত্রগুলি ঢাকায় সাময়িকপত্রের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়।

১৮৬০ থেকে শুরু করে ১৯০০ পর্যন্ত এই একচল্লিশ বছরে ঢাকা থেকে প্রায় ৭০টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকার পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরিশচন্দ্র মিত্র, দীনেশচরণ বসু প্রমুখ লেখকের সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'কবিতা কুসুমাবলী', 'মনোরঞ্জিকা', 'ঢাকা প্রকাশ', 'বিজ্ঞাপনী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'কবিতা কুসুমাবলী' পত্রিকায় তাঁর রচিত 'সদ্ভাবশতক'-এর অধিকাংশ কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'শুভ-সাধিনী' এবং 'বান্ধব' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। 'পূর্ববঙ্গের বঙ্গদর্শন' নামে খ্যাত 'বান্ধব' পত্রিকায় তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়। হরিশচন্দ্র মিত্র 'অবকাশরঞ্জিকা' 'চিত্তরঞ্জিকা', 'ঢাকাদর্পণ', 'কাব্যপ্রকাশ', 'মিত্রপ্রকাশ', 'হিন্দু রঞ্জিকা', 'হিন্দু হিতৈষিণী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সমাজ-সচেতন ও রুচিশীল লেখকরূপে হরিশচন্দ্র মিত্রের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর রচিত অধিকাংশ কবিতা ও প্রহসন ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'কুলকলঙ্কিনী', 'মহাপ্রস্থানকাব্য', 'কবি-কাহিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা দীনেশচরণ বসু কিছুদিনের জন্য 'ঢাকা প্রকাশ' সম্পাদনা করেন। তিনি 'বান্ধব' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রের মধ্যে 'বান্ধব' ও 'মিত্রপ্রকাশ' উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল এবং এ-দু'টি পত্রিকার নাম বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে অবশ্য স্মরণীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চার দশকে ঢাকা থেকে বহু বিচিত্র বিষয়ে নানা ধরণের পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী গেজেট থেকে আইন, সার্কুলার, অর্ডার প্রভৃতি সঙ্কলন করে প্রকাশিত হয় 'নব-ব্যবহার সংহিতা' (১৮৬০)। 'চিত্তরঞ্জিকা' (১৮৬২) এবং 'কবিতা কুসুমাবলী' (১৮৬০) ছিল 'পদ্যময়ী মাসিক পত্র'। স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির কল্যাণে প্রকাশিত হয় 'নারীশিক্ষা' (১৮৭০) ও 'অবলাবান্ধব' (১৮৬৯)। এমন কি, শুধু বাল্যবিবাহ

প্রতিরোধ করার জন্য 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' (১৮৭০) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ সনে ঢাকা থেকে শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ে 'রামধনু' নামে একটি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'মানসী' পত্রিকার মতে "বঙ্গভাষায় ইহাই বোধহয় সর্বপ্রথম শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র।"[১] চিকিৎসা শাস্ত্র-বিষয়ক কয়েকটি পত্র-পত্রিকাও এসময়ে প্রকাশিত হয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা 'আয়ুর্বেদ সঞ্জীবনী' (১৮৮৫), হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক– 'হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক' (১৮৮৫) এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র 'ভিষক' (১৮৮১)। হরিহর নন্দী সম্পাদিত ব্যঙ্গ পত্রিকা 'সদানন্দ' প্রকাশিত হয়– ১৮৮১ সনে। সম্পূর্ণ হাস্য-রসাত্মক রচনায় পূর্ণ একটি পত্রিকা প্রকাশ করা যে একটি দুরূহ কর্ম 'সদানন্দ' পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন'ও তা স্বীকার করেন।[২] ধর্মপ্রচার অথবা ধর্মীয় সমাজের মুখপত্র হিসেবেও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেমন— 'রত্নাকর' (১৮৮৪), 'বঙ্গবন্ধু' (১৮৮৮)।

সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের কথা বলতে গেলে চারটি পত্রিকার নাম উল্লেখ করতে হয়— 'ঢাকা প্রকাশ' (১৮৬১), 'ঢাকা দর্পণ' (১৮৬৩), ঢাকাদর্শক' (১৮৭৫) এবং 'ঢাকা গেজেট' (১৮৬১)। বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'ঢাকা প্রকাশে'র নাম 'সোমপ্রকাশ' বা 'সংবাদ প্রভাকরে'র নামের পাশেই স্থান পায়। 'ঢাকা প্রকাশ' প্রায় একশত বৎসর কাল প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকায় সাহিত্য এবং সংস্কৃতি-সংবাদ ছাড়াও তদানীন্তন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা প্রকাশিত হতো। পূর্ব-বঙ্গের জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ তু'লে ধরা ও তার প্রতিকার বিধান 'ঢাকা-প্রকাশে'র অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

'ঢাকা প্রকাশ' এ সম্পর্কে দাবী করত ঃ

"পূর্ববঙ্গই 'ঢাকা প্রকাশে'র জন্মস্থান এবং পূর্ববঙ্গের অভাব-অভিযোগের আলোচনা দ্বারা তত্ত্বৎপ্রতিকারে কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই 'ঢাকাপ্রকাশে'র সৃষ্টি।"[৩]

বিভিন্ন সময়ে 'ঢাকা প্রকাশে'র স্বত্বাধিকার বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হ'লেও এই পত্রিকা সর্বদাই নির্ভীক সাংবাদিকতায় আস্থাবান ছিল। ইংরেজ কর্মচারী, নীলকর, চাকর বা গোরা সৈন্যের অত্যাচারের কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করা হতো। যেমন[৫]—

(ক) "এমন মাস, এমন সপ্তাহ প্রায় নাই যে দানব ইংরেজের অমানুষ অত্যাচারের সংবাদ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়। সাহেবী অত্যাচারের কাহিনী লিখিতে লিখিতে কলম ভোঁতা হইয়া গেল, আর কত লিখিব এই বলিয়া এক একবার নিরস্ত হইয়া বসিতে চাই; কিন্তু এমনই গ্রহ দোষ যে, কর্তব্যানুরোধে পুনরায় লেখনী ধারণ করিতে হয়।"

(খ) "সেদিনকার চাঁদপুরের ঘটনা বোধ হয় পাঠকগণ ইতিমধ্যেই ভুলিয়া যান নাই। শ্বেতাঙ্গপ্রবর একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকেও (ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) অবলীলাক্রমে

১. "মানসী" গ্রন্থসমালোচনা, কার্তিক ১৩২২।

২. 'বঙ্গদর্শন' চৈত্র ১২৮৭।

৩. ঢাকা প্রকাশ, ৭ বৈশাখ ১৩০৯।

পদাঘাত দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। এরূপে কতশত ঘটনা নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু এত কান্নাকাটি করাতেও কোনরূপ প্রতিকার হইতেছে কি? কেন এমন হইতেছে, কেনই বা শৃগাল কুকুরের ন্যায় আমরা নিয়ত বিড়ম্বিত হইতেছি, হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ! একবারও একান্ত মনে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আমাদের মনে হয় আত্মসম্মান-বুদ্ধির অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। স্বাবলম্বন ও স্বজাতি-প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মমর্য্যাদা বুদ্ধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া আমরা পরপদলেহনকারী এক অদ্ভুত জীবরূপে পরিণত হইয়াছি। আমাদের যদি এ দুর্দ্দশা না হইবে তবে আর হইবে কার!"

জনসাধারণের স্বার্থ লইয়া আন্দোলন করার ফলে 'ঢাকা প্রকাশ' রাজরোষে পতিত হয় এবং সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় নতুন আইনের বলে 'ঢাকা প্রকাশে'র কাছে পঁচিশ টাকা জামিন চাওয়া হয়। তখন 'ঢাকা প্রকাশ আর রাখা হবেনা' বলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। কিন্তু সরকার এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে লিখিত কোন প্রবন্ধ বা সংবাদের জন্য নতুন আইনের কোন বিধান প্রয়োগ করা হবেনা বলে ঘোষণা (১৮৭৮) করলে 'ঢাকা প্রকাশ' 'বিদায়প্রার্থনা' প্রত্যাহার করে।[১]

সে যুগের পত্রপত্রিকার সম্পাদককে প্রায়ই মানহানির মামলার ঝক্কি পোহাতে হতো। 'ঢাকাদর্পণে' ঢাকা জেলার বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়কে ক্রমাগত ব্যক্তিগত আক্রমণ চালানোর জন্য উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনা হয়। এই মামলাটি সে যুগে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 'জেলা ম্যাজিষ্টেট মিঃ মার্টিন, এন. পি. পোগজ, ভাওয়ালের জমিদার কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি ১৫০ জন লোক কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সাক্ষী ছিলেন। সম্পাদক হরিশচন্দ্র মিত্র ও প্রকাশক কালিদাস মিত্র শেষ পর্যন্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করে অব্যাহতি লাভ করেন।'[২]

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'ঢাকা প্রকাশ' ও 'গরীব' মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য উভয় পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা আনা হয়। 'ঢাকা প্রকাশ' সম্পাদক শাস্তিপ্রাপ্ত হন।[৩] 'গরীব' ক্ষমাপ্রার্থী হলে 'রূপরঘুরাম বাবুদের মোকদ্দমার হাঙ্গামা" থেকে বিমুক্ত হন।[৪]

'ঢাকা প্রকাশ' প্রথমদিকে যখন ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ছিল, তখন হিন্দুসমাজের মুখপত্র ছিল 'হিন্দু হিতৈষিণী'। এই দুই পত্রিকার মধ্যে নিয়মিত বাদ-প্রতিবাদ সেকালের পাঠকদের কাছে বেশ উপভোগ্য বিষয় ছিল। উভয় পত্রিকাই অবশ্য তর্কবিতর্ক নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং আদালতে 'নালিসবাদ' পর্যন্ত অগ্রসর হয় নি।

সেযুগের পত্রপত্রিকায় আরেকটি চিত্তাকর্ষক বিষয় আমাদের নজরে পড়ে, তা হচ্ছে ঢাকার ও কলিকাতাব সাময়িকপত্রের মধ্যে মসীযুদ্ধ। প্রথমদিকে সে মসীযুদ্ধ বাদ-প্রতিবাদ বা কটাক্ষপাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রসঙ্গত 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত দু'টি সংবাদ এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

১. 'ঢাকাপ্রকাশের চিতাবরোহণ' ঢাকা প্রকাশ, ১৬ বৈশাখ ১২৮৫।

২. সত্যেন সেন– ঢাকা হইতে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত সাময়িক পত্র-, সোনার বাংলা, ২০ ভাদ্র, ১৩৫৪।

৩. কেদার নাথ মজুমদার- ঢাকার বিবরণ, ১৩১৬, পৃঃ ৭৭-৭৮।

৪. ঢাকা প্রকাশ, ১৭ আষাঢ় ১২৯৬।

(ক) ৯ই শ্রাবণ, বুধবার (১২৬৮)— ঢাকা নিউসে দৃষ্ট হইল, ঢাকার অন্তঃ-পাতি নবাবগঞ্জের থানার দারোগা প্রকাশ্যরূপে উৎকোচ গ্রহণ করাতে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

দারোগা নাকি ঢাকা কালেজের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র?[১]

(খ) ২৯এ শ্রাবণ, সোমবার (১২৬৮)— আমরা নবাবগঞ্জের উৎকোচগ্রাহী দারোগা ঢাকা কালেজের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র কিনা? জিজ্ঞাসা করাতে 'ঢাকা প্রকাশ' সম্পাদক অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন তিনি হুগলি কলেজের ছাত্র।

হায়! স্থান ও সঙ্গ দোষে লোকের স্বভাবের কি পরিবর্ত্তই হয়![২]

পরবর্তীকালে মসীযুদ্ধ অনেকটা নিন্দাবাদে রূপান্তরিত হয়। 'ঢাকাপ্রকাশ' প্রায়ই অভিযোগ করতো যে কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে অধিকাংশই অসৎ প্রকৃতির ছিলঃ

"কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে অধিকাংশের অসৎ প্রকৃতির পরিচয়ই আমরা পূর্বে ২ বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং কোন কোন বারে ধরিয়াও দেখাইয়াছি, তথাপি তাঁহারা সাবধান হয়েন নাই।"[৩]

'মিথ্যা সংবাদ প্রচার' এবং 'পরকীয় সংবাদ পরিবেশন'কেই ঢাকাপ্রকাশ অসৎ প্রকৃতির পরিচায়ক বলে আখ্যা দেয়। কলিকাতার 'চারুমিহির'-এর বিরুদ্ধে 'ঢাকা প্রকাশে'র অভিযোগ ছিল গুরুতরঃ—

"চারুমিহির পুনঃ পুনঃ যে নির্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক বাক্য দ্বারা ঢাকাবাসীকে নিন্দা করিতেছেন, তাহা কোনক্রমেই সহ্য হইতেছে না।"[৪]

এমন কি 'চারুমিহির' নাকি 'ঢাকার সমস্ত লোককে কানকাটা, নির্লজ্জ, নীচ প্রভৃতি'[৫] বলতেও দ্বিধা করতো না। অন্যদিকে, 'ঢাকা প্রকাশ'ও কটুবাক্য প্রয়োগে কম যায় নি। 'ঢাকাপ্রকাশ' কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহকে 'কালকুত্তাই' সংবাদপত্র বলে অভিহিত করতো। কারণ স্বরূপ বলা হয় ঃ

"ইংরাজী Calcutta শব্দের মূল কালকুত্তা স্থির করাই যুক্তিসঙ্গত। এবং সেই কালকুত্তা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিকে 'কালকুত্তাই' নামে পরিচিত করা তৎস্থানীয় সংবাদপত্রগুলির ব্যাকরণানুসারে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।"[৬]

ঢাকা ও কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের এই মসীযুদ্ধের পেছনে শুধু বৃত্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, তথাকথিত 'ঘটি বাঙ্গাল বিরোধ'ও হয়তো ক্রিয়াশীল ছিল।

১. সোমপ্রকাশ, ২৯ জুলাই ১৮৬১।
২. সোমপ্রকাশ, ১৯ আগষ্ট ১৮৬১।
পরবর্তীকালে ঢাকা প্রকাশ (২৫ অগ্রহায়ণ, ১২৭৩) 'সোমপ্রকাশের অসঙ্গত অপলাপ' শীর্ষক এক নিবন্ধে সোমপ্রকাশের এই উক্তির নিন্দা করে।
৩. ঢাকা প্রকাশ, ৭ শ্রাবণ ১৩০৭।
৪. ঢাকা প্রকাশ, ১২ চৈত্র, ১৩০৬।
৫. ঢাকা প্রকাশ, ১৯চৈত্র, ১৩০৬।
৬. ঢাকা প্রকাশ, ১৮ আষাঢ় ১৩০৬।

সেকালে খুব কম পত্রিকাই একক প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হতো। লক্ষ্য করা যায়. অধিকাংশ পত্রিকাই কোন না কোন সভা বা প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র। যেমন—

মনোরঞ্জিকা সভার মুখপত্র— মনোরঞ্জিকা,
হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র— হিন্দুহিতৈষিণী,
উদ্দেশ্য মহৎ সভার মুখপত্র— উদ্দেশ্যমহৎ,
সঙ্গত সভার মুখপত্র— বঙ্গবন্ধু,
শুভসাধিনী সভার মুখপত্র— শুভসাধিনী,
বাল্যবিবাহ নিবারণী সভার মুখপত্র— মহাপাপ বাল্যবিবাহ,
সারস্বত সমাজের মুখপত্র— সারস্বতপত্র,
জৈনসার বিদ্যালয়ের মুখপত্র— পল্লীবিজ্ঞান,
বোয়ালিয়া ধর্মসভার মুখপত্র— হিন্দুরঞ্জিকা এবং
ভৈষজ্য সমালোচনী সভার মুখপত্র— ভিষক।

অর্থাৎ প্রায় পত্রিকারই প্রকাশের ব্যয় কোন না কোন 'প্রাতিষ্ঠানিক ফাণ্ড' থেকে নির্বাহিত হতো। সম্পূর্ণভাবে নিজের টাকায় পত্রিকা চালানো সেযুগে দুঃসাহসিক কাজ ছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশকালে এই দুঃসাহসের পরিচয় দেন। কিন্তু তিনিও শেষদিকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় পত্রিকা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।[১] সীমিত গ্রাহক সংখ্যা, অত্যধিক মুদ্রাঙ্কণ খরচ এবং অতিরিক্ত ডাকমাশুলের কারণে অধিকাংশ পত্রিকারই আয়ু ছিল স্বল্পকালীন।

'পল্লীবিজ্ঞান' পত্রিকাটি জৈনসার গ্রামনিবাসী খ্যাতনামা 'জজবাবু' অভয়কুমার দত্তগুপ্তের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়।[২] প্রথম দিকে ১০০ খানা মাত্র মুদ্রিত হয়ে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হতো। পরে গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও অনেকে বিনামূল্যে পত্রিকা গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় 'পল্লীবিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ধার্য হয় মাত্র দু'টাকা। সাধারণভাবে পত্র-পত্রিকা ২০০ থেকে ৩০০ কপি মুদ্রিত হতো। 'ঢাকাপ্রকাশ', 'পল্লী বিজ্ঞান', 'হিন্দু হিতৈষিণী' প্রভৃতি পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৩শত।[৩]

ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাদির বিষয়ানুসারী ও কালানুক্রমিক পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ক) সাহিত্য সাময়িকী

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাহিত্যসাময়িকী **'কবিতাকুসুমাবলী'**। প্রকাশ-কাল মে ১৮৬০ (জ্যৈষ্ঠ ১২৬৭)। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল 'বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষ সাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধন।" সম্পাদক– কবি কৃষ্ণচন্দ্র

১. অমতৃলাল চক্রবর্তী— বান্ধব স্মৃতি, 'মোহাম্মদী' আষাঢ় ১৩৫৯।
২. যোগেন্দ্র গুপ্ত— বিক্রমপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৩৮৮-৮৯।
৩. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭ এবং কেদার নাথ মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৩।

মজুমদার। হরিশচন্দ্র মিত্র ছিলেন এই পত্রিকার প্রকাশক।

পত্রিকার আকার ছিল 'রয়েল অষ্টাংশিত'।[১] প্রথম দুই সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮, পরে ৩য় সংখ্যা থেকে এর পৃষ্ঠাসংখ্যা হয় ১৬। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল প্রথম এক টাকা, পরে আকার বৃদ্ধির ফলে দেড় টাকা।

কবিতাকুসুমাবলী প্রথম দুই সংখ্যা ছিল প্রকৃতপক্ষে 'পদ্যময়ী মাসিক', কিন্তু পরবর্তী সংখ্যা থেকে মাঝে মাঝে গদ্যপ্রবন্ধও প্রকাশিত হতে থাকে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়ে পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো— '১) ইংরেজী ও পার্সী কবিতার মর্মানুবাদ, ২) নাট্যসাহিত্য, ৩) সঙ্গীত-তত্ত্ব, ৪) মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞান, ৫) সঙ্গীত সংগ্রহ, ৬) রহস্য রচনা, (৭) পাদপূরণ, ৮) স্বভাব বর্ণনা ও ৯) সাধারণ কবিতা।'[২]

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতকে'র অধিকাংশ কবিতা এতে প্রথম প্রকাশিত হয়। হরিশচন্দ্র মিত্রও এ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। এ ছাড়া অনেক নতুন ও উদীয়মান লেখকের রচনাও কবিতাকুসুমাবলীতে স্থানলাভ করে। ঢাকা কলেজের 'এইচ' নামযুক্ত জনৈক মুসলমান কবির রচনাও এ পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

পত্রিকাটি পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়। ১ম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা(কার্তিক ১৩৬৭)য় প্রকাশিত সম্পাদকীয় ষান্মাসিক বিজ্ঞপিতে জানা যায় যে, কবিতাকুসুমাবলীর গ্রাহকসংখ্যা ছিল '৪০০ শতেরও অধিক'। ১ম বর্ষের শেষদিকে পত্রিকাটি অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়। তাই ২য় বর্ষের (১২৬৮) ১ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ মাসের পরিবর্তে ভাদ্র মাসে প্রকাশ লাভ করে।

১৮৬০ সনের জুন মাসে (আষাঢ় ১২৬৭) ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে **মনোরঞ্জিকা** নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদকের নাম উল্লেখ করেননি। গিরিজাকান্ত ঘোষের মতে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'মনোরঞ্জিকা'র সম্পাদক এবং সুত্রাপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের তদানীন্তন শিক্ষক মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন।[৩]

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনীকার ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'মনোরঞ্জিকা সভা'র মুখপত্র ছিল এই মনোরঞ্জিকা পত্রিকা এবং এই সভার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।[৪] মতান্তরে, ঢাকা নর্মাল স্কুলের প্রধান সহকারী উভয়াচরণ রায়ের উদ্যোগেই মনোরঞ্জিকাসভা স্থাপিত হয়।[৫]

'সোমপ্রকাশে' (২ জুলাই, ১৮৬০) প্রকাশিত এক সমালোচনায় ১ম সংখ্যার বিষয়সূচীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আষাঢ় (১২৬৭) সংখ্যায় মুদ্রাযন্ত্র, আধুনিক যুবকসম্প্রদায় ও তাড়িত বার্তাবহ এই তিনটি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১ম সংখ্যায় মনোরঞ্জিকার

---

১. কেদারনাথ মজুমদার– বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, পৃঃ ৩৫১।
২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৩-৪।
৩. সম্মিলন, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩২৮, পৃঃ ১১৯।
৪. ইন্দু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়– কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন চরিত, ১৩১৮, পৃঃ ২৫।
৫. গিরিজাকান্ত ঘোষ– '১২৬৭ সনে ঢাকার সাহিত্য'- ঢাকা প্রকাশ, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

সম্পাদক জানান যে, "পরাপবাদ ও পরদোষ কীর্তন করিয়া পত্রিকাখানি কলঙ্কিত ও অপবিত্র করিবেন না।" সম্পাদকের এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' মন্তব্য করে— 'তাঁহারা যদি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত না হইয়া ঈদৃশ সদর্থ ও মহোপকারক বিষয় দ্বারা পত্র পরিপূরিত করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের পত্রিকার মনোরঞ্জিকা এই নাম অন্বর্থ হইবে সন্দেহ নাই।'[১]

১৮৬১ সালে প্রকাশিত দু'খানি মাসিক পত্রিকার কথা কেদারনাথ মজুমদার উল্লেখ করেছেন— 'গদ্যপ্রসূন' ও 'গদ্য মাসিক'।

গদ্যপ্রসূন— ঢাকা সুত্রাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই পত্রিকাখানা বাহির করেন। ইনি ইতঃপূর্বে 'মনোরঞ্জিকা' পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন মনোরঞ্জিকা উঠিয়া গেলে গদ্যপ্রসূন বাহির করেন। ইনি মধ্যে বিদ্যাধর দাসের সহিত **'গদ্যমাসিক'** নামেও একখানা পত্রিকা বের করেছিলেন।[২]

'পদ্যময়ী মাসিকপত্র' **চিত্তরঞ্জিকা** প্রথম ১২৬৯ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৪মে, ১৮৬২ খ্রিঃ) প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির আকার ডিমাই ৮ পেজী ২ ফর্মা অর্থাৎ ১৬ পৃষ্ঠা। প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই আনা। স্থানীয় গ্রাহকদের জন্য বার্ষিক চাঁদা এক টাকা চার আনা এবং বিদেশীয় গ্রাহকদের জন্য ডাকমাশুল সমেত দু'টাকা।

'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রকাশক ছিলেন ঢাকা কলেজের তদানীন্তন ছাত্র সারদাকান্ত সেন সম্পাদক কে ছিলেন, তা সঠিক জানা যায় না। অনেকের অনুমান, কবি হরিশচন্দ্র মিত্র এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।[৩]

'চিত্তরঞ্জিকা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় যে 'বিজ্ঞাপন' প্রকাশিত হয়, তাতে পত্রিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা বিষয়ে কিছু জানা যায়। বিজ্ঞাপনের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

> "সম্প্রতি মাসিক প্রভাকর ব্যতীত সদ্ভাব ও রসপূর্ণ পদ্যময়ী পত্রিকা আর দেখা যায় না। বোধ হয় তন্নিবন্ধন কাব্যপ্রিয় মহোদয়গণ কবিতা-কুসুমের সৌরভ সম্ভোগে বঞ্চিত হওয়া প্রযুক্ত সর্বদাই ক্ষোভগ্রস্থ থাকেন। আমরা সাধ্যানুরূপ সেই ক্ষোভ অপনয়নার্থ এই খণ্ড প্রকাশ করিলাম।
>
> নতুন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল কবিতাই যে আমাদের স্বকল্পিত হইবে, এমত নহে। বিবিধ ভাষা হইতে সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা কলাপের অনুবাদ অথবা সারমর্মও সন্নিবেশিত হইবে।"

'চিত্তরঞ্জিকা'য় হরিশচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। গিরিজাকান্ত ঘোষ 'চিত্তরঞ্জিকা'র যে দুটি সংখ্যার সন্ধান পেয়েছিলেন, তাতে দু'জন মুসলমান কবির কবিতাও মুদ্রিত হয়েছিল। কবিতায় এই কবিদ্বয় সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করেছেন— 'আহমদ' এবং 'এইচ'। উভয়েই আপন পূর্ণনাম প্রকাশ করেন নি।

১. ব্রজেন্দ্রনাথের 'বাংলা সাময়িকপত্র' (১ম খন্ড পৃঃ ১৬) গ্রন্থে উদ্ধৃত।
২. কেদারনাথ মজুমদার– বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, পৃঃ ১৭৩।
৩. গিরিজাকান্ত ঘোষ— চিত্তরঞ্জিকা, "সম্মিলন" ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৮, পৃঃ ৭৬।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসে মাসিক **'অবকাশরঞ্জিকা'** প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হরিশচন্দ্র মিত্র। মুল্য চার আনা।

'অবকাশরঞ্জিকা'র উদ্দেশ্য ছিল 'নানা রসাত্মক পদ্যময় কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতামালা, তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন'। 'সোমপ্রকাশ'এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করে ঃ

> অবকাশরঞ্জিকার প্রথম সংখ্যা দর্শন করিয়াই আমাদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল, সম্পাদক যদি শিথিলপ্রযত্ন ও উপেক্ষমান না হন কৃতকার্য হইতে পারিবেন। অবকাশরঞ্জিকা কেবল নামতঃ নয়, অর্থতও লোকের অবকাশ-রঞ্জিকা হইবে সন্দেহ নাই।[১]

১৮৬৪ সনের জানুয়ারী (মাঘ ১২৭০) মাসে মাসিক **'কাব্যপ্রকাশ'** প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন হরিশচন্দ্র মিত্র।

কাব্যপ্রকাশের ১ম সংখ্যায় সম্পাদক জানান যে 'শিল্প বিজ্ঞান বা জ্যোতি-র্বিদ্যার অনুশীলনার্থ' এই পত্রিকা প্রচারিত হয় নি। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল 'বাঙ্গালীসাহিত্য সংসারে অপেক্ষাকৃত সুশ্রীকতা সম্পাদন'।[২] পত্রিকায় কাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা, প্রহসন 'সাহিত্যের অঙ্গীভূত কৌতুকগর্ভ গল্পাবলী' প্রভৃতি প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল।

কাব্যপ্রকাশের প্রথম সংখ্যার সমালোচনাপ্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ'(৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৪) মন্তব্য করে[৩] ঃ

> 'আমরা ইহার [কাব্যপ্রকাশের] প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে কৌরবদিগের দ্যুতক্রীড়া, বীরবাক্যাবলী, জয়দ্রথ নাটক প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। লেখা মন্দ নহে, পত্রিকামধ্যে পদ্যের ভাগই অধিক। রহস্য ও উপকথাও ইহার অন্তর্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহাতে সম্বাদ বা কোন নূতন প্রস্তাব নাই।...'

কবি হরিশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত সাহিত্য বিষয়ক পত্র **'মিত্রপ্রকাশ'** প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাসে। 'মিত্রপ্রকাশ' মাসিকপত্ররূপে প্রতিমাস অন্তর প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল না। ১ম সংখ্যায় ঘোষণা করা হয়— 'ইহা সংখ্যানুক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।[৪] ইহার আয়তন ৮ ফর্মা, দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৫ পাঁচ টাকা'। প্রথম দুটি সংখ্যা যথাক্রমে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ (১২৭৭) মাসে প্রকাশিত হলেও পরবর্তী দুটি সংখ্যা (৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা)-ই শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। ১ম পর্বের দ্বাদশ সংখ্যার প্রকাশকাল চৈত্র ১২৭৭। ১লা এপ্রিল ১৮৭২ তারিখে হরিশচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু হলে তাঁর অগ্রজ কালিদাস মিত্রের সম্পাদনায় 'মিত্রপ্রকাশ' অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্বের দ্বাদশ সংখ্যা ১২৭৯-র চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ এটি পত্রিকার শেষ সংখ্যা।

---

১. সোম প্রকাশ, ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৬২, 'বাঙ্গলা সাময়িক পত্র' থেকে উদ্ধৃত।

২. ব্রজেন্দ্রনাথ– বাংলা সাময়িক পত্র (১), পৃঃ ১৯৪।

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার হরিশচন্দ্র মিত্র' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত (পৃঃ ৩৯)।

৪. মিত্র প্রকাশ, বৈশাখ ১২৭৭, পৃঃ ২।

'মিত্রপ্রকাশ' সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসা প্রকাশিত হয়। 'ঢাকা প্রকাশ' এ-পত্রিকা সম্পর্কে মন্তব্য করে— 'ঈদৃশ পত্রিকা এদেশে অতি বিরল, নাই বলিলেও হয়' (১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৭)।

সম্পাদক প্রথম সংখ্যা থেকেই বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন, বঙ্গীয় কবিদিগের কাব্যকলাপের পরিচয় প্রদান এবং কাব্য, নাটক, পদ্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি ধারাবাহিক প্রকাশের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। লক্ষ্য করা যায়, সম্পাদক বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন রচনাসম্ভারে 'মিত্রপ্রকাশ'কে সুসজ্জিত করার জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এ পত্রিকায় একদিকে যেমন বিভিন্ন সাহিত্যিকের সৃষ্টিধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে গ্রন্থ সমালোচনা, কবি সাহিত্যিকদের জীবনী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রচিত প্রবন্ধাদি এতে স্থান পায়।

কবি এবং নাট্যকার হিসেবে হরিশচন্দ্র মিত্র সমধিক পরিচিত হলেও তিনি যে একজন সার্থক সাহিত্য সমালোচক ছিলেন, তা তার গ্রন্থসমালোচনা সমূহ পাঠ করলেই বোঝা যায়। এই সমালোচনাগুলির মধ্যে বিহারীলালের চারটি কাব্যের সমালোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মিত্র প্রকাশের অধিকাংশ রচনাই ছিল হরিশচন্দ্র মিত্রের লেখা। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা– নির্বাসিতা সীতা-কাব্য (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা-২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা), শ্রীরাম নির্বাসন (১ম বর্ষ- ২য় সংখ্যা), কন্যাপণ কি ভয়ানক- নাটক (১/ ৯), রাম বনবাস-নাটক (১/১২-২/২), সপত্নী কলহ-নাটক (২/১), হতভাগ্য শিক্ষক (২/৫-৬), পেটুক পঞ্চানন (২/৪) তাঁর রচিত নাটক, প্রহসন বা কাব্য ছাড়াও কয়েকটি মুল্যবান প্রবন্ধ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যেমন, 'বঙ্গভাষার আদি কবি কৃত্তিবাস ওঝার কাব্যসংগ্রহ ও তদীয় পরিচয়' (১ম পর্ব, ১ম সংখ্যা), 'ভণিতা' (১/৪) 'নাটক বা রূপক' (২/১)।

হরিশচন্দ্র মিত্র ছাড়া যাদবানন্দ রায়, জগদ্বন্ধু ভদ্র রাধারমণ ঘোষ প্রমুখ সাহিত্যিক মিত্রপ্রকাশের নিয়মিত লেখক ছিলেন। মিত্রপ্রকাশের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিবিধ বার্তাবলী। এতে সাহিত্য বিষয়ক সংবাদ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে মূল্যবান প্রবন্ধাদি সঙ্কলিত হত।

১৮৭১ সালে ঢাকা থেকে **'ধূমকেতু'** নামে আর একটি সাহিত্য মাসিক প্রকাশিত হয়। এর প্রথম প্রকাশ ৩১ শ্রাবণ ১২৭৮। ঢাকার সুলভ যন্ত্রে পত্রিকাটি মুদ্রিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের সমালোচনা করে বিভিন্ন প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হতো। এর সম্পাদক কে ছিলেন জানা যায় নি। ১৯০৪ সালে ঢাকা থেকে 'ধুমকেতু' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রায় দু'বছর স্থায়ী এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন নীরদ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।[১]

'বান্ধব' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনের' আদর্শে প্রচারিত একটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপত্র কালীপ্রসন্ন ঘোষের সম্পাদনায় ১২৮১ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়। বান্ধব অনিয়মিতরূপে দীর্ঘকাল চলেছিল। বিভিন্ন খণ্ডগুলির প্রকাশকাল নিম্নরূপ ঃ ॥

১ম বর্ষ — ১২৮১, আষাঢ়-চৈত্র

১. মুনতাসীর মামুন— 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র', ২য় খন্ড পৃঃ ২৬০ ও ৩৩৫।

২য় বর্ষ — ১২৮২, বৈশাখ-চৈত্র

৩য় বর্ষ — ১২৮৩, বৈশাখ-চৈত্র

৪র্থ বর্ষ — ১২৮৫ [১২৮৬ সালে কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি।]

৫ম বর্ষ — ১২৮৭

৬ষ্ঠ বর্ষ — ১২৮৮

৭ম বর্ষ — ১২৮৯ [১২৯০ সালে কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি।]

৮ম বর্ষ — ১২৯১

৯ম বর্ষ — ১২৯২ (বৈশাখ-আশ্বিন)

১২৯৩ (কার্তিক-চৈত্র)

১০ম বর্ষ— ১২৯৪ (৫টি সংখ্যা)

১১শ বর্ষ— ১২৯৫ (৩টি সংখ্যা)

(নবপর্যায়) ১ম বর্ষ— ১৩০৮ ফাল্‌গুন— ১৩০৯, মাঘ

২য় বর্ষ — ১৩১০ বৈশাখ-চৈত্র

৩য়-৪র্থ বর্ষ — ১৩১১, ১৩১২

৫ম বর্ষ — ১৩১৩ বৈশাখ-ভাদ্র।'

'বান্ধব' সুলভ মূল্যে প্রচারিত হতো। বার্ষিক মূল্য ছিল এক টাকা, ডাকমাশুল সমেত এক টাকা দুই আনা। এ সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশে' বলা হয়— 'বান্ধবের যেরূপ আয়তন এবং যেরূপ মুদ্রাক্ষর ঘন ঘন পংক্তিতে উহা লিখিত হইতেছে তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহার বার্ষিক মূল্য অতি অল্পই নির্দ্ধারিত হইয়াছে'।[১]

'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' নামে খ্যাত এই 'বান্ধব' পত্রিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

উনিশ শতকে ঢাকা থেকে যে কয়েকটি সাহিত্য পত্র প্রকাশিত হয়েছিল তন্মধ্যে হরিশচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও কালী প্রসন্নঘোষ সম্পাদিত পত্রিকাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে ঢাকায় যে সাহিত্য চর্চার একটি ধারা উৎসারিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ঢাকা থেকে আরও কিছু মাসিক সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া পত্রিকাগুলির বিশেষ কোনো অবদান পরিলক্ষিত হয় না। পত্রিকাগুলি হচ্ছে- **জ্ঞানভেদ** (১৮৭৭), **দুঃখিনী** (১৮৭৯), **ভারত ভিখারিণী** (১৮৭৯), **শ্রীক্ষেত্রচিত্র** (১৮৮১), **নবীন** (১৮৮২), **অধ্যয়ন** (১৮৮৭), **কামনা** (১৮৮৭), **সুদর্শন** (১৮৯৫), **মধুকর** (১৮৯৯) এবং **অদৃষ্ট** (১৮৯৯)।

ঢাকা শহর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার অনুপ্রেরণায় ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এরূপ কয়েকটি পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে প্রদত্ত হলো। মাসিক **'পল্লীবিজ্ঞান'** বিক্রমপুরের

১. ঢাকা প্রকাশ, ৮ আষাঢ়, ১২৮১।

জৈনসার গ্রাম নিবাসী অভয় কুমার দত্তগুপ্তের অর্থানুকূল্যে জৈনসার বঙ্গ বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল জানুয়ারি ১৮৬৭ (মাঘ ১২৭৩)। প্রথম ১০ সংখ্যার (মাঘ ১২৭৩– কার্তিক ১২৭৪) সম্পাদক ছিলেন জৈনসার বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়। একাদশ সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৭৪) থেকে সম্পাদনা করেন আনন্দকিশোর সেন [১]। ঢাকার সুলভ যন্ত্রে পত্রিকাটি মুদ্রিত হয়।

প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়– "যাহাতে পল্লীসমূহের বিশেষতঃ বিক্রমপুরের বিদ্যা ও শিক্ষার উপযুক্তরূপ চর্চা হইতে পারে, যাহাতে আচার ব্যবহারাদি পরিমার্জিত হইয়া সমাজের উন্নতি হইতে পারে এবং যাহা কিছু সাধারণের মঙ্গলের সহিত অনুসৃত সেই সকল বিষয়ই এই পত্রিকায় আন্দোলিত হইবে।"[২] এই উদ্দেশ্য সাধনে পল্লীবিজ্ঞান যে কতটা তৎপর ছিল তা সে পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধেই প্রতীয়মান হয়। প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা যায়, যেমন (১) ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা, (২) দেশের প্রচলিত অব্দ, (৩) ইতিহাস এবং পুরাবৃত্ত, (৪) স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুসন্ধান, (৫) বহুবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা, (৬) দেশীয় ভাষায় পুস্তকালয় ইত্যাদি।

'পল্লীবিজ্ঞান' পত্রিকার আর একটি বিশিষ্টতার কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। সেযুগের পত্রপত্রিকায় সাধারণতঃ শিরোভূষণ স্বরূপ সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হতো, কিন্তু 'পল্লীবিজ্ঞান' পত্রিকায় আমরা বাংলা শিরোভূষণ লক্ষ্য করি ঃ

'গেল পক্ষ গেল মাস কি করিলে কাজ।
তোষিতে ত্রাসিতে দগ্ধ বঙ্গের সমাজ।।
দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত।
হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত'।।

দ্বাদশ সংখ্যা (পৌষ, ১২৭৪) থেকে শুরু করে পত্রিকার শেষ সংখ্যা (আষাঢ় ১২৭৫) পর্যন্ত এই কবিতা পল্লীবিজ্ঞানের শিরোনামায় শোভা পায়।

ঢাকার নান্নার থেকে **'ভারত সুহৃদ'** নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার প্রকাশ কাল ফাল্গুন ১২৮৫। এর সম্পাদক ছিলেন জমিদার অম্বিকা চরণ রায়।

মাসিক 'ভারতসুহৃদ' সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশে' একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ঃ[৩]

> "ভারতসুহৃদ।– সুবিজ্ঞ লেখকগণ দ্বারা এই নামে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির হইবে। ইহাতে অত্যাশ্চর্য উপন্যাস নানাবিধ রহস্য ও আবশ্যকীয় সংবাদাদি থাকিবে।
>
> শ্রী অম্বিকাচরণ রায়,
> জমিদার– নান্নার।"

১. যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত– বিক্রমপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৩৮৯।
২. বাংলা সাময়িক পত্র (১ম খন্ড) পৃঃ ২১০।
৩. ঢাকা প্রকাশ, ১৪ মাঘ, ১২৮৫।

১ম বর্ষের কোন এক সংখ্যায় দীনেশচন্দ্র সেনের ছাত্রাবস্থায় রচিত 'জলদ' নামে একটি কবিতা মুদ্রিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "ভারতসুহৃদ অনিয়মিতভাবে অনেক দিন চলিয়াছিল"।

'ভারত সুহৃদ' পত্রিকা নান্নার গ্রামে স্থাপিত 'ভারত সুহৃদ' যন্ত্রে মুদ্রিত হয়, পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার দাম ছিল তিন আনা, বার্ষিক মূল্য ১ টাকা ৬ আনা, এবং প্রচার সংখ্যা ছিল ৩০০ কপি। প্রথম বর্ষের ৯ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৫ মে, ১৮৮০ সালে, এক বছর বিরতির পর।[১] 'বিক্রমপুর প্রকাশ নামে একটি মাসিকপত্র মহিমচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার বিক্রমপুর থেকে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নান্নার থেকে প্রকাশিত হয় পদ্যময়ী মাসিক **কিরণ**। সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

(খ) সংবাদ সাময়িকী

'ঢাকাপ্রকাশ' ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। বাঙ্গালা যন্ত্রের পরিচালকদের প্রচেষ্টায় এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। তাঁদের মধ্যে ব্রজসুন্দর মিত্র ও দীনবন্ধু মৌলিকের[২] নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু মৌলিকের বিয়োগবার্তায় 'ঢাকা প্রকাশ' সেকথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে ঃ

> 'তাঁহার উদ্যোগ চেষ্টায় এবং অর্থব্যয়ে ঢাকা নগরীতে সর্বপ্রথম বাঙ্গালা যন্ত্র আনীত হয়— ঢাকা হইতে একখানি দেশীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইলে এদেশের বিশেষতঃ ঢাকা অঞ্চলের অশেষ উপকার সংসাধিত হইবে জানিয়া তিনি এই 'ঢাকাপ্রকাশে'র জন্মদান করেন।'[৩]

'ঢাকাপ্রকাশে'র আরও একজন পৃষ্ঠপোষকের নাম পাওয়া যায়, তিনি 'মানিকগঞ্জ মহকুমার ইলিচপুর নিবাসী মৌলভী আবদুল করিম'।[৪]

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'ঢাকাপ্রকাশ' এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁর বেতন ধার্য হয় মাসিক ২৫ টাকা (বাঙ্গালা যন্ত্রের হেড কম্পোজিটারের বেতনের চেয়েও ৫ টাকা কম)। ১২৬৭ সালের ২৫ শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার 'ঢাকা প্রকাশে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম বৎসর রয়েল চার পেজী ফর্মার ৮ পৃষ্ঠায় পত্রিকা প্রকাশিতা হতো এবং বার্ষিক মূল্য ছিল ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা। দ্বিতীয় বৎসরে কলেবর হয় ৩ ফর্মা বা ১২ পৃষ্ঠা এবং বার্ষিক মুল্য ধার্য হয় ডাকমাশুল সমেত ৮ টাকা। পরবর্তীকালে বার্ষিক মূল্য কমিয়ে ৫ টাকা করা হয়। এমন কি ১৩০৯ সাল থেকে 'ঢাকা প্রকাশে'র আকার বর্তমান দৈনিক পত্রিকার আকারের ন্যায় বৃদ্ধি পেলেও বার্ষিক মূল্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। শেষ দিকে

১. মুনসতাসীর মামুন– 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র' ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৩।
২. দীনবন্ধু মৌলিক ঃ প্রথমে ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হন, পরে স্বীয় কর্মদক্ষতার গুণে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে তিনি ব্রজসুন্দর মিত্রের অনুগামী ছিলেন।
৩. ঢাকা প্রকাশ, ২৬ কার্তিক, ১২৭৯।
৪. ক) ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাদ্যায়– কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত, ১৩১৮, পৃঃ ২৫।
খ) কেদারনাথ মজুমদার– বাংলা সাময়িক সাহিত্য (১ম ভাগ), ১৩২৪, পৃঃ ৩৫৯।

অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হলেও পত্রিকাটি প্রায় একশত বৎসরকাল স্থায়ী হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'ঢাকা প্রকাশে'র ৪র্থ বর্ষ ২২শ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। তদানীন্তন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক দীননাথ সেনের সম্পাদকতায় ২৩শ সংখ্যা থেকে ৩৬শ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।[১] কবি দীনেশচরণ বসু একবার ৩ মাস ও আর একবার প্রায় ৫ মাস ঢাকা প্রকাশের সম্পাদকতা করেন।[২]

ঢাকা প্রকাশে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংবাদ ছাড়াও সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হতো। বলা হয়, পূর্ববঙ্গের অভাব-অভিযোগের আলোচনার দ্বারা তত্ত্বৎপ্রতিকারে কর্তৃপক্ষের কৃপ্যাদৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তই ঢাকাপ্রকাশের সৃষ্টি।[৩] 'ঢাকা প্রকাশ' সেযুগের ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চ্চার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিল। নুতন কোনও বই বা সাময়িকপত্র মুদ্রিত হলে তার সমালোচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হতো। সাহিত্য সমালোচনার গুরুত্ব প্রসঙ্গে 'ঢাকা প্রকাশে'র বক্তব্য ছিল ঃ

> "পুস্তক সমালোচন পত্রিকার একটি সর্বপ্রধান অঙ্গ থাকিবে। ভাষার উন্নতি ও সংশোধন পক্ষে পুস্তক সমালোচনা সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ইহা সকলেরই স্বীকার্য, ইহা বিশৃঙ্খল লেখকের হস্তলেখনীকে নিয়মিত করে, ভাষার সৌন্দর্য ও অলঙ্কার পরিবর্ধনে উৎকৃষ্ট লেখককে সাহায্য করে"[৪]।

১৮৬৫ সনে ঢাকায় স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার পর যে নাট্য-আন্দোলন গড়ে উঠে ঢাকা প্রকাশ উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ ও সমালোচনা দ্বারা সে-আন্দোলনে বিশেষ প্রেরণা যোগায়। মাইকেল মধুসুদন দত্ত ১৮৭২ সালে একটি মামলা উপলক্ষে ঢাকায় আসেন। ঢাকা প্রকাশ কার্যালয়ে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য একটি সম্মিলনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৫] দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সাহায্যার্থেও ঢাকা প্রকাশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে 'ঢাকা প্রকাশের' উদ্যোগেই কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সাহায্যার্থে সাহায্য তহবিল খোলা হয়।[৬] ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ঃ

> 'সদাশয় বিদ্বোৎসাহী বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যেভাবে হেমচন্দ্র, দীনেশচন্দ্রকে বৃত্তিদান করিয়াছে, গোবিন্দচন্দ্রের জন্যও সে বৃত্তির চেষ্টা করা আমরা সঙ্গত মনে করিতেছি।[৭]

'ঢাকা প্রকাশে' গল্প উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি প্রকাশিত হতো না। চিন্তামূলক প্রবন্ধ ও আলোচনা এই পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র কবিতা, এমনকি ব্যঙ্গকবিতাও মুদ্রিত হতো।

১. পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'ঢাকাপ্রকাশের জীবনকথা'— ঢাকা প্রকাশ, ৭ বৈশাখ ১৩৩৭
২. ঢাকাপ্রকাশ, ৩১ আশ্বিন, ১৩০৫।
৩. ঢাকাপ্রকাশ, ৭ বৈশাখ ১৩০৯।
৪. ঢাকা প্রকাশ, ২৬ কার্তিক, ১২৭৯।
৫. মধুস্মৃতি, পৃঃ ৫৩৫।
৬. ঢাকা প্রকাশ, ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭০।
৭. ঢাকা প্রকাশ, ৬ আগস্ট ১৯১১।

পাঠকদের রচিত কবিতাও ঢাকাপ্রকাশে মুদ্রিত হতে দেখা যায়। দুজন মুসলমান কবির রচনা এতে মুদ্রিত হয়। মৌলভী ওবেদুল্লা ওবেদীর বিয়োগ-দুঃখে রচিত ঢাকা কলেজের নওসের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী রচিত সুদীর্ঘ শোককাহিনীর অংশ-বিশেষ 'ঢাকা প্রকাশে'র একটি সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়।[১] ঢাকা ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র জনৈক শেখ জালালউদ্দীনের দুটি কবিতা ঢাকা প্রকাশে মুদ্রিত হয়।[২]

মুসলিম সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ ঢাকা প্রকাশে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। ঢাকা প্রকাশে মুদ্রিত সংবাদ বা বিবরণী থেকে আমরা সেযুগের দুটি মুসলিম সংগঠনী 'সমাজ সম্মিলনী' (প্রতিষ্ঠা ১৮৭৯ খ্রিঃ) এবং 'মুসলমান সুহৃদ-সম্মিলনী' (প্রতিষ্ঠা ১৮৮৩)-র বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে পরিচিত হই।

সাপ্তাহিক **'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'** ১৮৬২ সনের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক রামচন্দ্র ভৌমিক। পত্রিকাটি মাত্র এক বৎসর কাল স্থায়ীলাভ করেছিল।

কেদারনাথ মজুমদার তাঁর 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে' ঢাকাবার্ত্তা নামে যে পত্রিকার উল্লেখ করেছেন, তা মূলতঃ ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা।[৩] সত্যেন সেনের মতো 'ঢাকাবার্ত্তা একটি স্বতন্ত্র পত্রিকা।[৪]

'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় **'ঢাকাদর্পণ'** নামে এই নতুন সাপ্তাহিকীটি ১৮৬৩ সনের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়।

'ঢাকাদর্পণ' সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশে' লেখা হয় ঃ

> 'ইহা (ঢাকা দর্পণ) পাঠ করিয়া আমাদিগের যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ ভরসা করিতে পারি, ক্রমেই ইহার উন্নতি সাধন হইবে। ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকার বিরহে আমরা যে বিষম মনস্তাপ ভোগ করিতেছি; ঢাকাদর্পণ দ্বারা তাহা অনেক দূরীভূত হইল। এখন পরমেশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকার দ্বার আবার ঢাকাদর্পণকেও যেন অকাল-মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়া আমাদিগকে মনস্তাপ ভোগ করিতে না হয়।'[৫]

১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এক মানহানির মামলায় জড়িত হওয়ার পর সেপ্টেম্বর মাসে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়।

বালিয়াটি নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত (১৮৬৪) 'বিজ্ঞাপনী যন্ত্র' থেকে সাপ্তাহিক **'বিজ্ঞাপনী'** প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল মার্চ ১৮৬৫। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ৫০্ টাকা বেতনে সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁর সম্পাদনায় 'বিজ্ঞাপনী' একটি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিকপত্রে পরিণত হয়। সমকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 'বিজ্ঞাপনীর' বিশেষ প্রশংসা করা হয় ঃ

---

১. ঢাকা প্রকাশ, ১০ চৈত্র ১২৯১।
২. ঢাকা প্রকাশ, ২৯ ডিসেম্বর ১৮৬৪।
৩. কেদার নাথ মজুমদার– বাঙ্গলা সাময়িক সাহিত্য পৃঃ ৩৬৭।
৪. সত্যেন সেন– প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।
৫. ঢাকা প্রকাশ ১৮৬৩, পৃঃ ২২৯।

ক) 'কলিকাতায় যে যে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে ঢাকার 'বিজ্ঞাপনী' ও 'ঢাকাপ্রকাশ' ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে (সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ১৯ এপ্রিল, ১৮৬৫)।[১]

খ) ঢাকার বিজ্ঞাপনীপত্র মাত্র দুই মাসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষলাভ করিয়াছে দেখিয়া আমরা পুনঃ পুনঃ সন্তোষলাভ করিতেছি (সংবাদ প্রভাকর)।[২]

১৮৬৬ সনের এপ্রিল মাসে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয় এবং জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর সম্পাদনায় বিজ্ঞাপনী পত্রিকা ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সম্ভবতঃ ১৮৬৬ সনের জানুয়ারী মাসে 'বিজ্ঞাপনী'র সম্পাদক-পদ পরিত্যাগ করেন। ঢাকা প্রকাশের এক সংবাদে প্রকাশ ঃ

'শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার অস্বাস্থ্য নিবন্ধন প্রায় ৩ মাস হইল বিজ্ঞাপনীর সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন ... (১০ বৈশাখ ১২৭৩)।'

হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক **'হিন্দু হিতৈষিণী'** ১৮৬৫ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য করে ঢাকা শহরের হিন্দু সম্প্রদায় এ সময়ে 'হিন্দুধর্ম রক্ষিণী' নামে একটি সভা সংস্থাপন করেন। হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকা এই সভার মুখপত্র। ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধাচরণ ও হিন্দুধর্মের সমর্থন ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। হরিশচন্দ্র মিত্র নাকি হিন্দু হিতৈষিণী প্রকাশের 'অল্পপূর্বেও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী বলে পরিচিত ছিলেন।'[৩] 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকাও এ সম্পর্কে মন্তব্য করে—

'হরিশবাবু এতকাল চিরদুঃখিনী বঙ্গ-বিধবাদিগের সপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এক্ষণ তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণের এতাদৃশ পরিবর্তন অসম্ভবনীয়' (১১ জুলাই ১৮৬৫)।[৪]

১৮৬৯ সনের মাঝামাঝি হরিশচন্দ্র মিত্র হিন্দুহিতৈষিণীর কার্যভার ত্যাগ করেন এবং তখন আনন্দচন্দ্র সেন এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

ময়মনসিংহ থেকে দু'বৎসর প্রচারিত হবার পর পত্রিকাটির প্রচার রহিত হয়। 'যন্ত্রাধ্যক্ষদিগের পরস্পরের অনৈক্য অপ্রণয় ও অবহেলা'ই নাকি তার প্রধান কারণ।[৫]

পূর্ববঙ্গ শুভসাধিনী সভার মুখপত্র **'শুভসাধিনী'** ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে (ফাল্গুন ১২৭৭) প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক কালী প্রসন্ন ঘোষ। ১২৭৭ সালেই প্রতিষ্ঠিত 'শুভসাধিনী সভা'র সম্পাদক ছিলেন কালী নারায়ণ রায়।[৬] ডিমাই আকারের

১. বাংলা সাময়িক পত্র ১ম খন্ডে (পৃ. ২০২) উদ্ধৃত।
২. সংবাদ প্রভাকর, ২৯ বৈশাখ ১২৭২ (১০ মে, ১৮৬৫)
৩. আদিনাথ সেন— দীননাথ সেনের জীবনী, ১ম খন্ড, ১৯৪৮, পৃঃ ১৪১।
৪. বাংলা সাময়িক পত্র ১ম খন্ডে (পৃঃ ২০৩) উদ্ধৃত।
৫. ঢাকা প্রকাশ ২৭ ডিসেম্বর ১৮৬৮।
৬. নববার্ষিকী— ১২৮৪, পৃষ্ঠা ১৫৬।

এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক পয়সা মাত্র। 'শুভসাধিনী' পত্রিকায় ধর্মালোচনা, প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা, সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হতো।

'এই ক্ষুদ্র কাগজখানি প্রায় চার বৎসর জীবিত ছিল'।[১]

'হিতকরী' ঢাকা সুলভ যন্ত্র থেকে প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রকাশকাল ফাল্গুন ১২৭৭। 'হিতকরী' এবং 'শুভসাধিনী' উভয় পত্রিকা এক পয়সা মূল্যের। তাই এ-দুই পত্রিকার মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা ছিল। 'উভয় পত্রিকাই জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো'।[২]

সাপ্তাহিক **'ঢাকা দর্শক'**-এর প্রথম সংখ্যা ২১ শ্রাবণ ১২৮২, সালে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের নাম জানা যায়নি। পত্রিকার মূল্য ছিল মাত্র ১ পয়সা। সুলভমূল্যের এই পত্রিকাকে অভিনন্দন জানিয়ে ঢাকার East পত্রিকা লিখেছিলঃ—

> "We welcome the appearance of a pice-paper, 'Dacca Darshaka' . We wish our contemporary every success. This is the third attempt at publishing a pice-paper from here. The object of the paper is no doubt the good of the masses and we hope it will succeed in doing some good in that direction."[৩]

ইতিপূর্বে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পয়সা-মূল্যের পত্রিকা দুটির নাম— 'শুভসাধিনী' (সাপ্তাহিক– ফেব্রুয়ারী ১৮৭১) এবং 'হিতকরী' (সাপ্তাহিক –ফাল্গুন ১২৭৭)।

'ঢাকা প্রকাশে'র মতে 'ঢাকা দর্শক' পত্রিকার উদ্দেশ্য বিশেষ মহৎ ছিল না। সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'ঢাকা প্রকাশে'র মন্তব্যঃ—

> ঢাকা প্রকাশ ও ইহার সাহায্যকারীদের নিন্দাবাদ এবং নিজের আত্মীয় বন্ধুবর্গের গুণকীর্তনই নাকি ঢাকাদর্শকের প্রধান উদ্দেশ্য। যে সংবাদপত্রের লক্ষ্য এইরূপ মহৎ, ভদ্রসমাজে তাহার সমাদরের অসম্ভাবনা কি এবং তাহার চিরস্থায়িতারই বা ভাবনা কি?[৪]

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে দু'টি সাপ্তাহিকী প্রকাশিত হয়— **'প্রতিভা'** (আষাঢ় ১২৮৯) এবং **'জ্ঞানবিকাশিনী (আষাঢ় ১২৮৯)'**। পত্রিকা দু'টির সম্পাদকের নাম জানা যায় নি।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা সারস্বত সমাজের মুখপত্র **'সারস্বতপত্র'** (বৈশাখ ১২৯০) প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রাজবিহারী দাস।[৫] সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ঢাকায় সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই সারস্বত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও আমৃত্যু সম্পাদক ছিলেন।[৬] সত্যেন সেনের মতে প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন 'সারস্বত পত্রে'রও সম্পাদক ছিলেন। 'বান্ধব' পত্রিকায় এই পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়;

---

১. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত– বিক্রমপুরের ইতহাস, ১৩১৬, পৃঃ ২২৫।
২. সত্যেন সেন— প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।
৩. গিরিজাকান্ত ঘোষ রচিত '১২৬৭ সনে ঢাকার সাহিত্য' প্রবন্ধে (প্রতিভা, অগ্রহায়ণ ১৩২৫) উদ্ধৃত।
৪. সত্যেন সেন, প্রাগক্ত, পৃঃ ১৮।
৫. বাংলা সাময়িক পত্র, ২য় খন্ড পৃঃ ৩৮।
৬. সুবোধ চন্দ্র সেন গুপ্ত সম্পাদিত— 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান' পৃঃ ৩০৯।

"ইহা একখানি সংবাদ পত্র।......... যদি সারস্বতপত্র বঙ্গ দেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিতবৃন্দকে বাঙ্গালা সাহিত্য ও ভারতীয় রাজনীতির সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। তাহা হইলে এক মহান উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।"[১]

রাজবিহারী দাসের পর সারস্বত পত্রের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন উমেশ চন্দ্র বসু।[২]

'ঢাকা গেজেট' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৮৬ সনের জানুয়ারী মাসে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। সম্পাদক ভুতপূর্ব East- সম্পাদক শশিভূষণ রায়।

'ঢাকা প্রকাশ' এই পত্রিকাকে অভিনন্দন জানিয়ে মন্তব্য করে ঃ—

"যে কঠিন কাল পড়িয়াছে এবং আমাদের কর্তব্যের ভার দিন দিন যেরূপ গুরু হইতেছে তাহাতে সংবাদপত্রের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর। সহযোগী (ঢাকা গেজেট) বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। আমরা আমাদের নবীন সহযোগীর দীর্ঘ-জীবন কামরা করি।"

কিন্তু, পরবর্তী কালে এই দুই পত্রিকার মধ্যে প্রতিযোগিতা বিরূপতায় রূপান্তরিত হয়।

'ঢাকা প্রকাশের' মতে 'ঘৃণনীয় উপায়ে' ঢাকা গেজেট চলতো।

ঢাকা গেজেট দীর্ঘদিন চলে। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ঢাকাপ্রকাশে(২ ভাদ্র ১৩০৮)-ও এই পত্রিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ঢাকা গেজেট নিয়মিত প্রকাশিত হতো না, মাঝে মাঝেই পত্রিকা বন্ধ থাকতো। ঢাকা প্রকাশের মতে 'হিন্দু ধর্ম ও সৎকার্যের বিরুদ্ধে সর্বদা লেগে থাকাতে সদাশয় হিন্দু মহলে আর 'ঢাকা গেজেট' বিকোত না, ফলে কাগজখানি অদর্শনের হেতু উপস্থিত হয়।[৩]

১২৯৩ সালের সম্ভবতঃ ভাদ্র মাসে সাপ্তাহিক **'গরীবের'র** আত্মপ্রকাশ। ঢাকাপ্রকাশ এক পয়সা মূল্যের এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রসঙ্গে রসিকাতাপূর্ণ মন্তব্য করেঃ—

"গরীব। একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। গরীবের শহর ঢাকা হইতে গরীবের দোসর সংবাদপত্র হওয়া নিতান্তই আবশ্যক ছিল, সেই আবশ্যক এতদ্বারা পূর্ণ হইবে কিনা বলিতে পারিনা। গরীব টিকিয়া থাকিলে বোধ হয় পূর্ণ হইতে পারে। ঢাকা প্রকাশের বয়সে ঢাকায় অনেক সংবাদপত্র হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকেই বিলয় পাইয়াছে, তাহাতেই আমাদের আশঙ্কা হয়, গরীব বেচারা এদুর্দিনে টিকে কিনা? গরীব বলিয়া দয়া করিয়া যদি লোকে এক মুঠা করিয়া অন্ন দেন, তবেই গরীব রক্ষা পাইতে পারে। ভরসা করি, গরীবকে পালন করা সবলের কর্ত্তব্য বোধ হইবে।"[৪]

১২৯৫ সালের ভাদ্র মাসে (১৮৮৮) সাপ্তাহিক 'শক্তি' প্রকাশিত হয়। ঢাকাপ্রকাশের ১৮ ভাদ্র ১২৯৫ সংখ্যায় প্রকাশ— 'ঢাকা হইতে শক্তি নামে আর একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছে'।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার 'Bengal Times' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কেম্প 'শক্তির' নামে মানহানির মামলা আনেন।[৫]

---

১. বান্ধব— ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ১২৮৯।
২. মুনতাসীর মামুন— "উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র" ১ম খন্ড পৃঃ ৭০।
৩. ঢাকা প্রকাশ, ১ অগ্রহায়ণ, ১২৯৭।
৪. ঢাকা প্রকাশ, ৪ আশ্বিন ১২৯৩।
৫. ঢাকা প্রকাশ, ১৮ ভাদ্র ১২৯৫।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতে 'গিরিশচন্দ্র বসু **'শক্তি'** প্রকাশ করেন কিন্তু জনসাধারণের অনুৎসাহে তাহা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিল'।[১]

ঢাকার 'উদ্দেশ্য মহৎ' সভার মুখপত্র সাপ্তাহিক 'উদ্দেশ্যমহৎ' ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। ৮ পৌষ ১২৯৬ তারিখের 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় বলা হয়;

> "কিছুদিন হইল 'উদ্দেশ্য মহৎ' নামে একখন্ড সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। জানিতে পাইলাম চান্নিঘাটে 'উদ্দেশ্য মহৎ' নামে একটি সভা ও একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে।"

লক্ষণীয় বিষয়, প্রায় একই সময়ে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হতো মাসিক 'উদ্দেশ্য মহত'। মুনতাসীর মামুন এই পত্রিকার ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যার (আষাঢ় ১২৯৬) একটি কপির সন্ধান দিয়েছেন। পত্রিকাটির প্রাপ্ত সংখ্যায় 'উদ্দেশ্য মহৎ'' সভার কোনো উল্লেখ নেই।

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে 'অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদপত্র' **'গৌরব'** প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক পয়সা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য আট আনা। ডাকমাশুল সমেত আঠার আনা। ঢাকা প্রকাশের প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলা হয়— 'ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, ঔষধ প্রভৃতি বিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখকগণের প্রবন্ধ সকল থাকিবে'।[২]

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়।

'গৌরব' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অন্নদা প্রসাদ চক্রবর্তী।[৩]

ঢাকা জেলার মফস্বল থেকে ও দু'টি সংবাদ সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়— **পারিল বার্তাবহ** (পাক্ষিক) এবং **বিক্রমপুর বার্তাবহ** (সাপ্তাহিক)।

১২৮১ সালের সম্ভবতঃ পৌষ মাসে 'পারিল বার্তাবহ' আনিস উদ্দীন আহম্মদের সম্পাদনায় ঢাকা মানিকগঞ্জের অন্তর্গত পারিল থেকে প্রকাশিত হয়।

কেদারনাথ মজুমদারের মতে 'বিক্রমপুর বার্তাবহ' নামে একখানা সাপ্তাহিকপত্র কয়েক সপ্তাহ চলার পর বন্ধ হয়ে যায় (ঢাকার বিবরণ, পৃ. ৭৭)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাময়িকপত্র (২) গ্রন্থে এ পত্রিকার নাম উল্লেখ করেন নি।

গ) সমাজ সংস্কারক সাময়িকী

ঢাকা শহর এবং ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত সমাজ-সংস্কার মূলক সাময়িক পত্রের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে **'সংস্কার সংশোধিনী'** নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম করণেই এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে অর্থাৎ সমাজের সংস্কার ও সংশোধন।

বিক্রমপুরের কুকুটীয়াস্থ 'জ্ঞানমিহির বিকাশিনী' সভার মুখপত্র। সম্পাদক– কুকুটীয়া মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক জগন্নাথ সরকার। পত্রিকাটি কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই লোপ পায়। কবিতাকুসুমাবলীতে এই পত্রিকার প্রথম ৩টি সংখ্যার প্রকাশ সংবাদ প্রকাশিত হয়।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের লোনসিংহ গ্রাম থেকে পাক্ষিক **'অবলাবান্ধব'** ১০ই জ্যৈষ্ঠ

১. যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস', ১৩১৬, পৃঃ ২১৫।
২. মুনতাসীর মামুন– 'উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র'— (১ম খন্ড) পৃঃ ১০৫-৬।
৩. ঢাকা প্রকাশ, ২৫ ভাদ্র, ১২৯৫।
৪. মুনতাসীর মামুন- প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।

১২৭৬ প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন লোনসিংহ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করাই' ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।

'অবলাবান্ধব' ঢাকায় সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত হতো এবং তা ঢাকার পত্রিকা বলেই পরিচিত ছিল। পত্রিকাটি ঢাকা থেকে প্রায় এক বছর প্রকাশিত হওয়ার পর কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

ঢাকা সুলভ যন্ত্র থেকে প্রকাশিত ক্ষুদ্রায়তনের **'নারীশিক্ষা'** পত্রিকার প্রকাশকাল ১লা কার্তিক ১২৭৭। এর আয়তন এক ফরমা এবং বার্ষিক মূল্য আট আনা। পত্রিকায় সম্পাদকের কোন নাম ছিল না।

'নারীশিক্ষা' পত্রিকা সম্পর্কে 'মিত্রপ্রকাশে'র সুদীর্ঘ মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

'অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে আমরা সম্পাদককে উৎসাহ দিতে পারিলাম না; সংসারে দংশ মশকাদির উৎপত্তি বিনাশ যেরূপ অতি অল্প কালেই ঘটিয়া থাকে; সাহিত্য সংসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকাসকলও সেইরূপ অতি অল্প সময়েই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য নিতান্ত গুরু, এই গুরুতর বিষয়ে সহজে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই; সম্পাদক যদি ঈদৃশ মাসিক পত্রিকা প্রচার না করিয়া বৎসরান্তে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দ্বাদশ ফরমার এক এক খানি পুস্তক প্রচার করিতেন, তাহা হইলে উহা দ্বারা পত্রিকা অপেক্ষা নারী জাতির বিশেষ উপকার হইত। এক্ষণে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে যে কয়খানি পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, তাহার কোনখানিও ইহা হইতে নিকৃষ্ট নহে, সুতরাং নারী শিক্ষার গ্রাহকাধিক্যের আশা অত্যল্প। নারী শিক্ষা সম্পাদক নিয়মস্থলে লিখিয়াছেন, "যাঁহারা হিন্দু হিতৈষিণীর সহিত এই পত্রিকা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের পৃথক ডাক মাশুল লাগিবে না।" যাঁহারা হিন্দু হিতৈষিণীর গ্রাহক তাঁহারা প্রায়ই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, অতএব এই উপায়ে যে, গ্রাহকাধিক্য হইবে এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা হিতৈষিণীর গ্রাহক নহেন, এই পত্রিকা গ্রহণ ইচ্ছা করিলে "কবুতরের কল্যাণে মহিষ বলিদান" দেওয়ার ন্যায় তাঁহাদিগকে পত্রিকার মূল্য আট আনা এবং ডাক মাসুল বার আনা দিতে হইবে। এরূপ অপব্যয় স্বীকারে অতি অল্প লোকের মতি জন্মে। স্থানীয় গ্রাহকগণ যে, এখানিকে উৎসাহ দিবেন, তাহার ভরসাও অল্প, কারণ এ নগরে স্ত্রীশিক্ষা বন্ধুর সংখ্যা সমধিক নহে; শিক্ষানুরাগিনী- স্ত্রীলোক এ নগরে নাই বলিলেও অসঙ্গত হয় না, এমতবস্থায় ইহার জীবনের আশা কি? যদি কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র এখানির সম্পাদক হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাকে উৎসাহ দিতে প্রস্তুত আছি; কারণ এই সদুপায়ে তাহার রচনা শিক্ষা মার্জিত হইতে পারিবে। সম্পাদক যদি যুবক বা পরিণত বয়স্ক হন তাহা হইলে তাঁহাকে এই পরামর্শ দানে প্রস্তুত আছি যে, তিনি এরূপ ক্ষুদ্র নারী-শিক্ষার পত্রিকার সম্পাদকতার পরিবর্তে গ্রন্থ লিখিতে যত্ন করুন সহজে কৃতকার্য হইবেন।'[১]

মহাপাপ বাল্যবিবাহ (মাসিক) স্বনামখ্যাত ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়[২] প্রতিষ্ঠিত বাল্য-বিবাহ নিবারণী সভার মুখপত্র। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভাই নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' সম্পাদনা করেন। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ ১২৮০।

১. মিত্র প্রকাশ. ১ম পর্ব, ৬ সংখ্যা ১২৭৭।

২. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯১০) : জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ-ডি উপাধি পান (১৮৮৩)।

পত্রিকাটি প্রায় ২ বৎসরকাল প্রকাশিত হয়।[১]

প্রথম বর্ষের (১২৮০) পত্রগুলি একত্রে বাঁধাই করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। আয়তন ৮ পেজী ফর্মার ৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন আনা। প্রথম বর্ষের সংখ্যাগুলির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেঃ—

'ইহাতে অনেকগুলি কাজের কথা আছে— বাল্যবিবাহ প্রথা অশেষ অনিষ্টের কারণ, বিবিধ যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা ইহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে'।[২]

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিতে এই পত্রিকা সম্পর্কে লিখেছেন;

তখন ঢাকা সমাজ সংস্কারের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে এক পত্রিকা ঢাকা হইতে বাহির হয়, তাহাতে সেখানকার যুবকদলের উপরে আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মে।[৩]

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে **'সমাজ সংস্কার'** নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন বিহারী লাল সরকার। ১৮৮৫ সালের নভেম্বর মাসে (কার্তিক ১২৯২) প্রকাশিত হয় কালীচরণ বসু সম্পাদিত **'বঙ্গবালা'**।

ঘ) ধর্ম ও তত্ত্ব জ্ঞান বিষয়ক সাময়িকপত্র

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের 'সঙ্গতসভার' মুখপত্ররূপে **'বঙ্গবন্ধু'** ১২৭৭ সনের ১লা শ্রাবণ প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রতি মাসের ১ম ও ১৬শ তারিখে এ পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন ঢাকা পোগজ স্কুলের শিক্ষক বঙ্গচন্দ্র রায়। ৩ ফর্মা আয়তনের 'বঙ্গবন্ধু'র ডাকমাশুলসহ বার্ষিক মূল্য ছিল সাড়ে চার টাকা।

'ঢাকা প্রকাশে' প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে এ পত্রিকার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয় ঃ

"নর, নারী, জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাধারণের ধর্মভাব বর্দ্ধন সম্বন্ধে আলোচনা; উদারভাবে গবর্ণমেন্ট ও প্রজাবর্গের সম্মিলন সংসাধক পরস্পরের কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ এবং সর্বপ্রকার ভ্রম ও কুসংস্কারমূলক সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তন বিষয়ে উপায় প্রদর্শন ও সামাজিক সর্বপ্রকার উন্নতির সহকারিতা করিলে সহযোগীদের সহিত বন্ধুভাব সংরক্ষণপূর্বক পরস্পরের সাহায্যে দেশের কল্যাণ সাধন করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য"।[৪]

'বঙ্গবন্ধু' দু' বৎসরকাল পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর ১২৭৯ সনের ১লা শ্রাবণ থেকে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময়ে পত্রিকাটি ইংরেজী প্রবন্ধ সহকারে দ্বি-ভাষিকপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী অংশের নাম ছিল 'Friends of Bengal'. দু'বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে পত্রিকাটি 'পুনরায় বাঙ্গলা বঙ্গবন্ধু নামেই শুধু ধর্ম ও নীতি বিষয়ে দেশ সেবার ভার গ্রহণ করিয়া পাক্ষিক ২ ফর্মা আকারের প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে'।[৫]

'বঙ্গবন্ধু' ৩৪ বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩১০) পর্যন্ত ঢাকা থেকে নিয়মিত

---

১. হেমলতা সরকার– 'স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র', ১৯১৫, পৃঃ ৩৪৭।

২. ঢাকা প্রকাশ, ৮ আষাঢ় ১২৮১।

৩. শিবনাথ শাস্ত্রী– আত্মচরিত, সিগনেট– সংস্করণ, ১৩৫৯, পৃঃ ১০৫।

৪. ঢাকা প্রকাশ, ২৬ জুন ১৮৭০।

৫. বঙ্গবন্ধু (মাসিক) ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১৬; 'সম্পাদকের নিবেদন', পৃষ্ঠা ২।

প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকার কার্যালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ (পৌষ, ১৩১০) থেকে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 'বঙ্গবন্ধু' কলিকাতা থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

'বঙ্গবন্ধু' পুনরায় ঢাকা থেকে মাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হয় ১৩১৬র অগ্রহায়ণ মাসে।

১২৮৩ সালে আষাঢ় মাসে (১৮৭৬) **'ধর্মপ্রকাশ'** নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের নাম অজ্ঞাত। পত্রিকাটির বিষয়ে আর কোন তথ্য জানা যায়নি।

পাক্ষিক **'রত্নাকর'** (১৮৮৪) ঢাকা শীতল যন্ত্রে মুদ্রিত 'হিন্দু ধর্ম প্রচারক' পত্রিকা। পত্রিকাটি 'শ্রীবাঁশীনাথ বসাক দ্বারা সম্পাদিত এবং শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত'। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় এই পত্রিকা সম্পর্কে বলা হয়: Organ of the new Hindu religious revial".

'তত্ত্ব বিদ্যা, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও অর্থ শাস্ত্র প্রচারক পত্রিকা **'মহাবিদ্যা'** ১৮৮৫ (অগ্রহায়ণ ১২৯২) সালে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য।

সেবক (মাসিক) 'পূর্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী'র মুখপত্র। ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল আশ্বিন ১২৯৮ (১৮৯১)। সম্পাদক শশিভূষণ দত্ত, এম.এ.। দু'বৎসর চলার পর 'সেবক' কিছুদিন বন্ধ থাকে। তৃতীয় বর্ষের পত্রিকা ১৩০১ সালের মাঘ মাস থেকে প্রকাশিত হয়। 'সেবক' সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশের' মন্তব্য ঃ

> 'সেবক নামক একখানি মাসিক পত্র মধ্যে মধ্যে আসিতেছে। সেবকের উচিত প্রভুদিগের যথাসাধ্য সেবা করা। আমরা কিন্তু এ পর্যন্ত তুষ্ট হইবার উপযুক্ত সেবা পাই নাই'।[১]

ঙ) চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা

'ভিষক' বা 'The Physician' চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল জানুয়ারী, ১৮৮১। ঢাকা ভৈষজ্য-সমালোচনী সভার মুখপত্র। 'ভিষক' সম্পর্কে 'বান্ধবে'র মন্তব্য [২] ঃ

> 'বাবু সূর্য্য নারায়ণ ঘোষ, বাবু দুর্গাদাস রায় এবং বাবু কালীচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি চিকিৎসাবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণ কর্তৃক এখানি সম্পাদিত হইতেছে। সুতরাং ইহা না বলিলেও সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা বাঙ্গালা চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা আছে। এদেশে ইদানীং অনেক হাতুড়িয়া বৈদ্যের আবির্ভাব হইয়াছে ইহারা যমের অবতার। যাহাকে ধরে তাহার আর রক্ষা নাই। ... আমরা ভরসা করি ভৈষজ্য সমালোচনী সভার সভ্যগণ এবং উহার সদ্যুসাহশীল সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন এই পত্রিকাখানিকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিতে সর্বতোভাবে যত্নশীল রহিবেন এবং বঙ্গের ধনী সন্তানেরা অর্থানুকুল্যে ইহার উপকার করিবেন।'

কেদারনাথ মজুমদারের (ঢাকার বিবরণ, পৃঃ ৭৭) মতে 'ভিষক' ১৮৮৫ সনে বন্ধ হয়ে যায়।

১. ঢাকা প্রকাশ, ২৭ শ্রাবণ, ১৩০২।
২. বান্ধব ১২শ সংখ্যা, ১২৮৭, পৃঃ ৫৬৫–৬।

হোমিওপ্যাথি প্রচারক ঢাকা গিরিশ প্রেসে মুদ্রিত ও পূর্ণচন্দ্র সেন সম্পাদিত হোমিও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিকপত্র। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ ১২৯০।

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দের বেঙ্গল লাইব্রেরী তালিকা থেকে জানা যায় 'হোমিওপ্যাথি প্রচারকের'র ১২শ সংখ্যা অক্টোবর (১৮৮৪) মাসে প্রকাশিত হয়— পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০, মূল্য আট আনা এবং মুদ্রিত কপির সংখ্যা ৩০০।

'হোমিওপ্যাথি প্রচারক' ঢাকা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল স্কুল থেকে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী কালে এর নতুন নামকরণ হয় 'হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞান প্রচারক'।[১]

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিষয়ক মাসিকপত্র **আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনীর** প্রথম প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১২৯১ (১৮৮৪)। 'কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের অনুমতি অনুসারে কবিরাজ আনন্দপ্রসাদ সেন এবং কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেনের তত্ত্বাবধানে ভগবতীপ্রসন্ন সেন ও কবিরাজ হরিপ্রসন্ন সেন কর্তৃক সম্পাদিত'।

ঢাকাপ্রকাশের মতে 'পত্রিকাখানি যেভাবে সম্পাদিত হইতেছে তাহা সন্তোষ ও আশাজনক'।[২]

ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে মুদ্রিত **'হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক'**-এর সম্পাদক ছিলেন কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য। প্রথম প্রকাশকাল কার্তিক ১২৯২ (১৮৮৫)।

চ) হাস্যরসাত্মক পত্রিকা

ঢাকার খ্যাতনামা প্রহসন রচয়িতা হরিহর নন্দীর সম্পাদনায় হাস্যপ্রধান পত্রিকা 'অপূর্ব রহস্য' ১২৮৭ সালে শ্রাবণ মাসে (১৮৮০) প্রথম প্রকাশিত হয়। **'অপূর্ব রহস্য'** সম্ভবতঃ স্বল্পায়ু পত্রিকা ছিল।

১৮৮১ সালে হরিহর নন্দী **'সদানন্দ'** নামে আর একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এটি ছিল 'রসপ্রধান বিদ্রূপপত্র'। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১২৮৮। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'সদানন্দ' সম্পর্কে নিম্নলিখিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়ঃ—

> "সদানন্দ। বিদ্রূপপত্র। ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুন্সি মওলাবক্স প্রিন্টার কর্তৃক মুদ্রিত। পঞ্চানন্দের দেখাদেখি সদানন্দ, রসিকরাজ প্রভৃতি অবতীর্ণ হইয়াছেন। একখানি মাসিক পত্রিকা সমগ্র হাস্যরসে পূর্ণ করিয়া মাসে মাসে প্রকাশিত করা গোপালভাঁড়েরও সাধ্যায়ত্ত নহে। যাত্রার মধ্যে মধ্যে সং ভাল লাগে, তাহা বলিয়া আগা-গোড়া সং কেহ সহ্য করিতে পারে না। সকল রসের সীমা আছে; কোন প্রধান রস দীর্ঘকাল মন্থন করিলে সে রস নষ্ট হইয়া যায়, ভাঁড়ামিরত কথাই নাই।"

'সদানন্দ' নিয়মিত প্রকাশিত হয় নি। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় প্রকাশিত হয়। 'ঢাকা প্রকাশে' (৮ মাঘ ১২৯৫) বলা হয়— "হরিহর নন্দীর 'সদানন্দ' পুনরায় প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে ইহার প্রথম সংখ্যা পাইয়াছি; বিদ্রূপ-প্রিয়গণ পক্ষে ইহা একটি উপলক্ষ হইবে।'

---

১. G. W. Shaw- Printing & Publishing in Dhaka. 1859-1900. (ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটির এক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ)।

২. ঢাকা প্রকাশ, ১৪ পৌষ ১২৯১।

১৯০১-এর বেঙ্গল লাইব্রেরী তালিকায় সদানন্দের কয়েকটি সংখ্যার প্রকাশ-সংবাদ পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর (১৯০১) মাসে প্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ এবং মুদ্রিত কপির সংখ্যা ৫০০।

ছ) বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

রামধনু ঢাকা কলেজের ল্যাবরেটরি এ্যাসিস্টেন্ট সূর্যনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত শিল্প ও বিজ্ঞানবিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল জুন ১৮৮২। প্রায় পাঁচ বৎসরকাল 'রামধনু' নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

প্রথম চার বৎসরের 'রামধনু' ১৩২২ সালে ৭০০ পৃষ্ঠায় এক গ্রন্থের আকারে পুনর্মুদ্রিত হয়। 'মানসী' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩২২) উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয় ঃ

"ইংরাজি ১৮৮২ সনে ঢাকা হইতে রামধনু সাপ্তাহিক পত্রাকারে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বঙ্গভাষায় ইহাই বোধ হয় সর্বপ্রথম শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র। পরে বুঝি এখানি মাসিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল। ..... ৭০০ পৃষ্ঠায় শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে, ভাষা-ও সহজবোধ্য, কিন্তু সুব্যবস্থার অভাবে ইহার উপকারিতা অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে।"

জ) আইন বিষয়ক পত্রিকা

বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত **নবব্যবহার সংহিতা** পত্রিকার প্রকাশকাল আগষ্ট ১৮৬০। সম্পাদক– 'ঢাকা সদর আমীনের অন্যতর উকীল' রামচন্দ্র ভৌমিক। 'নবব্যবহার সংহিতা'র বার্ষিক চাঁদা ছিল ৪ টাকা। ১০ সেপ্টেম্বর (১৮৬০) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই পত্রিকার ১ম সংখ্যার প্রাপ্তি স্বীকার দেখা যায়। সরকারী গেজেট থেকে 'আইন, সারকুলার অর্ডার ও অন্যান্য বিধি' পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। সরকারী অর্ডার, সার্কুলার ইত্যাদির প্রাপ্তি সাপেক্ষে কখনো পাক্ষিক আবার কখনো বা মাসিক পত্ররূপে আত্ম-প্রকাশ করতো। তবে, এভাবে অনিয়মিত প্রচারিত হলেও পত্রিকাটি বেশ কিছুদিন স্থায়ীলাভ করেছিল বলে অনুমান করা যায়। ১৮৬২ সনের ১৪ এপ্রিল সোম-প্রকাশে নবব্যবহার সংহিতার নিম্নরূপ বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয় ঃ

> প্রতি মাসে গভর্ণমেন্টের গেজেটে যে সকল আইন ও সারকুলার অর্ডার এবং রাজকীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় তত্ত্বাবতের অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া 'নবব্যবহার সংহিতা নাম' পত্রিকাকারে প্রতি পক্ষে, প্রতি মাসে আমি প্রকাশ করিতেছি এবং অনতিবিলম্বে সপ্তাহে প্রকাশ করিতেও অঙ্গীকৃত হইয়াছি। আইনাদির বাঙ্গালা অনুবাদ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাকারে প্রকাশ করিবার একাধিকারী হইবার জন্য ১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে গবর্ণমেন্ট রেজিষ্টারী করিয়াছি। যখন আমি সাধারণের রাজনিয়মন শিক্ষার এক নূতন উপায় ও সুবিধা সংস্থাপন করিয়া সর্বাগ্রে গবর্ণমেন্টে রেজিষ্টারী করিয়াছি তখন আইনাদির বাঙ্গালা অনুবাদ পত্রিকা-কারে প্রচার করিতে কেবল আমি একাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব গবর্ণমেন্টের আদেশ অনুযায়ী কার্য্যকরণার্থ সর্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন কর।

সাময়িকপত্রে সেকালের ঢাকা— ১

উনিশ শতকের কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য সাময়িকপত্র থেকে ঢাকা সম্পর্কিত সংবাদাদি এখানে সঙ্কলিত হলো। বলা আবশ্যক, এ-সঙ্কলন সামগ্রিক নয়। কারণ, পত্র-পত্রিকাগুলির যে কয়েকটি সংখ্যা দেখার সুযোগ ঘটেছে, শুধুমাত্র সেগুলো অবলম্বনেই এই সংবাদ সঙ্কলন। পত্রপত্রিকাগুলি দুষ্প্রাপ্য। ইতিপূর্বে প্রকাশিত সঙ্কলন গ্রন্থেও এই সংবাদসমূহ স্থান পায়নি। তাই অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকদের জন্য ঢাকা বিষয়ক কিছু সংবাদ এখানে প্রকাশ করা গেল।

এ-সংবাদগুলি 'সংবাদপ্রভাকর' "ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র', 'সোমপ্রকাশ', 'মধ্যস্থ', 'অনুসন্ধান' ও 'সুধাকর' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। এ সব সাময়িকপত্র ঢাকার বাইরে থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকার সংবাদাদাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঢাকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সূত্রেই সংগৃহীত। তথ্যসুত্র স্বীকার সেকালের সাংবাদিকতার একটি প্রচলিত রীতি ছিল। তাই, প্রায় সংবাদের শুরুতে আমরা লক্ষ্য করবো— 'ঢাকা নিউস সম্পাদক বলেন...', 'ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক বলেন...', 'ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী পাঠে জানা গেল....' ইত্যাদি মন্তব্য। কোনো কোনো পত্রিকায় এজাতীয় ঋণস্বীকার না থাকায় 'ঢাকাপ্রকাশ' একদা অভিযোগ করে যে, কলিকাতার সংবাদসমূহের মধ্যে অধিকাংশই 'অসৎ প্রকৃতির' কারণ 'পরকীয় সংবাদ' পরিবেশনই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য (ঢাকা প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩০৭)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' (২৮ জানুয়ারি, ১৯৩১) প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হলেও ১৪ জুন ১৮৩৯ তারিখ থেকে দৈনিক সংবাদপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে,। ২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯ ঈশ্বরগুপ্ত পরলোকগমন করলে তাঁর অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক হন। 'ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র' (পাক্ষিক)-এর প্রকাশ কাল মে, ১৮৬১। বিনামূল্যে বিতরিত এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তারকচন্দ্র চূড়ামণি। সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ (১৫ নভেম্বর ১৮৫৮) সম্পাদনা করেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। নাট্যকার মনোমোহন বসু সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মধ্যস্থ' পত্রিকার আবির্ভাব ১৩ এপ্রিল ১৮৭২ তারিখে। প্রায় দেড় বছর সাপ্তাহিক পত্ররূপে নিয়মিত প্রকাশের পর 'মধ্যস্থ' মাসিকপত্ররূপে প্রচারিত হয়। অনুসন্ধান সমিতির পাক্ষিকপত্র (১৩ শ্রাবণ ১২৯৪) 'অনুসন্ধান'-এর সম্পাদক ছিলেন দুর্গাদাস লাহিড়ী। সাপ্তাহিক 'সুধাকরের' প্রথম প্রকাশ ১৮৮৯ এবং নভেম্বর মাসে। সম্পাদনা করেন শেখ আবদুর রহিম।

'সংবাদপ্রভাকর' থেকে আমরা সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) সম্পর্কে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ সঙ্কলন করেছি। দেখা যায়, 'সংবাদপ্রভাকর' সিপাহী বিদ্রোহকে বিশেষ সুনজরে দেখে নি। বিনয় ঘোষও লক্ষ্য করেছেন যে, 'অত্যন্ত বিসদৃশভাবে প্রভাকরের রাজভক্তির আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে'। তিনি অবশ্য মনে করেন, এ দোষ প্রভাকর বা তার সম্পাদকের একার নয়, প্রায় সমগ্র বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর (সাময়িকপত্রে

বাংলার সমাজচিত্র-- ২, ১৯৭৮, পৃঃ ২৪৫)। এর ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সংবাদেই দেখবো মুদ্রাকর আইন প্রবর্তনের পর কোনো কোনো পত্রিকার প্রকাশ রহিত হয়, কোনো কোনো পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনভঙ্গের অভিযোগও আনা হয়; অন্যদিকে প্রভাকরের রাজভক্তি প্রদর্শনের হাস্যকর প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় 'বর্তমান রাজবিদ্রোহিতা বিঘটিত বিপদ বিনাশের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা' বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। সাতজন ছাত্র রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ('সংবাদ প্রভাকর' ১ বৈশাখ ১২৬৫)।

উনিশ শতকের ঢাকা সামাজিক সংস্কার থেকে মুক্ত ছিল না। তাই লক্ষ করা যায়, এখানে বাল্যবিবাহ বহুল প্রচলিত ছিল। তিন বৎসর বয়স্ক পাত্রের সঙ্গে এক বৎসর বয়স্কা পাত্রীর বিবাহের সংবাদও আমরা দেখেছি। অন্যদিকে বিধবা-বিবাহে উৎসাহীরা ভয়ে ও আতঙ্কে দিন কাটিয়েছে।

ঢাকা নগরীতে উন্নয়নমূলক তৎপরতা ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠার (১ আগষ্ট ১৮৬৪) পরই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শুরুতে ঢাকা শহরের করদাতার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬ হাজার ৬০ আর ১৮৬৫–৬৬ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ছিল ৫৯৪৯২ টাকা ও ৪৮৪০৯ টাকা। (দ্রষ্টব্য– ঢাকার বিবরণ– কেদারনাথ মজুমদার, ১৩১৬, পৃঃ ১৪০ ও ১৪১)। উন্নয়নমূলক কাজ ব্যক্তিগত দানের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ সময়ে ঢাকার নবাব খাজা আবদুল গনী এবং নবাব আহসান উল্লাহ বাহাদুর ঢাকায় কলের জল সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক বাতি প্রকল্পে কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন। আমাদের সঙ্কলিত সংবাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংবাদে তাঁদের দানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। জানা যায়, নবাব বাহাদুর জলের কল প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শর্তে অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন, সে শর্তটি হচ্ছে যে 'নগরবাসীদিগকে এজন্য যেন করভারে প্রপীড়িত না করা হয়' (ঢাকার বিবরণ, পৃঃ ১৪৫)। সেকালের ঢাকা-নগরবাসী কতটা করভারমুক্ত হতে পেরেছিলেন তা আমাদের জানা নেই।

পূর্ববঙ্গে রেলওয়ে লাইন প্রবর্তন একটি স্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নেই। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঈসটার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি' নামে একটি প্রাইভেট কোম্পানি পূর্ববঙ্গে রেলপথ খোলে। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে 'ঈসটার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে' সরকারের হাতে আসে। প্রাইভেট রেলওয়ে কোম্পানির আমলে যাত্রীদের যে কি দুর্ভোগ পোহাতে হতো তার পরিচয় 'সংবাদ-প্রভাকরে'র একটি সংখ্যায় (১৫. ৩. ১২৬২) পাওয়া যায়। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও কৌতুহলী পাঠকদের জন্য সে সংবাদের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো।

> আহা যাহারা তৃতীয় শ্রেণীর শকটারোহণে গমনাগমন করে তাহারদিগের দুঃখ বর্ণনা করা যায় না, কোনো ব্যক্তি হাবড়াতে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিতে গেলে কি সাহেব কি সামান্য চাপরাসি সকলেই তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠে, ধাক্কা দেয়, ঠেলা মারে, সময়ে সময়ে বেত্রাঘাতও করিয়া থাকে, ঐ ব্যক্তি ঐ সমস্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া যদ্যপি টিকিট প্রদানের গর্ত্তের সম্মুখে গিয়া তিন আনার একখানি টিকিট চাহে তবে বিক্রেতা রৌপ্য মুদ্রা চাহেন। ক্রেতা তিন আনা মূল্যের রৌপ্য মুদ্রা কোথায় পাইবে, অতএব যদ্যাপি টাকা কিম্বা আধুলি দিয়া অবশিষ্ট পয়সা চায় তাহা গোলযোগে প্রায়ই প্রাপ্ত হয় না। সুচতুর ও বলবান লোকেরা তাহা পাইয়া থাকে।

এইরূপে টিকিট ক্রয় করিতে পারিলেই যে ঐ ব্যক্তির ক্লেশ নিবারণ হয় এমত নহে। সে গাড়ীতে উঠিবার স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে তথাকার প্রহরিরা তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয়! এই সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া গাড়ি আরোহণ করিলেও তাহার নিস্তার নাই, সাহেব ও চাপরাসিগণ গাড়িতে অধিক লোক পুরিবার নিমিত্ত ঘুসা ও ধাক্কা মারিতে থাকেন, এইরূপে পরিপূর্ণ হইলে এবং সকলের অঙ্গ প্রসারণের শক্তি অবরোধ হইলেও যদ্যপি কোনো ব্যক্তি টিকিট লইয়া উপস্থিত থাকে তবে তাহাকে জানোয়ারের গাড়িতে তুলিয়া লয়েন, তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিদিগকে যে প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হয় তাহা আর লিখিতে পারিনা।

(বিনয় ঘোষ সম্পাদিত 'সাময়িকপত্রে সমাজ চিত্র— ২ '১৮৭৮, থেকে উদ্ধৃত)

বর্তমানে আমাদের রেলওয়ে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন না হলেও অতীতের তুলনায় সাধারণ যাত্রীদের দুর্দশা এখনো কম নয়। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি কর্তৃপক্ষ বা উর্দ্ধতন শ্রেণীর যাত্রীদের মানসিকতারও কি বেশি পরিবর্তন হয়েছে?

বিচারবিভাগের কর্মচারীদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞানের অভাব বিষয়ক কয়েকটি সংবাদ আমরা সেকালের সাময়িকপত্রে পেয়েছি। দেশী কি বিদেশী বিচারপতিদের দুর্ব্যবহার বা দুর্নীতির কথা শুধু ঢাকা নয় সারা বাংলাদেশেই একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল বলে মনে হয়। 'সোমপ্রকাশ' তাই দুঃখ করে বলেছিল— 'সকল বিচারকর্তার প্রায় এক দশা' (১৫ এপ্রিল ১৮৬১)। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো ব্যক্তিকেও যে বিচারপতির হাতে হয়রানী হতে হয়েছিল, এমন একটি সংবাদ 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত হয়। ঘটনাটি বেশ কৌতুকপ্রদ ঃ

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ছোট আদালতে সাক্ষ্য দিবার এক পরয়ানা আইসে। তিনি তথায় উপস্থিত হন, কিন্তু জজ তাহা জানিতে না পারিয়া তাঁহার দশ টাকা করেন। তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ধৃত করা হয়। পরিশেষে তাঁহার নির্দোষতা সপ্রমাণ হওয়াতে তাঁহাকে ক্ষমা করা হইয়াছে। জজেরা কি মনোযোগী!

('সোমপ্রকাশ' ১ এপ্রিল ১৮৬১)

১৮৭২-এর দিকে ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' নামে একটি নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পরই প্রকৃতপক্ষে ঢাকার নাট্যান্দোলনের সূত্রপাত। এখানেই প্রথম টিকেটের বিনিময়ে নাট্যাভিনয়ের প্রদর্শন শুরু হয়। কলিকাতায় নাট্যাভিনয়ে টিকেটের প্রবর্তন অনেক পরবর্তী ঘটনা। সেক্ষেত্রে ঢাকা পথিকৃতের দাবীদার। ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের কর্মকর্তারাই ছিলেন 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'র পরিচালক। তাই ঢাকায় নাট্যাভিনয়ের জন্য ব্রাহ্মসমাজও নিন্দিত হয়েছে। মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' ঢাকার নাট্যমঞ্চে বহুবার অভিনীত হলেও তৎসম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিকে ব্রাহ্ম সমাজগৃহ বলা হয় এবং তথায় নাট্যাভিনয়ের জন্য মন্তব্য করা হয়— 'ব্রাহ্মদিগের ধর্মে বিলক্ষণ মতি' (মধ্যস্থ, ৩০ বৈশাখ, ১২৭৯)।

সেকালের সাময়িকপত্রে প্রকাশিত সংবাদে আমরা আর একটি বিষয় দেখি, তা হচ্ছে প্রায় সংবাদের শেষে বিশেষ মন্তব্য বা ফোঁড়নের সংযোজন। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে সঙ্কলিত বিভিন্ন সংবাদে আমরা বেশ কিছু কৌতুককর মন্তব্য লক্ষ্য করবো।

ক. সংবাদ প্রভাকর

১. ১৮৬৭ সালের ঘটনাবলী

সন ১২৭৪ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ

— বৈশাখ—

— ৩৪ গণিত দেশীয় পদাতিক দলের মঙ্গলপাণ্ডা নামক সিপাহি বারাকপুরে সারজেণ্ট মেজর সাহেবের প্রতি অস্ত্রাঘাত করাতে কোর্ট মর্সিয়েল বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়।

— ২ সংখ্যক গ্রিনেডিয়র পলটনের যে দুইজন সিপাহি টাকশাল ও টেজুরির সিপাহিদিগকে কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছিল কোর্ট মর্সিয়েল বিচারে তাহারা উভয়েই চতুর্দশবর্ষের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হয়।

— জ্যৈষ্ঠ—

— ঢাকা নগরবাসি যবনেরা অতিশয় গর্ব্বিত হওয়ায় তথায় সৈন্য প্রেরিত হয়।[১]

— গবর্ণমেণ্ট ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা এক বৎসরের জন্য নিবারণ করনার্থ এক নূতন নিয়ম প্রকাশ করেন।[২]

— আষাঢ়—

— ৭৩ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সেনারা ঢাকা অঞ্চলে উপদ্রবারম্ভ করে।

—শ্রাবণ—

— ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা নাশক আইন প্রচার হইবার রঙ্গপুর বার্তাবহপত্র [৩] এবং হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সের[৪] প্রভৃতি কয়েকখানা পত্র উঠিয়া যায়।

— ঢাকা কলেজের ৫ জন ছাত্র সিনিয়র ছাত্রীর বৃত্তি এবং ১৪ জন ছাত্র জুনিয়ার ছাত্রীয় বৃত্তিপ্রাপ্ত হন।

---

১. ঢাকা কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল মিঃ ব্রেনান্ড ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহের বিস্তারিত বর্ণনা তাঁর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন— At the end of May or beginning of June, two other companies of the 73rd arrived from Jalpaigoree. (দ্রষ্টব্য Echoes of the India Mutiny at Dacca, The Dacca Review, Vol. V, 1915, P. 244).

২. তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ১৩ জুন ১৮৫৭ থেকে ১৩ জুন ১৮৫৮ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে যে আইন প্রবর্তন করেন, তা '১৮৫৭ সালের ১৫ আইন' নামে খ্যাত। তাই আইনানুসারে 'রাজানুমিত বিরহে কোন মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করিলে অথবা রাজাভিমত বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বা পুস্তক বিশেষ অভিপ্রায় বিকাশ করিলে ৫০০০ টাকা দণ্ড ও দুই বৎসরের অনধিক কারাবাস করিতে হইবেক।' দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— বাংলা সাময়িকপত্র, ১৩৫৪ পৃঃ ১৫৩।

৩. পূর্ববঙ্গ (রংপুর) থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র, 'রঙ্গপুর বার্তাবহ', ১৮৪৭ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রায় দশ বৎসর চলার পর মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন জারির প্রতিবাদে ১৮৫৭ সালের আগষ্ট মাসে এর প্রকাশ রহিত হয়। প্রথমে এর সম্পাদক ছিলেন গুরুচরণ রায়, তাঁর মৃত্যুর পর সম্পাদক হন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

৪. ইংরেজী সাপ্তাহিক 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্ সার'-এর সম্পাদক ছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

— সুধাবর্ষণ [৫] দূরবীন এবং সুলতানল আখবরপত্র[৬] সম্পাদকদিকের বিরুদ্ধে ইণ্ডাইটি বিল গ্রাহ্য হয়।

— সমাচার সুধাবর্ষণ সম্পাদক ইণ্ডাইটী মোকদ্দমায় নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হন এবং দূরবীন ও সুলতান আখবর সম্পাদকেরা দোষস্বীকার পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহাতে উভয়ের ১ টাকা করিয়া দণ্ড হয়।

—অগ্রহায়ণ—

— চট্টগ্রামের বিদ্রোহিতার সমাচার শুনিয়া ঢাকার সিপাহিরা ক্ষেপিয়া উঠে[৭] তাহারদিগকে নিরস্ত্র করিবার সময়ে তাহারা আপত্তি করায় ঐ দুষ্ট দিগের অনেক প্রাণি হত ও আহত হয় অবশিষ্ট্য যৎ-কিঞ্চিৎ পলায়নপর হয়।

— ঢাকায় ছয়জন বিদ্রোহির ফাঁসি হয়।

— ঢাকার বিদ্রোহিদিগের আক্রমণাশংকায় রঙপুরের সিবিলেরা রাজকোষ স্থানান্তরিত করেন।[৮] তাহারা ঐ জিলার কয়েকস্থান লুট করে।

— পৌষ—

— ঢাকা ও শ্রীহট্টে নাবিক গোরা সেনা প্রেরিত হয়।[৯]

['বাৎসরিক সংবাদ প্রভাকরের ক্রোড়পত্র'
এপ্রিল ১৯৫৮; বৈশাখ ১২৬৫]

২. নতুন সেনানিবাস

ঢাকায় একদল উপযুক্ত রাজসেনা রাখিবার অভিপ্রায়ে আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ফেনিসমিল নামক নিকেতন পুনঃ নির্ম্মাণের আদেশ করিয়াছিলেন, ভোটরাজ্যের সংগ্রামকেই ইহার মুলীভূত কারণ বলিতে হইবে।[১০]

[২৬ মে, ১৮৬৫, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭২]

---

৫. দ্বিভাষিক (বাংলা ও হিন্দী) দৈনিকপত্র সমাচার সুধাবর্ষণ প্রথম ১৮৫৪-এর জুন মাসে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক- শ্যামসুন্দর সেন।

৬. ফার্সি সাপ্তাহিক 'সুলতান-উল-আখবর'-এর প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২ আগষ্ট, ১৮৩৫।

৭. চট্টগ্রামের ৩৪ গণিত সিপাহি দল ১৮ই নভেম্বর রাত্রে সহসা গবর্ণমেন্টের বিরোধী হয় (দ্রঃ রজনীকান্ত গুপ্ত- সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮২, পৃঃ ২০৯)। ব্রেনান্ডের ডায়েরি সূত্রে জানা যায় যে, ২১শে নভেম্বর ঢাকায় চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের সংবাদ পৌছে। সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণার আগেই ২২শে নভেম্বর সকালে ধনাগারের সিপাহীদের অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের নিরস্ত্র করা হয় এবং পরে লেফটেনান্ট লুইস্-এর বাহিনী লালবাগ কেল্লায় অবস্থিত সিপাহীদের উপর আক্রমণ চালায় বহু সিপাহী যুদ্ধে মারা যায়। চারজন পলাতককে ধরে ফাঁসি দেয়া হয়। (দ্রঃ Dacca Review, (Vol, V. 1915, P. 247-249)

৮. "(৪ঠা এবং ৫ই ডিসেম্বর) রংপুরের কালেক্টর সাহেব-- গবর্ণমেন্টের টাকা নিরাপদস্থানে পাঠাইয়া দেন" (দ্রষ্টব্য-রজনীকান্ত গুপ্ত, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮২, পৃঃ ২১৩)।

৯. ব্রেনান্ডের ডায়েরী : 3. 12. 1858— Two steamers and a flat arrived this morning with 300 of 54th Queen's Regiment and 100 sailors on board. (Dacca Review, P. 250).

১০. '১৮৬৪-এ ব্রিটিশেরা ভুটানের একাংশ দখল করে এবং ১৮৬৫-এ একটি যুদ্ধের পর আনুষ্ঠানিকভাবে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।' দ্রষ্টব্য- বাংলা বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ ৫৮৯।

৩. পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে

শীঘ্র কুষ্টিয়া অবধি ঢাকা পর্যন্ত রেলওয়ে হইবে। জরিপ হইতেছে। দক্ষিণ পুর্ব রেলওয়ের বিষ্ণুপুর শাখার কি হইল?

[২৯ এপ্রিল, ১৮৬৫, ১৮ বৈশাখ ১২৭২]

ইষ্টারেন বেঙ্গল রেলওয়ের[১১] উন্নতি পুর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের কুষ্ঠিয়া ষ্টেশন হইতে গোলোন্দা পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম শীঘ্র প্রস্তুত হইবে।[১২] একটি পুরাতন কুঠীর নামে এই গোলোন্দা নাম হইয়াছে। ইহা যমুনা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল। কমিসনর বকল্যাণ্ড বলেন, গোলোন্দা পর্য্যন্ত রেল পাতা হইলে ক্রমে লাইন বিস্তৃত করা যাইবে। গোলোন্দা হইতে ষ্টিমার যোগে নদী পার হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে রাস্তা চলিবে এবং মানিকগঞ্জকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে রাখিয়া ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী সাভার নগরে সংযুক্ত হইবে। সাভার হইতে ঈষৎ বক্রভাবে ঢাকায় যাইবে। তথা হইতে নারায়ণগঞ্জ, আসাম, ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী জামালপুরের গারো পাহাড়, গোয়ালপাড়া ও গৌহাটী অভিমুখে বিস্তৃত হইবে। ঢাকা হইতে শ্রীহট্টে রাস্তা করিবার সময় ব্রহ্মপুত্র ও মেগনা নদের সংযোগ স্থানীয় ভৈরব বাজারে যাইবার অসুবিধা হইবে না। দৃঢ়ভেড়ীবন্দী করিয়া লক্ষীয়া নদীর জলবেগ বন্ধ করা যাইতে পারিবে।

ভৈরববাজার হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হইলে কাছাড় পর্য্যন্ত রেলপাতা হইবে। আপাততঃ গোলোন্দ পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে। তাহার পর এক এক করিয়া শেষ সীমা পর্যন্ত দর্শন করা যাইবে।

গোলোন্দা পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইলেও এক্ষণে পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর, আসাম ও ময়মনসিংহের উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্য সুলভ হইতে পারে। নারায়ণগঞ্জ[১৩] ও সেরাজগঞ্জেরও বিস্তর উপকার হইবে। বকল্যাণ্ড সাহেব এতদ্বিষয়ে বিশেষ অনুকূলমত প্রকাশ করিয়াছেন।...

[৬ জুন, ১৮৬৫; ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২]

৪. খাজা আবদুল গণী

ঢাকা নিউস পাঠে অবগতি হইল যে, খাজে আবদুল গণি সাহেব বাঙ্গাল ব্যবস্থাপক

---

১১. "ভারতবর্ষে' প্রথম রেল খোলা হয় ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল। চার বৎসর পরে (১৮৫৭) 'ঈস্টর্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি' কলিকাতা হইতে কুষ্ঠিয়া পর্য্যন্ত ১১১ মাইল রেলপথ খুলিবেন স্থির করেন। এই কোম্পানির সহিত সরকারের চুক্তি হয় যে তাঁহারা কুষ্ঠিয়াতে পুল বাঁধিয়া ঢাকা পর্যন্ত লাইন লইয়া যাইবেন। তখন পদ্মা কুষ্ঠিয়ার ধার দিয়া প্রবাহিত ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই লাইনে প্রথম গাড়ী চলে। তখন কুষ্ঠিয়াই পূর্ববঙ্গ রেলের শেষ সীমা ছিল। ইতিমধ্যে পদ্মা দূরে সরিয়া যায় এবং পুল বাঁধা অসম্ভব হয়।" দ্রষ্টব্য, বাংলায় ভ্রমণ (১ম খণ্ড), ১৯৪০, পৃঃ ৬১।

১২. "১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রেল (কুষ্ঠিয়া হইতে) গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সেখান হইতে স্টীমারে করিয়া ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা হয়।" তদেব, পৃঃ ৬১।

১৩. "১৮৮৫ সনের জানুয়ারী মাস হইতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে রেল চলিতে আরম্ভ করে। অতঃপর ১৮৮৬ সনের আগষ্ট মাসে জয়দেবপুর পর্য্যন্ত রেল চলে এবং ১৮৮৭ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন বঙ্গেশ্বরের ময়মনসিংহ গমন উপলক্ষে ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথ খোলা হয়।" দ্রষ্টব্য, কেদারনাথ মজুমদার– ঢাকার বিবরণ, ১৯১০, পৃঃ ১৮৮।

সমাজের একজন সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।[১৪] খাজে সাহেব ইংরাজ ভাষাজ্ঞ বটেন, আমরা ভরোসা করি তিনি মুসলমানদিগের প্রতিনিধিকার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবেন।

[১১ অক্টোবর, ১৮৬৫; ২৬ আশ্বিন ১২৭২]

খ. ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র

১. টেলিগ্রাফ সংযোগ

ঢাকা অবধি করিয়া, একায়েব পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ সংকলিত হইয়াছে।[১৫]

[৩০ অগ্রহায়ণ, ১২৬৮]

২. বিধবা-বিবাহ

ঢাকার বিধবা-বিবাহ প্রতিজ্ঞাকারীরা, ক্রমে, ভীত হইতেছেন। বাস্তবিক, যে ভয়, আজিও কলিকাতার একাধিপত্য করিতেছে; সে, যে ঢাকায় ঢাকায় থাকিবে। কদাচ সম্ভবে না!!!

[৩০ অগ্রহায়ণ, ১২৬৮]

গ. সোমপ্রকাশ

১. ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেট

ঢাকা নিউস সম্পাদক বলেন ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যহ বেলা দুই ঘটিকার সময়ে কাছারিতে আইসেন, এবং দুই তিন ঘটিকামাত্র অবস্থিতি করিয়া প্রস্থান করেন। সকল বিচারকর্তার প্রায় এক দশা।

[১৫ই এপ্রিল ১৮৬১; ৪ বৈশাখ ১২৬৮]

২. বিচারপতির উগ্রস্বভাব

ঢাকা নিউস সম্পাদক বলেন, "কি এতদ্দেশীয় কি ইউরোপীয় যে বিচারপতি আপনার উগ্রস্বভাবকে দমন করিয়া রাখিতে না পারেন তিনি কোনোক্রমেই নিজ পদের যোগ্য নহেন।" তবে সরমর্ডাণ্ট ওয়েল-সের বিষয়ে সকলে উদাসীন আছেন কেন।

[৫ আগস্ট ১৮৬১, ২২ শ্রাবণ ১২৬৮]

---

১৪. ঢাকার একটি পত্রিকায় এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় ঃ "আমরা শুনিয়া যারপর নাই আহলাদিত হইলাম, এদদ্দেশের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত অনারেবল খাজে আবদুল গণি সাহেব সুপ্রিম কৌন্সেলের মেম্বর হইয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালার পক্ষে এটি সামান্য হর্ষের বিষয় নহে।"

[পল্লীবিজ্ঞান, ডিসেম্বর, ১৮৬৭]

১৫. রংপর থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকায়ও অনুরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঃ 'ঢাকা চট্টগ্রাম আরাকান ও আকাব দিয়া ব্রহ্ম প্রদেশ পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক তার স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ তারযোগে সংবাদ গতায়াত হইতেছে।"

[রঙপুর দিক প্রকাশ, ২২ নভেম্বর, ১৮৬০]

৩. ইনকাম ট্যাক্স

ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক বলেন, ঢাকার পঞ্চাইত ইনকাম টাক্স স্বরূপ ৬০,০০০ টাকা দিবার যে অঙ্গীকার করেন, তন্মধ্যে ৩৭,০০০ মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। পঞ্চাইতেরাও তবে বড় সূক্ষ্ম অনুমান করিয়াছিলেন।

[২৯ জুলাই, ১৮৬১, ৮ শ্রাবণ, ১২৬৮

৪. লাইসেন্স ট্যাক্স

ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক অনুমান করিয়াছেন, তথায় ২০,০০০ টাকা লাইসেন্স ট্যাক্স স্বরূপ আদায় হইতে পারিবে। ঢাকায় বাণিজ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, অতএব ঐ টাকা আদায় হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

[২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬১; ৮ আশ্বিন, ১২৬৮

৫. কুমারখালির হত্যাকারী

ঢাকা নিউস সম্পাদক বলেন কুমারখালির হত্যাকারী হিলিকে সম্প্রতি ঢাকায় দেখা গিয়াছিল এবং বোধ হয় সে ঢাকার নিকটবর্ত্তি কোনো পল্লীগ্রামে আছে। সে যে ধরা পড়ে না সে কেবল পুলিশ কর্মচারিদিগের গুণ।

[১২ মে ১৮৬২; ৩০ বৈশাখ ১২৬৯

৬. বিবিধ

ঢাকা নিউস সম্পাদক বলেন, পূর্ব্ব বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর ঢাকায় পঁহুছিয়াছেন। তথায় অবস্থিতি করিবেন।

[২২ জুলাই ১৮৬১, ৮ শ্রাবণ ১২৬৮]

ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক বলেন, কলিকাতার লার্ড বিশপ উক্ত নগরে উপনীত হইয়াছেন।

[২২ জুলাই, ১৮৬১]

ঢাকা নিউসের একজন পত্রপ্রেরক বলেন, তথায় কলিকাতার লার্ড বিশপ গমন করাতে তত্রত্য লোকেরা স্থির করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বি করিতে গমন করিয়াছেন। আজিও এমত মূর্খলোক আছে?

[২৯ আগষ্ট ১৮৬১; ৩১ শ্রাবণ ১২৬৮]

ঘ. মধ্যস্থ

১. খাজা আবদুল গণী

সোমপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, "ঢাকা নগরের উন্নতি বিধানার্থ খাজে আবদুল গণি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন, ঐ টাকা কোন বিষয়ে ব্যয় করা কর্তব্য, তাহার বিবেচনার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হন। কমিটি স্থির করিয়া বলিয়াছেন, ঐ টাকায় জলের কল করা হইবে। ৫০ হাজার টাকায় যদি একার্য সমাপ্ত না হয় খাজে আবদুল্লা আরো কতক

টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"[১৬]

[৩০ বৈশাখ ১২৭৯]

আমরা শ্রবণে আহলাদিত হইলাম, খাজে আবদুল গণি মিয়া এবং তাঁহার পুত্র ঢাকা নগরের উন্নতির জন্য আর এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। সামান্য দান নহে।

[৬ আশ্বিন ১২৭৯]

২. 'হিন্দু-হিতৈষিণী'

ঢাকাস্থ বন্ধুর পত্র পাঠে সুখী হইলাম, হিন্দুহিতৈষণীর নামে লাইবেল সূত্রে অর্থাৎ গ্লানির হুর্ম্মতে যে নালিশ হইয়াছিল তাহা ডিসমিস হইয়া গিয়াছে।[১৭]

[৩০ আষাঢ় ১২৭৯]

৩. প্রজা-প্রতিনিধি সভা

ঢাকার প্রজাপ্রতিনিধি-সভা দুইটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবর্ণর জেনরলকে দরখাস্ত করিয়াছেন। ছোটকর্ত্তার শিক্ষা সম্পর্কীয় অদ্ভুত কাণ্ড এবং নূতন ফৌজদারী আইন, সেই দুই দরখাস্তের বিষয়। আবেদনদ্বয় অতি সুপ্রণালীতে তেজের সহিত মান্যপূর্ব্বক কাগজের কথায় পূর্ণিত হইয়াছে।

[৬ আশ্বিন ১২৭৯]

৪. নাট্যাভিনয়

ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী পাঠে জানা গেল, তথায রামাভিষেক নাটকের অভিনয় অতি সুন্দররূপ হইতেছে। ঢাকায় দৃশ্যকাব্যের অভিনয় এই প্রথম। প্রথমেই টিকিট বিক্রয়ের নিয়ম হওয়াতে আরো আহলাদের বিষয় হইয়াছে।[১৮]

[২৩ বৈশাখ ১২৭৯]

১৬. Khwaja Abdul Ghani donated Rs. 50,000/- towards the expenses of giving water-pipe connection to the city.. The donation was later increased to 2 and half lakhs. (Sec, Ahmad Hasan Dani—Dacca, 1962, P. 118).

১৭. ঢাকার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের 'হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'র মুখপত্র ছিল 'হিন্দুহিতৈষিণী' আর ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ছিল 'ঢাকা প্রকাশ'। এই দুই পত্রিকার মধ্যে নিয়মিত বাদ প্রতিবাদ সেকালের পাঠকদের কাছে বেশ উপভোগ্য ছিল। পত্রিকার সম্পাদকদের বিরুদ্ধে প্রায়ই মানহানির মামলা লেগে থাকতো। ঢাকার 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকায় (১ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শকাব্দ) এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন-" ১৮৭৪/ ৭৫ সনের মধ্যে সম্পাদকদের মধ্যে অনেকটি লাইবেল মোকদ্দমা হইয়াছে।"

১৮. মধ্যস্থ পত্রিকার সম্পাদক মনোমোহন বসু রচিত 'রামাভিষেক' নাটকটি ঢাকার পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি নাট্যমঞ্চে ১৮৭২-এর ৩০শে মার্চ, ৬ই এপ্রিল, ১৩ই এপ্রিলও ২০শে এপ্রিল অভিনীত হয় এবং এই নাট্যাভিনয়ে প্রথমবারের মত টিকেট বিক্রয়ের প্রথা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে কলকাতার নাট্য মঞ্চেও টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ২৭শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত 'রামা-ভিষেক' নাটকের ৪র্থ রজনীতে টিকেটের ফি গ্রহণ করা হয় নাই, অভিনেতৃবর্গের আত্মীয়েরা ঐসকল টিকেট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন' (ঢাকা প্রকাশ ১৭ বৈশাখ ১২৭৯)।
'রামাভিষেক' অভিনয় ঢাকায় দৃশ্যকাব্যের প্রথম অভিনয় নয়। ইতিপূর্বে ঢাকায় নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হয়েছিল, সে সংবাদ ১২-৬-৬১ তারিখের হরকরা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (দ্রষ্টব্য- সৈয়দ মুর্তজা আলী- উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকার নাট্য আন্দোলন, সাহিত্য পত্রিকা ১৭/২।

ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে[১৯] লুইস থিয়েটারের জন্য ভাড়া দেওয়া হইয়াছে।[২০] "ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মে বিলক্ষণ মতি!"

[৩০ বৈশাখ ১২৭৯]

২৩ বৈশাখের হিন্দু হিতৈষিণী পাঠে আমরা বিস্ময়াভিভূত ও পরিতাপিত হইলাম, ঢাকায় রামাভিষেক নাটকের যে অভিনয় হইতেছে তাহার রঙ্গভূমি সুরাপায়ীদের দৌরাত্ম্যে ঘোর দূষিত স্থান হইয়া উঠিয়াছে। অভিনয়ের দ্বারা দেশের দুর্নীতি কি এইরূপে দূর করা হইতেছে? বিশেষতঃ রামাভিষেক ন্যায় নাটকের অভিনেতৃগণ সুরাপানে ঢলঢল হইয়া রাম লক্ষ্মণের চরিত্র অনুকরণে প্রবৃত্ত! কি হাস্যাস্পদের বিষয়। উক্ত পত্রের সম্পাদক লিখেন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ধূম্রপান হইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণগণ ক্ষেপিয়াছিলেন এখন, তথায় বারুণী দেবী বিরাজ করিতেছেন। ঢাকার কি এই উন্নতি? এই কি উচ্চ সভ্যতা হইয়াছে?

[৩০ বৈশাখ ১২৭৯]

৫. ছোট লাটের পাট-গবেষণা

আমাদের ছোটকর্ত্তা যখন যেদিকে যাহা ধরেন তাহা অল্পে ছাড়েন না। সম্প্রতি ঢাকায় পাটের চাষ কিরূপ হয় পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি ৮০ বিঘা জমী লইতে ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আপাততঃ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং বার্ষিক ৩৩৩৬ টাকা ব্যয় দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ব্রহ্মপুত্র নদ ও অন্যান্য স্থান হইতে বিবিধ প্রকার বীজ আনয়ন করিয়া বপন দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে।[২১] মনিয়ার নামক একজন ইংরেজ উহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন।

[২৬ ফাল্গুন ১২৭৯]

৬. বিচারপতির দুর্নীতি

ঢাকা ছোট আদালতের জজ মেং লিন্টন সাহেব আদালতের পেয়াদা দ্বারা বাজার করাইতেন। তাহাতে অবশ্যই বাজার দর অপেক্ষা সকল দ্রব্যই অনেক সস্তা পাইতেন। আবার আব্বাস আলী নামা তাঁহার নিজের চাকর স্বীয় প্রভুর উপর এমন প্রভুত্ব চালাইত এবং সেই প্রভুত্বের এত বড়াই করিত যে আদালতের আমলা প্রভৃতি লোকজন আব্বাসকে ঘুষ দিত। এই সকল কারণে ছোটকর্ত্তা প্রশংসিত রূপে তাহাকে পদচ্যুত করেন। তিনি বড় সরকারে আপীল করাতে সেখানেও ঐ রায় বহাল রহিয়াছে। বেশীর ভাগে বড়কর্ত্তা ছোট কর্ত্তাকে অন্যান্য রাজ কর্মচারীগণকেও এ দোষে মুক্ত থাকিবার জন্য কড়াকড় করিতে বলিয়াছেন।

[১লা বৈশাখ ১২৮০]

---

১৯. ঢাকার প্রথম নাট্যমঞ্চ 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'কে এখানে ব্রাহ্ম সমাজগৃহ বলা হয়েছে। 'বর্তমানে যেখানে জগন্নাথ কলেজ রয়েছে রঙ্গমঞ্চটি সেখানে ছিল; তার একপাশে ছিল মন্ডি সাহেবের কুঠি আর অন্য পাশে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজ' (দ্রষ্টব্য মৎপ্রণীত 'ঢাকার প্রথম নাট্যমঞ্চ পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি', দৈনিক বাংলা, ঈদ সংখ্যা ১৯৭৬)। 'ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ ও রঙ্গগৃহের কর্তৃপক্ষও ছিল প্রায় এক' (ঢাকাপ্রকাশ ২৮-১১-১৮৮০)।

২০. লাইস থিয়েটার সম্পর্কে 'ঢাকাপ্রকাশ' (২৮ এপ্রিল ১৮৭২)-এ প্রকাশিত সংবাদ ঃ
"ঢাকাস্থ 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে আগামী ১লা ও ৪মে কলিকাতার লুইস থিয়েটার হইবে।"

২১. "১৮৭২/৭৩ সনে ঢাকায় গবর্ণমেন্ট হইতে পাটের চাষের জন্য Experimental Farm স্থাপিত হইয়াছিল" (দ্রষ্টব্য– কেদারনাথ মজুমদারের– ঢাকার বিবরণ ১৩১৬, ফাল্গুন, পৃঃ ১০০)।

৭. অপূর্ব্ব বাল্যবিবাহ

ঢাকার হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, "সেদিন শাখারী বাজারে এক অপূর্ব্ব বাল্য বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের বয়ঃক্রম ৩ বৎসর ২ মাস এবং পাত্রীর বয়স ১ বৎসর ১ মাস মাত্র। বিবাহ-কালে সোজা হইয়া বসিতে পারে না বলিয়া বধূকে একটি ধামার মধ্যে বসাইয়া কার্য্য নির্বাহ করা হইয়াছে। শাখারী বাজারে বাল্য বিবাহ যেরূপ প্রচলিত বোধ হয় এরূপ কুত্রাপি নাই।" আমরা ছোট বেলা "পেটে দর" দেখিয়াছিলাম, ইহাও প্রায় তাই।

[৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০]

ঙ. অনুসন্ধান

১. ছোট লাটের জাহাজে চুরি

ঢাকায় ছোটলাট সাহেব যাইলে, তাঁহার ষ্টিমার হইতে কতকগুলি টাকাকড়ি চুরী গিয়াছে।

[৩১ ভাদ্র ১২৯৫]

২. ঢাকার পুস্তকবিক্রেতা

ঢাকায় একজন পুস্তকবিক্রেতা পুস্তকের গাটের সঙ্গে লুকাইয়া আফিং চালান আনিয়া বিক্রয় করিত। তজ্জন্য তাহার দণ্ড হয়। কিন্তু এখন সে আপিলে নিষ্কৃতি পাইয়াছে।

[১৫ পৌষ, ১২৯৫]

চ. সুধাকর

১. নবাব আহসানউল্লাহ

নবাব আহছানউল্লা খান বাহাদুর লেডী ডাফরিনের ফণ্ডে বার্ষিক ৫০০৲ টাকা আর ঢাকাস্থ রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের কোনো বিশেষ কার্য্যের জন্য বার্ষিক ৩০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। [১লা অগ্রহায়ণ, ১২৯৬, ১৫ই নবেম্বর, ১৮৮৯]

২. ঢাকা— গোয়ালন্দ যোগাযোগ

শক্তি বলেন; বাবু মাধবচন্দ্র রায় বাহাদুর ঢাকা হইতে গোয়ালন্দের অপর পাড় পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে লাইন খুলিবার প্রস্তাব ঢাকার ডিষ্ট্রিকট বোর্ডের নিকট করিয়াছেন, খরচ ঢাকার রোডসেস তহবিল হইতে প্রদত্ত হইবে। ঢাকাবাসীগণের জন্য সুসংবাদ বটে।

[২৯ শে অগ্রহায়ণ ১২৯৬]

৩. আবদুল করিম সম্বর্ধনা

ঢাকা, দেবিদাসের ঘাট, ইমদাদ আলি মিঞার পত্রের সার মর্ম্ম— মৌলবি আবদুল করিম বি, এ সাহেব[২২] ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের এসিষ্টাণ্ট স্কুল ইন্সপেক্টর হইয়া আসাতে বিগত ২৬ শে জানুয়ারী রবিবার ঢাকা জগন্নাথ কলেজে শ্রীহট্ট নিবাসী ছাত্রগণ তাঁহাদের 'ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন সমিতির' এক সভা আহুত করেন। সভায় প্রায় ১০০ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন, অধিকাংশ হিন্দু।

[২৬ শে মাঘ ১২৯৬]

---

২২. মৌলবি আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩) কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন। কিছুদিন আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতার পর তিনি স্কুল সমূহের সহকারী ইন্সপেক্টর ও পরে বিভাগীয় ইন্সপেক্টর হন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' (১৮১৩) বহুল প্রশংসিত গ্রন্থ।

সাময়িকপত্রে সেকালের ঢাকা— ২

সাময়িকপত্র এক অর্থে যুগের দর্পণ। দর্পণের মতো সাময়িকপত্রের মাধ্যমে সমসাময়িক কালের পূর্ণ পরিচিতি উদ্‌ঘাটিত হয়। একদিকে যেমন প্রতিটি ঘটনা সাময়িকপত্রে লিপিবদ্ধ হয়, অন্যদিকে যুগমানসও তাতে হয় বিধৃত। তাই ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্যবিশারদ, গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসুজনের কাছে প্রাচীন সাময়িকপত্রগুলি বিশেষ মূল্যবান উপাদান।

উনিশ শতকের সাময়িকপত্রগুলি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। গবেষকদের ব্যবহারের জন্য প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য সাময়িকপত্রাদি থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সঙ্কলন করার কাজে প্রথম উদ্যোগী হন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে সংবাদাদি সঙ্কলন করে প্রকাশ করেন 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দু'টি খণ্ড। বিনয় ঘোষ 'সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র' গ্রন্থে সঙ্কলন করেন 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার বিভিন্ন সংবাদ ও নিবন্ধ।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমি উনিশ শতকের কয়েকটি সাময়িকপত্র থেকে সেকালের ঢাকা বিষয়ক কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলন করেছি। সাময়িকপত্রগুলির যে কয়েকটি সংখ্যা আমার দেখার সুযোগে হয়েছে, কেবল সে সংখ্যাগুলি থেকেই বিভিন্ন সংবাদ সঙ্কলিত হয়েছে। সুতরাং স্বীকারে বাধা নেই, সঙ্কলনটি পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু, তবু এ সঙ্কলন উনিশ শতকের ঢাকা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠক এবং গবেষকদের কোনো না কোনো কৌতূহলের উপাদান হবে। সঙ্কলিত সংবাদাদি প্রসঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যও যথাসম্ভব সংযোজিত হয়েছে।

সঙ্কলনের উৎস হয়েছে কলকাতার 'সোমপ্রকাশ' ও 'সংবাদ প্রভাকর', রংপুরের 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' এবং ঢাকার 'ঢাকা প্রকাশ', 'বঙ্গবন্ধু' ও 'পল্লীবিজ্ঞান'। 'সোমপ্রকাশ' ও 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত ঢাকার সংবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ঢাকা প্রকাশ' বা 'ঢাকা নিউজ' পত্রিকার সূত্রে প্রাপ্ত।

সঙ্কলিত সংবাদগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে সাহিত্যবিষয়ক সংবাদ, দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষাবিষয়ক, তৃতীয় ভাগে আমোদবিষয়ক এবং শেষ পর্যায়ে স্থান পেয়েছে বিবিধ বিষয়ের সংবাদ।

এক

ঢাকার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র 'বাঙ্গালা যন্ত্র' ১৮৬০ সনে স্থাপিত[১] হওয়ার পর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' উক্ত বৎসরই মুদ্রিত হয়। এই যুগান্তকারী নাট্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়েই ঢাকায় মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের সূচনা। গ্রন্থটির রচনাস্থল ঢাকা। ঢাকা ছিল দীনবন্ধু

১. '১২৬৬ সালে বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, বাবু রামকুমার বসু ও বাবু ভগবান চন্দ্র বসু প্রভৃতির চেষ্টায় ঢাকায় প্রথম মুদ্রযন্ত্র স্থাপিত হয়'— কেদারনাথ মজুমদার : বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, ১৯১৭— পৃঃ ৩৪৯।

মিত্রের কর্মস্থল। কর্মব্যপদেশে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সফরকালে তিনি নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে যে তথ্য ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন, 'নীলদর্পণ' তারই প্রকাশ। 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নীলদর্পণের একটি বিজ্ঞাপন ঃ

নীলদর্পণ

"বিজ্ঞাপন। নীলদর্পণ নামে যে গ্রন্থ ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র, ডি রোজরিয়ার লাইব্রেরীর, বাঙ্গালা যন্ত্র, চিপ্ লাইব্রেরী, এই কয় স্থানে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য এক টাকা।"

সোমপ্রকাশ (কলিকাতা)ঃ ২২ শে নভেম্বর, ১৮৬০।

'নীলদর্পণ' গ্রন্থটি ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে জেম্‌স্ লঙের উদ্যোগে এ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 'ক্যালকাটা প্রিন্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং প্রেস' থেকে মুদ্রাকর ক্লিমেন্ট হেনরি ম্যানুয়েল কর্তৃক মুদ্রিত হয়। পুস্তকে প্রকাশকের কোনো নাম ছিল না। অনুবাদ প্রকাশের জন্য ম্যানুয়েলের নামে মাম্‌লা রুজু হয়। বিচারে তাঁকে অর্থদণ্ড ভোগ করতে হয়।

নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশের দণ্ড

"নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশক ক্লিমেণ্ট হেনরি ম্যানুয়েলের নামে ইংলিশম্যান সম্পাদক অভিযোগ করিয়াছিলেন, গত ১০ই জুন ঐ মোকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে উক্ত মহোদয়ের দশ টাকা দণ্ড হইয়াছে।"

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ (রংপুর) ঃ ৪ঠা জুলাই, ১৮৬১।

লঙ্ আত্মগোপন না করে ম্যানুয়েলের উকিল মারফত আদালতে জানান যে, ম্যানুয়েল এ গ্রন্থের মুদ্রাকর মাত্র— প্রকাশক মুলতঃ জেমস্ লঙ্ নিজেই।[১] লঙের বিরুদ্ধে তারপর সুপ্রিম কোর্টের ফৌজদারী বিভাগে মানহানির মামলা আনা হয়। বাদী হন 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এ্যাণ্ড কমার্সিয়াল এসোসিয়েশন অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার'র সেক্রেটারী উইলিয়াম ফার্‌গুসন এবং 'ইংলিশম্যান' সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেট। লঙ সাহেবের বিচারের পূর্ণ বিবরণী সোমপ্রকাশের ২৯শে জুলাই ১৮৬১ সংখ্যায় (পৃঃ ৪৩৪-৪৩৮) এবং ৫ই আগস্ট ১৮৬১ সংখ্যায় (পৃঃ ৪৪৬-৪৪৭) প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬১ সংখ্যায় লঙ্‌য়ের প্রশংসায় মার্শম্যানের উক্তি মুদ্রিত হয়। রংপুরের সাপ্তাহিক 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' পত্রিকায় ৪ঠা আগস্ট ১৮৬১ সংখ্যায় 'লং সাহেবের অনুচিত দণ্ড' শীর্ষক এক বিরাট সম্পাদকীয় লিখিত হয়।

'ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়র' সূত্রে জানা যায় ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ঢাকা জেলায় মাত্র দুটি নীলের কারখানা ছিল; কিন্তু ১৮৩৩ সনের দিকে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩। ঢাকা জেলার আটি, ফুলবাড়িয়া, গালিমপুর, একডালা, মানিকগঞ্জ, মির্জাপুর, পাইকপাড়া, দিঘলি, লৌহজং প্রভৃতি অঞ্চলে নীলের ফ্যাক্টরি ছিল।[২]

সমসাময়িককালের পত্রপত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়মিত প্রকাশিত হতো।

---

১. যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ 'জেম্‌স্ লঙ' প্রবন্ধ— উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ; ১৯৬৩, পৃঃ ২৭৮।

২. B. C. Allen: Eastern Bengal District Gagetters; Dacca— 1912, Page 107.

নীল চাষ

'হরকরা সম্পাদক বলেন, ঢাকা জেলায় পূর্ব্বে যে নীল হইত, বর্ত্তমান বর্ষে তাহার তিন অংশের এক অংশ হইয়াছে। অসৎ ব্যবহার পরিত্যাগ না করিলে ইহার পর ইহাও হইবে না?'

সোমপ্রকাশ (কলিকাতা) : ২২ জুলাই, ১৮৬১।

নীলকরের অত্যাচার

"ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক বলেন একজন নীলকরের আমলা এক দ্বারের কবজা অন্য দ্বারে লাগাইতে নীলকর তাহাকে গুরুতররূপে আঘাত করিয়া সংজ্ঞাশূন্য করিয়াছিলেন। সম্পাদক ইহাতে লিখিয়াছেন, নীলকরের দাসত্ব করা অপেক্ষা অনাহারে প্রাণত্যাগ করা ভাল।"

সোমপ্রকাশ ঃ ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৬১।

"ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক নীলসংক্রান্ত তিনটি ভয়ানক সংবাদ লিখিয়াছেন— প্রথম একজন নীলকর সুরাপুরের কোনো জমীদারের প্রজাগণের বাটী লুঠ করিবার চেষ্টায় আছেন। দ্বিতীয় ম্যাক আর্থর নামক একজন নীলকরের আজ্ঞানুসারে বারাংকুলা গ্রামের তিলকচন্দ্র রায়কে বধ করা হইয়াছে। দাদন না লওয়া এই অত্যাচারের কারণ। তৃতীয়, তত্রত্য বৃদ্ধ পাপী বহুরূপী ওয়াইজ সাহেব নীল লইয়া গোলযোগ করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। 'বন্যার জল ঢুকিয়াছে' এখন আর অল্পে নিস্তার নাই।"

সোমপ্রকাশ ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬২।

সোমপ্রকাশের সংবাদে উল্লিখিত মিঃ ওয়াইজ ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত নীলকর। তিনি গাছা জমিদারের কাছ থেকে ভাওয়ালের অংশবিশেষ ক্রয় করে পরে ১৮৫১ সনে সে জমিদারী ৪,৪৬,০০০ টাকায় বিক্রী করেন।[১]

সেকালের পত্রপত্রিকার মধ্যে একমাত্র 'ঢাকা নিউজ' (Dacca News) পত্রিকাই নীলকরদের কার্যকলাপ সমর্থন করতো। আলেকজাণ্ডার ফর্বস্ ছিলেন এ পত্রিকার সম্পাদক। এককালে তিনি নীলকুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। নীলকরদের স্বার্থসংরক্ষণে 'ঢাকা নিউজ' বিশেষ তৎপর থাকায় পত্রিকাটি 'Planters' journal' নামে পরিচিত ছিল। নীলকরদের কার্যকলাপ ঢাকা নিউজ কিরূপ সমর্থন করতো, নিম্নের উদ্ধৃতিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

ঢাকা নিউজ ও নীলকর

"ঢাকা নিউস সম্পাদক বলেন, চা-করদিগের অত্যাচারের বিষয় লইয়া এক্ষণে সংবাদপত্রে যে আন্দোলন হইতেছে সে সমুদায় মিথ্যা, চা-করেরা অত্যাচার করে না। নীলকরদিগেকে নষ্ট করিয়া এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক ও তাঁহাদিগের সংবাদদাতা চা-করদিগের সর্বস্বান্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। আমাদিগের প্রার্থনা এই চা-করদিগের অত্যাচার বিত্তান্ত মিথ্যাই হউক। কিন্তু আমরা যে প্রমাণ পাইতেছি তাহাতে চা-করেরা নীলকরদিগের 'গাঁর ভাই' তাহা বলিয়া বিলক্ষণ জানা হইয়াছে।"

সোমপ্রকাশ (কলকাতা) ঃ ২২ ফাল্গুন, ১২৬৮।

---

১. B. C. Allen : প্রাগুক্ত— পৃঃ ১৮৪।

আলেকজাণ্ডার ফর্ব্‌স্ পরে 'ঢাকা নিউজ'-এর কার্য্যভার ত্যাগ করে কলকাতার 'হরকরা' পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। ১৮৬১ সনের ডিসেম্বর মাসের কোনো এক সংখ্যায় ঢাকা নিউজ পত্রিকার সম্পাদক আলেকজাণ্ডর ফর্ব্‌স্-এর জীবনী প্রকাশ করেন সে সম্পর্কে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় ঃ

আলেকজাণ্ডার ফর্বস্

"ঢাকা নিউস সম্পাদক হরকরার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক আলেকজাণ্ডার ফর্ব্বসের সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। ফর্ব্বস্ প্রধানতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের রেসমের কুঠিতে, পরে আলী মিয়ার জমিদারীর অধ্যক্ষ হন। তিনি এককালে নীল কুঠির অধ্যক্ষ, ঢাকা ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি ও ঢাকা নিউসের সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদন করেন। ফর্ব্বস্ উপযুক্ত ব্যক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার স্বভাবটি ভাল নয়।"

সোমপ্রকাশঃ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৬১।

ফর্ব্‌স্ ঢাকা নিউজ পত্রিকা ত্যাগ করার পর স্থানীয় কয়েকজন ইংরেজ ও আর্মানী পত্রিকাটির স্বত্ব ক্রয় করেন[১]। এ'সময় ঢাকা নিউজের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় সে বিষয়েও দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

ঢাকা নিউজ

"... একদা যাহার প্রভাবে ঢাকা প্রদেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার ভয়ে এ প্রদেশের দুর্দ্দান্ত দুর্জন দল প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে সেই সংবাদপত্রের ঈদৃশী শোচনীয় অবস্থা বিলোকনে আমাদের অন্তঃকরণ অতীব দুঃখিত হইতেছে।"

ঢাকা প্রকাশ ঃ ৭ অগ্রহায়ণ, ১২৬৮।

"ঢাকা নিউস সম্পাদক প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ পত্রিকা বিক্রীত হইবে। বর্ত্তমান অধিকারীরা তাহা এককালে উঠাইয়া না দিয়া হস্তান্তর করিবার সংকল্প করিয়াছেন। উহা উঠিয়া না গিয়া যদি কেহ গ্রহণ করিয়া উহার কার্য্য সম্পাদন করেন, বড় ভাল হয়। ঐ পত্রখানি থাকাতে অনেক কুক্রিয়াশীল ব্যক্তি অনেক দমনে ছিল। পত্র উঠিয়া গেলে তাহাদিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইবে।"

সোমপ্রকাশ ঃ ৩০ ডিসেম্বর, ১৮৬১; ১৬ পৌষ, ১২৬৮।

নীলকরদের সমর্থক হয়েও ঢাকা নিউজ পত্রিকা বিভিন্ন অন্যায় ও কুক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে তেজস্বিনী লেখনী ধারণ করেছিল তার প্রমাণ উপরের উদ্ধৃতি দুটি। এ পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন মিঃ কেমারন, মিঃ পগোজ, মিঃ ওয়াইজ, মিঃ গ্রিগ ও খাজা আবদুল গণি[২]। মিঃ কেম্প দীর্ঘদিন ঢাকা নিউজ সম্পাদনা করেন। ১৮৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বেঙ্গল টাইম্‌স্'।

১. সত্যেন সেন ঃ 'ঢাকা হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত সাময়িকপত্র', সোনার বাংলা— ২০ ভাদ্র, ১৩৫৪।

২. কেদারনাথ মজুমদার ঃ ঢাকার বিবরণ, ১৩১৬— পৃঃ ৭৪।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িকপত্রাদির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঢাকা প্রকাশ। 'ঢাকা প্রকাশ' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সনে। ১৮৬০ সনে ঢাকা থেকে বেরোয় চারটি পত্রিকা— কবিতা কুসুমাবলী, মনোরঞ্জিকা, নবব্যবহার সংহিতা ও সংস্কার সংশোধনী।

ঢাকার নতুন সংবাদপত্র

"বর্তমান বর্ষের অধিকারে কয়েকখানি নূতন বাঙ্গলা সমাচার পত্রের উদয় হইয়াছে, ঢাকা নগরের বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে মনোরঞ্জিকা ও কবিতা কুসুমাবলী নামে দুইখানি নূতন পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছে। সম্প্রতি নব ব্যবহার সংহিতা নামে আর একখানি মাসিকপত্র ঐ যন্ত্র হইতে বিকাশ হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট গেজেটের প্রকাশিত আইন স্যরকূলর অর্ডর সদর দেওয়ানি আদালতের নাজির ফয়সালা প্রভৃতি রাজবিধান সম্পর্কীয় ভিন্ন সংবাদাদি তাহাতে প্রকাশ হয় না। আমরা তাহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি, পত্রের পরিমাণে মূল্য অল্পই হইয়াছে বলিতে হয়, রাজ বিধানাধি বিদিষ জনগণের পক্ষে এই পত্রিকা উপকারদায়িনী হইবে, গত সংখ্যক দিক্প্রকাশে ইহার বিষয়ে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছে তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গ ব্যবহার সংহিতার মূল্য ও সম্পাদকের নাম ধাম ইত্যাদি অবগত হইয়াছেন, পুনরুল্লেখ প্রয়োজন বিরহ।'

'কবিতাকুসুমাবলীর চতুর্থ সংখ্যা পাঠে আমরা প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি।'। "সদ্ভাব শতক", "কবির কল্পনা" এই দুইটি প্রস্তাবের রচনা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এবং কবিতা সকল সরস সরল শব্দে বিন্যস্ত হওয়াতে চিত্তানন্দবর্দ্ধিনী হইয়াছে, ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত বর্ত্তমান খণ্ডের তুলনা করিলে রচনাগত অনেক তারতম্য উপলব্ধি হয়, এমন কি একাধার জাত বলিয়া বোধ হয় না। যদি এক লেখনী নিঃসৃতা, তবে অল্প দিনের অভ্যাসে মিত্র কবি মহাশয় রচনার যে উৎকর্ষতা সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসাবাদ দেওয়া উচিত। প্রথম সংখ্যা কুসুমাবলীর আত্মপ্রশংসা ইত্যাদি হাস্য-রস্যোৎ-পাদক প্রবন্ধ কয়েকটি যথার্থই হাস্যজনক হইয়াছিল তৎপাঠে আমরা নবীন সহযোগী মহাশয়ের হিতার্থে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া পত্রের উন্নতি পক্ষে যত্নবান হওয়াতে সাধু চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি। রচনা বিষয় দিনে দিনে এইরূপ উন্নতি দেখাইতে পারিলে তাহার নবীন পত্রিকা ভদ্রসমাজে অবশ্য বিশেষ আদরণীয় হইবে।......"

রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ (রংপুর) ঃ ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬০।

ঢাকা প্রকাশ

"এই ফাল্গুন মাস অবধি ঢাকা প্রকাশ নামে একখানি নূতন বাঙ্গালা সমাচারপত্র ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে প্রচার হইতে আরম্ভ হইবে। ইহার অনুষ্ঠানপত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহা রাজকীয় ও অন্যান্য বিষয় ও নানাবিধ সমাচার দ্বারা পরিপূরিত হইবে।... ... যাঁহারা ঢাকা প্রকাশ প্রচারের উদযোগে আছেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই তাঁহারা যেন উপযুক্ত পাত্রের হস্তে এতৎ সম্পাদন ভার সমর্পণ করেন। দিন দিন

বাঙ্গলা পুস্তকের, বাঙ্গলা সমাচার পত্রের ও বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, বাঙ্গলাদেশে লোকের জ্ঞান ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে। পুস্তক রচয়িতা ও সমাচার পত্র সম্পাদায়িতাদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা এই সময়ে উপাদেয় ও রুচিকর ভোজ্য তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সেই ক্ষুধার উদ্দীপন করিয়া দেন। যাহাতে ক্ষুধামান্দ্য হইয়া যায় ও অরুচি জন্মে, এরূপ কদর্য্য ভোজ্য যেন তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা না হয়। তাহা হইলে অনিষ্ট করা হইবে।........."

সোমপ্রকাশ (কলিকাতা) ঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১, ১লা ফাল্গুন, ১২৬৭।

ঢাকা প্রকাশ

"ঢাকা প্রকাশের প্রথম খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা আশাধিক প্রীতিলাভ করিয়াছি। সম্পাদক যেরূপে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, ভগ্নোৎসাহ না হইয়া যদি দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য সম্পাদন করেন, পরিণামে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া স্বদেশের উপকার সাধনে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

'ঢাকা প্রকাশ পুর্ব্বতন সোমপ্রকাশের ন্যায় এক একবার দুইখণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক এক পৃষ্ঠে দুই দুই পঙক্তিশ্রেণী আছে। ইহাতে তিনটি প্রস্তাব লিখিত দৃষ্ট হইল। প্রথম প্রস্তাবে সম্পাদক সমাচারপত্র সম্পাদনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া এতদ্বিষয়ে দেশের লোকের বিরাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল বাঙ্গলা সংবাদপত্রের প্রতি কেন বাঙ্গালাভাষার প্রতি আজিও অধিসংখ্যক লোকের অনাদর আছে; আজিও অনেকে বাঙ্গালা ভাষা রীতিমত পড়িতে পারেন না, আজিও অনেকে অগ্রে সম্পাদপত্র মধ্যে আদিরসাশ্লিষ্ট পদ্যের অনুসন্ধান করেন, একথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যথার্থ কথা না কহিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়, সম্পাদকদিগেরও শেষ আছে। সম্পাদকেরা যদি প্রগাঢ় বিষয়ের চর্চ্চা করেন, রচনা মধ্যে আপনাদিগের বিদ্যাবত্তা ও অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, নূতন নূতন বিষয় ও নূতন নূতন সমাচার প্রচার দ্বারা পাঠকগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে পারেন, সম্বাদ-পত্র নিতান্ত উপেক্ষিত হয় না।... ..."

সোমপ্রকাশ (সম্পাদকীয়) ঃ ১৮ই মার্চ, ১৮৬১, ৬ চৈত্র ১২৬৭।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'কবিতা কুসুমাবলী'। প্রথম সংখ্যার প্রকাশ কাল জ্যৈষ্ঠ ১২৬৭ (১৮৬০ খ্রীঃ)। সম্পাদনা করেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। তাঁর 'সদ্ভাবশতক' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ঢাকার দ্বিতীয় সাময়িকপত্র 'মনোরঞ্জিকা' প্রকাশিত হয় ১২৬৭ সালের আষাঢ় মাসে। সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। কেদারনাথ মজুমদার 'বাঙ্গালা সাময়িক-সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'ঢাকার কতিপয় উৎসাহী যুবক মনোরঞ্জিকা সভা নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভায় তাহারা রচনাদি পাঠ ও বক্তৃতাদি দ্বারা সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন (পৃ. ৩৪৯)।' উক্ত সভার মুখপত্রই 'মনোরঞ্জিকা' পত্রিকা।

রামচন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক প্রকাশিত 'নবব্যবহার সংহিতা' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮৬০ সনের আগস্ট মাসে।

ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ' (১৮৬১)-এরও সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। সম্পাদনার জন্য প্রথম দিকে তাঁর বেতন ছিল মাসিক ২৫ টাকা। পরে ৩৫ টাকা বেতন নির্দিষ্ট হয়।[১] ঢাকা প্রকাশ মানিকগঞ্জ মহকুমার ইলিচপুর নিবাসী মৌলবী আবদুল করিমের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়।[২] ঢাকা প্রকাশ প্রায় একশত বৎসরকাল প্রকাশিত হয়েছিল।

দুই

ঢাকার প্রাচীনতম কলেজ 'ঢাকা কলেজ' সম্পর্কে নিম্নের কয়েকটি সংবাদ সেকালের সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হয়েছিল।

ঢাকা কলেজে বাংলার অধ্যাপক

"ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ব্রেনাণ্ড সাহেবের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। তথায় একজন ব্যবস্থাপক নিয়োজিত হইবেন। আমরা শুনিলাম উক্ত কলেজে বাঙ্গালায় একজন পৃথক অধ্যাপক হইবেন। আমাদিগের অভিলাষ এই গবর্ণমেন্ট কৃষ্ণনগর হুগলী ও বহরমপুরের কলেজেও এই প্রকার সুবিচার করেন।"

সোমপ্রকাশ ঃ ২৬শে জানুয়ারী, ১৮৬১।

ঢাকা কলেজের অর্থ বরাদ্দ

'ঢাকা কলেজের নিমিত্ত গবর্ণবেন্টকে এক্ষণ বার্ষিক ১৮,২৬০ টাকা দিতে হইতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে ২২,৬৬২ টাকা দিতে হইত। ক্রমেই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে ১২৯ জন ছাত্র ছিল, এক্ষণ ২৭২ জন হইয়াছে। ছাত্র বেতন ও জরিমানা প্রভৃতিতে গত বৎসর প্রায় ১৭,৬৮৯ টাকা আদায় হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য গবর্ণমেন্টকে ৮০ টাকা মাত্র ব্যয় পড়িতেছে। ঢাকা কলেজের জন্য গবর্ণমেন্টের যত অল্পব্যয় দিতে হইতেছে আর কোনোও কলেজের জন্যই এরূপ নহে।"

ঢাকা প্রকাশ ঃ ১লা এপ্রিল ১৮৮২।

তদানীন্তন সিভিল সার্জন ডঃ জেম্‌স্‌ টেলরের উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় ১৮৩৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই স্কুলই কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত। ১৮৪১ সনে এই ইংরেজী বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই ঢাকা কলেজের প্রতিষ্ঠা। মিঃ আয়ারল্যাণ্ড কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। পরবর্তীকালে ডঃ টি. ওয়াইজ (১৮৪৪-৪৬), ডাব্লিউ ব্রেনাণ্ড (১৮৫৭-৭৩), ডাব্লিউ বুথ, টার্নার, পেগেট, পোপ প্রমুখ শিক্ষাবিদ ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। ব্রেনাণ্ড সাহেব সিপাহী বিপ্লবের সময় সিপাহী দমনে স্থানীয় ইউরোপীয়দের সংঘবদ্ধ করেন এবং অস্ত্রধারণ করেন।

---

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাংলা সাময়িক পত্র— ১ম খণ্ড, ১৩৫৪— পৃঃ ১৬৬।
২. কেদারনাথ ঃ বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য— পৃঃ ৩৫৯ (পাদটীকা)।

'ঢাকা প্রকাশ'-এ প্রকাশিত (১.৪.৮২) সংবাদে জানা যায় ১৮৮২ সনে ঢাকা কলেজের ছাত্রসংখ্যা ২৭২ এবং ১৮৮০ সনে ছিল ১২৯ জন। পূর্ববর্তী কয়েক বছরের ছাত্রসংখ্যা নিম্ন রূপ[১] ঃ

১৮৫৬-৫৭	৪৩ জন
১৮৬০-৬১	৭৬ "
১৮৭০-৭১	১১২ "

ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বছরের মধ্যে পোগজ স্কুল, নর্ম্যাল স্কুল, আবদুল গনি স্কুল, জগন্নাথ স্কুল, ঢাকা মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপিত হয়।

১৮৮০ সনে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি পঞ্জিকায় নিম্নলিখিত কয়েকটি স্কুলের নাম, প্রতিষ্ঠাকাল এবং তদানীন্তন প্রধান শিক্ষকের নাম পাওয়া যায়[২] ঃ

নাম	সংস্থাপন	প্রধান শিক্ষক
কলেজিয়েট স্কুল	১৮৩৫	কৈলাসচন্দ্র ঘোষ
ঢাকা কলেজ	১৮৪১	জে. ডি. এইচ. পোপ
পোগজ স্কুল	১২ জুন ১৮৪৮	অমরচান্দ লাহা
ঢাকা নর্মেল স্কুল	৮ জানুযারী, ১৮৫৭	জগদ্বন্ধু লাহা
আবদুল গণি স্কুল	জুলাই ১৮৬৩	মোহনচান্দ বসাক
(ইডেন) স্ত্রীবিদ্যালয়	১৮৭০	মিসেস স্টেন্সবুরি
জগন্নাথ স্কুল	২ মার্চ, ১৮৭২	গোপী মোহন বসাক
ঢাকা মাদ্রাসা	১৬ মার্চ, ১৮৭৪	মৌলবী ওবেদুল্লাহ
মেডিকেল স্কুল	১৫ জুন, ১৮৭৫	সূর্যনারায়ণ সিংহ, দুর্গাদাস রায়, কাশীচন্দ্র দত্ত প্রিয়নাথ বসু
ঢাকা স্কুল	জানুয়ারী ১৮৭৫	কৃষ্ণদাস চন্দ
রূপরঘু স্কুল	২১ জানুয়ারী, ১৮৭৮	শরচচন্দ্র ঘোষ

মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি সংবাদ ঢাকার 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

মেডিকেল স্কুল

"আগামী ১৫ই জুন ঢাকাতে মেডিকেল স্কুল সংস্থাপিত হইবে। বাবু কাশীচন্দ্র দত্ত। সূর্যনারায়ণ সিংহ, দুর্গাদাস রায়, উমাচরণ দাস এবং প্রকাশচন্দ্র সেন উক্ত স্কুলের প্রফেসর হইবেন। মেডিকেল স্কুল হইবে সুখেরই বিষয়; কিন্তু কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যে সকল দুরাচার দুর্ব্যবহার ও দুর্নীতির সংশ্রব রহিয়াছে তাহা যাহাতে ঢাকার স্কুলে স্থান

১. Syed Murtaza Ali : Education and Literature in Daccca— A city and its Civic Body'— 1966— p. 19.

২. 'নবপঞ্জিকা'ঃ ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত— ১৮৮০, পৃঃ ২৫।

না পায় তজ্জন্য প্রথমাবধি সাবধান থাকা হয় তাই আমাদের অনুরোধ, নচেৎ দুঃখের সীমা থাকিবে না।"

বঙ্গবন্ধু (ঢাকা) ঃ ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শকাব্দ (১৮৭৫ খ্রি.)।

মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রায় সতের বৎসর আগে ১৮৫৮ সনের ১লা মে তারিখে ঢাকায় রবার্ট মিটফোর্ড সাহেবের নামে মিটফোর্ড হাসপাতাল স্থাপিত হয়। মেডিক্যাল স্কুলের দালান ১৮৮৯ সনে ৬৪,০০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়।[১]

কলেজ ও স্কুলসমূহে নীতি শিক্ষার প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় এক সমিতি সরকারের কাছে আবেদন জানায়। সে সংবাদটি নিম্নরূপ ঃ

নীতি শিক্ষার প্রবর্তনা

"কলেজ ও স্কুলাদিতে নীতি শিক্ষার প্রবর্তন করার জন্য পূর্ব্ব বাঙ্গালা শুভসাধিনী সভা হইতে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে।"

বঙ্গবন্ধু (ঢাকা) ঃ ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শকাব্দ (১৮৭৫ খ্রিঃ)।

'শুভসাধিনী সভা' ১২৭৭ সালে সংস্থাপিত হয়।[২] স্ত্রীশিক্ষা দান এবং অন্যান্য সামাজিক উন্নতি করা। এ সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীকালী নারায়ণ ছিলেন এর সম্পাদক।

সেকালে ঢাকায় ধর্ম, নীতি ও অন্যান্য দেশহিতকর বিষয় আলোচনার্থে কয়েকটি সমাজ বা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

পূর্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজ	স্থাপিত	১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ
শুভসাধিনী সভা	"	১৮৬৯ "
বিক্রমপুর হিতসাধিনী	"	বাং ১২৭৮ সাল
জনসাধারণ সভা	"	১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ
হিন্দুধর্মরক্ষিনী সভা	"	
অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা	"	বাং ১২৭৮ সাল
সারস্বত সমাজ	"	বাং ১২৮৫ "
ছাত্রসভা	"	বাং ১২৮৬ "
সমাজ সম্মিলনী	স্থাপিত	১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ
মুসলিম সুহৃদ সম্মিলনী	"	১৮৮৩"

'সমাজ সম্মিলনী' এবং 'মুসলিম সুহৃদ সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যথাক্রমে মৌলভী ওবায়দুল্লাহ ও মৌলভী আবদুল আজিজ।

১. B. C. Allen : প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৫।

২. 'নববার্ষিকী' ঃ কলিকাতা ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত— সামাজিক ও অপরবিধ হিতকর সমাজ, প্রবন্ধ; পৃঃ ১৫৬।

হিন্দু সভা	স্থাপিত	১৮৮৪ খ্রিঃ
পারজোয়ার সমিতি	"	১৮৮৪ খ্রিঃ

এ সমিতিগুলির অধিকাংশেরই কার্যক্রম প্রধানতঃ ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। সমিতি-নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসারে তারা প্রতি বৎসর বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতো।

উনিশ শতকে ঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলেও সে তুলনায় গ্রন্থাগার বা পাঠাগারের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এ সম্পর্কে ঢাকার পল্লীবিজ্ঞান পত্রিকায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয় ঃ

দেশীয় ভাষায় পুস্তকালয়

"আমরা ভাষার উন্নতি বিষয়ে আয়াস প্রকাশে ত্রুটি করি নাই। অন্যান্য পত্রিকায়ও ইহা লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। ভাষা উন্নতির উপায় সমূহ মধ্যে স্থানে স্থানে পুস্তকালয় সংস্থাপিত হওয়া প্রধান একটি উপায়।

'এক্ষণে কোনো কোনো স্থলে পুস্তকালয় না আছে এমত নয়। কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প। নগরপল্লীতে যত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, পুস্তকালয়ের সংখ্যা তাহার শতাংশের একাংশ নয়। তাহার অনুষ্ঠান-ই-বা কোথা হইতেছে, বিদ্যাধ্যাপনের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ এবং বিদ্যানুরাগী দেশীয় মহাশয়রা ইহার অনুষ্ঠান না করিলে এ-বিষয়ক অসদ্ভাব বিদূরিত হওয়ার নয়। তাঁহাদের প্রতিই দেশের মঙ্গলের অনেক নির্ভর করিতেছে। আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ মাত্র দেওয়াইতে পারি। ঢাকা নগরে এত বড় কলেজ এবং নর্ম্মাল স্কুল এবং পোগস স্কুল ইত্যাদি এত বিদ্যালয় আছে, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় যে সাধারণের ব্যবহার জন্য বঙ্গভাষার একটি পুস্তকালয় আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। আমাদের এ বিক্রমপুরে প্রায় শতাধিক বিদ্যালয় আছে কিন্তু ঈদৃশ পুস্তকালয় একটিও নাই। ইহা একের যত্নে অথবা সাহায্যে হওয়া সম্ভাবিত নয়। বিদ্যানুরাগী মহোদয়েরা একত্রিত হইয়া কেন এজন্য সাধারণের সাহায্যের অনুষ্ঠান না করেন, তাহা করিলে ভ্যাসা করি গবর্ণমেণ্টও ইহার সাহায্যপক্ষে অনুমোদন করিতে পারেন।

'এ উপলক্ষে আমাদের আরো কিছু বক্তব্য আছে, বঙ্গভাষায় গদ্যপদ্য কতখানি পুস্তক আছে তৎসমুদয়ের নাম এবং রচয়িতাদিগের পত্রিকা ইত্যাদি লইয়া একখানি পুস্তক হওয়াও নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রেতাদের সমূহ সংগ্রহ করিয়া এবং যে যে স্থানে প্রধান লাইব্রেরী আছে তাহা হইতে পুস্তকাদির সবিশেষ অবগত হইয়া এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য উপায় দ্বারা অবশ্য প্রস্তাবিত প্রণালীর একখানি পুস্তক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এইরূপ পুস্তক হইলে তাহাতে প্রাচীন এবং নব্য গ্রন্থ সকল যথাশ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। এবং তাহা যে বিশেষ উপকারের কারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"....

পল্লীবিজ্ঞান (ঢাকা) ঃ নভেম্বর, ১৮৬৭।

তিন

যে কোনো নাট্য আন্দোলনই গড়ে ওঠে নাট্যশালাকে কেন্দ্র করে। ঢাকায় উনিশ শতকে নাট্যচর্চার উদ্‌গম হয়েছিল প্রধানতঃ একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করে। এই রঙ্গমঞ্চের নাম ছিল 'পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'।

১৮৬৫ সনে 'পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'র প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে যেখানে জগন্নাথ কলেজ রয়েছে রঙ্গমঞ্চটি সেখানে স্থাপিত ছিল। এর প্রতিষ্ঠার পেছনে উদ্যোগী ছিলেন মোহিনী মোহন দাস, অভয় দাস, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল চক্রবর্তী এবং রাম চক্রবর্তী। 'পূর্ব্ব-বঙ্গ রঙ্গভূমি'তে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয় 'রাম অভিষেক'। পরবর্তীকালে পরেশ নাথ ঘোষ, রাধামাধব চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী, আকমল খান ও ইউসুফ খানের উদ্যোগে এ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় 'সরোজিনী', 'মেঘনাদবধ', মহারাষ্ট্র, 'কলঙ্ক' প্রভৃতি নাটক। এছাড়া জমিদার কিশোরী লাল চৌধুরী ও পদা সাহার বাটীতে এবং জগন্নাথ কলেজ হস্টেলেও কয়েকটি নাটকের অভিনয় হয়।[১]

'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'র বাঁধা স্টেজ ছিল। অমৃত লাল বসু তাঁর আত্মজীবনীতে একথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর নাট্যদল নিয়ে ঢাকায় পৌঁছে কয়েক ঘণ্টা পরেই সে বাঁধা স্টেজে নাটক মঞ্চস্থ করেন।[২]

১৮৭৩ সনে কলিকাতার হিন্দুন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানী ঢাকায় আসে এবং 'পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'তে নীলদর্পণ নাটক মঞ্চস্থ করে। সে সম্পর্কে অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ—

পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে নীলদর্পণ অভিনয়

"ঢাকার হিন্দু নাশনাল থিয়েটার কোম্পানীর নীলদর্পণ নাটক অভিনয় সম্বন্ধে একজন দর্শক আমাদিগকে এইরূপ লিখেন— গত শনিবার ঢাকা পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে কলিকাতার হিন্দু নেশনাল থিয়েটরের সভ্যগণ নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয় যে কতদূর সুন্দর হইয়াছিল বলা যায় না। ঢাকাস্থ সমুদায় ভদ্রসমাজ ও ইংরাজগণ অভিনয় দর্শনার্থ উপস্থিত ছিলেন। রঙ্গভূমি লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। চারি ঘণ্টা কাল অভিনয় দর্শন করিয়া আমাদের মনের যে কত দূর পরিবর্তন হইয়াছিল বলা বাহুল্য। আমরা সমস্ত ঢাকাবাসী অভিনয় সন্দর্শন করিয়া যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি লিখিয়া শেষ করিতে পারি না।"[৩]

অমৃত বাজার পত্রিকা ঃ ২২শে মে, ১৮৭৩।

সমসাময়িককালে ঢাকায় 'নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানী' নামে একটি নাট্য গোষ্ঠী গঠিত হয়। যে নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোগে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানম শকুন্তলম' বাংলায় অনূদিত হয় এবং ১৮৭১ সনে তা মঞ্চস্থ হয়।[৪]

১. Syed Murtaza Ali : প্রাগুক্ত; পৃঃ ২৬।
২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস; পৃঃ ১২৫।
৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ঃ পৃঃ ১২৫—১২৬।
৪. সৈয়দ মূর্তজা আলী ঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬।

ঢাকার নবাবপুরস্থ কয়েকজন বসাক পরিবারের তরুণ যুবকের উৎসাহে এই থিয়েটার কোম্পানীর সৃষ্টি। ১৮৮১ সনে এই নাট্যদলের অভিনীত 'শকুন্তলা' নাটক দর্শনে একজন দর্শক নিম্নের প্রশংসাসূচক পত্রটি লিখেছিলেন ঃ

শকুন্তলাভিনয়

"ঢাকা নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানীর শকুন্তলাভিনয় দেখিয়া যারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। কি সংগীত কি কথাবার্ত্তা, কি অভিনয়, কি চিত্রপট, সকলই মনোহর এবং চিত্তাকর্ষক। ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় আমি কখনই দেখি নাই।....

'আমি বিশ্বস্তলোকের মুখে শুনিয়াছি শ্রীযুক্ত ধরণীনাথ বসাক, রামচন্দ্র বসাক, প্রিয়নাথ বসাক, শ্যামবন্ধু বসাক, রাধিকা মোহন বসাক, ললিত মোহন বসাক[১] , রামকুমার বসাক, সনৎকুমার বসাক, মোহন চাঁদ বসাক, দীনবন্ধু বসাক, মঙ্গলচাঁদ বসাক এবং আনন্দ চন্দ্র বসাক এই চতুর্দ্দশ জন বসাক পরিবারের যুবদ্বারা এই এমেটিয়র থিয়েটার কোম্পানির সৃষ্টি হইয়াছে এবং বড় সুখের কথা এই যে, ইহারাই অভিনেতা। কি চিত্র, কি সংগীত, কি সমবেত বাদ্য সকলই তাহাদের দ্বারা পরিচালিত। কোনোরূপে, কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করে নাই। এমনকি অভিনীত নাটকও ইহাদের দ্বারা রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সংগীত শাস্ত্র বিশারদ মদনমোহন বসাক এই কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত আছেন।...

কস্যচিৎ নাটকপ্রিয় দর্শকস্যা।"

ঢাকা প্রকাশ ঃ ২০শে ভাদ্র, ১২৮৮; ৪.৯.১৮৮১।

'নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানী'র প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার তাঁতিবাজারের যুবকদল নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করে। এ সম্পর্কে ঢাকা প্রকাশের মন্তব্য লক্ষণীয় ঃ

তাঁতিবাজারের থিয়েটার দল

"ঢাকা নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানি অভিনয় কার্য্যে সবিশেষ যশ আহরণ করিয়াছেন, নবাবপুরের সহিত ঢাকা তাঁতিবাজারের চির প্রতিযোগিতা। তাঁতিবাজার নবাবপুর ঈদৃশ যশোভাগিতায় অসহিষ্ণু হইয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, ঢাকা কোনো এক পণ্ডিতকে অগ্রণী করিয়া শীঘ্রই একটি অভিনয় কার্য্যে ব্রতী। তাঁহাদেরও সফলকাম হইবার সম্ভাবনা। বিশুদ্ধরূপে যত অভিনয় হয়, ততই ভাল। তাঁতিবাজারের বাবুরা অন্যান্য ভদ্র ও পদস্থ লোকদিগকে ও তাঁহাদের অভিনয় যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু নবাবপুরবাসীদিগকে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই এই তাঁহাদের বিশেষ প্রশংসা। শুনিতে পাই নবাবপুরের থিয়েটার দল প্রচলিত সংস্কৃত যাবতীয় নাটকের অনুবাদ করিয়া অভিনয় করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। ইহাদের এই সংকল্প অভিনয় কার্য্যের আর একটি পথ উৎঘাটিত করিতেছে। ইহাও শুনিতে পাই, উত্তর চরিত, বিক্রমোর্বশী, রত্নাবলী, নবীন সংহার নবাবপুরে গীতি নাট্যাকারে অনুবাদিত হইতেছে। শকুন্তলার অনুবাদ ও অভিনয় দেখিয়া আমরা ভরসা করি, নবাবপুর এ বিষয়ে

১. ঢাকা প্রকাশের পৃষ্ঠায় দুজন বসাকের নাম অনুপস্থিত, সেক্ষেত্রে মুদ্রিত হয়েছে (১) (২)।

অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে। যাহা হউক এই ব্যাপারে নবাবপুর তাঁতিবাজারের চিরন্তনী ঈর্ষা নিন্দনীয় প্রতিহিংসায় পরিণত না হয়। এই আমাদের বাসনা।"

ঢাকা প্রকাশ ঃ ১০ই শ্রাবণ, ১২৮৮; ২৪.৭.১৮৮১।

দীর্ঘদিন যাবত সংস্কারের অভাবে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ১৮৮৪ সনে যে গৃহ সংস্কারের উদ্যোগ দেখা দেয়, সে বিষয়ে ঢাকা প্রকাশেও দুটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহের সংস্কার

"পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গত বুধবারের সভায় অবধারণ করিয়াছেন যে, ৮০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উক্ত গৃহের জীর্ণসংস্কার করা হইবে এবং পুনরায় তথায় একখানি নাটকের অভিনয় হইবে। অভিনয়ার্থ উত্তর-চরিত নাটক মনোনীত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহটি ঢাকার টাউন হল, অধিকাংশ সভা সমিতিই তথায় অধিবিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা রক্ষা করার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।"

ঢাকা প্রকাশ ঃ ১৬ই বৈশাখ, ১২৯১ (১৮৮৪)।

'এখানকার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য লোক পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গৃহে পুনরায় নাটকাভিনয় করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এবার উত্তর রামচরিত নাটক অভিনয় হইবে অবধারিত হইয়াছে। ঢাকায় সাধারণ সভাসমিতির অধিবেশন করিতে হইলেই পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমির প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠাতৃদের অমনোযোগে সংপ্রতি উহার বিলোপ দশা আসন্নবর্ত্তিনী। পুনরায় নাটকাভিনয় উপলক্ষে যদি গৃহটির পুনঃ সংস্কার হয়—দীর্ঘস্থায়িতার উপায় হইতে পারে তাহা হইলে নাট্যামোদীদের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার একটি মহোপকার হয়, বলা বাহুল্য।"

ঢাকা প্রকাশ ঃ ১৪ পৌষ, ১২৯১; ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৪।

ঢাকায় জনসাধারণের আমোদ বা চিত্তরঞ্জনের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান ছিল ঐতিহাসিক জন্মাষ্টমী মিছিল। জাঁকজমকপূর্ণ এই মিছিল সম্পর্কে প্রকাশিত একটি সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

জন্মাষ্টমী মিছিল

"ঢাকা স্থানবাসি 'এ' সাক্ষরিত সংবাদদাতা লেখেন 'ঢাকা নগরের শ্রী-কৃষ্ণের জন্মতিথি দিবসে অর্থাৎ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে প্রতিবর্ষে মহাসমারোহ হয়, উক্ত নগরবাসি তন্তুবায়েরা নবাবপুরি ও ইসলামপুরি এই দুই নামে দুই দলে বিভক্ত হইয়া নানা সজ্জায় রাজপথে বহির্গত হইয়া অশ্রাব্য অশ্লীল গীত ইত্যাদি দ্বারা ইতর লোকের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকে। এবর্ষে অধিক সমারোহ হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে যাঁহারা সভ্য ভব্য বিদ্বান ও ভদ্র বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও এই কদর্য্য আমোদে আমোদী হইয়া সপরিবারে উৎসবদর্শনে ব্যগ্র হন।"

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ (রংপুর) ঃ ৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৬০।

ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দীতে এই মিছিলের প্রবর্তন হয়। Taylor সাহেবের 'Topography of Dacca' (১৮৪০) গ্রন্থে এই মিছিলের সূচনা সম্পর্কে বলা হয়— 'The time-honoured and celebrated procession of Nawabpur party dates from the year 982 B. S. corresponding to 1575 A. D., when Islam Khan Bahadur was the ruling Nawab of Dacca. It is started by Krishna Das Muchhodi, a Basak Dewan of the said Nabab, who helped in bringing out the procession with all his paraphernalia. প্রকাশ, ঢাকার নবাবপুর নিবাসী কৃষ্ণদাস মুচ্ছদী কুলদেবতা 'লক্ষ্মীনারায়ণ'-এর প্রীত্যর্থে প্রতি বৎসর এই মিছিল বের করতো। অনুমান ১৭২৫ সনে ইসলামপুরের পান্নিটোলানিবাসী গদাধর ও বলাইচাঁদ বসাক নামে দুজন ধনী ব্যক্তি তাঁদের ইষ্টদেবতার সন্তুষ্টির জন্য জাঁকজমকের সাথে আর একটি মিছিল বের করে। তারপর থেকে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নিয়মিত নবাবপুর ও ইসলামপুরের মধ্যে মিছিলের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। কার মিছিল আগে বেরুবে এই নিয়ে উভয় পক্ষে বহু বাকবিতণ্ডা হয়। অবশেষে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ঢাকার কমিশনার মিঃ ডেভিডসনের মধ্যস্থতায় স্থিরীকৃত হয় যে এক বৎসর নবাবপুরের মিছিল প্রথম দিন ও ইসলামপুরের মিছিল দ্বিতীয় দিন বেরুবে এবং পরবর্তী বৎসর ইসলামপুরের মিছিল প্রথম দিন ও নবাবপুরের মিছিল দ্বিতীয় দিন বেরুবে। ১৮৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলে সং-সাজের প্রচলন হয়। এই সংসাজের প্রচলনের ফলে কিছু স্থূল আমোদ ও অশ্লীলতা প্রশ্রয় পায়। সেকালে মিছিলের সঙ্গে বড় বড় সুসজ্জিত চৌকী বেরুতো। ১৯০১ সনের দিকে ঢাকার রাজপথে বিজলীবাতির তার খাটানোর পর চৌকীর প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়। তার বদলে প্রচলিত হয় চলন্ত গ্যালারীর। ১৯১৯ সন থেকে নবাবপুর ও ইসলামপুরের মিছিল আগস্ট মাসের নির্দিষ্ট দিনে বেরুতো। ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর মাসের পর ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিল আর বেরোয়নি।

চার

সেকালের পত্র-পত্রিকায়, নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী ছাড়া পুলিশ এবং ফিরিঙ্গীদের দৌরাত্ম্যেরও কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫৭-র সিপাহী বিপ্লবের পর ইংরেজ সরকার এদেশে নতুন নতুন ট্যাক্স বসাতে শুরু করে। সেকালের পত্র পত্রিকায় ক্ষীণকণ্ঠে হলেও তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ বা প্রতিবাদ প্রকাশ করা হয় ঃ

পুলিশ সৈন্যের অত্যাচার

"ঢাকা নিউস সম্পাদক বলেন, সম্প্রতি কয়েকজন মনিপুরনিবাসী পুলিশ সৈন্য ঢাকার বংশী বাজারের কয়েকজন চৌকিদারকে প্রহার করিয়াছে। পুলিশ সৈন্যদিগের প্রহার সহ্য করা সামান্য সাহস নহে।"

সোমপ্রকাশ ঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬১।

ফিরিঙ্গী অত্যাচার

"ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক বলেন, তত্রত্য ফিরিঙ্গি সেনারা অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারা সর্ব্বদাই দোকান প্রভৃতি লুট করে। ফিরিঙ্গিদিগের স্বভাব কত ভাল হইবে।"

সোমপ্রকাশ ঃ ২৯শে জুলাই, ১৮৬১।

ইনকামট্যাক্স

"ঢাকা নিউস সম্পাদক তত্রত্য আসেসরের কয়েকটি কার্য্যপটুতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আসেসর সকলকেই ফরম দিতেছেন। কে কে দিতে পারে কে না পারে তাহা বিবেচনা করিতেছেন না।".....

সোমপ্রকাশ ঃ ৪ঠা মার্চ, ১৮৬১।

ইনকামট্যাক্স

"এসেসরেরা কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া যত দিন বসিয়া ছিলেন, গবর্ণমেন্ট কৃপা করিয়া তাঁহারদিগের নিয়মিত বেতন প্রদানে ক্রটি করেন নাই। গবর্ণমেন্টের এইরূপ কৃপা অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। এসে সরেরা অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও কৃতজ্ঞ পুরুষ। তাঁহারা স্ব স্ব আন্তরিক অবিচলিত প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতা কার্য্যেও প্রকাশ করিতে বিলক্ষণ যত্ন পাইতেছেন। যাহার বার্ষিক আয় ২০০ টাকার ন্যূন, আইনে তাহার নিকট ট্যাক্স গ্রহণের বিধি নাই। কিন্তু এ প্রদেশের কোনো কোনো প্রভুভক্ত এসেসরের কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা নাই। যাহার বার্ষিক আয় ১৫০ টাকা তাহাকে আয়ের ঘরে আরো ৫০ টাকার অঙ্কপাত করিতে অনুরোধ করিতেছেন। যাহার আয় ১৯০ টাকা তাহাকে আরো ১০ টাকা লিখিয়া দিতে অনুমতি করিতেছেন। এইরূপে যাহার আয় ২০০ টাকার যত ন্যূন দেখেন, তাহাকে তৎপূরণ করিয়া দিতে ভুয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন। ইহা কি সামান্য প্রভুভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা চিহ্ন? জগতে এরূপ প্রভুভক্ত ও কৃতজ্ঞ পুরুষ কচিৎ জন্মগ্রহণ করেন। আমরা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করি, এমন খায়েরখাহ্ এসেসরদিগের বেতন শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি করিয়া দিন।"

ঢাকা প্রকাশ ঃ ৭ই মার্চ, ১৮৬১।

পান-তামাকের প্রতি ট্যাক্স

"আমাদিগের লেপটেনেন্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরও রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি লইয়া সিটেনকার সাহেবকে পান-তামাকের প্রতি ট্যাক্স স্থাপনার প্রস্তাব করিবার আদেশ করেন। তদনুসারে সিটেনকার সাহেব বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। উহার স্থূলমর্ম্ম এই, তামাকের ভূমির প্রতি কাঠায় চারি আনা এবং পানের ভূমির প্রতি কাঠায় অন্যূন তদ্দ্বিগুণ কর লওয়া যাইবে। এই করের দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা এদেশের খাল খনন, রাজপথ ও সেতু নির্ম্মাণ

প্রভৃতিতে ব্যয়িত হইবে। এই নূতন বিলের প্রস্তাবের কথা শুনিয়া আমাদিগের ত্রেতাযুগের কতকগুলি কথা মনে পড়িল। প্রস্তাবের বাহুল্য দোষ স্বীকার করিয়াও আমরা তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

'আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, ভয়ঙ্কর বিদ্রোহবহ্নি এক প্রকার প্রশমিত হইলে, উইলসন সাহেব যখন ভারতবর্ষে ইনকামটাক্স স্থাপনার প্রথম প্রস্তাব করেন, তখন বঙ্গদেশীয় অনেকে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করে যে, যেদেশে ন্যায্য ব্যয়াপেক্ষা আয়ের ন্যূনতা ঘটান হয়, সেই দেশেই নূতন ২ টাক্স স্থাপনার দ্বারা আয় ব্যয়ের সমতা বিধান আবশ্যকীয় হইয়া উঠে। বঙ্গদেশের বার্ষিক আয় এবং ন্যায্য ব্যয়ের পরস্পর তুলনা করিলে, ইহার ব্যয়াপেক্ষা আয়ের সংখ্যাই অধিকতর দৃষ্ট হয়। সুতরাং অধুনা এখানে কোনো প্রকার টাক্স স্থাপনার কিঁছু মাত্র আবশ্যক করে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতদ্রূপ স্থলেও গবর্ণমেণ্টে এদেশে ক্লেশকর ইনকামটাক্স স্থাপন করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত ন্যায়বিরুদ্ধ সন্দেহ নাই। গবর্ণমেন্টের এবম্প্রকার ন্যায় বিরুদ্ধানুষ্ঠানের কারণ অনুসন্ধান করিলে বোধ হয়, বিগত বিদ্রোহযজ্ঞে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনর্থক বহুল অর্থাহুতি প্রদান করিতে হইয়াছে, তদ্বশতঃ তাঁহাদিগের বিলক্ষণ অর্থাভাব ঘটিয়াছে, সেই অর্থাভাব নিরাকরণ করিবার নিমিত্তেই এক্ষণে ইনকাম টাক্সের প্রস্তাব করা হইতেছে।'...

ঢাকা প্রকাশ ঃ ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬১; ১১ই আশ্বিন, ১২৬৮।

সেকালের আদালতের অবস্থা আধুনিক কালের চেয়ে খুব বেশি উন্নত ছিল না। সেরেস্তাদের শোষণ নীতি সে যুগেও অব্যাহত ছিল। একটি দলীলের নকল সংগ্রহে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হতো নিম্নের সংবাদটি তারই পরিচয়বহ।

আদালতের ব্যয়

"ঢাকা নিউস সম্পাদক উচ্চ আদালতে দলিল অথবা অন্য অন্য কাগজের নকল লইতে যে ব্যয় হয় তাহার এক হিসাব দিয়াছেন।

	টাকা
ওকালত নামার ইষ্টাম্প	২
দলিল ফিরাইয়া লইবার আবেদনের ইষ্টাম্প নকল	২
নকল লইবার	ঐ
তাহা গ্রাহ্য করাইবার জন্য মুহরিকে	২
নকল ইষ্টাম্প	৭।।০
উক্ত লেখার ব্যয়	৩।।০
দুইজন মহাপেজকে	২
উকিলের ফি	৬
যথার্থ হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার কারণ	১

ইংরাজি নাম প্রভৃতির জন্য ।।০

কাগজ অন্বেষণ করিবার ব্যয় ১৪

সকল আদালতেই এই প্রকার যতদিবস বৃদ্ধ সেরেস্তাদাদ প্রভৃতিকে বিদায় দেওয়া না হইবে ততদিন এই অনিষ্ট দূর হইবে না।"

সোমপ্রকাশ (কলকাতা) ঃ ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৬১।

ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলওয়ে

"আমরা গত পূর্ব্ববারের ঢাকা প্রকাশে প্রকাশ করিয়াছি, প্রস্তাবিত ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে গোয়ালন্দ অথবা গোলন্দের নিম্নবর্ত্তিনী পদ্মার পরপারবর্ত্তী আরিচা বা শিবালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতেছে না; কেবল ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত এক লাইন এবং নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আর একটি ক্ষুদ্র লাইন হইয়াই ক্ষান্ত হইতেছে। এতদ্দ্বারা যে বাসনানুরূপ উপকার হইবে না, আমাদিগের ন্যায় অনেকেই উহা মুক্তকণ্ঠে উল্লেখ করিতেছেন, সত্য বটে উহা দ্বারা ঢাকা ও ময়মনসিংহের যৎকিঞ্চিৎ উপকার হইবে, কিন্তু রেলওয়ে বিস্তার দ্বারা যেরূপ প্রশান্ত উপকারের প্রত্যাশা গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত লাইন সম্প্রসারিত না থাকিলে তাহার কিছুই সুসিদ্ধ হইবে না।"...

ঢাকা প্রকাশ ঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

"ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে সম্বন্ধীয় কার্য্য এ বৎসরের জন্য সমাপ্ত হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা হইয়া ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত যে স্থান দিয়া লাইন যাইবে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং জরীপ কার্য্যও সমাপ্ত হইয়াছে। আগামী অক্টোবর মাসে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ হইবে।"

ঢাকা প্রকাশ ঃ ২৯শে এপ্রিল, ১৮৮২।

১৮৮৫ সনের জানুয়ারী মাসে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তারপর ১৮৮৬ সনের আগস্ট মাসে জয়দেবপুর পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হয়।

টেলিগ্রাফ

"ঢাকা চট্টগ্রাম আরাকান ও আকাব দিয়া ব্রহ্ম প্রদেশ পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তার স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ তারযোগে সংবাদ গতায়াত হইতেছে।"

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ (রংপুর) ঃ ২২ শে নভেম্বর, ১৮৬০।

১৮৫৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ম্যাক্‌গ্রেথ সাহেবের উদ্যোগে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে টেলিগ্রাফ যোগাযোগের কাজ শুরু হয়।[১] পরের বছর সে কাজ শেষ হয় এবং ঢাকা চট্টগ্রাম টেলিগ্রাফ চল্‌তে থাকে। ১৯৬০ সনে টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা চট্টগ্রাম থেকে আকিয়াব পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ঢাকা ও গোয়ালন্দের লাইন খোলা হয় ১৮৬০-এর পরে।

নিম্নে বিভিন্ন বিষয়ক কতকগুলি সংবাদ উদ্ধৃত করা গেল :

পাগলা গারদ

"ঢাকা পাগলা গারদের কয়েদিদিগকে অন্য অন্য কয়েদির ন্যায় কর্ম করিতে হইবে। তন্নিমিত্ত তথায় একটি কারখানাগৃহ প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে প্রতি মাসে ৪৩৮ টাকা ব্যয় হইবে। পাগল ভাল করিবার উত্তম পন্থা বটে।"

সোমপ্রকাশ (কলকাতা) ঃ ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১।

জন্মমৃত্যুর নির্দেশ লিপি

"... এদেশে জন্ম মৃত্যুর সাধারণ একটি রেজিষ্টর রাখিবার বিষয় আজ-পুরুষেরা অভিপ্রায় করিয়াছেন। পাঠকবর্গ এমন মনে করিবেন না, যে রেজিষ্টর রাখার প্রজাদের কিছু ব্যয় পড়িবেক। ব্যয় ও ক্লেশের সম্ভাবনা মাত্র নাই। কয়েকদিন হইল, আমাদের বিজ্ঞতম সিভিল সারজন শ্রীযুক্ত ডাক্তার জেমস ওয়াইজ সাহেবের প্রযত্নে এ উপলক্ষ্যে একটি সভা হইয়া আপাততঃ প্রশ্নটি ঢাকা নগরে প্রচলন করা সুস্থির হইয়াছে।[১] ঢাকার কিয়দংশ লইয়া কয়েকটি বিভাগ নির্দিষ্ট করা গিয়াছে, জন্মের একটি রেজিষ্টর এবং মৃত্যুর আর একটি রেজিষ্টর রাখা যাইবে। তাহাতে যে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।'...

জন্মবিষয়ক— ১। পিতার নাম, ২। পিতার ব্যবসায়, ৩। পিতার বাসস্থান, ৪। জন্মের তারিখ, ৫। পুত্র কি কন্যা, ৬। মৃত সন্তান, ৭। যমজ, ৮। মন্তব্য।

মৃত্যুবিষয়ক----১। মৃত ব্যক্তির নাম, ২। পিতার নাম, ৩। স্ত্রী কি পুরুষ, ৪। বাস, ৫। ব্যবসায়, ৬। মৃত্যুর তারিখ, ৭। যে পীড়াতে মৃত্যু হইল, ৮। কতদিবস পীড়া থাকে,। ৯। জন্মস্থান, ১০। মন্তব্য।

পল্লীবিজ্ঞান (ঢাকা) ঃ নভেম্বর, ১৮৬৭।

খাজা আবদুল গণী

"আমরা শুনিয়া যারপর নাই আহলাদিত হইলাম, এতদ্দেশের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত অনারেবল খাজে আবদুল গণি সাহেব সুপ্রিম কৌন্সেলের মেম্বর হইয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালার পক্ষে একটি সামান্য হর্ষের বিষয় নয়।"

পল্লীবিজ্ঞান (ঢাকা) ঃ নভেম্বর, ১৮৬৭।

ভাওয়ালের জমীদার

"বিজ্ঞাপনী" পত্র বলেন ভাওয়ালের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ চৌধুরী গবর্ণমেন্ট হইতে রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

সংবাদ প্রভাকর (কলিকাতা) ঃ ৩রা নভেম্বর, ১৮৬৫।

---

১. কেদারনাথ মজুমদার ঃ ঢাকার বিবরণ ; পৃঃ ১৯৫-৯৬।

আবগারী কাছারী নির্মাণ

"বিজ্ঞাপনী বলেন গবর্ণমেণ্ট হইতে ঢাকার আবগারী কাছারী নির্ম্মাণার্থ ৪৬৩৫ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। এই বৎসরের মধ্যেই কর্ম্মারম্ভ হইবে।"

সংবাদ প্রভাকর ঃ ৩রা নভেম্বর, ১৮৬৫।

ঢাকা ব্যাঙ্ক

"ঢাকা ব্যাঙ্ক বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের সহিত একত্র হওয়াতে উক্ত ব্যাঙ্কের অংশীরা বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের অংশী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। তাহারা প্রতি সহস্র টাকার অংশে ১৩৭৫ টাকা পাইবেন। ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অংশের মূল্য বিবেচনা করিলে ঢাকা ব্যাঙ্কের অংশীরা লাভই করিলেন।"

সোমপ্রকাশ ঃ ১৭ই মার্চ, ১৮৬২।

সৌজন্য স্বীকার ঃ

১. ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ঃ সোমপ্রকাশ (১৮৬০, ১৮৬১), সংবাদ প্রভাকর (১৮৬৫), পল্লী বিজ্ঞান (১৮৬৭), বঙ্গবন্ধু ((১৮৭৫), রঙ্পুর দিক্প্রকাশ (১৮৬০), ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১)।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী ঃ ঢাকা প্রকাশ (১৮৮১-৮২, ১৮৮৪)।

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ক. বাংলা গ্রন্থ

(অজ্ঞাত)	:	বাংলায় ভ্রমণ ১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৪০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	:	কল্লোল যুগ –১৯৫০
অনুপম হায়াত	:	নবাব পরিবারের ডায়েরীতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি, ঢাকা-২০০১
আদিনাথ সেন	:	দীননাথ সেনের জীবনী, ১ম খণ্ড-১৯৪৮
আনিসুজ্জামান	:	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ঢাকা ১৯৬৪
আবদুল কাদির	:	নজরুল প্রতিভার স্বরূপ – ঢাকা ১৯৮৯
আবুল কাশেম মুহম্মদ আদমউদ্দীন	:	পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস ঢাকা ১৯৬৯
আবুল ফজল	:	রেখাচিত্র – চট্টগ্রাম, ১৯৬৬
আবুল মনসুর আহমদ	:	আত্মকথা-ঢাকা ১৯৭৮
আর্থার লয়েড ক্লে	:	ঢাকা : ক্লের ডায়েরী – ফয়েজুল করীম অনূদিত
আলী আহমদ (সঙ্কলিত)	:	বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী– ঢাকা, ১৯৮৫
ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	:	কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন চরিত–১৩১৮
ইব্রাহীম খাঁ	:	বাতায়ন-ঢাকা ১৯৬৭
উপেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জী	:	চরিতাভিধান ঢাকা ১৯০৮
ওয়াকিল আহমদ	:	উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তাচেতনার ধারা ঢাকা ১৯৮৩
কাজী আবদুল ওদুদ	:	নজরুল প্রতিভা ১৯৪৯
কাজী নজরুল ইসলাম	:	নজরুল রচনাবলী ১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড ১৯৭৭
কায়কোবাদ	:	মহাশ্মশান ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৩৪
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম	:	চল্লিশের দশকে ঢাকা-১৯৯৪
কেদারনাথ মজুমদার	:	ঢাকার বিবরণ –১৩১৬
	:	বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য-ময়মনসিংহ ১৯১৭
খোন্দকার সিরাজুল হক	:	মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম– ঢাকা ১৯৮৪
গিরিশচন্দ্র সেন	:	আত্মজীবন, ১৮৭২
গোলাম মুরশিদ	:	সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলাদেশ–১৯৮৪
জসীম উদ্দীন	:	ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায়

জয়ন্ত গোস্বামী : সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন, কলিকাতা ১৯৭৪
জেমাস টেইলর : কোম্পানী আমলে ঢাকা (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত) ১৯৯০
তাফাজ্জল হোসেন, অধ্যক্ষ : স্মৃতিকণা।
দীনেশচন্দ্র সেন : প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মুসলমানের অবদান, ঢাকা ১৯৪০
নগেন্দ্রনাথ সেন : মধু-স্মৃতি-কলিকাতা ১৩৬১
নবীনচন্দ্র সেন : আমার জীবন-বসুমতী সংস্করণ
নাজির হোসেন : কিংবদন্তির ঢাকা, ৩য় সং ১৯৯৫
পরিতোষ সেন : জিন্দাবাহার – ১৯৯৮
প্রশান্ত কুমার পাল : রবি জীবনী- ১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড-কলিকাতা ১৩৮৯-১৩৯৫
বরুণ কুমার চক্রবর্তী : বাংলা প্রবাদ : স্থান কাল পাত্র কলিকাতা ১৯৮৪
বঙ্গেশ্বর রায় : ঢাকা আমার ঢাকা-কলকাতা ১৯৯০
বিনয় ঘোষ : (সম্পা) সাময়িক পত্রেসমাজচিত্র ১ম-৫ম খণ্ড কলিকাতা
বিপিন বিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ (২য় পর্যায়)
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস– কলিকাতা ১৩৫৩
: বাংলা সাময়িকপত্র -১ম খণ্ড ১৩৫৪
: বাংলা সাময়িকপত্র ২য় খণ্ড ১৩৫৮
: সংবাদপত্রে সেকালের কথা– ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ
: সাহিত্য সাধক চরিতমালার কয়েকটি খণ্ড
ব্রাডলি বার্ট : প্রাচ্যের রহস্য নগরী (রহিমউদ্দিন সিদ্দিকী অনূদিত), ১৩৭২
মুনতাসির মামুন : উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার-ঢাকা, ১৯৭৯
: উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সভা সমিতি, ঢাকা, ১৯৮৪
: উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র– ১ম-৪র্থ ১৯৮৫-১৯৯১
: উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ-ঢাকা ১৯৮৬
: কালীপ্রসন্ন ঘোষ-ঢাকা ১৯৮৮
মুহম্মদ এনামুল হক : বুলগেরিয়া ভ্রমণ-১৯৭৮
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ব্যঞ্জনবর্ণ ঢাকা-১৯৬৫
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম : সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ –১৯৯০
: চকবাজারের কেতাবপট্টি ১৯৯০
: উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্যও সংস্কৃতি ১৯৯০
: বাঙালি প্রণীত প্রথম বাংলা অভিধান, ঢাকা ২০০২

	:	নানা প্রসঙ্গে নজরুল, ২০০২
	:	নজরুল সংবর্ধনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ২০০৮
যতীন সরকার	:	কেদারনাথ মজুমদার (জীবনী) ঢাকা ১৯৮৭
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	:	মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জিকা (১৮৫৩-৬৭) কলিকাতা, ১৯৯৩
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	:	বিক্রমপুরের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩১৬
যোগেন্দ্রনাথ বসু	:	মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ১৯২৫
যোগেশচন্দ্র বাগল	:	ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, কলকাতা, ১৯৬৩
রজনীকান্ত গুপ্ত	:	সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ১৯৮২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	:	জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, পৌষ, ১৩৮২
রাজিয়া সুলতানা	:	(সম্পাদনা) আবদুল হাকিম, রচনাবলী, ১৯৮৯
শামসুর রহমান	:	স্মৃতির শহর, ঢাকা ১৯৯০
শিবনাথ শাস্ত্রী	:	আত্মচরিত, ১৩৫৯
সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ	:	সাহিত্য সেবক মঞ্জুষা, ১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৮৩-৫
	:	বঙ্গীয় সাহিত্যকোষ, শেষ খণ্ড, কলিকাতা ১৯৮৩
সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী	:	বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি ১৯৭৩
সুকুমার সেন	:	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড ১৩৭০
	:	ইসলামী বাংলা সাহিত্য ১৩৮০
	:	বটতলার ছাপা ও ছবি, কলিকাতা ১৯৮৪
সুশান্ত সরকার	:	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ঢাকা ১৯৮৯
সৈয়দ আবুল মকসুদ	:	গোবিন্দচন্দ্র দাস, ঢাকা, ১৯৮৭
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	:	বঙ্গভাষার লেখক, ১ম সংস্করণ
হাকীম হাবীবুর রহমান	:	ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে (হাশেম সুফী অনূদিত) ১৯৯৫
হেমলতা সরকার	:	স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র, ১৯১৫ কলিকাতা

খ. দোভাষী পুঁথি

আবদুল গফুর	:	খয়রবরকৎ ঢাকা, ১৮৭০
আব্বাস আলী	:	গোলজারে এসলাম-ঢাকা ১৮৮১
গোলাম মওলা	:	শাহরুমের কেচ্ছা, ১৮৮০
ফকির গরীবুল্লাহ	:	রৌসনল মোমেনিন, ২য় সংস্করণ-কলকাতা, ১৮৬৭
	:	দেলারাম-কলকাতা, ১৮৮২
	:	দেল রৌসন-কলকাতা ১৮৬৮
	:	ইবলিছনামার পুঁথি-কলকাতা, ১৮৭০
	:	নেক বিবির কেচ্ছা-কলকাতা, ১৮৭৯
বশিরুদ্দিন আহমদ	:	গোল গুনাহর চন্দ্রমুখী, ঢাকা, ১৮৮০

মনিরুদ্দিন ডাক্তার : চামানে নওবাহার-ঢাকা, ১৮৮০
মালে মোহাম্মদ : ছয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল-ঢাকা, ১৮৭৫
: আহকামল জুম্মা-ঢাকা, ১৮৭৬
: তাম্বিয়াতন নেছা, কলিকাতা, ১৮৭৪
: জরুরাতল এসলাম-কলিকাতা, ১৮৮১
মোহাম্মদ ঘিনু : আশক কামাল-ঢাকা, ১৮৬৯
: আশক জঞ্জাল-ঢাকা, ১৮৭৯
মো. জহির উদ্দিন : তালেনামা– দ্বিতীয় ভাগ-ঢাকা, ১৮৬৭
: এস্কে আজায়েব (১ম জেলেদ)-ঢাকা, ১৮৭৭
: ওমর উমাইয়া-ঢাকা, ১৮৭৪
: আয়েনুল মোমেনিন-ঢাকা, ১৮৯৬
: আজাবুল কবর-ঢাকা, ১৯০০
মো. ফয়েজউদ্দিন : ১৩০ ফরজের ছহি বয়ান-ঢাকা ১৮৬৮
: তালেনামা– ১ম ভাগ-ঢাকা, ১৮৬৭
: নাজাতোল মোছলেমিন-ঢাকা, ১৮৭৯
: আহকামোচ্ছালাত-ঢাকা ১৮৮০
: তেরছদ্দির পুঁথি-ঢাকা, ১৮৮০
: নক্সে সোলামানী-ঢাকা, ১৮৮৪
: আদম-ফিল হাদিস-ঢাকা, ১৮৮৫
: মধুমালার পুঁথি, ১৮৮৫
সৈয়দ জান : নছিহত নামা-ঢাকা, ১৮৬৮
হায়দার জান : হায়রাতুল আফলাক, ১৮৬৮
: খলিল গোলজার-ঢাকা, ১৮৭৪
: এস্কে আজায়েব, দ্বিতীয় জেলেদ-ঢাকা, ১৮৭৭

গ. ইংরেজী গ্রন্থ

A.B.M. Habibullah : Discriptive Catalogue of Persian, Urdu and Arabic Manscripts in the Dacca University Library, Vol and II
A. H. Dani : Dacca, 1962
Azimusshan Haider : A city and its body-Dhaka 1966
B. C. Allen : Eastern Bengal District Gazetters, Dacca.
Graham Shaw : Printing in Calcutta to 1800
James Wise : Notes on the Races, Rastes and Trades of Eastern Bengal-London 1883.
M.A Rahim : The history of the University Dhaka -1981

Sharifuddin Ahmed (ed.) : Dhaka—Past, Present and Future-Dhaka 1991
Sufia Ahmed : Muslim Community in Bengal (1884-1912)
Syed Murtuza Ali : Personality Profiles, Dhaka, 1965
William Crooke (ed.) : Hobson Jobson, Calcutta 1990

ঘ. সাময়িকপত্র, বর্ষপঞ্জি ও স্মরণিকা

অনুসন্ধান : পৌষ ১২৯৫, ফাল্গুন ১২৯৮
অভিযান : ভাদ্র ১৩৩৩
অমৃত : ৬ কার্তিক ১৩৭১
আজাদ (দৈনিক) : ১০ অক্টোবর ১৯৬৪
আর্মানীটোলা স্কুল : ছাত্র পুনর্মিলনী স্মরণিকা ১৯৯৩
জনকণ্ঠ (দৈনিক) : ১৫ জুলাই ১৯৯৫
ঢাকা প্রকাশ : ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে রক্ষিত (১৮৬১ খণ্ড)
: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষিত খণ্ডাবলী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা : পৌষ ১৩৮৫, আষাঢ়, ১৩৮৬
ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী : বার্ষিক কার্যবিবরণ ১৮৮৩
ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন : ১৩২৫-১৩২৮
দেশ : সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭
নজরুল একাডেমী পত্রিকা : বৈশাখ-জৈষ্ঠ ১৩৭৬
নবনূর : শ্রাবণ ১৩১১
নবপঞ্জিকা : ১২৮৪
নববার্ষিকী : ১২৮৭
পল্লীবিজ্ঞান : ১৮৬৭
প্রতিভা : অগ্রহায়ণ ১৩২৫
প্রবাহ : ২৫ জুন, ১৯৫৮ আগস্ট ১৯৬৭
বই : নভেম্বর ১৯৬৭,
বক্তব্য : ১৯৭৭, নভেম্বর ১৯৮৪
বঙ্গদর্শন : চৈত্র ১২৮৭
বঙ্গবন্ধু : অগ্রহায়ণ ১৩১৬
বার্ষিক সওগাত : ১৩৩১
বাংলা একাডেমী পত্রিকা : মাঘ চৈত্র ১৯৬৬, মাঘ চৈত্র ১৩৭২
বান্ধব : ১-১১তম বর্ষ, নবপর্যায় ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড
বিচিত্রা : মার্চ ১৯৮৯
বুলবুল : পৌষ-চৈত্র ১৩৪০
ভাষা-সাহিত্য পত্র : ৫ম বর্ষ ১৩৮৪, ৭ম বর্ষ ১৩৮৬
মানসী : কার্তিক ১৩২২